তুমি জানোনি

একটি জীবনের না-বলা প্রেমকথা

ফারিস হাকিম

তুমি জানো নি

বাংলাদেশে প্রথম প্রকাশ: ১০ আগস্ট ২০২৬

প্রকাশক

কেএমএফ পাবলিশার্স
(ISIN: 000000050389326X)
(RJSC&F: P-48328/2022)

ডিওআই (DOI):

https://doi.org/10.64907/xkmf.book.b2.15.08.26

আইএসবিএন (ISBN): 978-984-35-9742-7

কিউআর (DR) কোড

978-984-35-9742-7

কম্পিউটার সম্পাদনা: কেএমএফ সাইবার সলিউশনস

মুদ্রণ: কেএমএফ প্রিন্টারস

মূল্য:

মুদ্রিত সংস্করণ: বাংলাদেশে ৬০০.০০ টাকা
আন্তর্জাতিক মূল্য: ৩০.০০ মার্কিন ডলার
(আন্তর্জাতিক পরিবহন/ডাক খরচ ব্যতীত)

ডিজিটাল সংস্করণ: উন্মুক্ত প্রবেশাধিকার (Open Access)

বারকোড

978-984-35-9742-7

প্রকাশকের কথা

তুমি জানোনি কেবল একটি প্রেমের কবিতার বই নয়; এটি সময়, স্মৃতি এবং না-বলা অনুভূতির এক দীর্ঘ কাব্যিক যাত্রা। বিশ্ববিদ্যালয় জীবনের একটি প্রথম দেখা থেকে জন্ম নেওয়া অনুভব সময়ের সঙ্গে দূরত্ব, স্মৃতি ও মমতায় রূপ নিয়েছে। বহু বছর পেরিয়েও সেই স্মৃতি হারিয়ে যায়নি; বরং নতুন ভাষায় ফিরে এসেছে কবিতার পাতায়।

এই গ্রন্থে ভালোবাসা কোনো অধিকার বা প্রাপ্তির দাবি নয়। এখানে ভালোবাসা কখনো অপেক্ষা, কখনো নীরবতা, কখনো দূর থেকে প্রিয় মানুষের ভালো থাকাকে কামনা করা।

পাঠক এই কবিতাগুলোর মধ্যে হয়তো লেখকের ব্যক্তিগত স্মৃতির পাশাপাশি নিজের জীবনের কোনো হারিয়ে যাওয়া সময়, মুখ কিংবা না-বলা কথাকেও খুঁজে পাবেন।

প্রকাশক

লেখকের কথা

কিছু কথা সময়মতো বলা হয় না। কিছু অনুভূতি প্রকাশের আগেই স্মৃতি হয়ে যায়। আর কিছু মানুষ জীবন থেকে দূরে চলে গেলেও মনের কোনো এক নির্জন জায়গায় থেকে যায়।

তুমি জানোনি তেমনই কিছু না-বলা কথার ফিরে আসা। যে অনুভূতির জন্ম বিশ্ববিদ্যালয় জীবনে, তাকে আমি কোনো প্রাপ্তি বা অধিকারের গল্প হিসেবে লিখিনি। সময় ও দূরত্ব পেরিয়ে স্মৃতিতে যা রয়ে গেছে, কবিতায় শুধু সেটুকুই ধরতে চেয়েছি।

এ বইয়ের কবিতাগুলো তাই কাউকে ফিরে পাওয়ার আহ্বান নয়; বরং একসময় নিঃশব্দে ভালোবেসেছিলাম-সেই অনুভূতির প্রতি আমার স্বীকারোক্তি।

সব কথা যাকে নিয়ে লেখা, তাকে সব কথা জানতেই হবে-এমন নয়।

কিছু কথা কবিতা হয়ে থাকাই হয়তো সুন্দর।

ফারিস হাকিম

সূচিপত্র

কবিতার নাম	পৃষ্ঠা	কবিতার নাম	পৃষ্ঠা
১. প্রথম দেখা ১৯৯০	৫	৩১. পুরোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে	২২৫
২. তোমাকে দেখার পরের দিন	৭	৩২. আমাদের সেই করিডোর	২৩৪
৩. ক্যাম্পাসের সেই পথ	৯	৩৩. বেঞ্চটি কি এখনো আছে?	২৪৩
৪. আমার অপ্রকাশিত পৃথিবী	১২	৩৪. হারিয়ে যাওয়া পাণ্ডুলিপি	২৫১
৫. প্রথম গোপন পঙ্ক্তি	১৭	৩৫. কাগজ হারিয়েছে, তুমি নও	২৬১
৬. তোমার পাশ দিয়ে হেঁটে যাওয়া	২৪	৩৬. আবার কলম ধরলাম	২৭১
৭. একটি বেঞ্চ, দুটি নীরবতা	৩১	৩৭. ঘাটের কাছে দাঁড়িয়ে	২৮০
৮. তোমার চোখের কাছে পরাজয়	৪০	৩৮. আয়নায় সেই তরুণ	২৮৯
৯. ক্লাস শেষে তুমি	৪৯	৩৯. তোমারও কি বয়স বেড়েছে?	২৯৯
১০. যেদিন অপেক্ষার জন্ম হলো	৫৯	৪০. স্মৃতিতে তোমার বয়স বাড়ে না	৩০৯
১১. তোমার নাম লিখিনি	৭১	৪১. যদি আজ তোমাকে দেখি	৩১৬
১২. অপ্রেরিত প্রথম চিঠি	৮৪	৪২. চিনতে পারব তো?	৩২৫
১৩. একটু কথা বলবে?	৮৮	৪৩. তোমার চোখ কি একই আছে?	৩৩৪
১৪. তোমার হাসির দিন	৯৩	৪৪. সময় তোমাকে বদলেছে কতটুকু	৩৪২
১৫. যে বিকেল আর ফেরেনি	৯৭	৪৫. আমার স্মৃতির তুমি	৩৪৯
১৬. আমার গোপন পাণ্ডুলিপি	১০৪	৪৬. তোমাকে আর চাই না-তবু ভালোবাসি	৩৫৭
১৭. পাতার পর পাতায় তুমি	১১১	৪৭. অধিকারহীন প্রেম	৩৬৫
১৮. তুমি কি কিছু বুঝেছিলে?	১১৮	৪৮. তোমার জীবনে আমার কোনো দাবি নেই	৩৭৫
১৯. ভালোবাসি-বলতে পারিনি	১২৫	৪৯. দূর থেকেই ভালো থেকো	৩৮৩
২০. তোমার নীরব উত্তর	১৩৫	৫০. ক্ষমা করো আমার কবিতাগুলোকে	৩৯০
২১. যেদিন তুমি বারণ করলে	১৪২	৫১. যদি কখনো পড়ে থাকো	৩৯৮

কবিতার নাম	পৃষ্ঠা
২২. আমি থেমে গেলাম	১৫০
২৩. তোমার সীমানার বাইরে	১৬০
২৪. শেষবার সামনে থেকে	১৭০
২৫. তারপর ত্রিশ বছর	১৭৭
২৬. দূরত্বেরও একটি ভাষা আছে	১৮৫
২৭. খোঁজ নিইনি, ভুলিওনি	১৯৩
২৮. তোমাকে না দেখার অভ্যাস	২০২
২৯. শহরে তুমি আছো	২১০
৫২. একদিন যদি মনে পড়ে	৪০৭
৫৩. আমাকে নয়, সেই ছেলেটিকে মনে রেখো	৪১৫
৫৪. ১৯৯০-এর ছেলেটি এখনো বেঁচে আছে	৪২৩
৫৫. আমরা দুজনেই এখন প্রায় ষাট	৪৩৩
৫৬. শেষ বয়সের প্রথম প্রেম	৪৪৪
৫৭. ভালোবাসা কি সত্যিই শেষ হয়?	৪৫৩
৫৮. তোমার জন্য শেষ প্রার্থনা	৪৬১
৫৯. যেদিন আর লিখব না	৪৬৯

প্রথম দেখা ১৯৯০

তোমায় দেবো নাকো তৃপ্তি বিভোর সুখের মেতে,
অন্তর আমার সইবে নাকো তোমার বেদনার চিৎকারে।

সেদিন তোমায় প্রথম দেখি বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে,
কী যে হলো-আজও তাহার উত্তর খুঁজি গোপনে।
চারদিকে কত মুখ ছিল, কত কোলাহলের ঢেউ,
তবু কেন সেই জনারণ্যে চোখে পড়লে শুধু তুমি একা কেউ।

তুমি কি জানো-একটি ক্ষণও দীর্ঘ জীবন হতে পারে?
একটি চাহনি ত্রিশটি বছর নীরব হয়ে জেগে থাকে?
তুমি হেঁটে গেলে-পথের ধুলো পথেই পড়ে রইল,
শুধু আমার তরুণ হৃদয় তোমার পিছু হারিয়ে গেল।

সেদিন তোমার চোখে আমি কী দেখেছিলাম, জানি না,
হয়তো কোনো দূর আকাশের অচেনা এক ঠিকানা।
হয়তো ছিল সাধারণই-আমিই অসাধারণ করে
রেখেছিলাম সেই মুহূর্ত বুকের গোপন ঘরে।

বলিনি তোমায়-"ভালোবাসি", শব্দটি বড় ছোট,
আমার কাছে ভালোবাসা ছিল অনন্ত কোনো শপথ।
তোমার হাসির পাশে যেন আমার দাবি নাহি থাকে,
তোমার চলার স্বাধীনতায় আমার ছায়া নাহি আঁকে।

তবু লিখেছি-পাতার পরে পাতা, রাত্রির পরে রাত,
তোমার নামে গড়ে উঠেছিল আমার গোপন কাব্যপ্রাসাদ।
কালির অক্ষর জানত শুধু অপ্রকাশিত সেই কথা-
একটি মেয়ের প্রথম দেখায় বদলে গিয়েছিল জীবনের ব্যাকরণটা।

সে পাণ্ডুলিপি আজ হারিয়েছে-কোথায়, কে তা জানে!
হয়তো কোনো পুরোনো বাক্সে, হয়তো বিস্মৃতির গানে।
কিন্তু আশ্চর্য-কাগজ হারায়, অক্ষর মুছে যায়,
প্রথম দেখার সেই বিকেলটি কেন কখনো হারায় নাই?

তারপর জীবন নদীর মতো কত দূরে বয়ে গেল,
কত বসন্ত এলো-গেল, কত পরিচিত মুখ বদলাল।

তুমি বলেছিলে-দূরে থেকো; আমি দূরেই থেকে গেলাম,
তোমার ইচ্ছার সীমানাটুকু নীরবে মেনে নিলাম।

সামনে গিয়ে দেখিনি তোমায় প্রায় ত্রিশটি বছর,
তবু স্মৃতির বিশ্ববিদ্যালয়ে তুমি সেই প্রথম প্রহর।
সেখানে এখনো তরুণ তুমি, আমিও তরুণ কবি,
একটি মুহূর্তের ভিতর দাঁড়িয়ে-দুজনেই চিরনবীন ছবি।

আজ আমাদের চুলে হয়তো সময় রুপালি রেখা আঁকে,
ষাটের কাছাকাছি জীবন এসে পুরোনো দরজায় ডাকে।
তবু ১৯৯০-এর সেই ছেলেটি আমার ভিতর আজও
প্রথম তোমায় দেখার ক্ষণে থমকে দাঁড়ায়-নিঃশব্দে।

আমি তোমায় পাওয়ার জন্য ভালোবাসিনি কোনোদিন,
পাওয়া-না-পাওয়ার হিসাব করলে প্রেম হয়ে যায় ঋণ।
তুমি যেখানে ভালো থেকো-সেই হোক আমার প্রার্থনা,
আমার কাছে প্রেম মানে তো তোমার প্রতি কোনো দাবি না।

যদি কোনোদিন বাতাস বয়ে পুরোনো ক্যাম্পাস ছুঁয়ে যায়,
যদি কোনো পরিচিত পথ হঠাৎ তোমাকে পেছন ফিরে তাকায়-
জেনো, সেই পথের কোনো এক বিস্মৃত প্রান্তরে
একটি প্রথম দেখা আজও কবিতা হয়ে ঝরে।

তোমায় দেবো নাকো তৃপ্তি বিভোর সুখের মেতে,
তোমার স্বাধীন আকাশ থাকুক তোমারই হাতে।
শুধু আমার যতদিন এই শব্দেরা বেঁচে রবে-
প্রথম দেখার সেই মেয়েটি আমার কবিতায় থেকে যাবে।

তোমাকে দেখার পরের দিন

সকাল হলো-অথচ কেন সকালটা আর আগের মতো নয়,
জানালাজুড়ে রোদের ভেতর কার যেন মুখ কথা কয়।
গতকাল তুমি হেঁটে গেলে-অতি সাধারণ পথ ধরে,
আজ সে পথই কেমন যেন ডাকছে আমায় নাম না ধরে।

রাতটা আমার কেটেছিল কি ঘুমে, না কোনো ঘোরে?
চোখ বুজলেই তোমার মুখটি ভেসে উঠেছে অন্ধকারে।
আমি তখন বুঝিনি প্রেম-কী তার সংজ্ঞা, কী পরিচয়,
শুধু বুঝেছি, তোমায় দেখার পর থেকে আমি আর আগের আমি নই।

বিশ্ববিদ্যালয়ের পথে আবার সকালবেলা যাই,
অকারণেই পরিচিত মুখের ভিড়ে তোমাকেই খুঁজে বেড়াই।
ক্লাসের ঘণ্টা বাজছে দূরে, বন্ধুরা সব কথা বলে,
আমার মনটি পড়ে আছে গতকালের সেই পথের তলে।

কত মেয়ে হেঁটে যায়-কত রঙের পোশাক পরে,
কত হাসি বাতাস ছোঁয়, কত কথা যায় কানে ঝরে;
তবু কেন একটি মুখই সমস্ত মুখকে ঢেকে দেয়?
কেন তোমার না-থাকাটাও তোমার থাকার মতো মনে হয়?

বই খুলেছি-অক্ষরগুলো আজকে বড় অবাধ্য,
একটি লাইন পড়তে গিয়ে হারিয়ে ফেলি পরের বাক্য।
পাতার সাদা শূন্যতায় কে যেন তোমার ছবি আঁকে,
কলম আমার নিজের অজান্তে থেমে থাকে তোমার নামে।

তখনও তোমার নামটি হয়তো হৃদয় জানত না,
তোমার ঘর, তোমার পৃথিবী-কিছুই আমার জানা না।
জানতাম শুধু, গতকাল এক অপরিচিত মুখের কাছে
আমার সমস্ত পরিচিত পৃথিবী হঠাৎ অপরিচিত হয়েছে।

দুপুর গড়িয়ে বিকেল এলো-ক্যাম্পাস হলো ছায়াময়,
যে পথে তোমায় প্রথম দেখি, সেই পথ ধরে হাঁটি নির্ভয়।
ভাবি-হয়তো আবার তুমি ওই বাঁকটিতে এসে দাঁড়াবে,
হয়তো আমার দিকে নয়-অন্য কোথাও তাকিয়ে চলে যাবে।

তাতেই বা কী? তোমার চোখে চোখ রাখার দাবি ছিল না,
তোমার পাশে হাঁটার কোনো অধিকারও চাইনি সেদিন।
শুধু দূর থেকে আর একবার তোমাকে দেখার ইচ্ছাটুকু
কী আশ্চর্য এক ব্যাকুলতায় ভরিয়ে দিয়েছিল তরুণ বুক।

সন্ধ্যা নামল। তুমি এলে না। পথটাও হলো ফাঁকা,
আমি ফিরলাম-তবু মনে হলো কিছু যেন রয়ে গেল একা।
কী রেখে এলাম জানি না-কোনো স্বপ্ন, কোনো অপেক্ষা?
নাকি আমার প্রথম যৌবন রেখে এলাম তোমার দেখা পথে?

সেই রাতে প্রথম বুঝি-অপেক্ষারও জন্মদিন আছে,
কারও অনুপস্থিতি কখনো উপস্থিতির চেয়েও কাছে।
মানুষকে একদিন দেখেও পরদিন তাকে খোঁজা যায়-
একটি মুখ না দেখার ব্যথা বুকের ভেতর বাজতে চায়।

আজ এত বছর পরে যখন সেই সকালটি মনে পড়ে,
ভাবি-কী সরল ছিলাম আমি সেই উনিশশো নব্বইয়ের ভোরে!
জানতাম না, তোমাকে খোঁজা একদিন থামিয়ে দিতে হবে,
জানতাম না, না-দেখার মধ্যেও এত দীর্ঘ ভালোবাসা রবে।

যদি সেদিনের আমি জানত আজকের আমার কথা-
হয়তো অবাক হয়ে বলত, "এতদিনও থাকে প্রথম দেখা?"
আমি তাকে শুধু বলতাম-**"সব ভালোবাসা কাছে ডাকে না,**
কিছু ভালোবাসা দূরে থেকেও সারাজীবন ফুরায় না।"

ক্যাম্পাসের সেই পথ

ক্যাম্পাসের সেই পথটি আজও কি তেমন আছে,
দুপুর শেষে নরম রোদ কি গাছের পাতায় নাচে?
আজও কি ক্লাস ভাঙলে সেখানে তরুণেরা ভিড় করে,
কেউ কি কাউকে প্রথম দেখে হঠাৎ থমকে দাঁড়ায় পথের ’পরে?

আমার কাছে সেই পথটি পথ ছিল না আর,
তুমি একদিন হেঁটেছিলে-তাই হয়েছিল অন্যরকম তার।
ইট-পাথরের সাধারণ পথ, ধুলো-মাখা চেনা বাঁক,
তোমার পায়ের ছোঁয়া পেয়ে হয়ে গেল স্মৃতির পবিত্র ফাঁক।

কতবার যে হেঁটেছি পরে সেই একই পথ ধরে,
কখনো ধীরে, কখনো শুধু তোমায় দেখব বলে।
কাউকে বলিনি কেন আমার ক্লাস শেষে এত দেরি,
কেন অকারণ ঘুরে বেড়াই-কীসের আশায় পথের ফেরি।

তুমি হয়তো বন্ধুদের সঙ্গে গল্প করতে করতে যেতে,
আমি হয়তো অনেক দূরে-চোখ নামিয়ে দাঁড়িয়ে পথে।
তোমার হাসির শব্দটুকুও যদি বাতাস বয়ে আনত,
আমার সমস্ত বিকেল তখন অকারণেই ভালো লাগত।

কখনো তুমি সামনে এলে আমি অন্যদিকে চাইতাম,
মনের ভেতর ঝড় উঠলেও বাইরে শান্তই থাকতাম।
কী আশ্চর্য সেই বয়স-কাছে যেতে মন যে চায়,
আবার কাছে এলেই কেন সমস্ত ভাষা হারিয়ে যায়!

আমি চাইনি পথ আটকাতে, চাইনি তোমার সময় নিতে,
শুধু একই পথে কিছুদূর নীরবে চেয়েছি হেঁটে যেতে।
তুমি জানতে না-তোমার কয়েকটি নিরীহ পদক্ষেপ
কারও জীবনে লিখে দিচ্ছে অদৃশ্য এক দীর্ঘ অনুচ্ছেদ।

কখনো তুমি আসতে না-তবু পথটি ছেড়ে যেতাম না,
যুক্তি দিয়ে তরুণ মনকে তখন বোঝাতে পারতাম না।
ভাবতাম, ওই বাঁকের পরে হঠাৎ যদি দেখা মেলে,
এক মুহূর্তের সেই দেখাতেই দিনটি যাবে আলো জ্বেলে।

বৃষ্টি এলে সেই পথটার রং বদলে যেত ধীরে,
ভেজা পাতার গন্ধ নামত বিশ্ববিদ্যালয় ঘিরে।
তখনও মনে হতো-এই বৃষ্টির কোনো এক প্রান্তে
তুমিও বুঝি দাঁড়িয়ে আছো ছাতা হাতে, আপনমনে।

শীতের সকালে কুয়াশাতে পথ হারাত দূর সীমানা,
তবু তোমাকে চিনতে আমার প্রয়োজন হতো না ঠিকানা।
শত মানুষের চলার মাঝে একটি চলন আলাদা ছিল-
দূর থেকেই বুঝতাম আমি, ওই তো তুমি-হৃদয় বলত।

বসন্ত এলে কৃষ্ণচূড়ায় আগুন ধরত কি না মনে নেই,
মনে আছে শুধু তোমার উপস্থিতিতে রঙিন হতো দিনগুলো সেই।
প্রকৃতির কত সৌন্দর্য তখন চোখের সামনে ছিল,
তবু আমার তরুণ চোখে একটি মানুষই ঋতু হয়ে মিলল।

তারপর একদিন সেই পথেই সময় বদলাতে থাকে,
কাছে যাওয়ার ইচ্ছাগুলো নীরব হতে শেখে।
যে পথ একদিন তোমাকে দেখার অজুহাত হয়েছিল,
সেই পথই পরে তোমাকে না-দেখার শিক্ষা দিয়েছিল।

জীবন আমাকে নিয়ে গেছে কত শহর, কত পথে,
কত প্রশস্ত রাজপথ পেরিয়েছি প্রয়োজনের রথে।
তবু পৃথিবীর কোনো পথই সেই পথটির মতো নয়-
যেখানে প্রথম অপেক্ষা শিখেছিল এক তরুণ হৃদয়।

আজ যদি আবার ফিরে যাই সেই পুরোনো প্রাঙ্গণে,
হয়তো কিছুই চিনব না সময়ের নতুন আয়োজনে।
নতুন ভবন, নতুন মুখ, নতুন প্রজন্মের কোলাহল-
শুধু আমার চোখ খুঁজবে একটি হারিয়ে যাওয়া বিকেল।

হয়তো দাঁড়াব সেই জায়গাটায়, যেখানে দাঁড়াতাম চুপ করে,
কিন্তু এবার তোমার আসার অপেক্ষা করব না পথের ’পরে।
কারণ এতদিনে বুঝেছি-স্মৃতিকে ফিরিয়ে আনতে নেই,
যে মুহূর্ত সুন্দর হয়ে গেছে, তাকে বর্তমানের কাছে চাইতে নেই।

তবু সেই পথকে মনে মনে একটি কথা বলে আসব-
“তুমি তাকে দেখেছিলে প্রতিদিন, যখন আমি শুধু দূর থেকে ভালোবাসতাম।

আমি চলে গেছি বহু দূরে, সময়ও গেছে বহুদূর-
তুমি আমার হয়ে রেখো সেই তরুণীর কয়েকটি পদচিহ্নের নূপুর।”

আর যদি কোনো সন্ধ্যায় বাতাস পুরোনো পাতায় কথা কয়,
আমার হারানো বয়সটুকু যদি সেখানে ফিরে রয়-
পথ, তুমি তাকে বলো না আমার দীর্ঘ অপেক্ষার কথা,
শুধু বলো-এক তরুণ একদিন এখানে শিখেছিল
ভালোবাসার জন্য পাশাপাশি হাঁটতেই হয় না।

আমার অপ্রকাশিত পৃথিবী

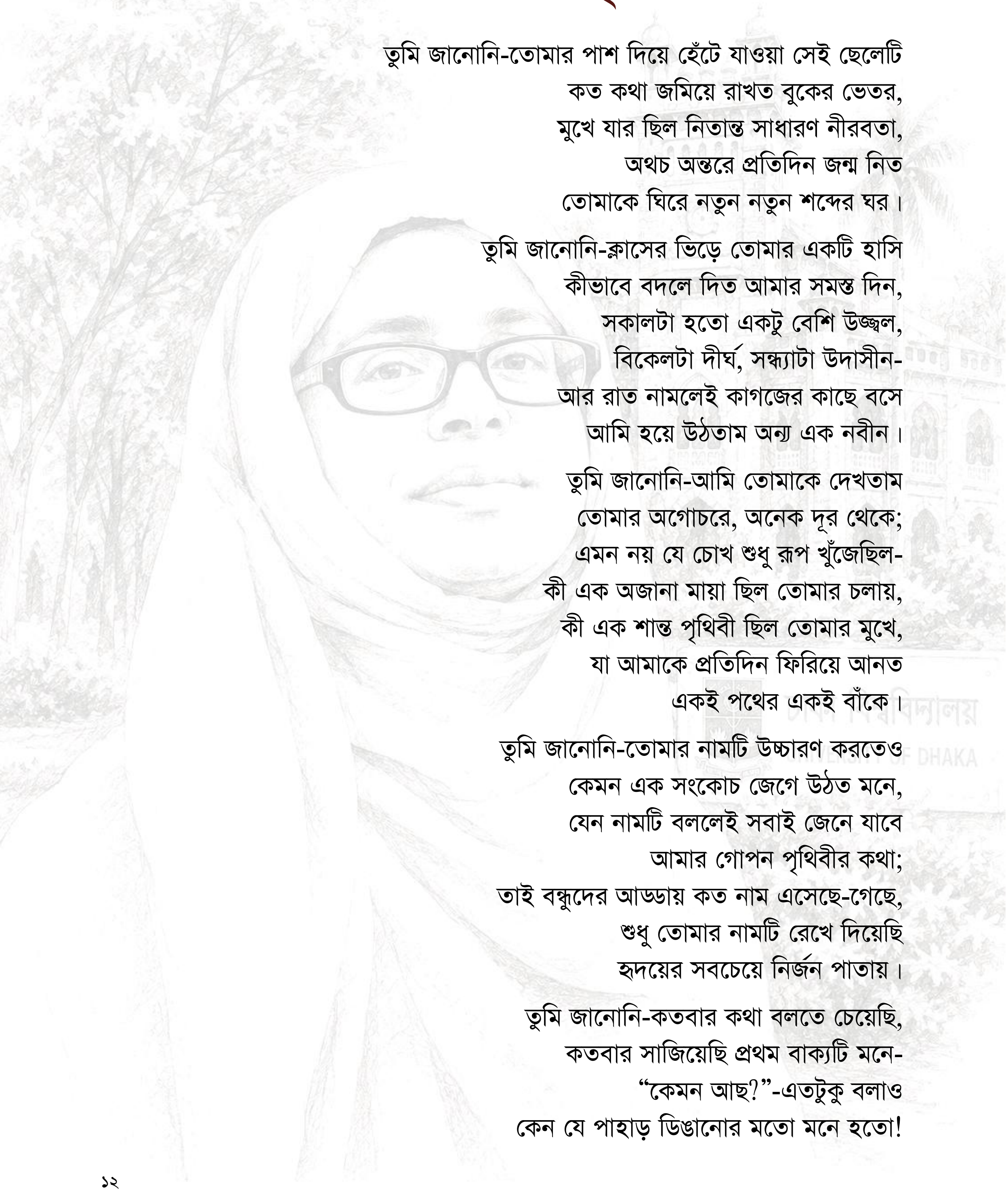

তুমি জানোনি-তোমার পাশ দিয়ে হেঁটে যাওয়া সেই ছেলেটি
কত কথা জমিয়ে রাখত বুকের ভেতর,
মুখে যার ছিল নিতান্ত সাধারণ নীরবতা,
অথচ অন্তরে প্রতিদিন জন্ম নিত
তোমাকে ঘিরে নতুন নতুন শব্দের ঘর।

তুমি জানোনি-ক্লাসের ভিড়ে তোমার একটি হাসি
কীভাবে বদলে দিত আমার সমস্ত দিন,
সকালটা হতো একটু বেশি উজ্জ্বল,
বিকেলটা দীর্ঘ, সন্ধ্যাটা উদাসীন-
আর রাত নামলেই কাগজের কাছে বসে
আমি হয়ে উঠতাম অন্য এক নবীন।

তুমি জানোনি-আমি তোমাকে দেখতাম
তোমার অগোচরে, অনেক দূর থেকে;
এমন নয় যে চোখ শুধু রূপ খুঁজেছিল-
কী এক অজানা মায়া ছিল তোমার চলায়,
কী এক শান্ত পৃথিবী ছিল তোমার মুখে,
যা আমাকে প্রতিদিন ফিরিয়ে আনত
একই পথের একই বাঁকে।

তুমি জানোনি-তোমার নামটি উচ্চারণ করতেও
কেমন এক সংকোচ জেগে উঠত মনে,
যেন নামটি বললেই সবাই জেনে যাবে
আমার গোপন পৃথিবীর কথা;
তাই বন্ধুদের আড্ডায় কত নাম এসেছে-গেছে,
শুধু তোমার নামটি রেখে দিয়েছি
হৃদয়ের সবচেয়ে নির্জন পাতায়।

তুমি জানোনি-কতবার কথা বলতে চেয়েছি,
কতবার সাজিয়েছি প্রথম বাক্যটি মনে-
"কেমন আছ?"-এতটুকু বলাও
কেন যে পাহাড় ডিঙানোর মতো মনে হতো!

তুমি কাছে এলে প্রস্তুত সব শব্দ
এক নিমেষে কোথায় হারিয়ে যেত,
আর তুমি চলে গেলে সেই শব্দগুলোই
আমাকে সারারাত প্রশ্ন করত।

তুমি জানোনি-একদিন তোমার পোশাকের একটি রং
আমার সারাদিনের স্মৃতি হয়ে ছিল,
একদিন তোমার চুলে বাতাস লেগেছিল-
সেই সামান্য দৃশ্যও কত পঙ্‌ক্তির জন্ম দিয়েছিল।
তোমার কাছে যা ছিল একটি সাধারণ দিন,
আমার কাছে তা হয়ে উঠেছিল
লিখে রাখার মতো কোনো উৎসব।

তুমি জানোনি-তোমাকে নিয়ে লেখা শুরু করেছিলাম আমি,
একটি কবিতা নয়, দুটি কবিতা নয়-
পাতার পরে পাতা জমে উঠছিল ধীরে;
তুমি তখন হয়তো নিজের জীবন নিয়ে ব্যস্ত,
আর আমি নিঃশব্দে তোমাকে বসিয়ে দিচ্ছিলাম
আমার অক্ষরের গভীরে।

সেখানে তোমাকে আমি কোনোদিন আমার করিনি,
কোনো কল্পনার শিকল পরাইনি তোমার পায়ে;
শুধু লিখেছি-তুমি যেমন করে হেঁটে যাও,
তেমন করেই হেঁটে যেও স্বাধীনতায়।
আমার ভালোবাসা যদি সত্যিই ভালোবাসা হয়,
তবে সে কেন তোমার আকাশ ছোট করে দেয়?

তুমি জানোনি-কখনো তোমার মন খারাপ দেখলে
আমার নিজের আনন্দটুকুও ম্লান হয়ে যেত,
যদিও তোমার দুঃখের কারণ জানার
কোনো অধিকার আমার ছিল না।
তবু মনে হতো-
পৃথিবীর সমস্ত সুখ যদি হাতে থাকত,
এক মুঠো তোমার পথে রেখে আসতাম,
নামটি লিখতাম না।

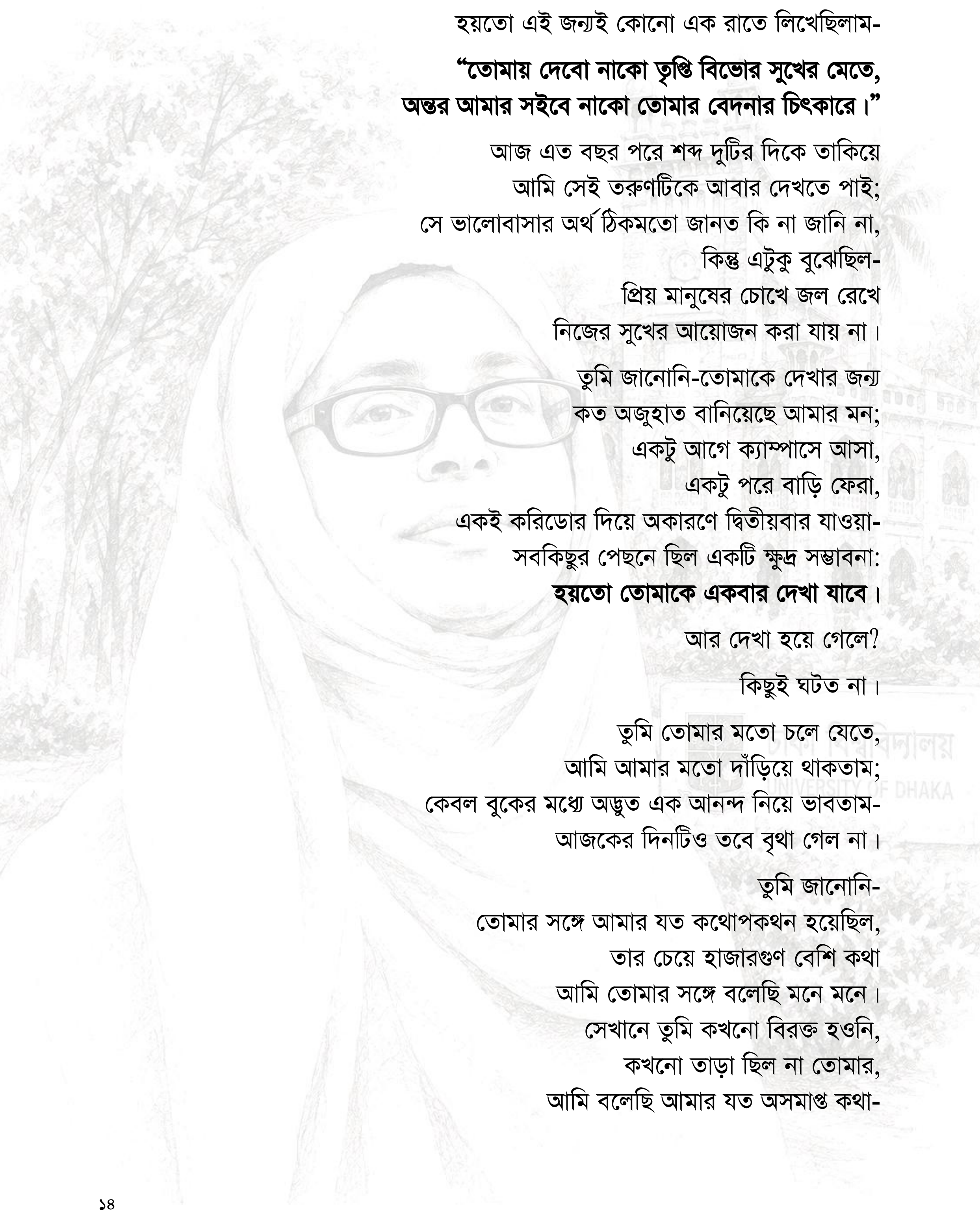

হয়তো এই জন্যই কোনো এক রাতে লিখেছিলাম-

"তোমায় দেবো নাকো তৃপ্তি বিভোর সুখের মেতে,
অন্তর আমার সইবে নাকো তোমার বেদনার চিৎকারে।"

আজ এত বছর পরে শব্দ দুটির দিকে তাকিয়ে
আমি সেই তরুণটিকে আবার দেখতে পাই;
সে ভালোবাসার অর্থ ঠিকমতো জানত কি না জানি না,
কিন্তু এটুকু বুঝেছিল-
প্রিয় মানুষের চোখে জল রেখে
নিজের সুখের আয়োজন করা যায় না।

তুমি জানোনি-তোমাকে দেখার জন্য
কত অজুহাত বানিয়েছে আমার মন;
একটু আগে ক্যাম্পাসে আসা,
একটু পরে বাড়ি ফেরা,
একই করিডোর দিয়ে অকারণে দ্বিতীয়বার যাওয়া-
সবকিছুর পেছনে ছিল একটি ক্ষুদ্র সম্ভাবনা:
হয়তো তোমাকে একবার দেখা যাবে।

আর দেখা হয়ে গেলে?

কিছুই ঘটত না।

তুমি তোমার মতো চলে যেতে,
আমি আমার মতো দাঁড়িয়ে থাকতাম;
কেবল বুকের মধ্যে অদ্ভুত এক আনন্দ নিয়ে ভাবতাম-
আজকের দিনটিও তবে বৃথা গেল না।

তুমি জানোনি-
তোমার সঙ্গে আমার যত কথোপকথন হয়েছিল,
তার চেয়ে হাজারগুণ বেশি কথা
আমি তোমার সঙ্গে বলেছি মনে মনে।
সেখানে তুমি কখনো বিরক্ত হওনি,
কখনো তাড়া ছিল না তোমার,
আমি বলেছি আমার যত অসমাপ্ত কথা-

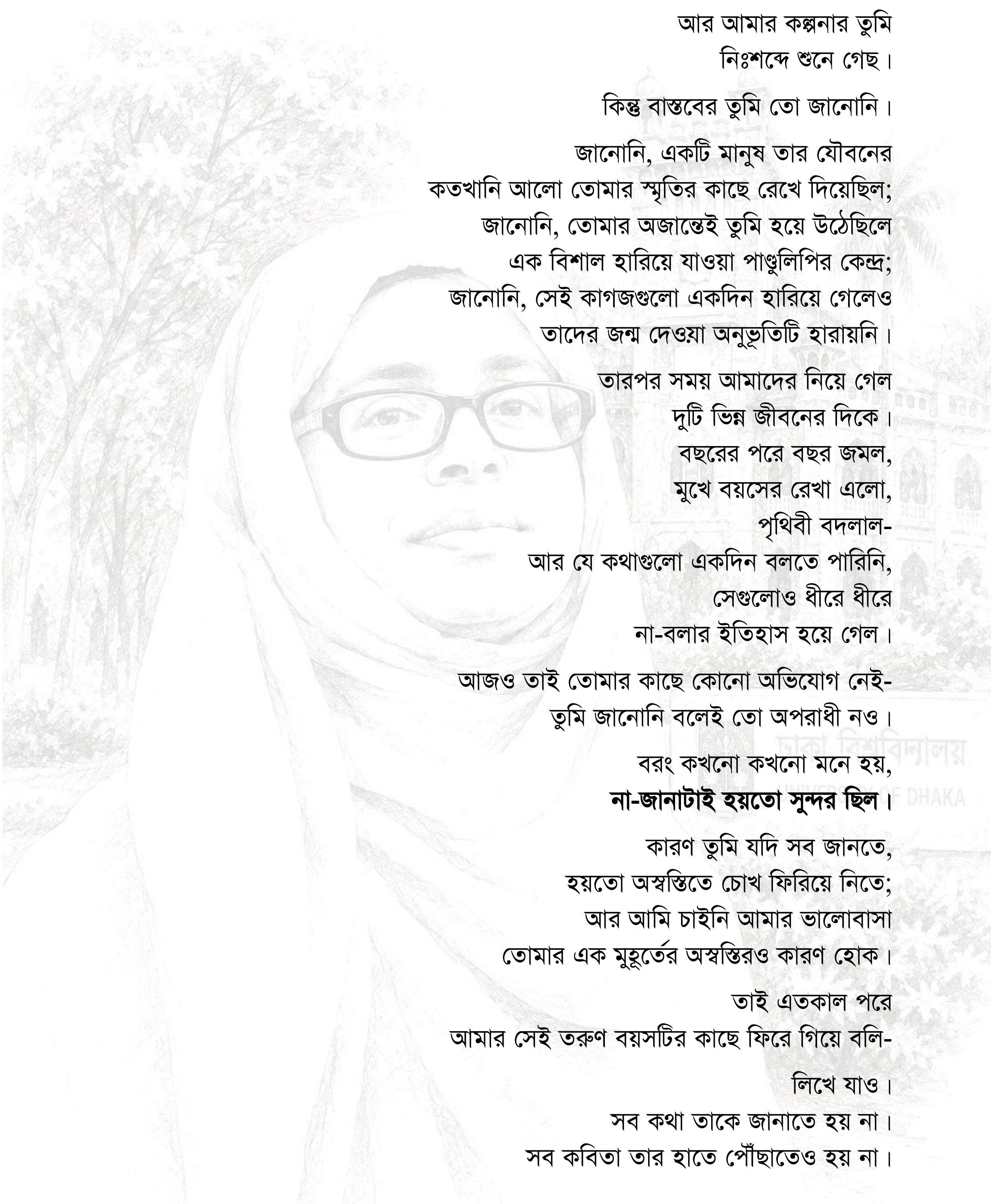

আর আমার কল্পনার তুমি
নিঃশব্দে শুনে গেছ।

কিন্তু বাস্তবের তুমি তো জানোনি।

জানোনি, একটি মানুষ তার যৌবনের
কতখানি আলো তোমার স্মৃতির কাছে রেখে দিয়েছিল;
জানোনি, তোমার অজান্তেই তুমি হয়ে উঠেছিলে
এক বিশাল হারিয়ে যাওয়া পাণ্ডুলিপির কেন্দ্র;
জানোনি, সেই কাগজগুলো একদিন হারিয়ে গেলেও
তাদের জন্ম দেওয়া অনুভূতিটি হারায়নি।

তারপর সময় আমাদের নিয়ে গেল
দুটি ভিন্ন জীবনের দিকে।
বছরের পরে বছর জমল,
মুখে বয়সের রেখা এলো,
পৃথিবী বদলাল-
আর যে কথাগুলো একদিন বলতে পারিনি,
সেগুলোও ধীরে ধীরে
না-বলার ইতিহাস হয়ে গেল।

আজও তাই তোমার কাছে কোনো অভিযোগ নেই-
তুমি জানোনি বলেই তো অপরাধী নও।

বরং কখনো কখনো মনে হয়,
না-জানাটাই হয়তো সুন্দর ছিল।

কারণ তুমি যদি সব জানতে,
হয়তো অস্বস্তিতে চোখ ফিরিয়ে নিতে;
আর আমি চাইনি আমার ভালোবাসা
তোমার এক মুহূর্তের অস্বস্তিরও কারণ হোক।

তাই এতকাল পরে
আমার সেই তরুণ বয়সটির কাছে ফিরে গিয়ে বলি-

লিখে যাও।
সব কথা তাকে জানাতে হয় না।
সব কবিতা তার হাতে পৌঁছাতেও হয় না।

কিছু কবিতা শুধু জন্ম নেয়
একজন মানুষকে নিঃশব্দে ভালোবেসেছিলে-
এই সাক্ষ্যটুকু রেখে যাওয়ার জন্য।

আর তুমি-

তুমি জানোনি।
হয়তো আজও জানো না-
একটি জীবনের এতগুলো বছর পেরিয়েও
উনিশশো নব্বইয়ের কোনো এক বিকেলে
তোমাকে প্রথম দেখে থমকে যাওয়া
সেই তরুণটির কবিতা
এখনো শেষ হয়নি।

প্রথম গোপন পঙ্‌ক্তি

কবে প্রথম লিখেছিলাম তোমাকে নিয়ে-
তারিখটি আজ আর মনে নেই,
শুধু মনে আছে,
সেদিন রাত অনেক হয়েছিল;
চারপাশের পৃথিবী ঘুমিয়ে গেলে
আমার টেবিলে একটি সাদা কাগজ
কী আশ্চর্যভাবে জেগে ছিল।

কলম হাতে নিয়েছিলাম-
কী লিখব, জানতাম না।
কবিতা লিখব-এমন কোনো সিদ্ধান্তও ছিল না;
শুধু বুকের মধ্যে জমে থাকা
অচেনা এক অনুভূতি
কোনো একটি পথ খুঁজছিল বাইরে আসার।

তোমার নাম লিখতে গিয়েও লিখিনি।

মনে হয়েছিল,
নাম লিখে দিলে তুমি বুঝি
আমার একার গোপন পৃথিবী থেকে
হঠাৎ বাস্তবের মানুষ হয়ে যাবে।
তাই নামের জায়গাটি ফাঁকা রেখে
লিখেছিলাম শুধু-
“তুমি।”

সেই ‘তুমি’ যে কে,
পৃথিবীর কেউ জানত না;
কাগজ জানত,
কলম জানত,
আর জানত আমার অস্থির হৃদয়।

প্রথম পঙ্‌ক্তিটি কী ছিল-
আজ আর ঠিক মনে করতে পারি না।

এতগুলো বছর স্মৃতির ওপর দিয়ে
বয়ে গেছে সময়ের নদী;
কত শব্দ ভেসে গেছে,
কত বাক্য ডুবে গেছে বিস্মৃতির জলে।

তবু দুটি পঙ্‌ক্তি
কীভাবে যেন আজও ফিরে আসে-

"তোমায় দেবো নাকো তৃপ্তি বিভোর সুখের মেতে,
অন্তর আমার সইবে নাকো তোমার বেদনার চিৎকারে।"

হয়তো ঠিক সেই রাতেই লিখেছিলাম,
হয়তো আরও পরে;
স্মৃতি আজ তারিখের সাক্ষ্য দিতে পারে না।
কিন্তু আমি জানি,
এই কথার ভিতরেই কোথাও ছিল
আমার প্রথম প্রেমের সহজ দর্শন-

তোমাকে চাইব,
কিন্তু তোমার কষ্টের বিনিময়ে নয়।

তোমাকে ভালোবাসব,
কিন্তু আমার সুখের জন্য
তোমাকে কোনোদিন দুঃখ দেব না।

তখন কি বুঝেছিলাম
এই কথার ভার কত দীর্ঘ?

বুঝিনি।

তখন তো বয়স ছিল স্বপ্ন দেখার,
একটি মুখ দেখলেই
পৃথিবী বদলে যাওয়ার;
একটি হাসি মনে রেখে
সারারাত জেগে থাকার;
একটি নাম না লিখেও
শত পৃষ্ঠা ভরে ফেলার বয়স।

সেদিন প্রথম পঙ্‌ক্তির পরে
আরেকটি পঙ্‌ক্তি এলো,
তারপর আরেকটি।

শব্দেরা যেন আমাকে জিজ্ঞেস না করেই
নিজেদের জায়গা খুঁজে নিচ্ছিল কাগজে।

কখনো তোমার চোখ নিয়ে,
কখনো তোমার নীরবতা,
কখনো ক্যাম্পাসের পথে
তোমার হেঁটে যাওয়ার দৃশ্য,
কখনো এমন কিছু নিয়েও লিখেছি
যা হয়তো কখনো ঘটেইনি-
শুধু ঘটেছিল আমার কল্পনায়।

রাত বাড়ত।

বাড়ির সবাই ঘুমিয়ে পড়ত,
দূরের কোনো শব্দও একসময় থেমে যেত;
শুধু আমার কলমটি থামতে চাইত না।

আমি লিখতাম।

কারও পড়ার জন্য নয়,
কোথাও প্রকাশের জন্য নয়,
তোমাকে দেওয়ার সাহসও ছিল না।

তবু লিখতাম।

কারণ তোমাকে না-বলা কথাগুলো
কাগজকে না বললে
বুকের ভেতর যেন জায়গা হতো না।

একদিন দেখি,
একটি কবিতা আর একটি কবিতায় থেমে নেই;
পাতা জমছে।

পাতার সঙ্গে রাত জমছে,
রাতের সঙ্গে তোমার স্মৃতি,

আর স্মৃতির সঙ্গে
এক তরুণ মানুষের অদ্ভুত এক জীবন।

সেই থেকেই হয়তো শুরু হয়েছিল
আমার সেই বিশাল গোপন পাণ্ডুলিপি।

কেউ জানত না তার কথা।

বন্ধুরা জানত না,
পরিবার জানত না,
এমনকি তুমি-
যার জন্য এত শব্দের জন্ম-
তুমিও জানোনি।

কী অদ্ভুত!

যাকে কেন্দ্র করে একটি বই লেখা হচ্ছে,
সে-ই জানে না
সে একটি বইয়ের প্রধান চরিত্র!

কখনো ভাবতাম,
একদিন হয়তো তোমাকে পড়তে দেব।

তুমি অবাক হয়ে বলবে-
"এত কিছু লিখেছ?"

আমি হয়তো লজ্জায় চোখ নামিয়ে বলব-
"সবটুকু তোমাকে নিয়ে নয়।"

অথচ আমরা দুজনেই জানব,
সেই কথাটি সত্য নয়।

কিন্তু সেই দিন আর আসেনি।

পাণ্ডুলিপি বড় হয়েছে,
আমরা বড় হয়েছি,
জীবন তার নিজের নিয়মে
আমাদের চারপাশ বদলে দিয়েছে।

একসময় সেই পাণ্ডুলিপিও হারিয়ে গেল।

কীভাবে হারাল,
কোন সময়ে,
কোন ঘরের কোন অন্ধকার কোণে
আমার যৌবনের সেই অক্ষরগুলো
শেষবারের মতো পড়ে ছিল-
আজ আর জানি না।

অনেক কিছু হারালে মানুষ আবার কিনতে পারে,
অনেক লেখা হারালে আবার লেখা যায়;
কিন্তু তরুণ বয়সে
প্রথম ভালোবাসার কাঁপা হাতে লেখা শব্দ-
তা কি দ্বিতীয়বার হুবহু ফিরে আসে?

আসে না।

কারণ সেই হাতটিও তো আর নেই।

আজকের হাতটি বয়সের,
অভিজ্ঞতার,
পাওয়া-হারানোর বহু ইতিহাসের।

সেদিনের হাতটি ছিল
শুধু বিস্ময়ের।

তবু আজ যখন আবার লিখতে বসেছি,
মনে হয়-
পাণ্ডুলিপিটি হয়তো পুরোপুরি হারায়নি।

তার কাগজ হারিয়েছে,
কালি হারিয়েছে,
বাক্য হারিয়েছে-

কিন্তু যে মানুষটির জন্য
প্রথম পঙ্‌ক্তিটি জন্মেছিল,
তার স্মৃতি তো এখনো
আমার ভেতরে কোথাও বসে আছে।

আর সবচেয়ে আশ্চর্য-

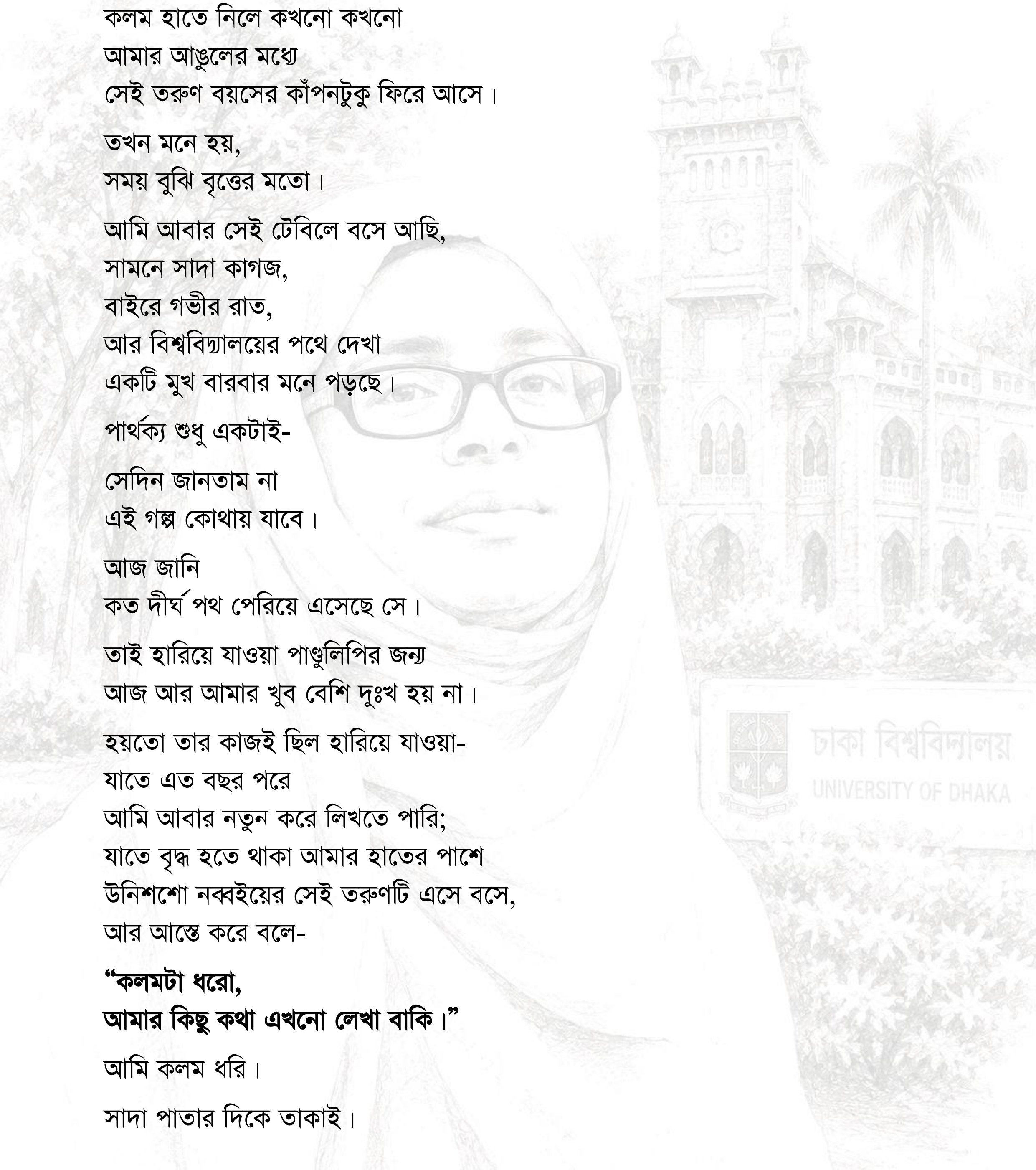

আজ প্রায় ষাটের কাছে এসে
কলম হাতে নিলে কখনো কখনো
আমার আঙুলের মধ্যে
সেই তরুণ বয়সের কাঁপনটুকু ফিরে আসে।

তখন মনে হয়,
সময় বুঝি বৃত্তের মতো।

আমি আবার সেই টেবিলে বসে আছি,
সামনে সাদা কাগজ,
বাইরে গভীর রাত,
আর বিশ্ববিদ্যালয়ের পথে দেখা
একটি মুখ বারবার মনে পড়ছে।

পার্থক্য শুধু একটাই-

সেদিন জানতাম না
এই গল্প কোথায় যাবে।

আজ জানি
কত দীর্ঘ পথ পেরিয়ে এসেছে সে।

তাই হারিয়ে যাওয়া পাণ্ডুলিপির জন্য
আজ আর আমার খুব বেশি দুঃখ হয় না।

হয়তো তার কাজই ছিল হারিয়ে যাওয়া-
যাতে এত বছর পরে
আমি আবার নতুন করে লিখতে পারি;
যাতে বৃদ্ধ হতে থাকা আমার হাতের পাশে
উনিশশো নব্বইয়ের সেই তরুণটি এসে বসে,
আর আস্তে করে বলে-

**“কলমটা ধরো,
আমার কিছু কথা এখনো লেখা বাকি।”**

আমি কলম ধরি।

সাদা পাতার দিকে তাকাই।

আর এত বছর পরেও
আমার প্রতিটি কবিতার প্রথম শব্দটি
কেমন করে যেন
সেই পুরোনো শব্দটিই হয়ে যায়-

তুমি।

তোমার পাশ দিয়ে হেঁটে যাওয়া

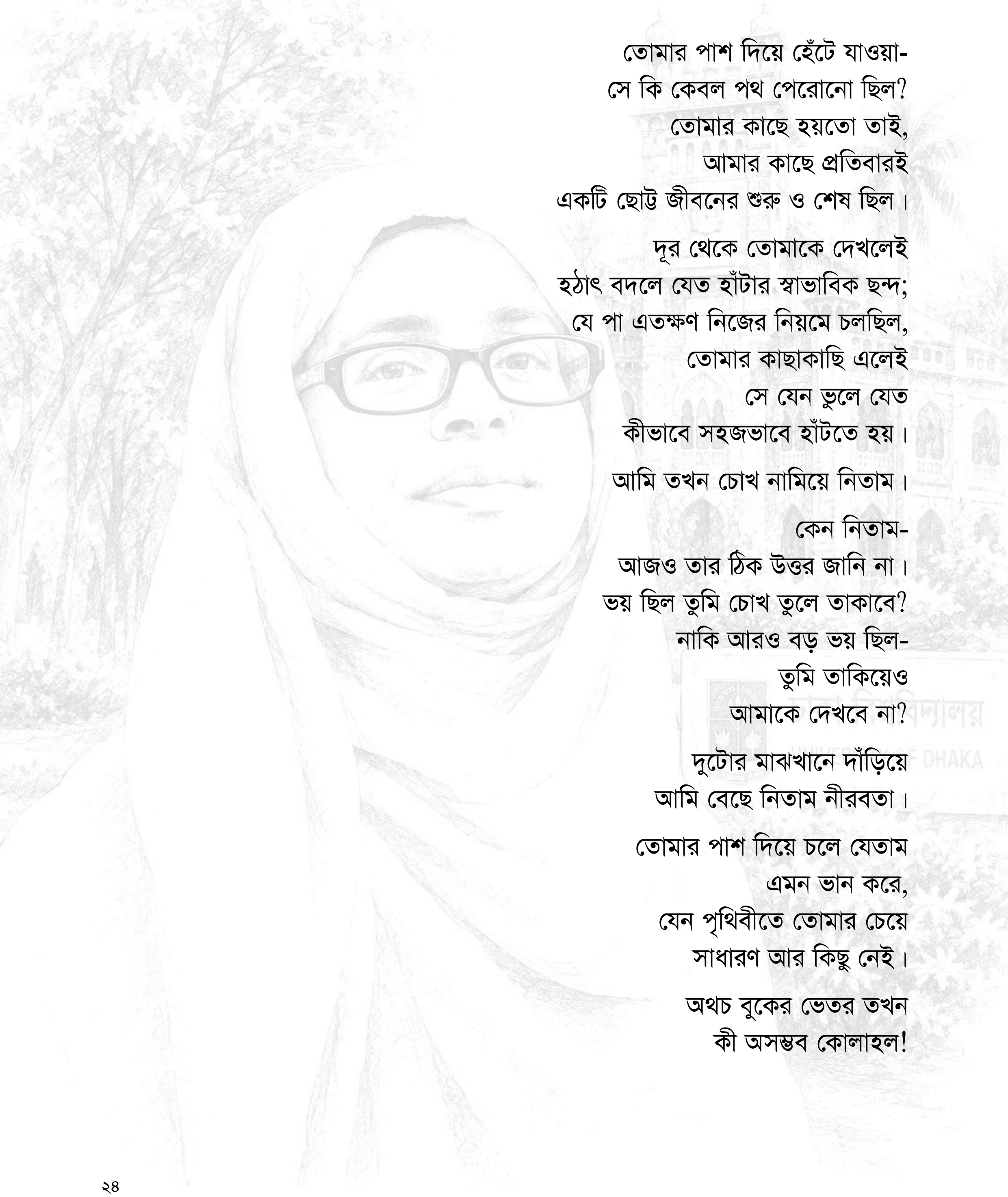

তোমার পাশ দিয়ে হেঁটে যাওয়া-
সে কি কেবল পথ পেরোনো ছিল?
তোমার কাছে হয়তো তাই,
আমার কাছে প্রতিবারই
একটি ছোট্ট জীবনের শুরু ও শেষ ছিল।

দূর থেকে তোমাকে দেখলেই
হঠাৎ বদলে যেত হাঁটার স্বাভাবিক ছন্দ;
যে পা এতক্ষণ নিজের নিয়মে চলছিল,
তোমার কাছাকাছি এলেই
সে যেন ভুলে যেত
কীভাবে সহজভাবে হাঁটতে হয়।

আমি তখন চোখ নামিয়ে নিতাম।

কেন নিতাম-
আজও তার ঠিক উত্তর জানি না।
ভয় ছিল তুমি চোখ তুলে তাকাবে?
নাকি আরও বড় ভয় ছিল-
তুমি তাকিয়েও
আমাকে দেখবে না?

দুটোর মাঝখানে দাঁড়িয়ে
আমি বেছে নিতাম নীরবতা।

তোমার পাশ দিয়ে চলে যেতাম
এমন ভান করে,
যেন পৃথিবীতে তোমার চেয়ে
সাধারণ আর কিছু নেই।

অথচ বুকের ভেতর তখন
কী অসম্ভব কোলাহল!

মনে হতো-
তুমি কি শুনতে পাচ্ছ
আমার হৃদয়ের এই অবাধ্য শব্দ?

তুমি কি বুঝতে পারছ
একজন মানুষ তোমার কয়েক হাত দূর দিয়ে
কেবল হেঁটে যাচ্ছে না-
সে নিজের সমস্ত সাহস একত্র করে
একটি মুহূর্ত পার হচ্ছে?

তোমার ওড়নার প্রান্তে বাতাস লাগত,
চুলের পাশে আলো এসে পড়ত,
হাতে হয়তো বই থাকত-
অথবা বন্ধুদের সঙ্গে কথা বলতে বলতে
তুমি অন্যমনস্কভাবে চলে যেতে।

কত সাধারণ ছিল সেই দৃশ্য!

আজ বুঝি,
জীবনের সবচেয়ে অসাধারণ স্মৃতিগুলো
প্রায়ই জন্ম নেয়
সবচেয়ে সাধারণ মুহূর্ত থেকে।

তোমার পাশ দিয়ে হেঁটে যাওয়ার সময়
আমি কখনো একটু ধীরে চলেছি,
কখনো অকারণে দ্রুত।

ধীরে চলেছি-
মুহূর্তটাকে আরেকটু দীর্ঘ করার জন্য।

দ্রুত চলেছি-
তুমি যেন আমার অস্থিরতা বুঝতে না পারো।

কী অদ্ভুত সেই বয়স!

একই হৃদয় একই সঙ্গে
কাছে যেতে চায়,

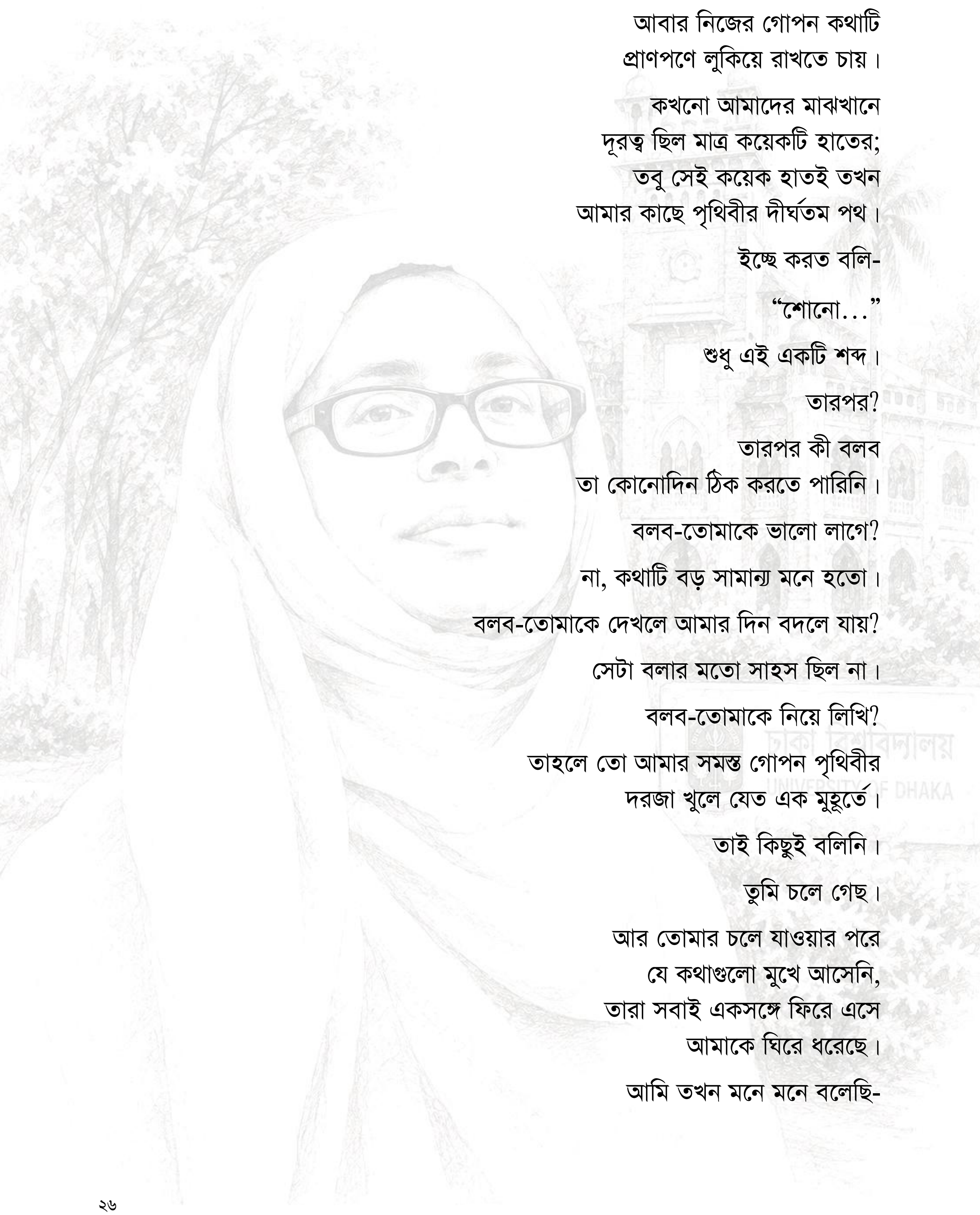

আবার নিজের গোপন কথাটি
প্রাণপণে লুকিয়ে রাখতে চায়।

কখনো আমাদের মাঝখানে
দূরত্ব ছিল মাত্র কয়েকটি হাতের;
তবু সেই কয়েক হাতই তখন
আমার কাছে পৃথিবীর দীর্ঘতম পথ।

ইচ্ছে করত বলি-

"শোনো..."

শুধু এই একটি শব্দ।

তারপর?

তারপর কী বলব
তা কোনোদিন ঠিক করতে পারিনি।

বলব-তোমাকে ভালো লাগে?

না, কথাটি বড় সামান্য মনে হতো।

বলব-তোমাকে দেখলে আমার দিন বদলে যায়?

সেটা বলার মতো সাহস ছিল না।

বলব-তোমাকে নিয়ে লিখি?

তাহলে তো আমার সমস্ত গোপন পৃথিবীর
দরজা খুলে যেত এক মুহূর্তে।

তাই কিছুই বলিনি।

তুমি চলে গেছ।

আর তোমার চলে যাওয়ার পরে
যে কথাগুলো মুখে আসেনি,
তারা সবাই একসঙ্গে ফিরে এসে
আমাকে ঘিরে ধরেছে।

আমি তখন মনে মনে বলেছি-

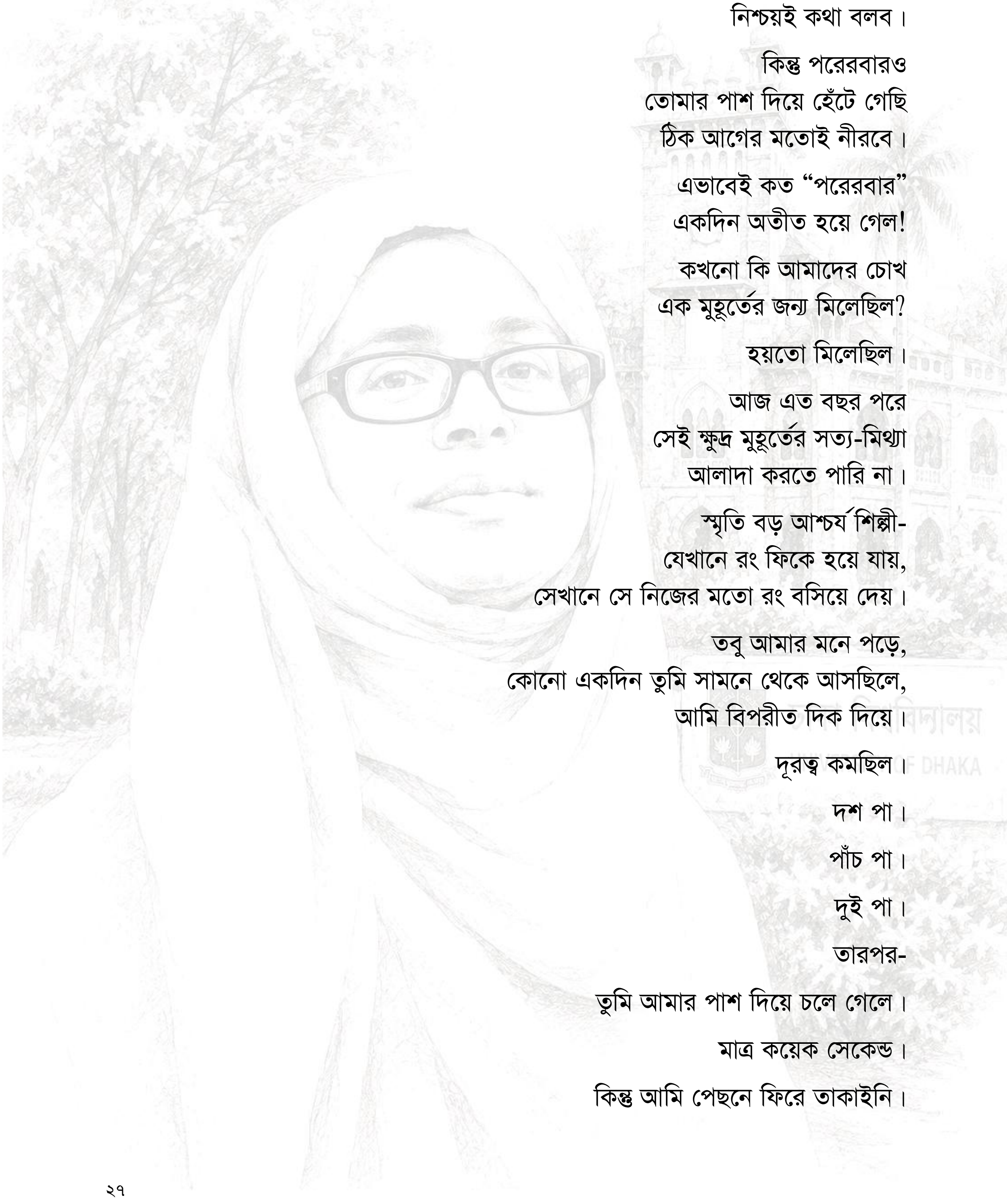

আরেকবার যদি দেখা হয়,
নিশ্চয়ই কথা বলব।

কিন্তু পরেরবারও
তোমার পাশ দিয়ে হেঁটে গেছি
ঠিক আগের মতোই নীরবে।

এভাবেই কত "পরেরবার"
একদিন অতীত হয়ে গেল!

কখনো কি আমাদের চোখ
এক মুহূর্তের জন্য মিলেছিল?

হয়তো মিলেছিল।

আজ এত বছর পরে
সেই ক্ষুদ্র মুহূর্তের সত্য-মিথ্যা
আলাদা করতে পারি না।

স্মৃতি বড় আশ্চর্য শিল্পী-
যেখানে রং ফিকে হয়ে যায়,
সেখানে সে নিজের মতো রং বসিয়ে দেয়।

তবু আমার মনে পড়ে,
কোনো একদিন তুমি সামনে থেকে আসছিলে,
আমি বিপরীত দিক দিয়ে।

দূরত্ব কমছিল।

দশ পা।

পাঁচ পা।

দুই পা।

তারপর-

তুমি আমার পাশ দিয়ে চলে গেলে।

মাত্র কয়েক সেকেন্ড।

কিন্তু আমি পেছনে ফিরে তাকাইনি।

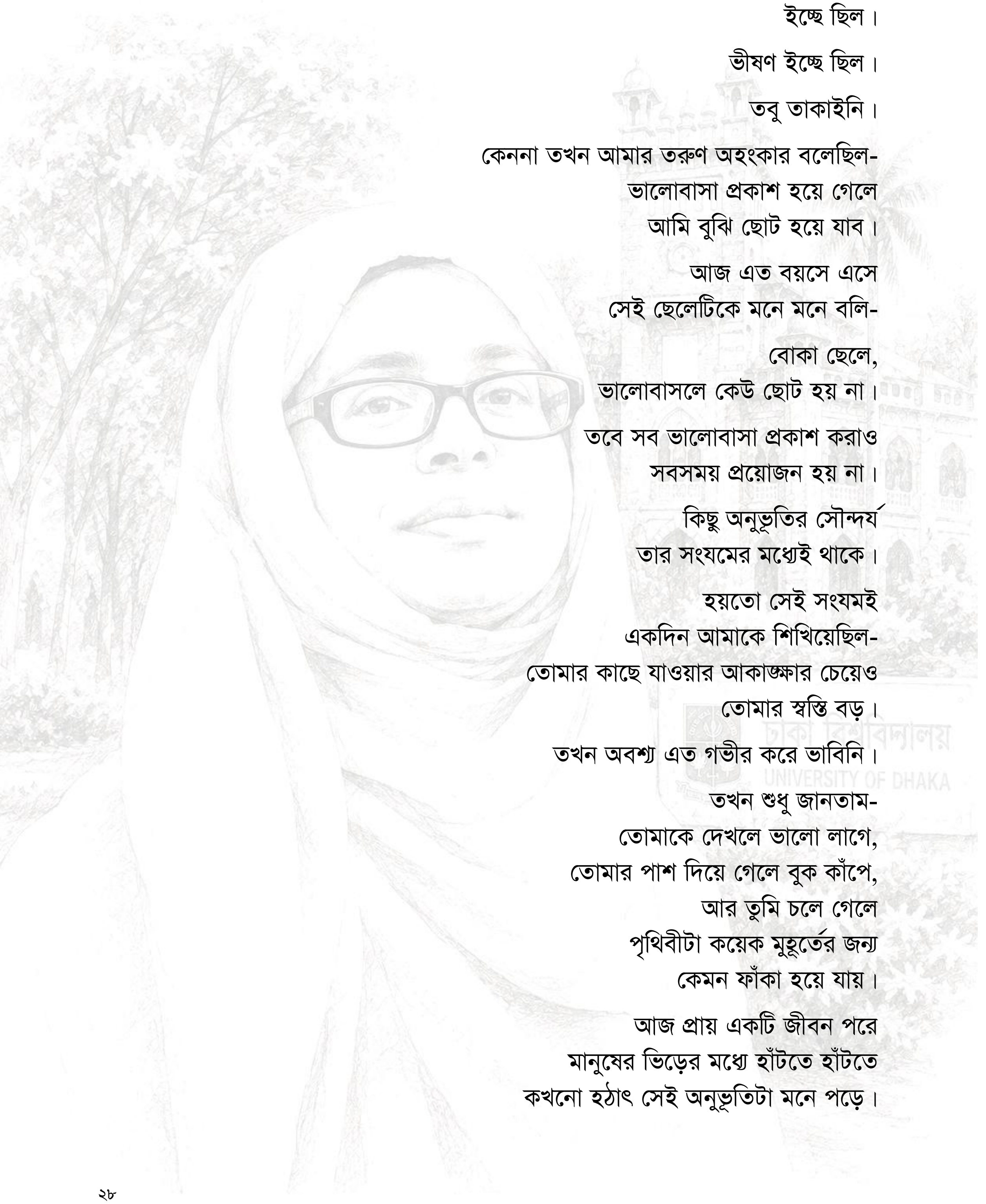

ইচ্ছে ছিল।

ভীষণ ইচ্ছে ছিল।

তবু তাকাইনি।

কেননা তখন আমার তরুণ অহংকার বলেছিল-
ভালোবাসা প্রকাশ হয়ে গেলে
আমি বুঝি ছোট হয়ে যাব।

আজ এত বয়সে এসে
সেই ছেলেটিকে মনে মনে বলি-

বোকা ছেলে,
ভালোবাসলে কেউ ছোট হয় না।

তবে সব ভালোবাসা প্রকাশ করাও
সবসময় প্রয়োজন হয় না।

কিছু অনুভূতির সৌন্দর্য
তার সংযমের মধ্যেই থাকে।

হয়তো সেই সংযমই
একদিন আমাকে শিখিয়েছিল-
তোমার কাছে যাওয়ার আকাঙ্ক্ষার চেয়েও
তোমার স্বস্তি বড়।

তখন অবশ্য এত গভীর করে ভাবিনি।

তখন শুধু জানতাম-
তোমাকে দেখলে ভালো লাগে,
তোমার পাশ দিয়ে গেলে বুক কাঁপে,
আর তুমি চলে গেলে
পৃথিবীটা কয়েক মুহূর্তের জন্য
কেমন ফাঁকা হয়ে যায়।

আজ প্রায় একটি জীবন পরে
মানুষের ভিড়ের মধ্যে হাঁটতে হাঁটতে
কখনো হঠাৎ সেই অনুভূতিটা মনে পড়ে।

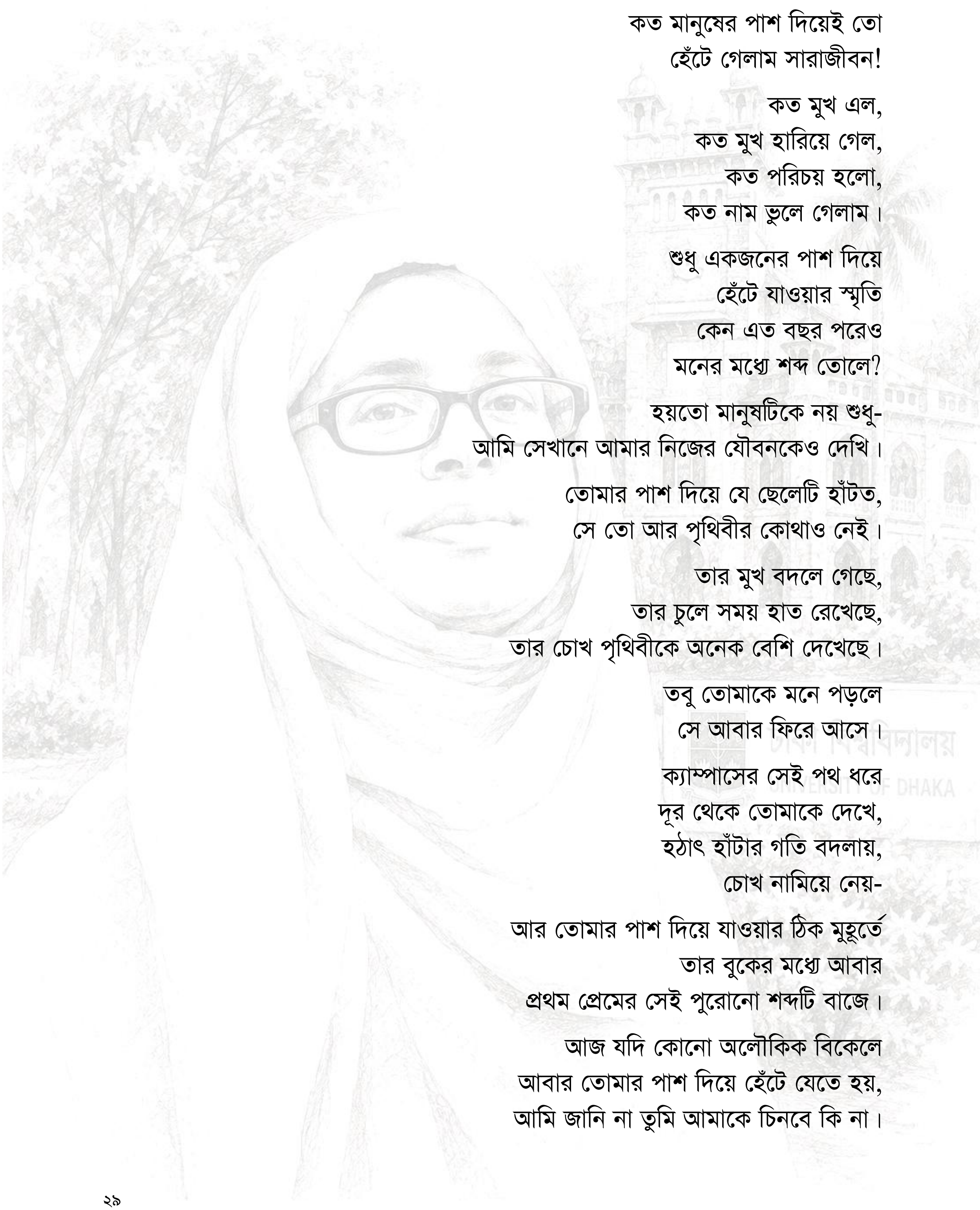

কত মানুষের পাশ দিয়েই তো
হেঁটে গেলাম সারাজীবন!

কত মুখ এল,
কত মুখ হারিয়ে গেল,
কত পরিচয় হলো,
কত নাম ভুলে গেলাম।

শুধু একজনের পাশ দিয়ে
হেঁটে যাওয়ার স্মৃতি
কেন এত বছর পরেও
মনের মধ্যে শব্দ তোলে?

হয়তো মানুষটিকে নয় শুধু-
আমি সেখানে আমার নিজের যৌবনকেও দেখি।

তোমার পাশ দিয়ে যে ছেলেটি হাঁটত,
সে তো আর পৃথিবীর কোথাও নেই।

তার মুখ বদলে গেছে,
তার চুলে সময় হাত রেখেছে,
তার চোখ পৃথিবীকে অনেক বেশি দেখেছে।

তবু তোমাকে মনে পড়লে
সে আবার ফিরে আসে।

ক্যাম্পাসের সেই পথ ধরে
দূর থেকে তোমাকে দেখে,
হঠাৎ হাঁটার গতি বদলায়,
চোখ নামিয়ে নেয়-

আর তোমার পাশ দিয়ে যাওয়ার ঠিক মুহূর্তে
তার বুকের মধ্যে আবার
প্রথম প্রেমের সেই পুরোনো শব্দটি বাজে।

আজ যদি কোনো অলৌকিক বিকেলে
আবার তোমার পাশ দিয়ে হেঁটে যেতে হয়,
আমি জানি না তুমি আমাকে চিনবে কি না।

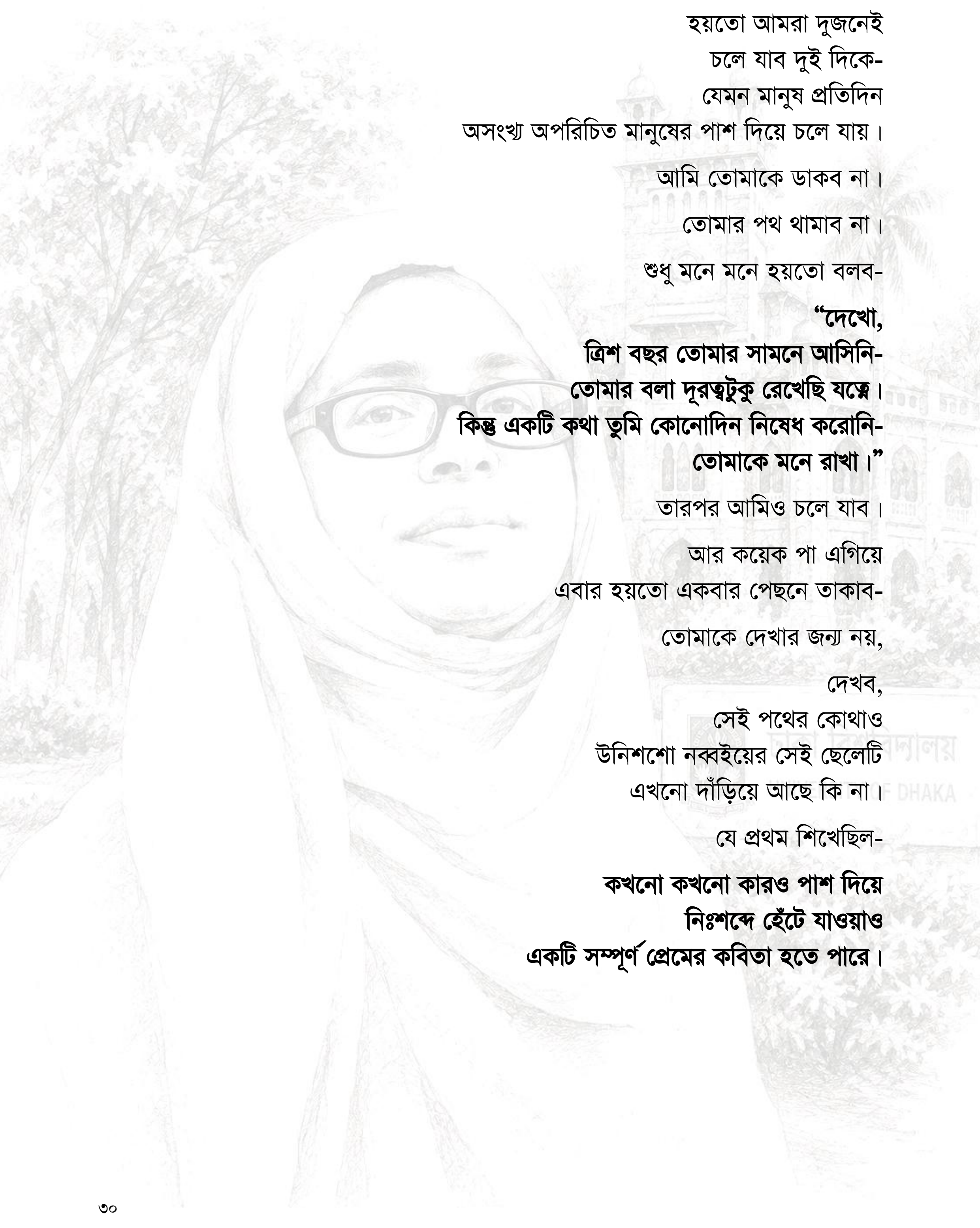

হয়তো আমরা দুজনেই
চলে যাব দুই দিকে-
যেমন মানুষ প্রতিদিন
অসংখ্য অপরিচিত মানুষের পাশ দিয়ে চলে যায়।

আমি তোমাকে ডাকব না।

তোমার পথ থামাব না।

শুধু মনে মনে হয়তো বলব-

“দেখো,
ত্রিশ বছর তোমার সামনে আসিনি-
তোমার বলা দূরত্বটুকু রেখেছি যত্নে।
কিন্তু একটি কথা তুমি কোনোদিন নিষেধ করোনি-
তোমাকে মনে রাখা।”

তারপর আমিও চলে যাব।

আর কয়েক পা এগিয়ে
এবার হয়তো একবার পেছনে তাকাব-

তোমাকে দেখার জন্য নয়,

দেখব,
সেই পথের কোথাও
উনিশশো নব্বইয়ের সেই ছেলেটি
এখনো দাঁড়িয়ে আছে কি না।

যে প্রথম শিখেছিল-

কখনো কখনো কারও পাশ দিয়ে
নিঃশব্দে হেঁটে যাওয়াও
একটি সম্পূর্ণ প্রেমের কবিতা হতে পারে।

একটি বেঞ্চ, দুটি নীরবতা

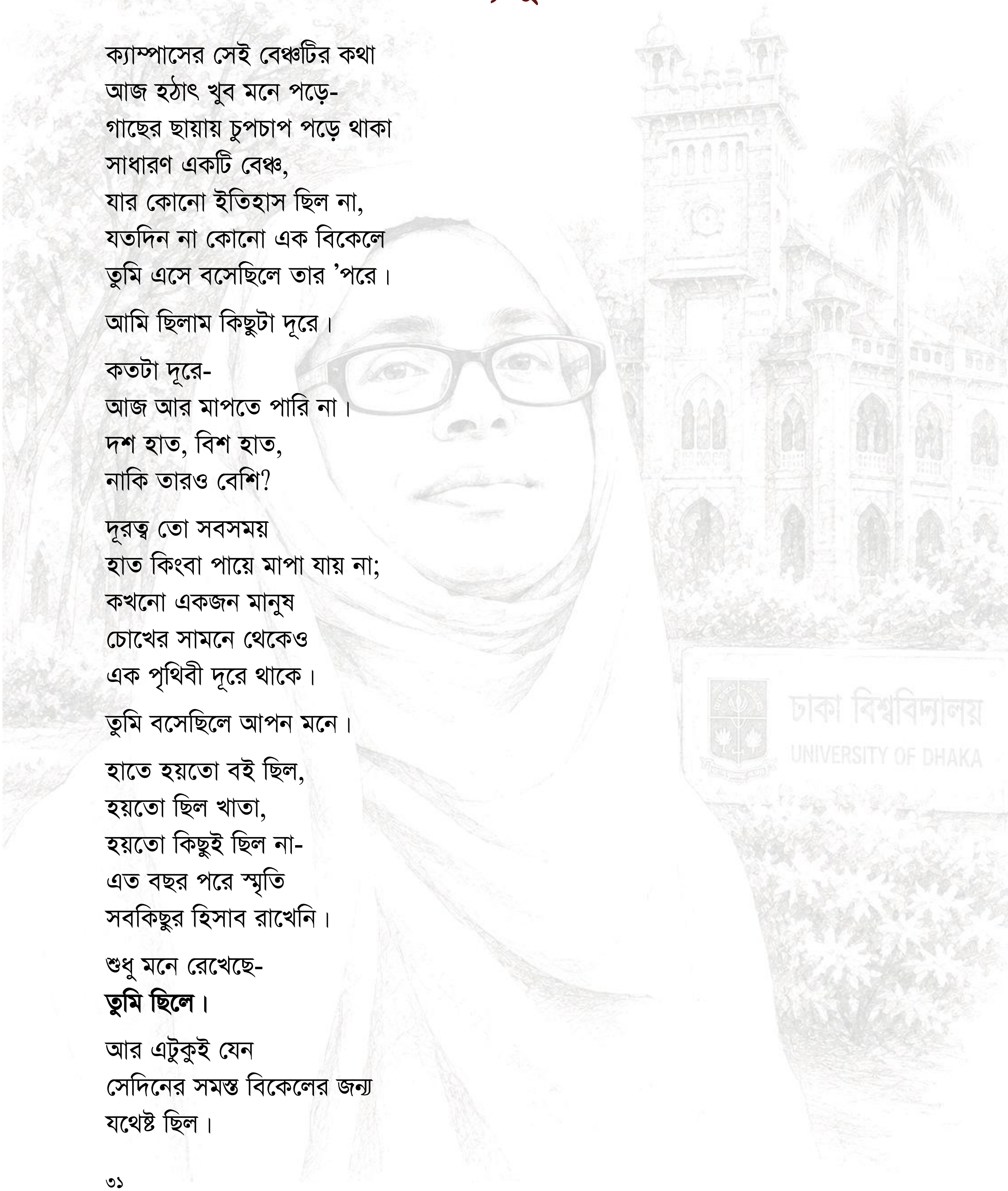

ক্যাম্পাসের সেই বেঞ্চটির কথা
আজ হঠাৎ খুব মনে পড়ে-
গাছের ছায়ায় চুপচাপ পড়ে থাকা
সাধারণ একটি বেঞ্চ,
যার কোনো ইতিহাস ছিল না,
যতদিন না কোনো এক বিকেলে
তুমি এসে বসেছিলে তার 'পরে।

আমি ছিলাম কিছুটা দূরে।

কতটা দূরে-
আজ আর মাপতে পারি না।
দশ হাত, বিশ হাত,
নাকি তারও বেশি?

দূরত্ব তো সবসময়
হাত কিংবা পায়ে মাপা যায় না;
কখনো একজন মানুষ
চোখের সামনে থেকেও
এক পৃথিবী দূরে থাকে।

তুমি বসেছিলে আপন মনে।

হাতে হয়তো বই ছিল,
হয়তো ছিল খাতা,
হয়তো কিছুই ছিল না-
এত বছর পরে স্মৃতি
সবকিছুর হিসাব রাখেনি।

শুধু মনে রেখেছে-
তুমি ছিলে।

আর এটুকুই যেন
সেদিনের সমস্ত বিকেলের জন্য
যথেষ্ট ছিল।

তোমার পাশে জায়গা ছিল।

আমি চাইলে হয়তো
গিয়ে বসতে পারতাম।

কেউ নিষেধ করেনি,
কোনো দেয়াল ছিল না,
কোনো সীমানাও আঁকা ছিল না।

তবু যেতে পারিনি।

কেন?

আজকের আমি
সেই তরুণ আমাকে প্রশ্ন করি-
একটি বেঞ্চের অন্য প্রান্তে বসতে
কতটুকুই বা সাহস লাগে?

কিন্তু তখন জানতাম,
ওই কয়েক পা হাঁটা মানে
শুধু তোমার কাছে যাওয়া নয়-
আমার গোপন পৃথিবীটাকেও
তোমার চোখের সামনে নিয়ে যাওয়া।

তাই দাঁড়িয়ে ছিলাম দূরে।

তুমি নীরব।

আমিও নীরব।

কিন্তু আমাদের দুই নীরবতা
এক ছিল না।

তোমার নীরবতায় হয়তো
ছিল ক্লাসের ক্লান্তি,
কোনো পরীক্ষার চিন্তা,
বাড়ি ফেরার তাড়া,
বন্ধুর অপেক্ষা,
কিংবা একেবারেই কিছু না।

আর আমার নীরবতার মধ্যে?

সেখানে তখন
একটি সম্পূর্ণ পাণ্ডুলিপির
শব্দেরা ভিড় করছিল।

তারা সবাই বলতে চাইছিল-

তোমাকে প্রথম দেখার পর
কেন ক্যাম্পাস বদলে গেছে,

কেন পরিচিত পথগুলো
অপরিচিত সুন্দর লাগে,

কেন ক্লাসের বই খুলে
অন্য অক্ষরের মাঝেও
তোমার মুখ মনে পড়ে,

কেন তোমাকে একদিন না দেখলে
দিনের কোথাও যেন
একটি অসম্পূর্ণতা থেকে যায়।

কত কথা!

অথচ মুখ খুলে
একটিও বলতে পারিনি।

ভাবছিলাম,
তুমি যদি হঠাৎ তাকাও?

ঠিক তখনই হয়তো
তুমি চোখ তুলেছিলে।

অথবা আমার স্মৃতিই
এত বছর পরে
সেই দৃশ্যটি তৈরি করেছে।

জানি না।

শুধু মনে হয়,
এক মুহূর্তের জন্য
তোমার চোখ এসেছিল আমার দিকে।

আমি সঙ্গে সঙ্গে
চোখ সরিয়ে নিয়েছিলাম।

যেন ধরা পড়ে গেছি!

কী ধরা পড়েছিল?

আমি তো কোনো অপরাধ করিনি।

শুধু একজন মানুষকে
ভালো লাগতে শুরু করেছিল।

তবু প্রথম প্রেমের কাছে
নিজের হৃদয়ই কখনো কখনো
সবচেয়ে বড় গোপন অপরাধের মতো লাগে।

আমি অন্যদিকে তাকিয়ে
এমন ভান করলাম,
যেন তোমাকে দেখিইনি।

অথচ পৃথিবীর মধ্যে
সেই মুহূর্তে
তোমাকেই সবচেয়ে বেশি দেখছিলাম।

কিছুক্ষণ পরে
তোমার পাশে কেউ এসে বসেছিল কি?

হয়তো কোনো সহপাঠী,
হয়তো কোনো বান্ধবী।

স্মৃতি সেখানে ঝাপসা।

শুধু এটুকু স্পষ্ট-
তোমার চারপাশে জীবন চলছিল
একেবারে স্বাভাবিক নিয়মে,
আর আমার ভেতরে
অস্বাভাবিক কিছু একটা
ধীরে ধীরে স্থায়ী হয়ে যাচ্ছিল।

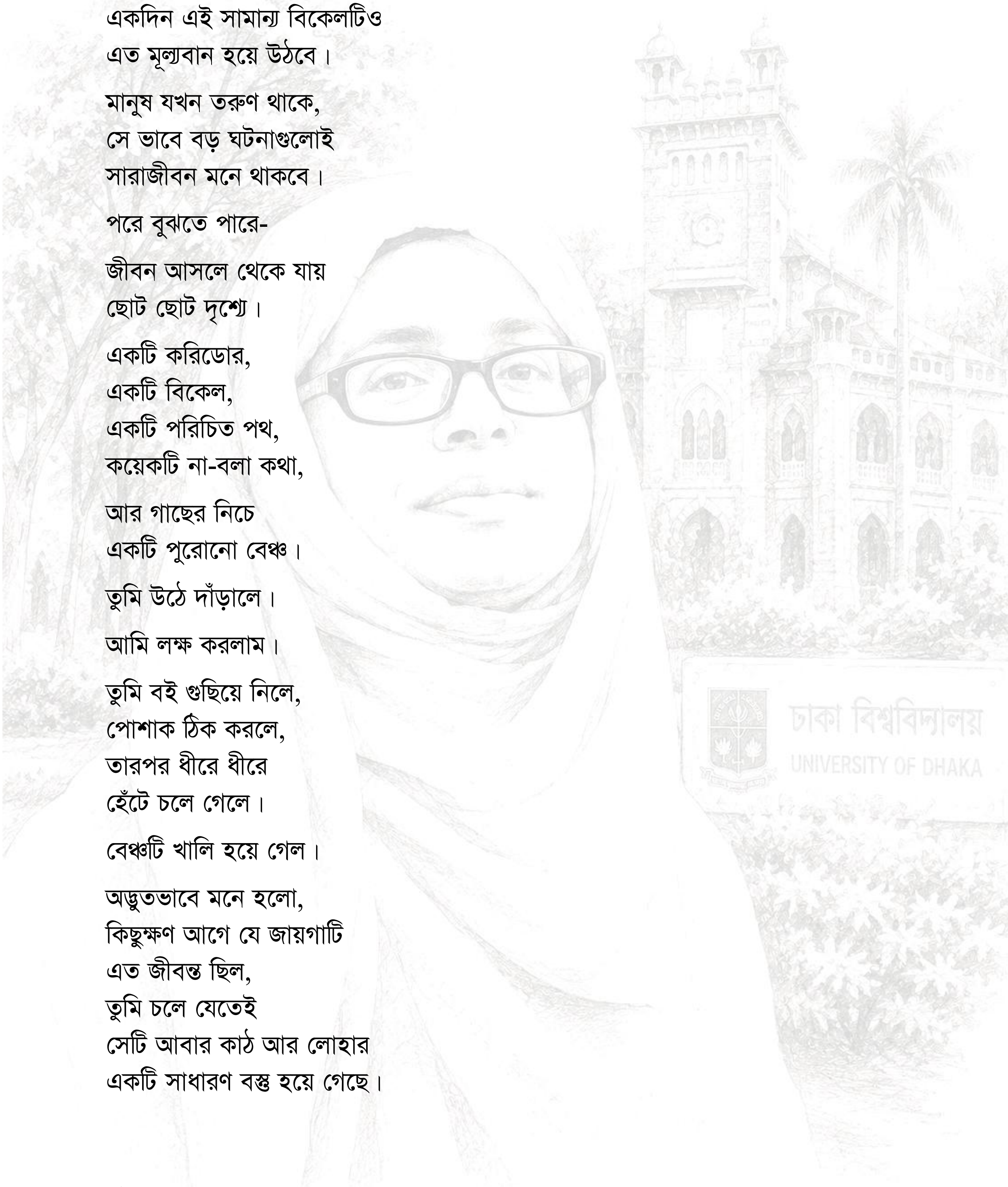

আমি তখন বুঝিনি-
একদিন এই সামান্য বিকেলটিও
এত মূল্যবান হয়ে উঠবে।

মানুষ যখন তরুণ থাকে,
সে ভাবে বড় ঘটনাগুলোই
সারাজীবন মনে থাকবে।

পরে বুঝতে পারে-

জীবন আসলে থেকে যায়
ছোট ছোট দৃশ্যে।

একটি করিডোর,
একটি বিকেল,
একটি পরিচিত পথ,
কয়েকটি না-বলা কথা,

আর গাছের নিচে
একটি পুরোনো বেঞ্চ।

তুমি উঠে দাঁড়ালে।

আমি লক্ষ করলাম।

তুমি বই গুছিয়ে নিলে,
পোশাক ঠিক করলে,
তারপর ধীরে ধীরে
হেঁটে চলে গেলে।

বেঞ্চটি খালি হয়ে গেল।

অদ্ভুতভাবে মনে হলো,
কিছুক্ষণ আগে যে জায়গাটি
এত জীবন্ত ছিল,
তুমি চলে যেতেই
সেটি আবার কাঠ আর লোহার
একটি সাধারণ বস্তু হয়ে গেছে।

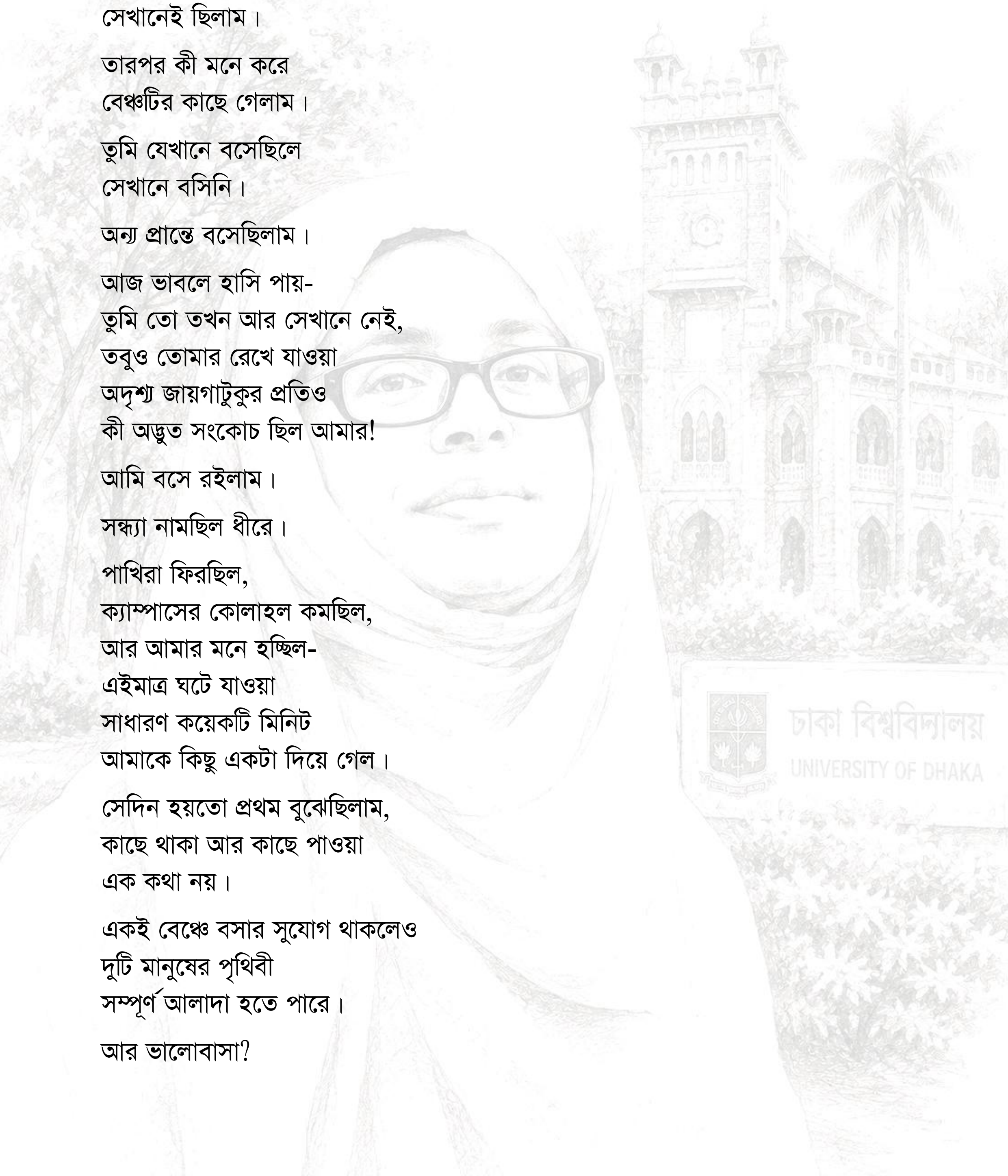

আমি আরও কিছুক্ষণ
সেখানেই ছিলাম।

তারপর কী মনে করে
বেঞ্চটির কাছে গেলাম।

তুমি যেখানে বসেছিলে
সেখানে বসিনি।

অন্য প্রান্তে বসেছিলাম।

আজ ভাবলে হাসি পায়-
তুমি তো তখন আর সেখানে নেই,
তবুও তোমার রেখে যাওয়া
অদৃশ্য জায়গাটুকুর প্রতিও
কী অদ্ভুত সংকোচ ছিল আমার!

আমি বসে রইলাম।

সন্ধ্যা নামছিল ধীরে।

পাখিরা ফিরছিল,
ক্যাম্পাসের কোলাহল কমছিল,
আর আমার মনে হচ্ছিল-
এইমাত্র ঘটে যাওয়া
সাধারণ কয়েকটি মিনিট
আমাকে কিছু একটা দিয়ে গেল।

সেদিন হয়তো প্রথম বুঝেছিলাম,
কাছে থাকা আর কাছে পাওয়া
এক কথা নয়।

একই বেঞ্চে বসার সুযোগ থাকলেও
দুটি মানুষের পৃথিবী
সম্পূর্ণ আলাদা হতে পারে।

আর ভালোবাসা?

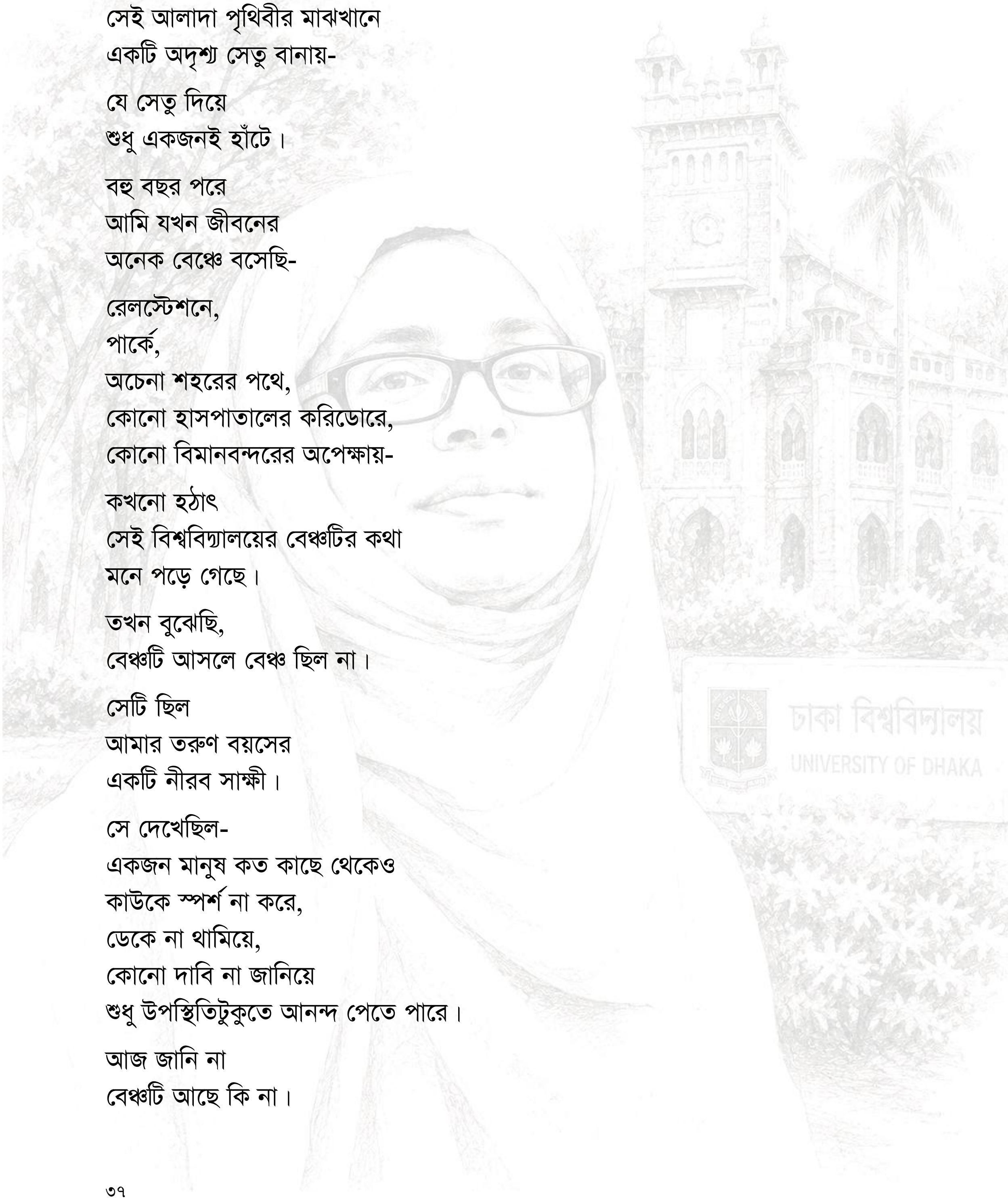

সে কখনো কখনো
সেই আলাদা পৃথিবীর মাঝখানে
একটি অদৃশ্য সেতু বানায়-

যে সেতু দিয়ে
শুধু একজনই হাঁটে।

বহু বছর পরে
আমি যখন জীবনের
অনেক বেঞ্চে বসেছি-

রেলস্টেশনে,
পার্কে,
অচেনা শহরের পথে,
কোনো হাসপাতালের করিডোরে,
কোনো বিমানবন্দরের অপেক্ষায়-

কখনো হঠাৎ
সেই বিশ্ববিদ্যালয়ের বেঞ্চটির কথা
মনে পড়ে গেছে।

তখন বুঝেছি,
বেঞ্চটি আসলে বেঞ্চ ছিল না।

সেটি ছিল
আমার তরুণ বয়সের
একটি নীরব সাক্ষী।

সে দেখেছিল-
একজন মানুষ কত কাছে থেকেও
কাউকে স্পর্শ না করে,
ডেকে না থামিয়ে,
কোনো দাবি না জানিয়ে
শুধু উপস্থিতিটুকুতে আনন্দ পেতে পারে।

আজ জানি না
বেঞ্চটি আছে কি না।

হয়তো বহু আগেই
ভেঙে ফেলা হয়েছে।

হয়তো সেখানে
নতুন ভবন উঠেছে।

হয়তো নতুন কোনো বেঞ্চে
এখন অন্য দুই তরুণ-তরুণী বসে
নিজেদের ভবিষ্যৎ নিয়ে কথা বলে।

কিন্তু আমার স্মৃতিতে
সেই বেঞ্চটি এখনো আছে।

সেখানে তুমি বসে আছো
উনিশশো নব্বইয়ের কোনো বিকেলে।

আর কিছুটা দূরে
আমি দাঁড়িয়ে আছি।

আমাদের মাঝখানে
কয়েক হাত পথ-

আর কয়েক দশকের ভবিষ্যৎ।

আজ যদি সেই বেঞ্চটি
আমাকে একটি প্রশ্ন করতে পারত-

"এত বছর পরেও
তুমি কেন সেই বিকেল মনে রেখেছ?"

আমি হয়তো বলতাম-

কারণ সেদিন
আমাদের মধ্যে কোনো প্রেমের কথা হয়নি,
কোনো প্রতিশ্রুতি হয়নি,
কোনো গল্পও শুরু হয়নি।

ছিল শুধু-

একটি বেঞ্চ,
দুটি মানুষ,

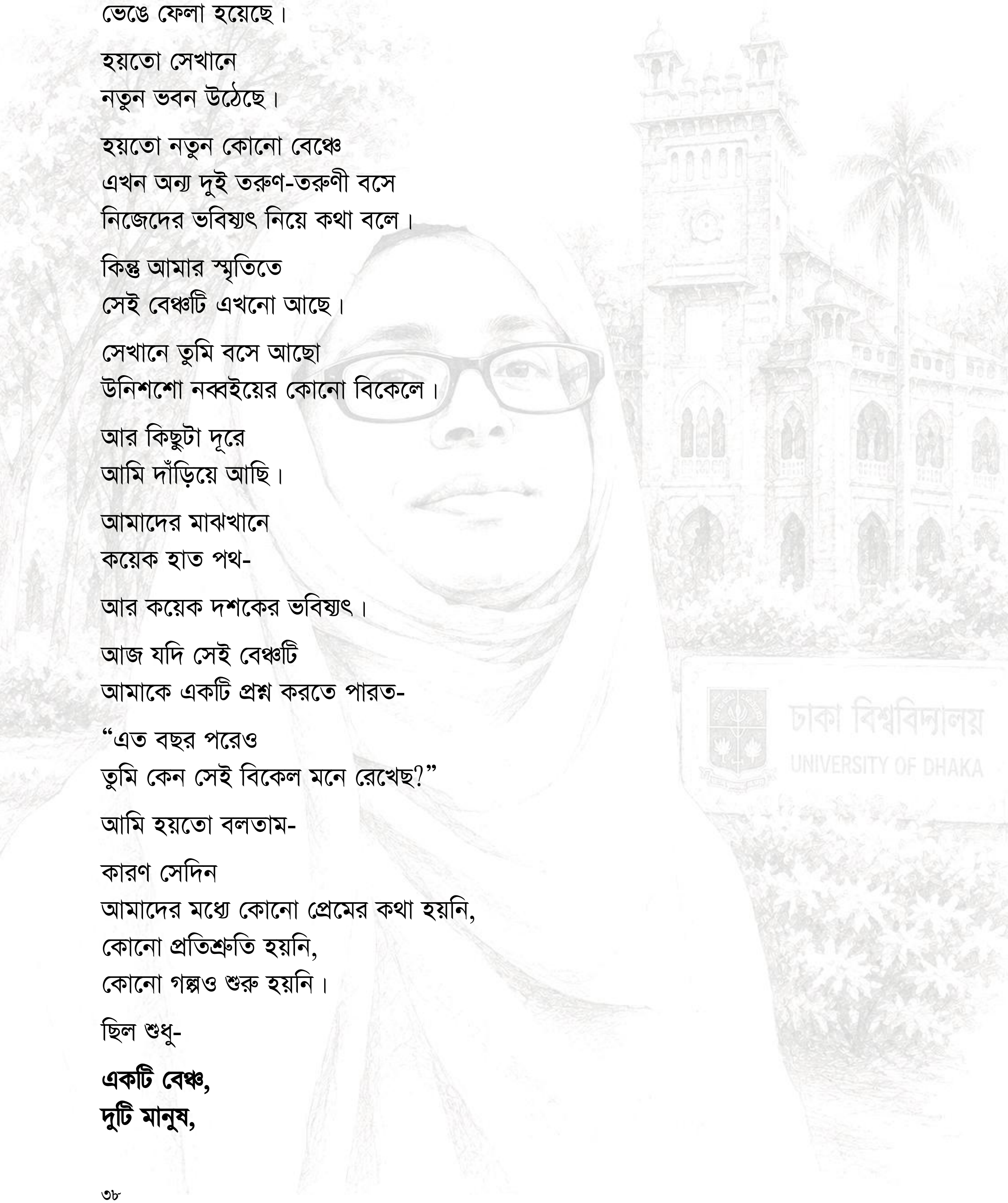

দুটি আলাদা পৃথিবী,
আর দুটি নীরবতা।

তোমার নীরবতা
হয়তো সেদিনই শেষ হয়ে গিয়েছিল।

আমার নীরবতাটি
আজও কবিতা হয়ে
লিখে চলেছে তোমাকে।

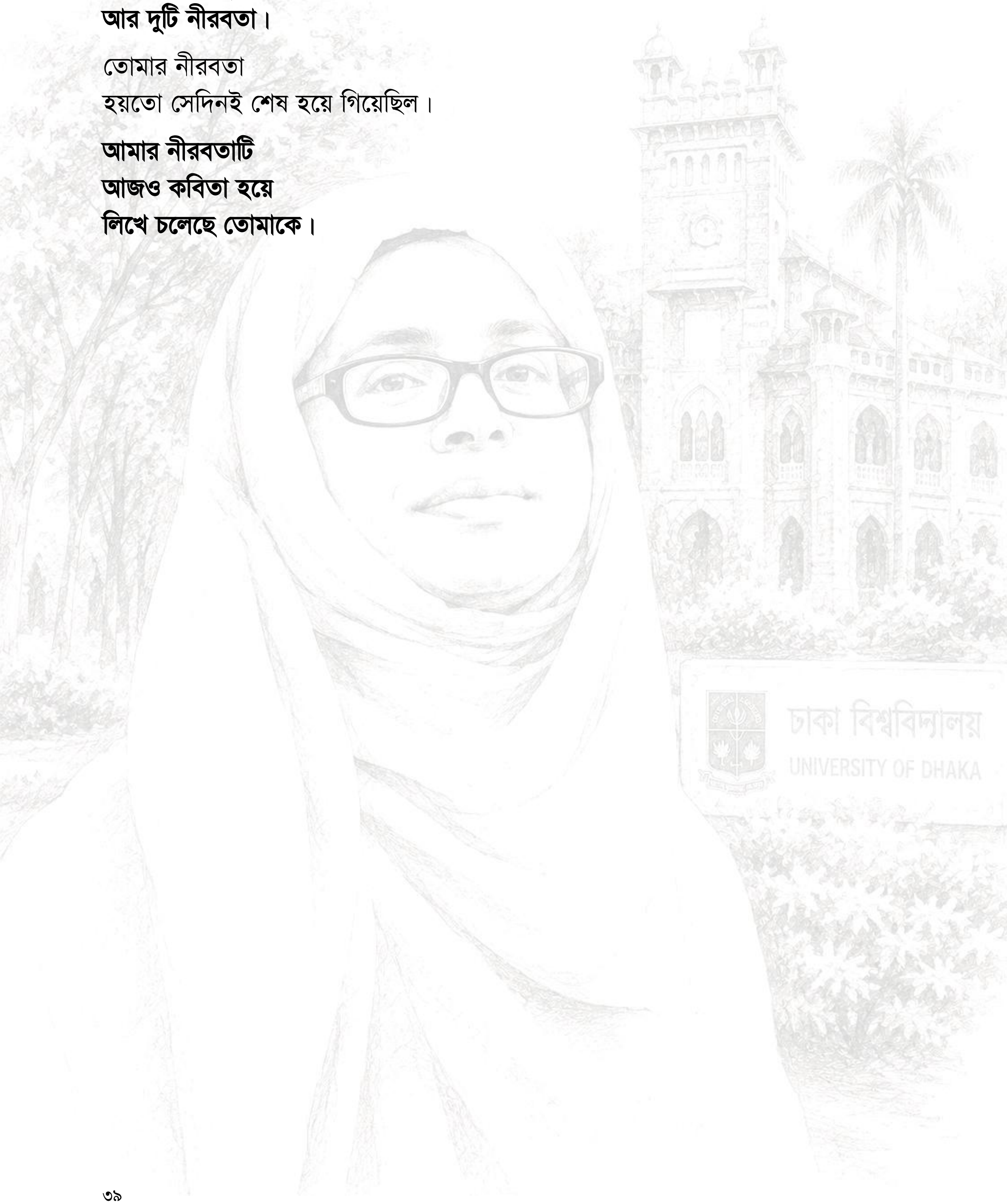

তোমার চোখের কাছে পরাজয়

তোমার চোখের কথা লিখতে গিয়ে
আজও আমার কলম থেমে যায়-
কী ছিল সেখানে,
কোন রঙ, কোন ভাষা, কোন অদৃশ্য টান,
এত বছর পরেও
তার সঠিক উপমা খুঁজে পাই না।

চোখ তো কতই দেখেছি জীবনে।

কত মানুষের চোখে আনন্দ,
কত চোখে অভিমান,
কত চোখে মায়া,
কত চোখে দেখেছি
জীবনের ক্লান্ত বিকেল।

তবু তোমার চোখের কাছে এসে
আমার সমস্ত উপমা
কেন যেন পরাজিত হয়ে যায়।

সেদিনও হয়েছিল।

বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো এক সকালে
হঠাৎ আমাদের চোখ মিলেছিল-
মাত্র কয়েক মুহূর্তের জন্য।

তুমি হয়তো তাকিয়েছিলে
একেবারেই স্বাভাবিকভাবে,
যেভাবে একজন মানুষ
আরেকজন মানুষের দিকে তাকায়।

কিন্তু আমার কাছে
সেই কয়েকটি মুহূর্ত
স্বাভাবিক ছিল না।

আমি প্রস্তুত ছিলাম না।

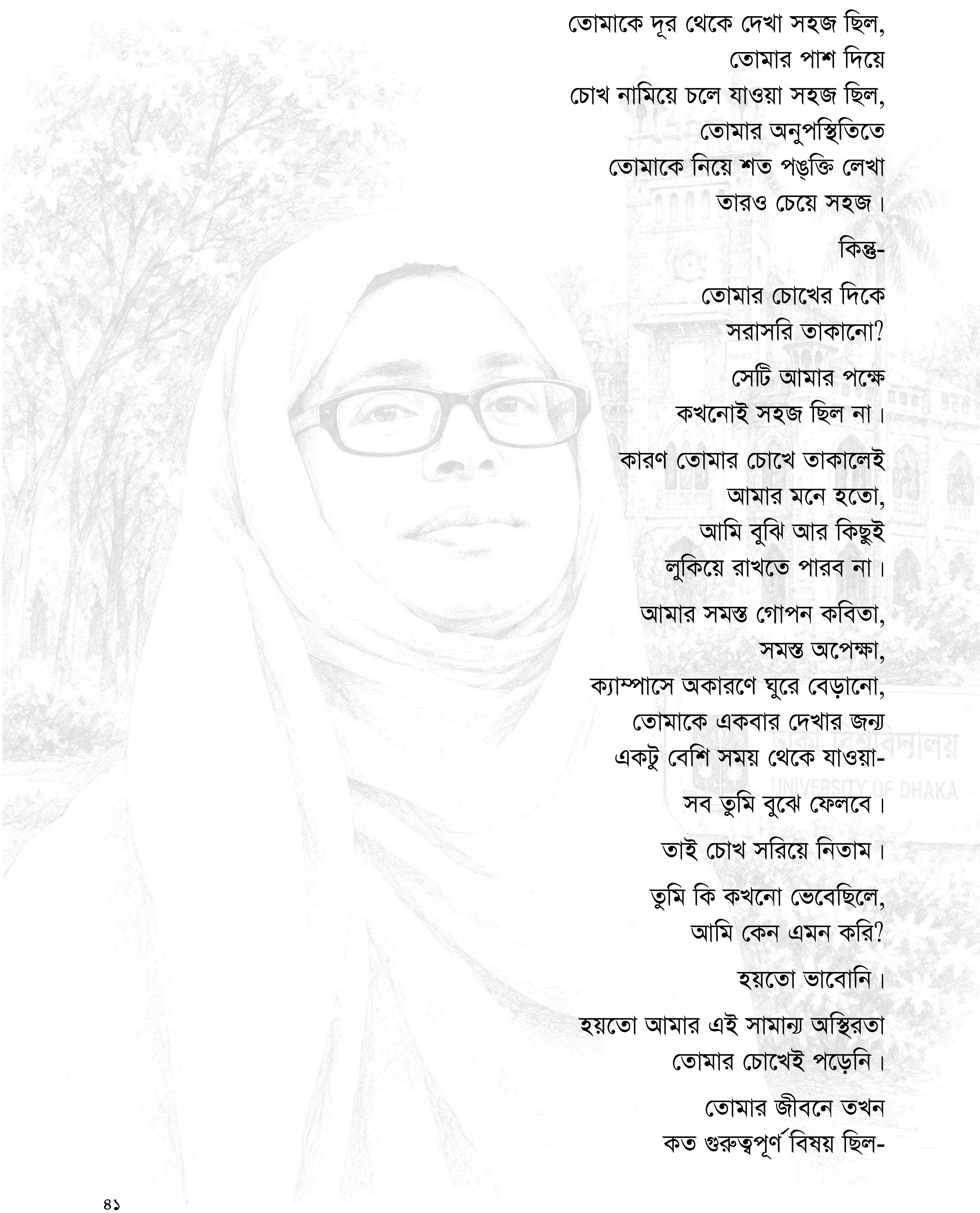

তোমাকে দূর থেকে দেখা সহজ ছিল,
তোমার পাশ দিয়ে
চোখ নামিয়ে চলে যাওয়া সহজ ছিল,
তোমার অনুপস্থিতিতে
তোমাকে নিয়ে শত পঙ্‌ক্তি লেখা
তারও চেয়ে সহজ।

কিন্তু-

তোমার চোখের দিকে
সরাসরি তাকানো?

সেটি আমার পক্ষে
কখনোই সহজ ছিল না।

কারণ তোমার চোখে তাকালেই
আমার মনে হতো,
আমি বুঝি আর কিছুই
লুকিয়ে রাখতে পারব না।

আমার সমস্ত গোপন কবিতা,
সমস্ত অপেক্ষা,
ক্যাম্পাসে অকারণে ঘুরে বেড়ানো,
তোমাকে একবার দেখার জন্য
একটু বেশি সময় থেকে যাওয়া-

সব তুমি বুঝে ফেলবে।

তাই চোখ সরিয়ে নিতাম।

তুমি কি কখনো ভেবেছিলে,
আমি কেন এমন করি?

হয়তো ভাবোনি।

হয়তো আমার এই সামান্য অস্থিরতা
তোমার চোখেই পড়েনি।

তোমার জীবনে তখন
কত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল-

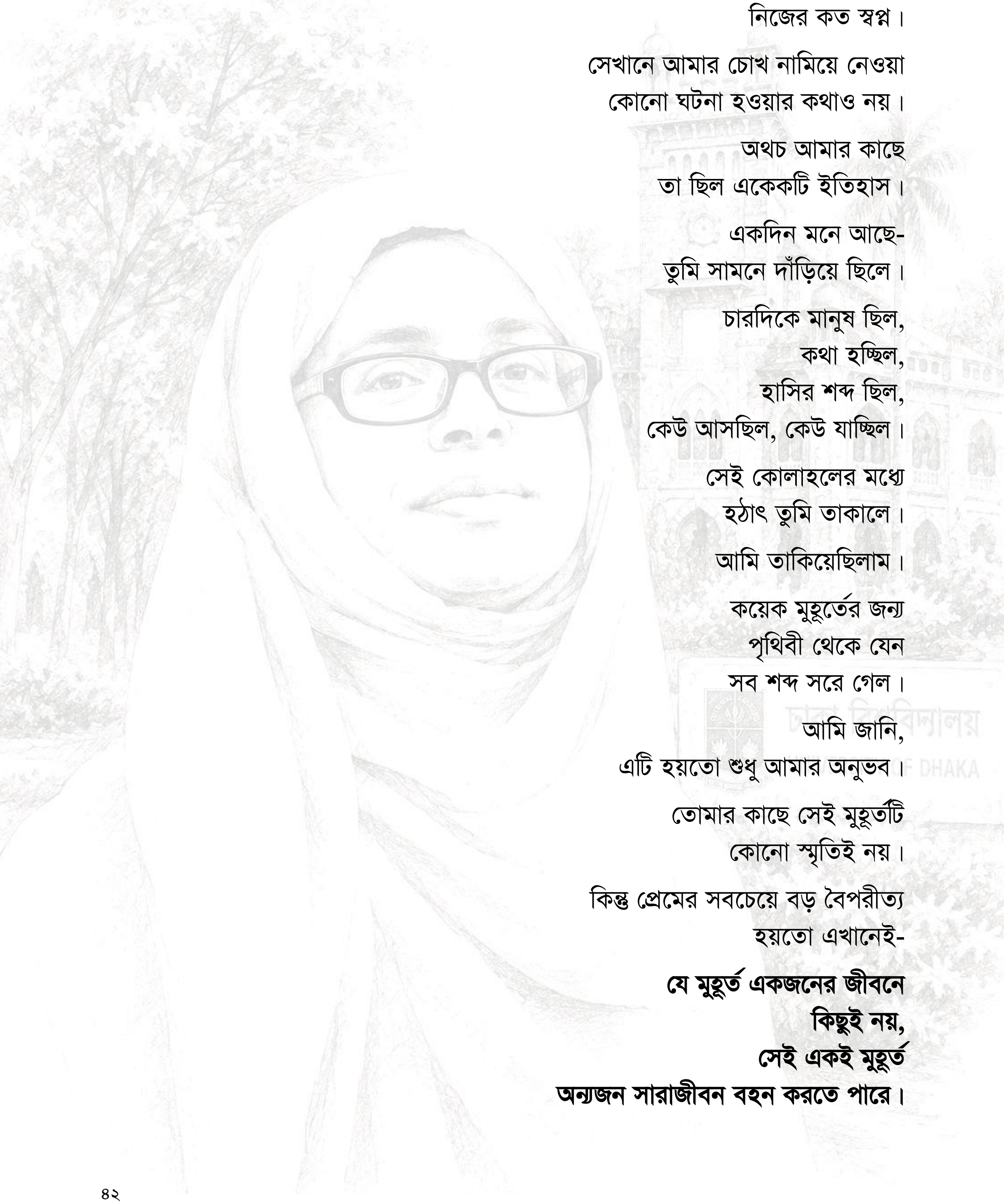

পড়াশোনা, ভবিষ্যৎ, পরিবার, বন্ধু,
নিজের কত স্বপ্ন।

সেখানে আমার চোখ নামিয়ে নেওয়া
কোনো ঘটনা হওয়ার কথাও নয়।

অথচ আমার কাছে
তা ছিল একেকটি ইতিহাস।

একদিন মনে আছে-
তুমি সামনে দাঁড়িয়ে ছিলে।

চারদিকে মানুষ ছিল,
কথা হচ্ছিল,
হাসির শব্দ ছিল,
কেউ আসছিল, কেউ যাচ্ছিল।

সেই কোলাহলের মধ্যে
হঠাৎ তুমি তাকালে।

আমি তাকিয়েছিলাম।

কয়েক মুহূর্তের জন্য
পৃথিবী থেকে যেন
সব শব্দ সরে গেল।

আমি জানি,
এটি হয়তো শুধু আমার অনুভব।

তোমার কাছে সেই মুহূর্তটি
কোনো স্মৃতিই নয়।

কিন্তু প্রেমের সবচেয়ে বড় বৈপরীত্য
হয়তো এখানেই-

যে মুহূর্ত একজনের জীবনে
কিছুই নয়,
সেই একই মুহূর্ত
অন্যজন সারাজীবন বহন করতে পারে।

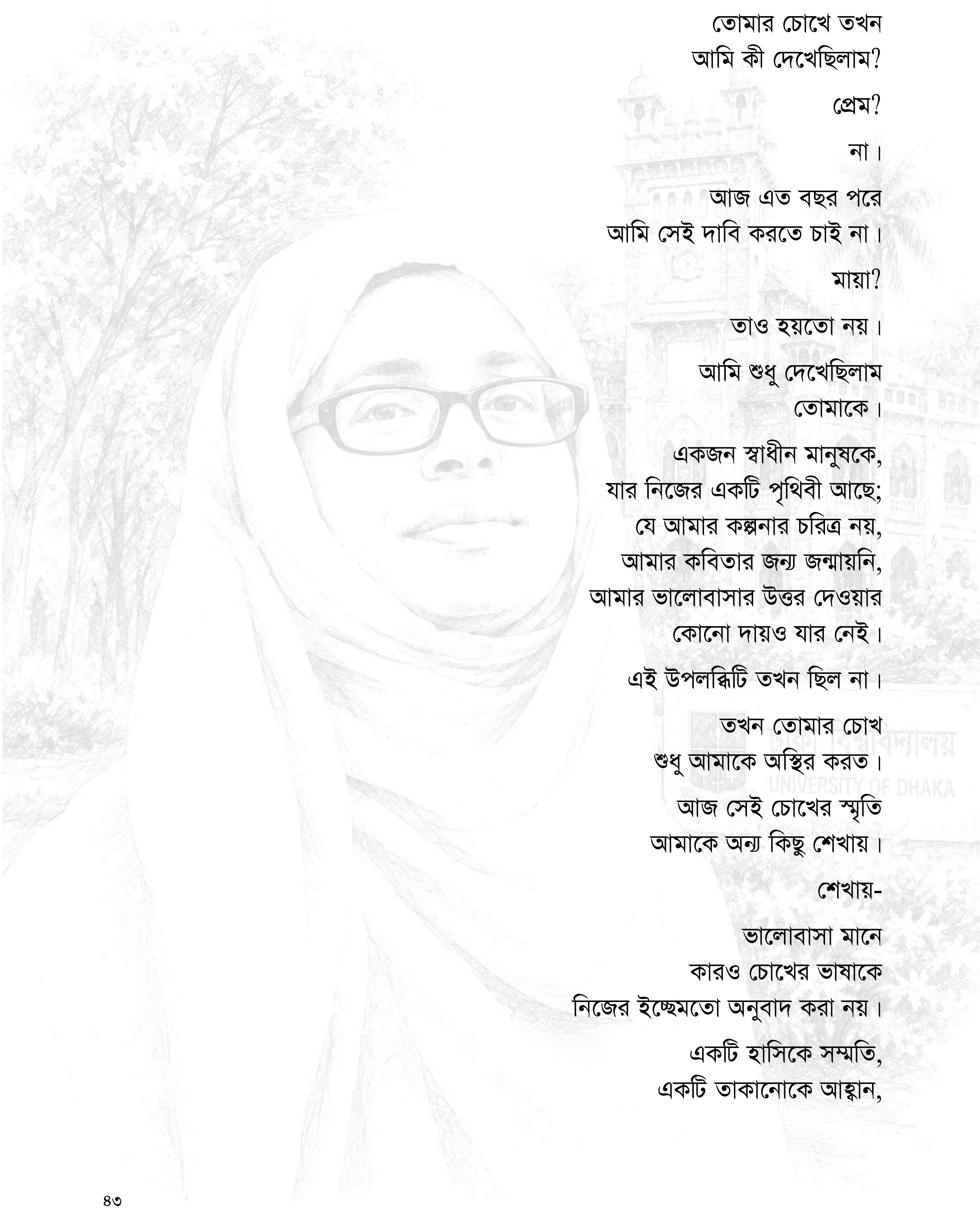

তোমার চোখে তখন
আমি কী দেখেছিলাম?

প্রেম?

না।

আজ এত বছর পরে
আমি সেই দাবি করতে চাই না।

মায়া?

তাও হয়তো নয়।

আমি শুধু দেখেছিলাম
তোমাকে।

একজন স্বাধীন মানুষকে,
যার নিজের একটি পৃথিবী আছে;
যে আমার কল্পনার চরিত্র নয়,
আমার কবিতার জন্য জন্মায়নি,
আমার ভালোবাসার উত্তর দেওয়ার
কোনো দায়ও যার নেই।

এই উপলব্ধিটি তখন ছিল না।

তখন তোমার চোখ
শুধু আমাকে অস্থির করত।

আজ সেই চোখের স্মৃতি
আমাকে অন্য কিছু শেখায়।

শেখায়-

ভালোবাসা মানে
কারও চোখের ভাষাকে
নিজের ইচ্ছেমতো অনুবাদ করা নয়।

একটি হাসিকে সম্মতি,
একটি তাকানোকে আহ্বান,

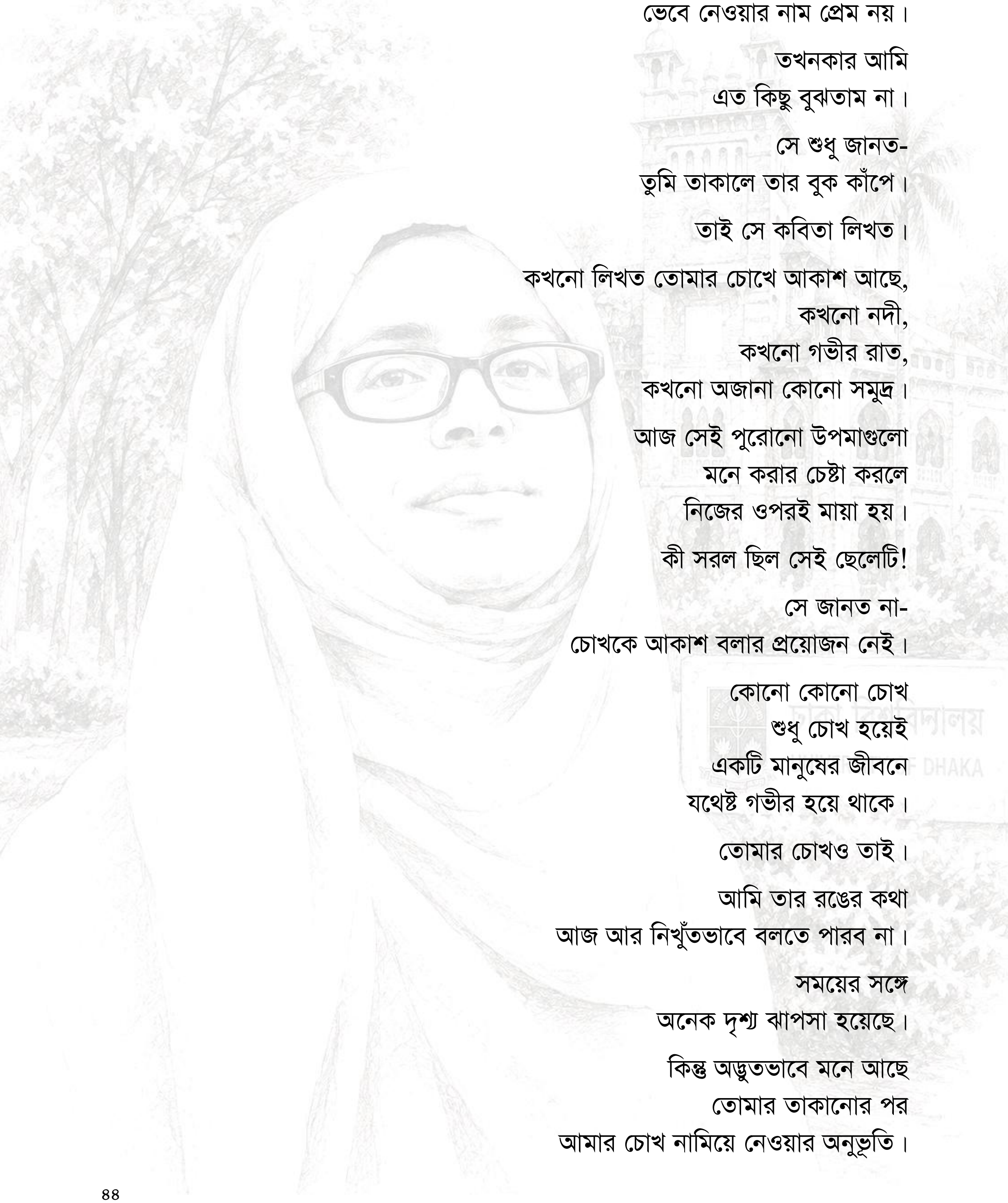

একটি সৌজন্যকে ভালোবাসা
ভেবে নেওয়ার নাম প্রেম নয়।

তখনকার আমি
এত কিছু বুঝতাম না।

সে শুধু জানত-
তুমি তাকালে তার বুক কাঁপে।

তাই সে কবিতা লিখত।

কখনো লিখত তোমার চোখে আকাশ আছে,
কখনো নদী,
কখনো গভীর রাত,
কখনো অজানা কোনো সমুদ্র।

আজ সেই পুরোনো উপমাগুলো
মনে করার চেষ্টা করলে
নিজের ওপরই মায়া হয়।

কী সরল ছিল সেই ছেলেটি!

সে জানত না-
চোখকে আকাশ বলার প্রয়োজন নেই।

কোনো কোনো চোখ
শুধু চোখ হয়েই
একটি মানুষের জীবনে
যথেষ্ট গভীর হয়ে থাকে।

তোমার চোখও তাই।

আমি তার রঙের কথা
আজ আর নিখুঁতভাবে বলতে পারব না।

সময়ের সঙ্গে
অনেক দৃশ্য ঝাপসা হয়েছে।

কিন্তু অদ্ভুতভাবে মনে আছে
তোমার তাকানোর পর
আমার চোখ নামিয়ে নেওয়ার অনুভূতি।

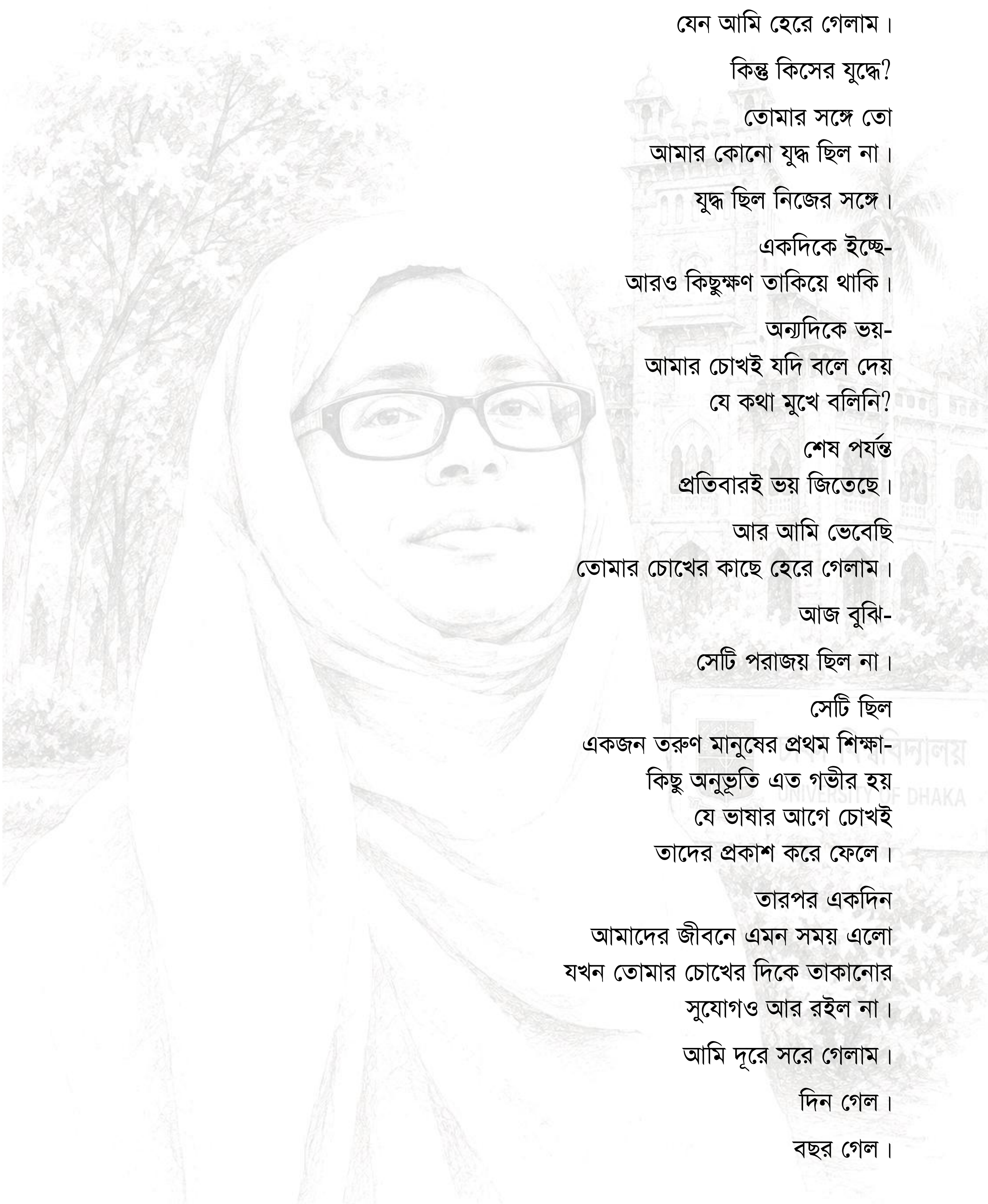

যেন আমি হেরে গেলাম।

কিন্তু কিসের যুদ্ধে?

তোমার সঙ্গে তো
আমার কোনো যুদ্ধ ছিল না।

যুদ্ধ ছিল নিজের সঙ্গে।

একদিকে ইচ্ছে-
আরও কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকি।

অন্যদিকে ভয়-
আমার চোখই যদি বলে দেয়
যে কথা মুখে বলিনি?

শেষ পর্যন্ত
প্রতিবারই ভয় জিতেছে।

আর আমি ভেবেছি
তোমার চোখের কাছে হেরে গেলাম।

আজ বুঝি-

সেটি পরাজয় ছিল না।

সেটি ছিল
একজন তরুণ মানুষের প্রথম শিক্ষা-
কিছু অনুভূতি এত গভীর হয়
যে ভাষার আগে চোখই
তাদের প্রকাশ করে ফেলে।

তারপর একদিন
আমাদের জীবনে এমন সময় এলো
যখন তোমার চোখের দিকে তাকানোর
সুযোগও আর রইল না।

আমি দূরে সরে গেলাম।

দিন গেল।

বছর গেল।

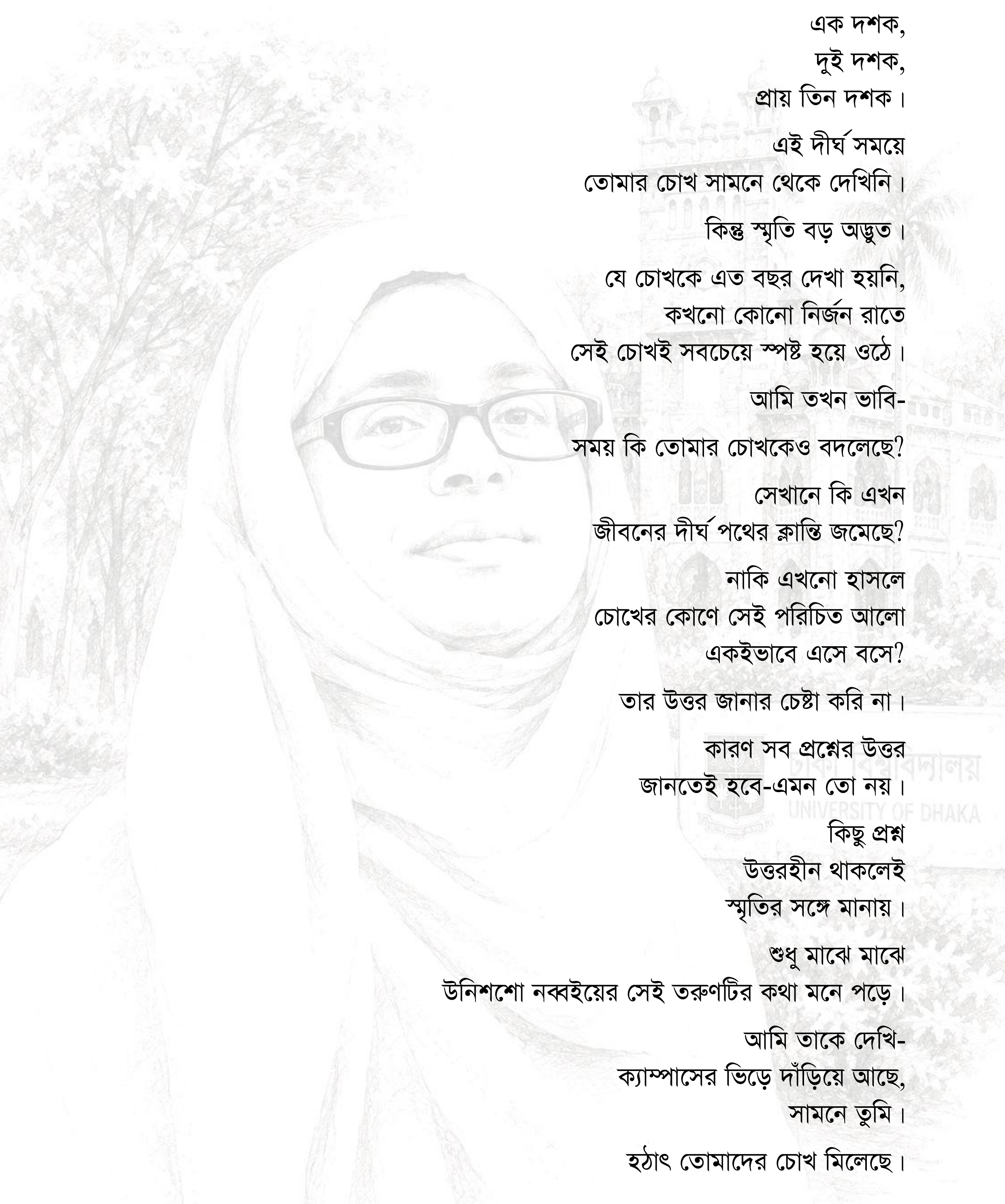

এক দশক,
দুই দশক,
প্রায় তিন দশক।

এই দীর্ঘ সময়ে
তোমার চোখ সামনে থেকে দেখিনি।

কিন্তু স্মৃতি বড় অদ্ভুত।

যে চোখকে এত বছর দেখা হয়নি,
কখনো কোনো নির্জন রাতে
সেই চোখই সবচেয়ে স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

আমি তখন ভাবি-

সময় কি তোমার চোখকেও বদলেছে?

সেখানে কি এখন
জীবনের দীর্ঘ পথের ক্লান্তি জমেছে?

নাকি এখনো হাসলে
চোখের কোণে সেই পরিচিত আলো
একইভাবে এসে বসে?

তার উত্তর জানার চেষ্টা করি না।

কারণ সব প্রশ্নের উত্তর
জানতেই হবে-এমন তো নয়।
কিছু প্রশ্ন
উত্তরহীন থাকলেই
স্মৃতির সঙ্গে মানায়।

শুধু মাঝে মাঝে
উনিশশো নব্বইয়ের সেই তরুণটির কথা মনে পড়ে।

আমি তাকে দেখি-
ক্যাম্পাসের ভিড়ে দাঁড়িয়ে আছে,
সামনে তুমি।

হঠাৎ তোমাদের চোখ মিলেছে।

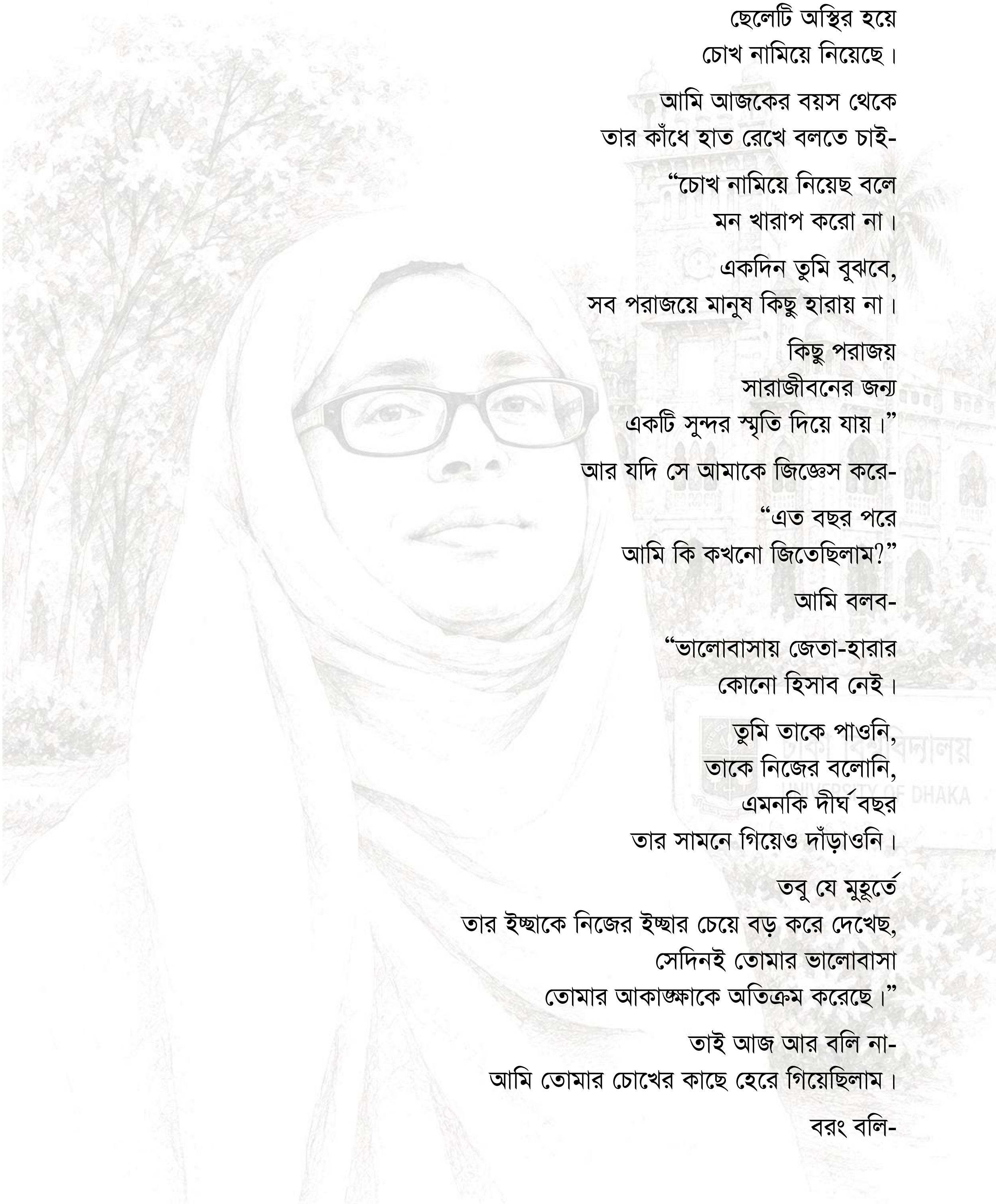

ছেলেটি অস্থির হয়ে
চোখ নামিয়ে নিয়েছে।

আমি আজকের বয়স থেকে
তার কাঁধে হাত রেখে বলতে চাই-

"চোখ নামিয়ে নিয়েছ বলে
মন খারাপ করো না।

একদিন তুমি বুঝবে,
সব পরাজয়ে মানুষ কিছু হারায় না।

কিছু পরাজয়
সারাজীবনের জন্য
একটি সুন্দর স্মৃতি দিয়ে যায়।"

আর যদি সে আমাকে জিজ্ঞেস করে-

"এত বছর পরে
আমি কি কখনো জিতেছিলাম?"

আমি বলব-

"ভালোবাসায় জেতা-হারার
কোনো হিসাব নেই।

তুমি তাকে পাওনি,
তাকে নিজের বলোনি,
এমনকি দীর্ঘ বছর
তার সামনে গিয়েও দাঁড়াওনি।

তবু যে মুহূর্তে
তার ইচ্ছাকে নিজের ইচ্ছার চেয়ে বড় করে দেখেছ,
সেদিনই তোমার ভালোবাসা
তোমার আকাঙ্ক্ষাকে অতিক্রম করেছে।"

তাই আজ আর বলি না-
আমি তোমার চোখের কাছে হেরে গিয়েছিলাম।

বরং বলি-

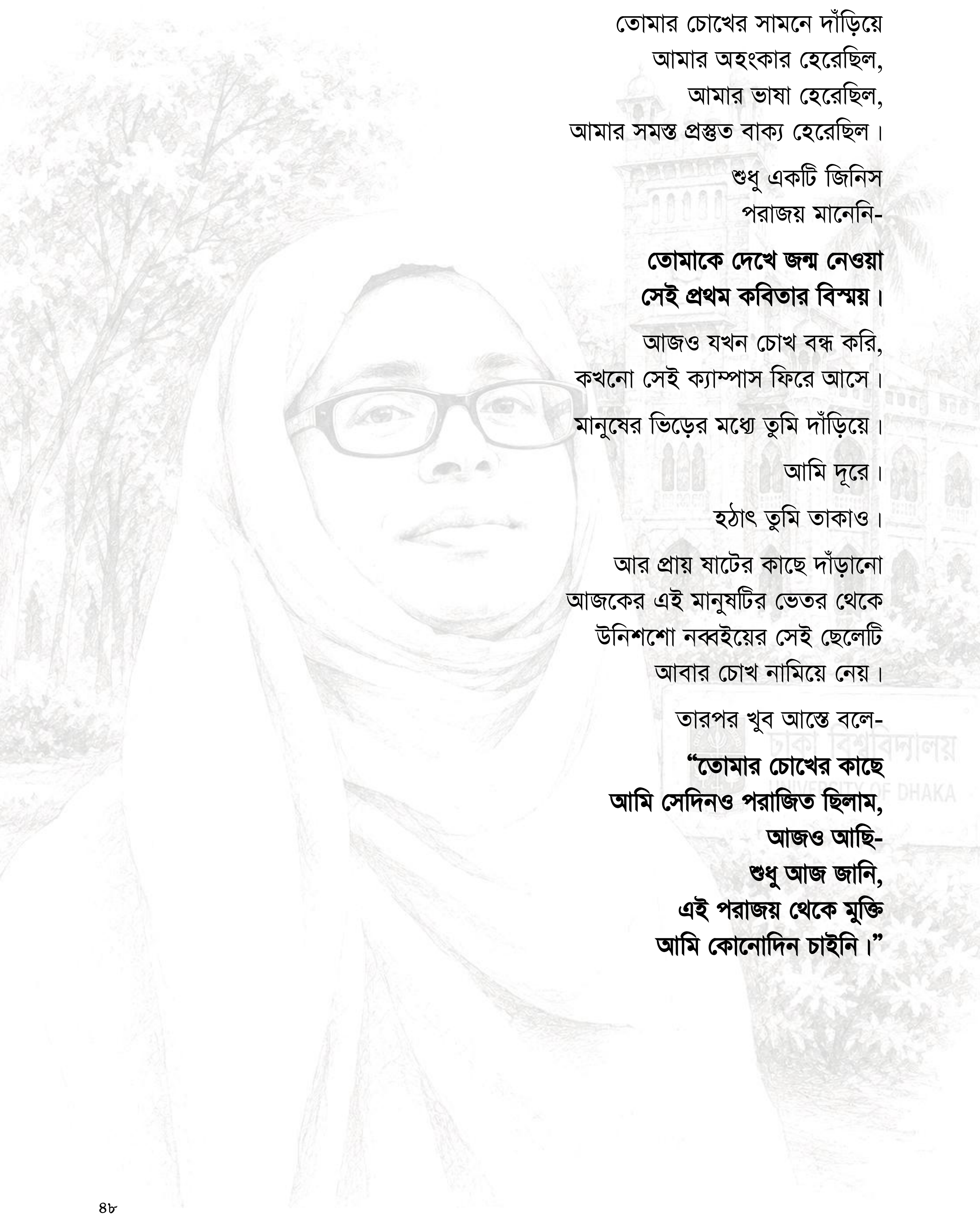

তোমার চোখের সামনে দাঁড়িয়ে
আমার অহংকার হেরেছিল,
আমার ভাষা হেরেছিল,
আমার সমস্ত প্রস্তুত বাক্য হেরেছিল।

শুধু একটি জিনিস
পরাজয় মানেনি-

তোমাকে দেখে জন্ম নেওয়া
সেই প্রথম কবিতার বিস্ময়।

আজও যখন চোখ বন্ধ করি,
কখনো সেই ক্যাম্পাস ফিরে আসে।

মানুষের ভিড়ের মধ্যে তুমি দাঁড়িয়ে।

আমি দূরে।

হঠাৎ তুমি তাকাও।

আর প্রায় ষাটের কাছে দাঁড়ানো
আজকের এই মানুষটির ভেতর থেকে
উনিশশো নব্বইয়ের সেই ছেলেটি
আবার চোখ নামিয়ে নেয়।

তারপর খুব আস্তে বলে-

"তোমার চোখের কাছে
আমি সেদিনও পরাজিত ছিলাম,
আজও আছি-
শুধু আজ জানি,
এই পরাজয় থেকে মুক্তি
আমি কোনোদিন চাইনি।"

ক্লাস শেষে তুমি

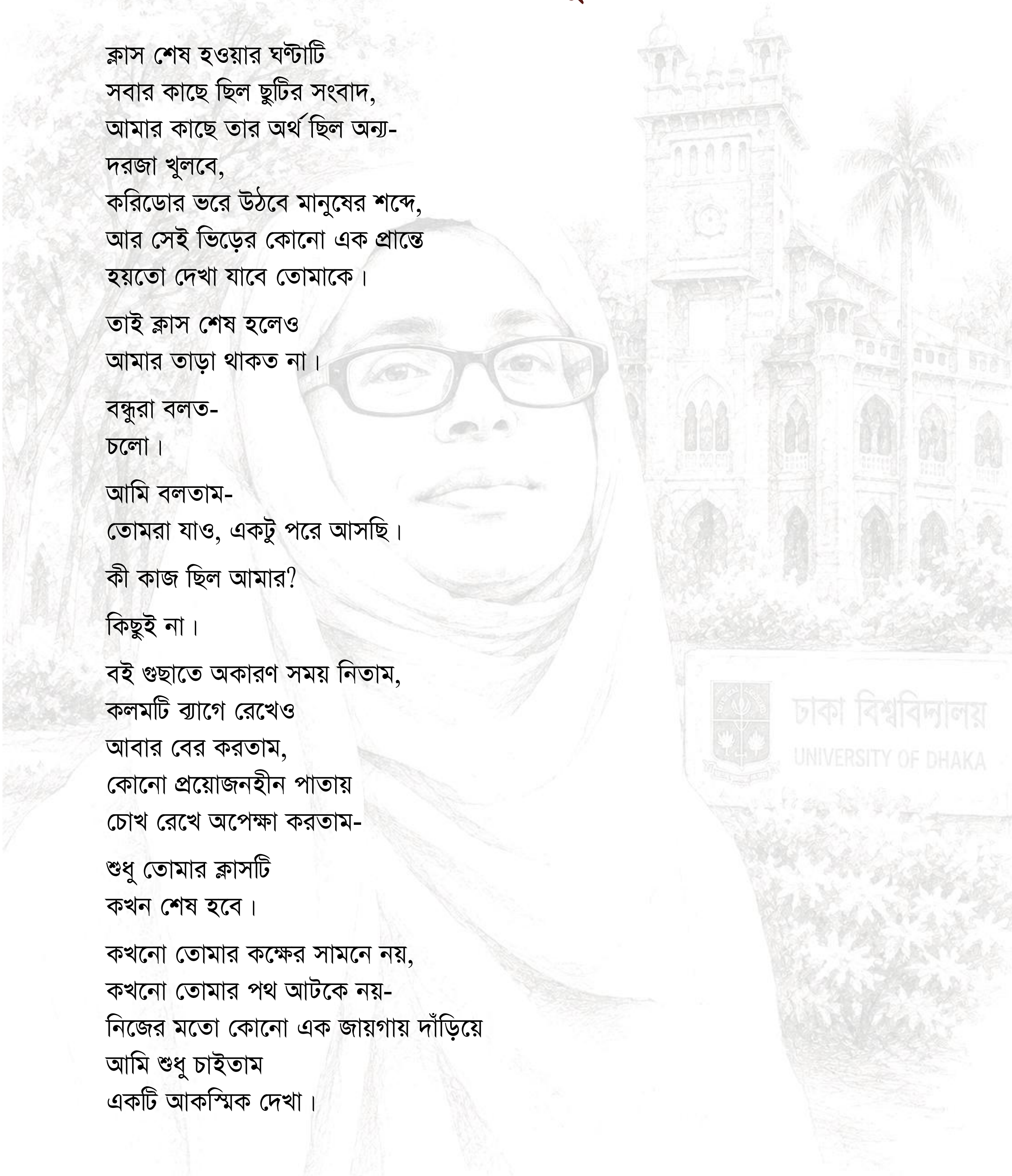

ক্লাস শেষ হওয়ার ঘণ্টাটি
সবার কাছে ছিল ছুটির সংবাদ,
আমার কাছে তার অর্থ ছিল অন্য-
দরজা খুলবে,
করিডোর ভরে উঠবে মানুষের শব্দে,
আর সেই ভিড়ের কোনো এক প্রান্তে
হয়তো দেখা যাবে তোমাকে।

তাই ক্লাস শেষ হলেও
আমার তাড়া থাকত না।

বন্ধুরা বলত-
চলো।

আমি বলতাম-
তোমরা যাও, একটু পরে আসছি।

কী কাজ ছিল আমার?

কিছুই না।

বই গুছাতে অকারণ সময় নিতাম,
কলমটি ব্যাগে রেখেও
আবার বের করতাম,
কোনো প্রয়োজনহীন পাতায়
চোখ রেখে অপেক্ষা করতাম-

শুধু তোমার ক্লাসটি
কখন শেষ হবে।

কখনো তোমার কক্ষের সামনে নয়,
কখনো তোমার পথ আটকে নয়-
নিজের মতো কোনো এক জায়গায় দাঁড়িয়ে
আমি শুধু চাইতাম
একটি আকস্মিক দেখা।

যেন সবটাই কাকতালীয়।

যেন আমি তোমার জন্য অপেক্ষা করিনি।

যেন তোমাকে দেখার সঙ্গে
আমার বিকেলের কোনো সম্পর্কই নেই।

অথচ তখন আমার সমস্ত বিকেল
তোমার একটি মুহূর্তের কাছে
কী সহজে পরাজিত হয়ে থাকত!

তারপর-

কোনো এক দরজা দিয়ে
তুমি বেরিয়ে আসতে।

সঙ্গে কয়েকজন সহপাঠী,
হাতে বই-খাতা,
চোখেমুখে সদ্য শেষ হওয়া ক্লাসের
সাধারণ ব্যস্ততা।

তুমি হয়তো কোনো কথায় হাসছ,
কখনো মন দিয়ে কারও কথা শুনছ,
কখনো দ্রুত পায়ে হাঁটছ-

আর আমি দূর থেকে ভাবছি,

মানুষের হাঁটাও
এত সুন্দর হতে পারে?

তখন জানতাম না
সৌন্দর্য আসলে তোমার হাঁটায় ছিল,
নাকি আমার দেখার চোখে।

প্রেমে পড়া মানুষের চোখ
বোধহয় পৃথিবীকে নিরপেক্ষভাবে দেখে না।

সে যাকে ভালোবাসে,
তার অতি সাধারণ কাজেও
একটু বেশি আলো বসিয়ে দেয়।

তুমি বই হাতে নিলে-
সেটিও সুন্দর।

তুমি চুল সরালে-
সেটিও মনে থাকে।

তুমি কারও প্রশ্নের উত্তর দিলে-
দূর থেকে শব্দ না শুনেও
আমি দৃশ্যটি মনে রাখি।

তুমি চলে গেলে-

সেই চলে যাওয়াটুকুও
আমার কাছে কবিতা।

কখনো তোমাকে দেখে
আমি অন্য পথে চলে যেতাম।

কেন?

হয়তো ভয় ছিল
একই পথে গেলে তুমি ভাববে
আমি তোমাকে অনুসরণ করছি।

আমি চাইনি
আমার ভালো লাগা
তোমার চলার পথে কোনো অস্বস্তি হয়ে দাঁড়াক।

তাই মন চাইত একদিকে,
পা যেত অন্যদিকে।

আজ ভাবি-
প্রেমের প্রথম পাঠগুলোর একটি
আমি হয়তো তখনই শিখছিলাম:

কাছে যাওয়ার সুযোগ থাকলেই
কাছে যেতে হয় না।

কখনো দূরত্বও
ভালোবাসার একটি ভদ্র ভাষা।

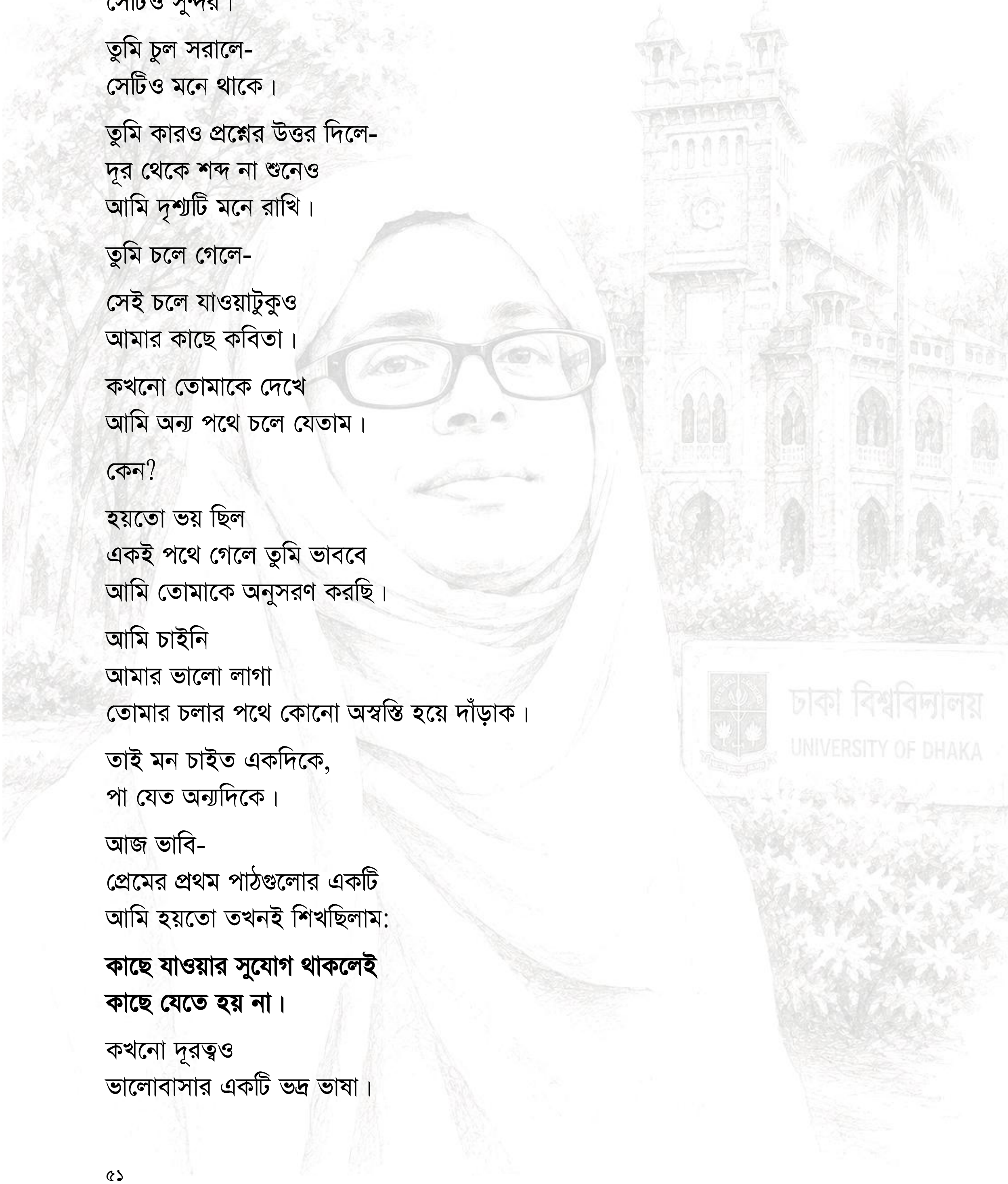

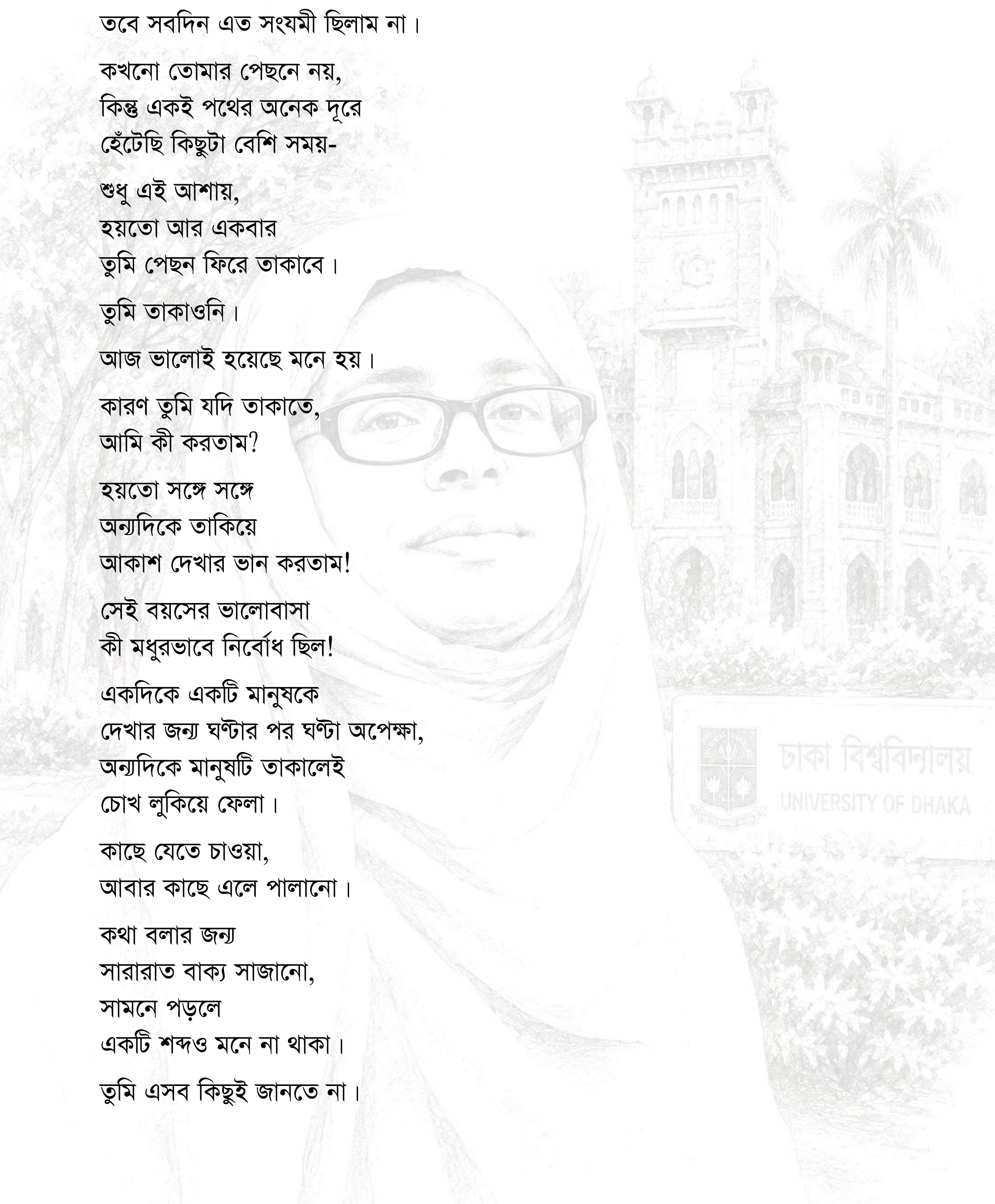

তবে সবদিন এত সংযমী ছিলাম না।

কখনো তোমার পেছনে নয়,
কিন্তু একই পথের অনেক দূরে
হেঁটেছি কিছুটা বেশি সময়-

শুধু এই আশায়,
হয়তো আর একবার
তুমি পেছন ফিরে তাকাবে।

তুমি তাকাওনি।

আজ ভালোই হয়েছে মনে হয়।

কারণ তুমি যদি তাকাতে,
আমি কী করতাম?

হয়তো সঙ্গে সঙ্গে
অন্যদিকে তাকিয়ে
আকাশ দেখার ভান করতাম!

সেই বয়সের ভালোবাসা
কী মধুরভাবে নির্বোধ ছিল!

একদিকে একটি মানুষকে
দেখার জন্য ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপেক্ষা,
অন্যদিকে মানুষটি তাকালেই
চোখ লুকিয়ে ফেলা।

কাছে যেতে চাওয়া,
আবার কাছে এলে পালানো।

কথা বলার জন্য
সারারাত বাক্য সাজানো,
সামনে পড়লে
একটি শব্দও মনে না থাকা।

তুমি এসব কিছুই জানতে না।

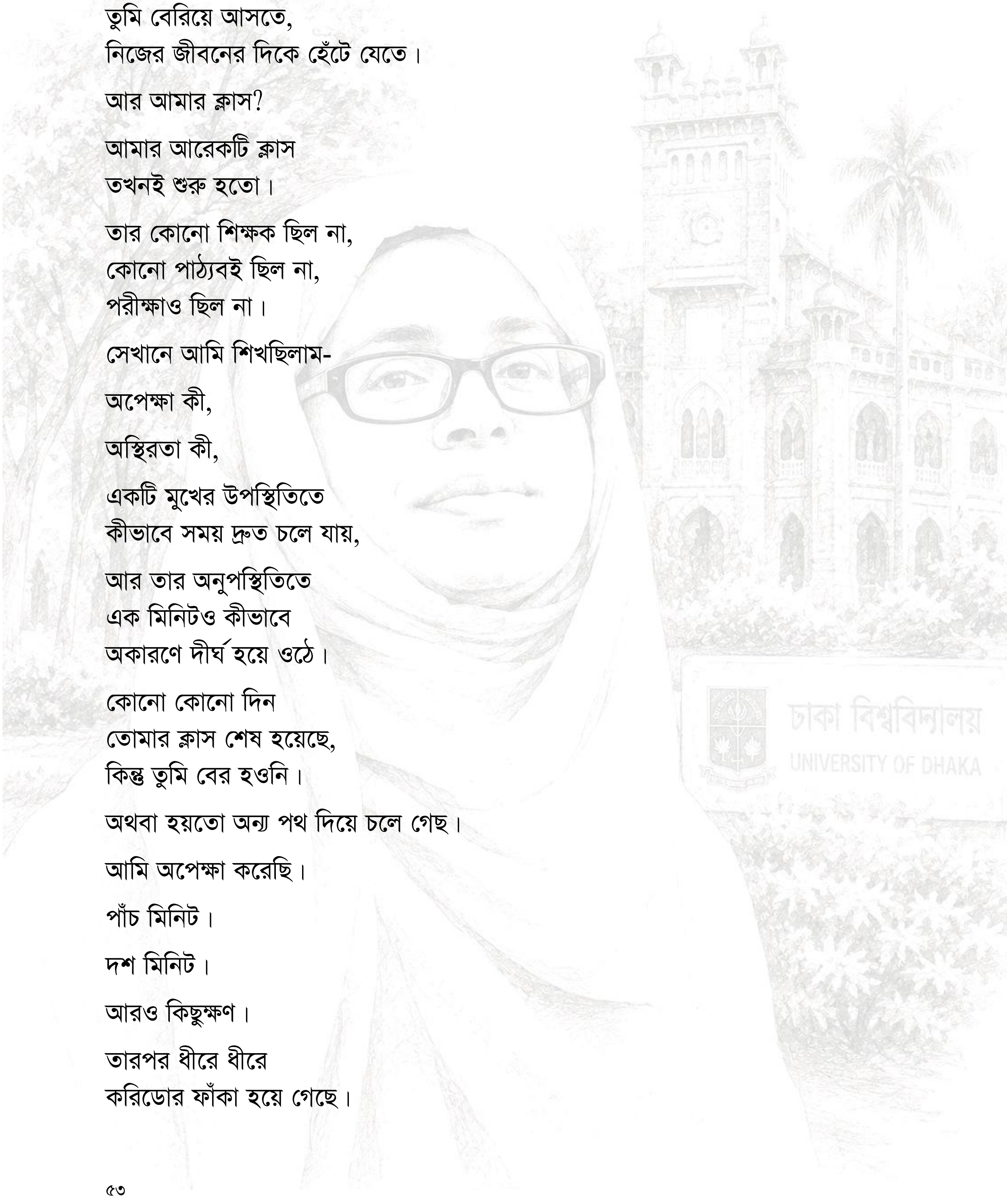

তোমার ক্লাস শেষ হতো,
তুমি বেরিয়ে আসতে,
নিজের জীবনের দিকে হেঁটে যেতে।

আর আমার ক্লাস?

আমার আরেকটি ক্লাস
তখনই শুরু হতো।

তার কোনো শিক্ষক ছিল না,
কোনো পাঠ্যবই ছিল না,
পরীক্ষাও ছিল না।

সেখানে আমি শিখছিলাম-

অপেক্ষা কী,

অস্থিরতা কী,

একটি মুখের উপস্থিতিতে
কীভাবে সময় দ্রুত চলে যায়,

আর তার অনুপস্থিতিতে
এক মিনিটও কীভাবে
অকারণে দীর্ঘ হয়ে ওঠে।

কোনো কোনো দিন
তোমার ক্লাস শেষ হয়েছে,
কিন্তু তুমি বের হওনি।

অথবা হয়তো অন্য পথ দিয়ে চলে গেছ।

আমি অপেক্ষা করেছি।

পাঁচ মিনিট।

দশ মিনিট।

আরও কিছুক্ষণ।

তারপর ধীরে ধীরে
করিডোর ফাঁকা হয়ে গেছে।

মানুষ কমেছে।

শব্দ কমেছে।

শেষ পর্যন্ত বুঝেছি-
আজ আর দেখা হবে না।

কী অদ্ভুত এক শূন্যতা
তখন বুকের মধ্যে নামত!

যেন কেউ আমাকে
কিছু দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল,
তারপর দেয়নি।

অথচ কেউ তো
কোনো প্রতিশ্রুতিই দেয়নি।

তুমি তো বলোনি-
"ক্লাস শেষে আমাকে দেখতে পাবে।"

আমিই নিজের মনে
একটি প্রত্যাশা বানিয়েছিলাম।

আমিই তার জন্য অপেক্ষা করেছি।

আমিই শেষে
সামান্য মন খারাপ নিয়ে বাড়ি ফিরেছি।

আজ বুঝি-

মানুষের অনেক কষ্টই
অন্য মানুষ তৈরি করে না;
আমাদের নিজের প্রত্যাশা
নিঃশব্দে তৈরি করে।

কিন্তু তখন
এত দর্শন জানতাম না।

তখন শুধু মনে হতো-

আজ তোমাকে দেখা হলো না।

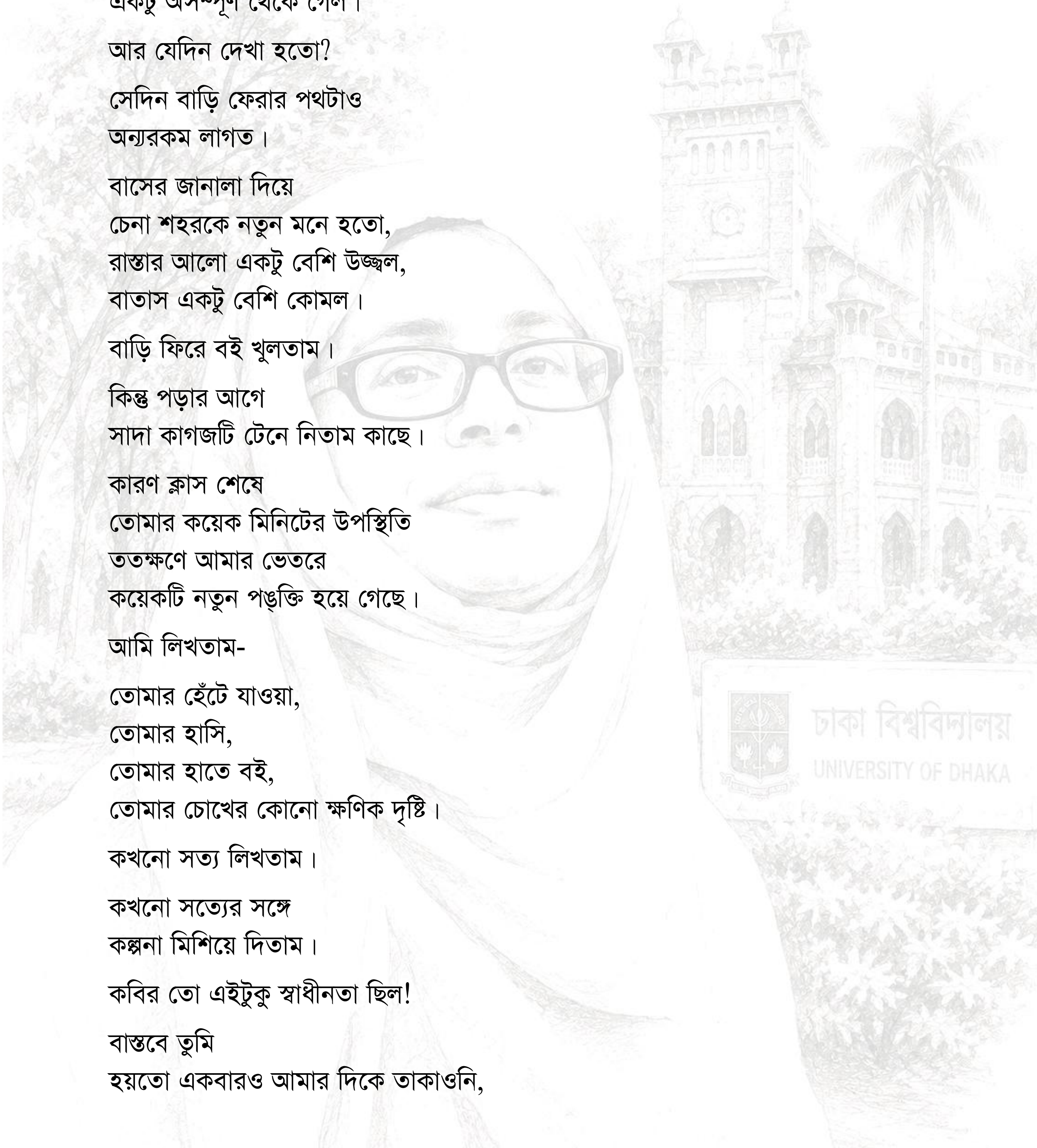

দিনটি যেন
একটু অসম্পূর্ণ থেকে গেল।

আর যেদিন দেখা হতো?

সেদিন বাড়ি ফেরার পথটাও
অন্যরকম লাগত।

বাসের জানালা দিয়ে
চেনা শহরকে নতুন মনে হতো,
রাস্তার আলো একটু বেশি উজ্জ্বল,
বাতাস একটু বেশি কোমল।

বাড়ি ফিরে বই খুলতাম।

কিন্তু পড়ার আগে
সাদা কাগজটি টেনে নিতাম কাছে।

কারণ ক্লাস শেষে
তোমার কয়েক মিনিটের উপস্থিতি
ততক্ষণে আমার ভেতরে
কয়েকটি নতুন পঙ্‌ক্তি হয়ে গেছে।

আমি লিখতাম-

তোমার হেঁটে যাওয়া,
তোমার হাসি,
তোমার হাতে বই,
তোমার চোখের কোনো ক্ষণিক দৃষ্টি।

কখনো সত্য লিখতাম।

কখনো সত্যের সঙ্গে
কল্পনা মিশিয়ে দিতাম।

কবির তো এইটুকু স্বাধীনতা ছিল!

বাস্তবে তুমি
হয়তো একবারও আমার দিকে তাকাওনি,

কিন্তু কবিতায়
কখনো তোমাকে দিয়ে
একবার পেছন ফিরে তাকিয়েছি।

বাস্তবে আমাদের
কথা হয়নি,

কিন্তু কবিতায়
তোমার সঙ্গে কত সন্ধ্যা
কথা বলে কাটিয়েছি।

বাস্তব আমাকে
যেটুকু দেয়নি,

কল্পনা তার চেয়ে বেশি দিয়েছিল।

তবু একটি সীমা ছিল-

আমার কল্পনার তোমাকে
আমি কখনো বন্দী করতে চাইনি।

কারণ অদ্ভুতভাবে
তরুণ বয়সেই আমার মনে হয়েছিল-

যাকে ভালোবাসি,
তার স্বাধীনতাও ভালোবাসতে হয়।

তার হাসি যদি
আমাকে ছাড়া পূর্ণ হয়,

তবু সেই হাসি সুন্দর।

তার পথ যদি
আমার পথ থেকে আলাদা হয়,

তবু তার পথ থামিয়ে
আমার দিকে ফেরানো
ভালোবাসা হতে পারে না।

এই উপলব্ধি তখন
সম্পূর্ণ ছিল না হয়তো।

পরে জীবন তাকে
অনেক কঠিনভাবে পূর্ণ করেছে।

একদিন সত্যিই
আমাকে তোমার পথ থেকে
সরে দাঁড়াতে হয়েছে।

আর আমি সরে গেছি।

তারপর কত হাজার ক্লাস
শেষ হয়েছে পৃথিবীর বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে।

কত তরুণ দরজা দিয়ে বেরিয়েছে,
কত প্রেম শুরু হয়েছে,
কত প্রেম শেষ হয়েছে।

আমাদের বয়সও
চুপচাপ এগিয়েছে ষাটের দিকে।

আজ আর কোনো করিডোরে দাঁড়িয়ে
তোমার ক্লাস শেষ হওয়ার
অপেক্ষা করি না।

প্রায় ত্রিশ বছর
সামনে থেকে তোমাকে দেখতেও যাইনি।

তবু কখনো
বিকেলের কোনো বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস দেখলে
আমার ভেতরে অদ্ভুতভাবে
একটি পুরোনো ঘণ্টা বেজে ওঠে।

মনে হয়-

এই তো ক্লাস শেষ হলো।

এখনই হয়তো
দরজা দিয়ে তুমি বেরিয়ে আসবে।

হাতে কয়েকটি বই থাকবে,
পাশে সহপাঠীরা,
তুমি নিজের মতো হেঁটে যাবে।

আর দূরে দাঁড়িয়ে থাকবে
একজন তরুণ-

যে তখনো জানে না
এই কয়েক মিনিটের অপেক্ষা
একদিন তিন দশকের স্মৃতি হয়ে যাবে।

আমি আজ তার পাশে গিয়ে
নিঃশব্দে দাঁড়াই।

তাকে বলি না
ভবিষ্যতে কী ঘটবে।

বললে হয়তো
তার এই নির্মল অপেক্ষাটুকু
বিষণ্ন হয়ে যাবে।

শুধু কাঁধে হাত রেখে বলি-

"দেখে নাও।
কোনো দাবি নিয়ে নয়,
কোনো ভবিষ্যতের প্রতিশ্রুতি নিয়ে নয়-
শুধু এই মুহূর্তটুকু দেখে রাখো।

একদিন অনেক বয়সে
তোমার সব ক্লাস শেষ হয়ে যাবে,
অনেক বই বন্ধ হয়ে যাবে,
অনেক মুখও ভুলে যাবে-

কিন্তু ক্লাস শেষে
মানুষের ভিড়ের মধ্যে
ওই মেয়েটির হেঁটে আসার দৃশ্যটি
তোমার হৃদয়ের কোনো এক করিডোরে
আজীবন ক্লাস শেষে বেরিয়ে আসবে।"

যেদিন অপেক্ষার জন্ম হলো

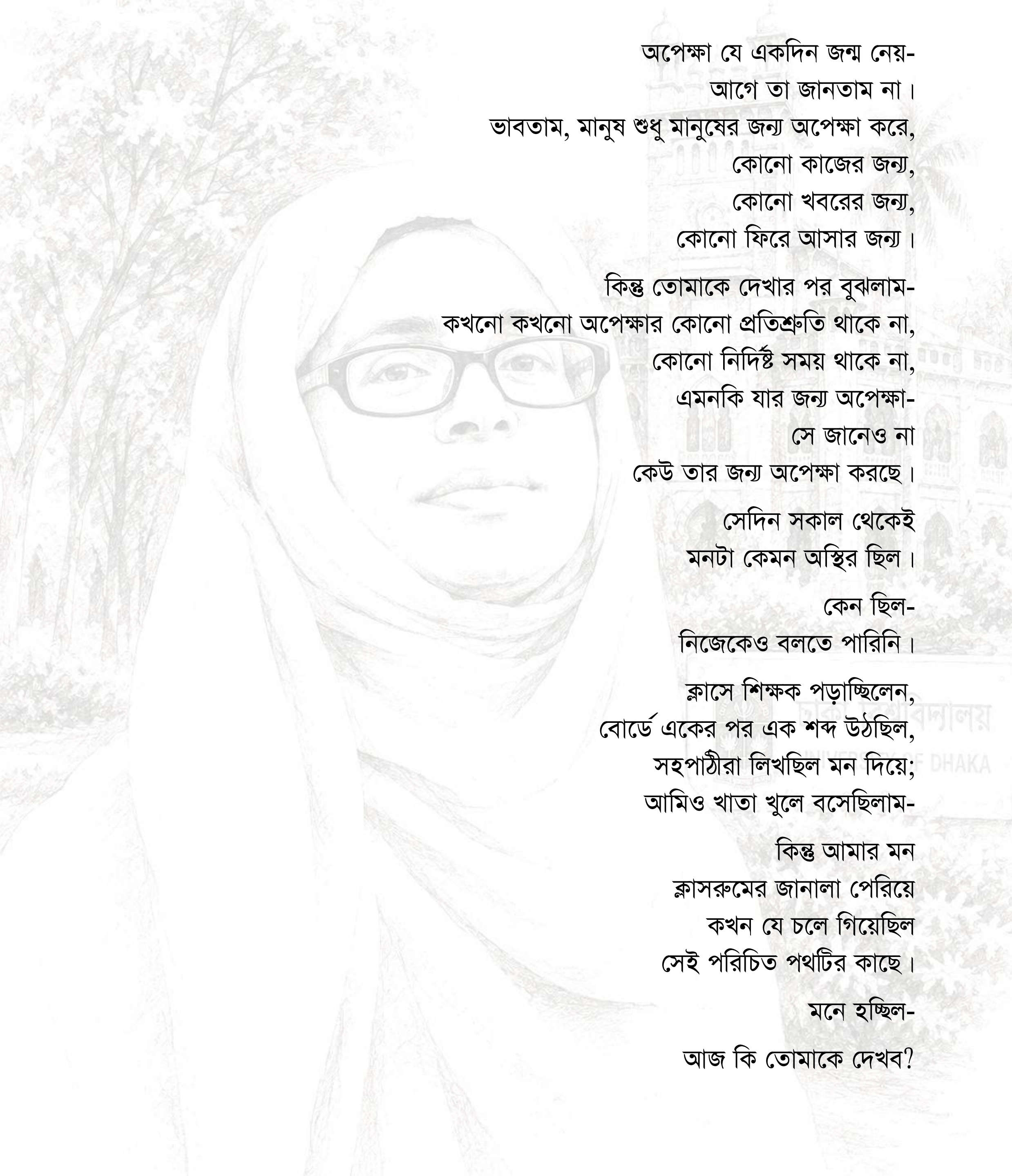

অপেক্ষা যে একদিন জন্ম নেয়-
আগে তা জানতাম না।
ভাবতাম, মানুষ শুধু মানুষের জন্য অপেক্ষা করে,
কোনো কাজের জন্য,
কোনো খবরের জন্য,
কোনো ফিরে আসার জন্য।

কিন্তু তোমাকে দেখার পর বুঝলাম-
কখনো কখনো অপেক্ষার কোনো প্রতিশ্রুতি থাকে না,
কোনো নির্দিষ্ট সময় থাকে না,
এমনকি যার জন্য অপেক্ষা-
সে জানেও না
কেউ তার জন্য অপেক্ষা করছে।

সেদিন সকাল থেকেই
মনটা কেমন অস্থির ছিল।

কেন ছিল-
নিজেকেও বলতে পারিনি।

ক্লাসে শিক্ষক পড়াচ্ছিলেন,
বোর্ডে একের পর এক শব্দ উঠছিল,
সহপাঠীরা লিখছিল মন দিয়ে;
আমিও খাতা খুলে বসেছিলাম-

কিন্তু আমার মন
ক্লাসরুমের জানালা পেরিয়ে
কখন যে চলে গিয়েছিল
সেই পরিচিত পথটির কাছে।

মনে হচ্ছিল-

আজ কি তোমাকে দেখব?

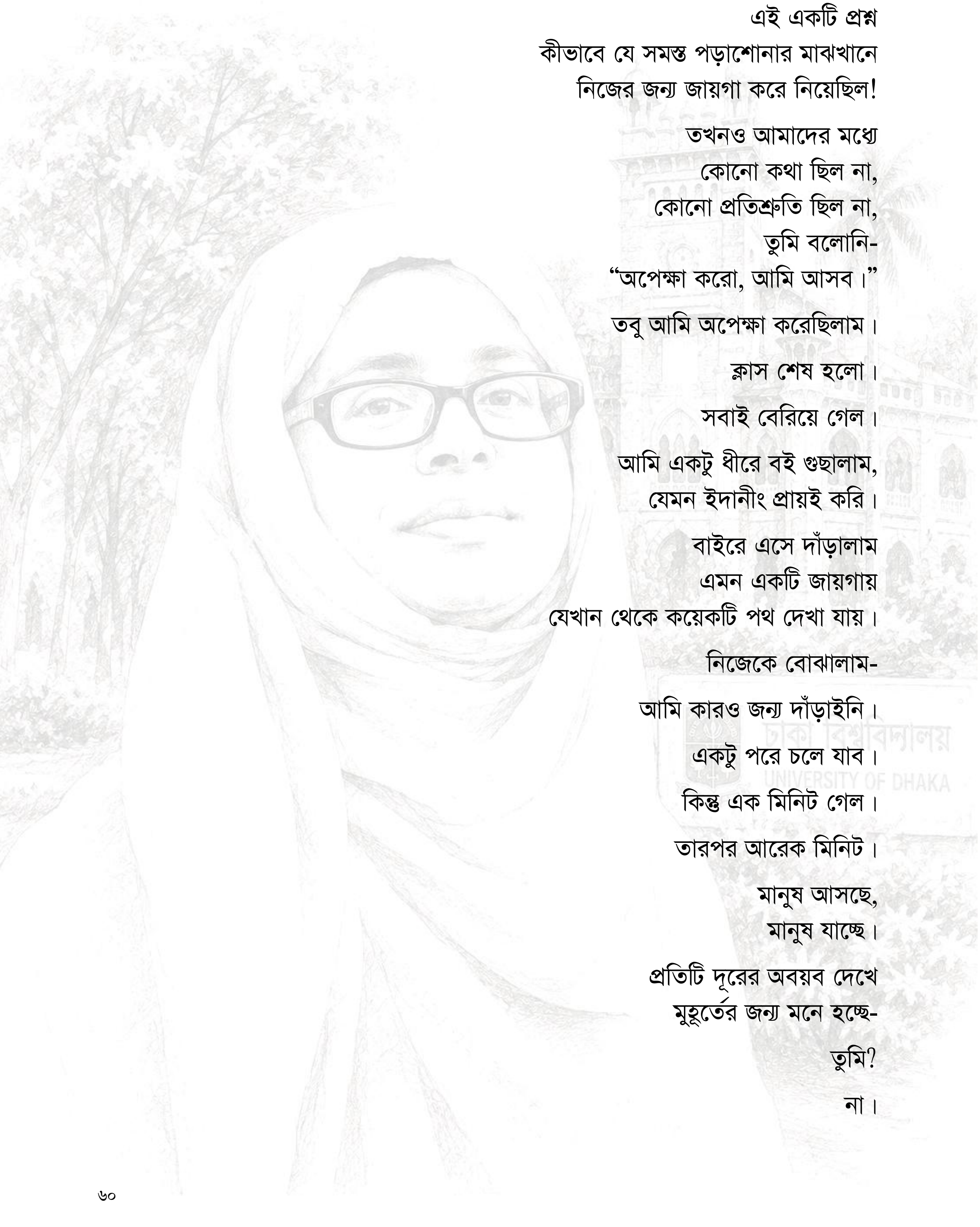

এই একটি প্রশ্ন
কীভাবে যে সমস্ত পড়াশোনার মাঝখানে
নিজের জন্য জায়গা করে নিয়েছিল!

তখনও আমাদের মধ্যে
কোনো কথা ছিল না,
কোনো প্রতিশ্রুতি ছিল না,
তুমি বলোনি-
"অপেক্ষা করো, আমি আসব।"

তবু আমি অপেক্ষা করেছিলাম।

ক্লাস শেষ হলো।

সবাই বেরিয়ে গেল।

আমি একটু ধীরে বই গুছালাম,
যেমন ইদানীং প্রায়ই করি।

বাইরে এসে দাঁড়ালাম
এমন একটি জায়গায়
যেখান থেকে কয়েকটি পথ দেখা যায়।

নিজেকে বোঝালাম-

আমি কারও জন্য দাঁড়াইনি।

একটু পরে চলে যাব।

কিন্তু এক মিনিট গেল।

তারপর আরেক মিনিট।

মানুষ আসছে,
মানুষ যাচ্ছে।

প্রতিটি দূরের অবয়ব দেখে
মুহূর্তের জন্য মনে হচ্ছে-

তুমি?

না।

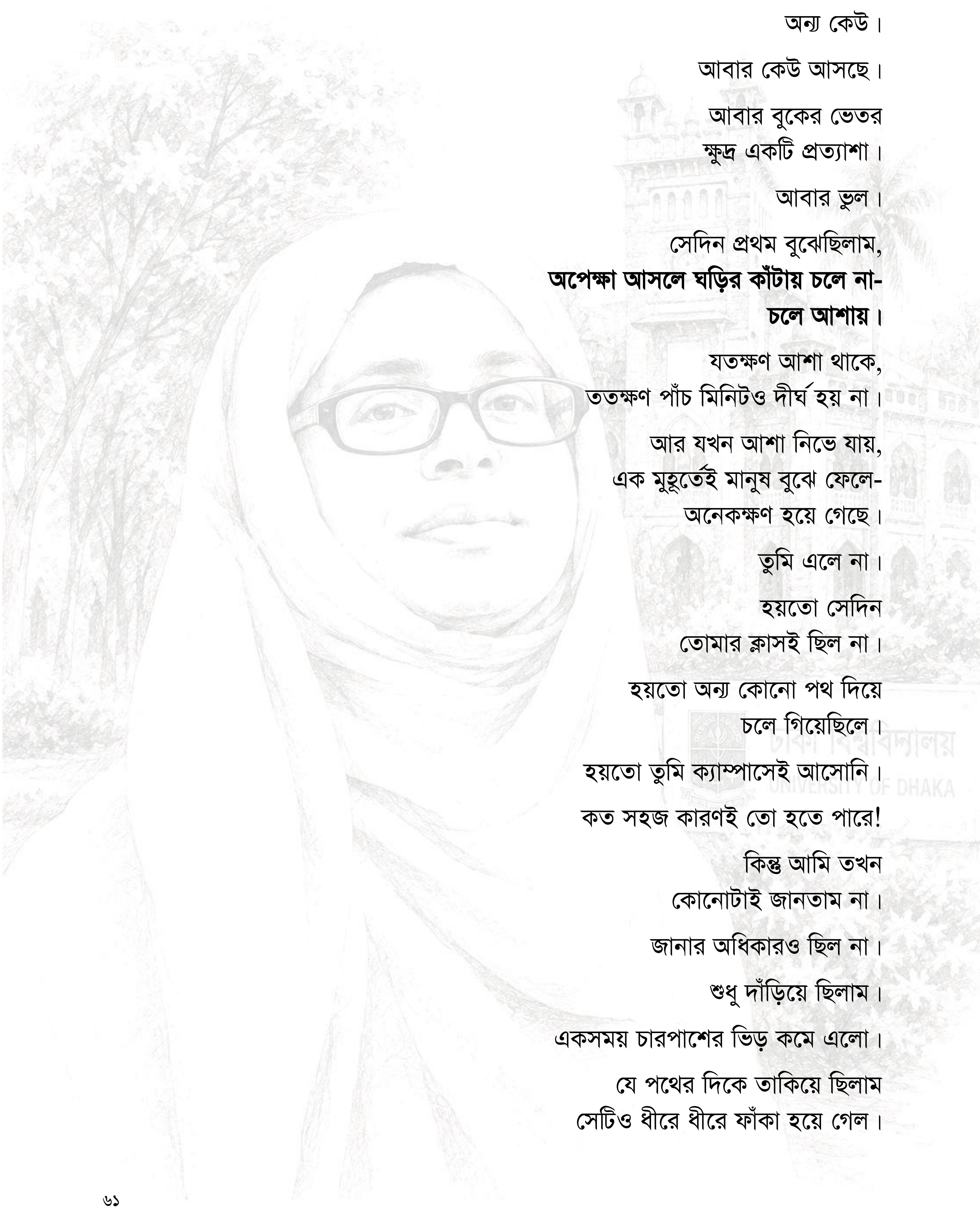

অন্য কেউ।

আবার কেউ আসছে।

আবার বুকের ভেতর
ক্ষুদ্র একটি প্রত্যাশা।

আবার ভুল।

সেদিন প্রথম বুঝেছিলাম,
অপেক্ষা আসলে ঘড়ির কাঁটায় চলে না-
চলে আশায়।

যতক্ষণ আশা থাকে,
ততক্ষণ পাঁচ মিনিটও দীর্ঘ হয় না।

আর যখন আশা নিভে যায়,
এক মুহূর্তেই মানুষ বুঝে ফেলে-
অনেকক্ষণ হয়ে গেছে।

তুমি এলে না।

হয়তো সেদিন
তোমার ক্লাসই ছিল না।

হয়তো অন্য কোনো পথ দিয়ে
চলে গিয়েছিলে।

হয়তো তুমি ক্যাম্পাসেই আসোনি।

কত সহজ কারণই তো হতে পারে!

কিন্তু আমি তখন
কোনোটাই জানতাম না।

জানার অধিকারও ছিল না।

শুধু দাঁড়িয়ে ছিলাম।

একসময় চারপাশের ভিড় কমে এলো।

যে পথের দিকে তাকিয়ে ছিলাম
সেটিও ধীরে ধীরে ফাঁকা হয়ে গেল।

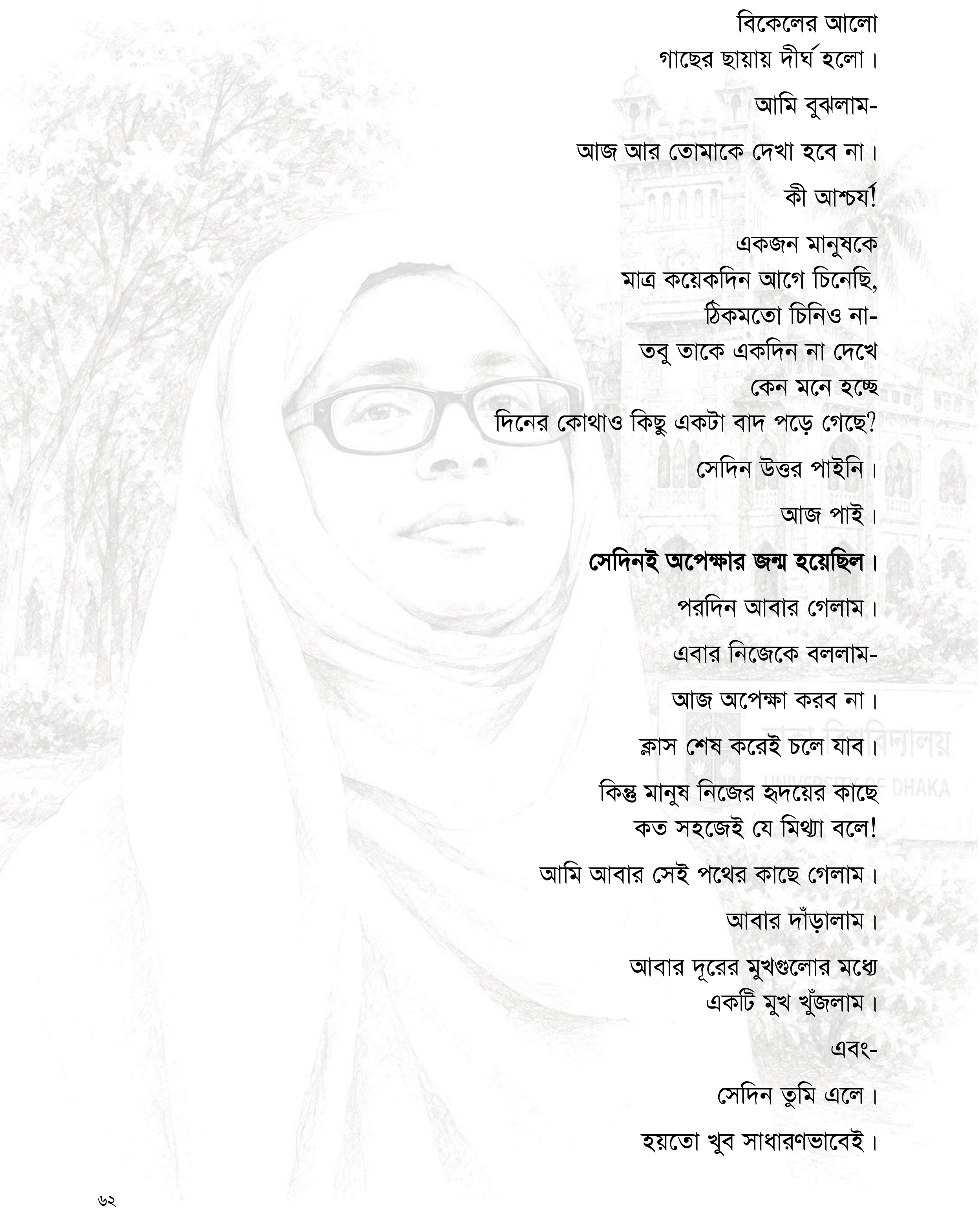

বিকেলের আলো
গাছের ছায়ায় দীর্ঘ হলো।

আমি বুঝলাম-

আজ আর তোমাকে দেখা হবে না।

কী আশ্চর্য!

একজন মানুষকে
মাত্র কয়েকদিন আগে চিনেছি,
ঠিকমতো চিনিও না-
তবু তাকে একদিন না দেখে
কেন মনে হচ্ছে
দিনের কোথাও কিছু একটা বাদ পড়ে গেছে?

সেদিন উত্তর পাইনি।

আজ পাই।

সেদিনই অপেক্ষার জন্ম হয়েছিল।

পরদিন আবার গেলাম।

এবার নিজেকে বললাম-

আজ অপেক্ষা করব না।

ক্লাস শেষ করেই চলে যাব।

কিন্তু মানুষ নিজের হৃদয়ের কাছে
কত সহজেই যে মিথ্যা বলে!

আমি আবার সেই পথের কাছে গেলাম।

আবার দাঁড়ালাম।

আবার দূরের মুখগুলোর মধ্যে
একটি মুখ খুঁজলাম।

এবং-

সেদিন তুমি এলে।

হয়তো খুব সাধারণভাবেই।

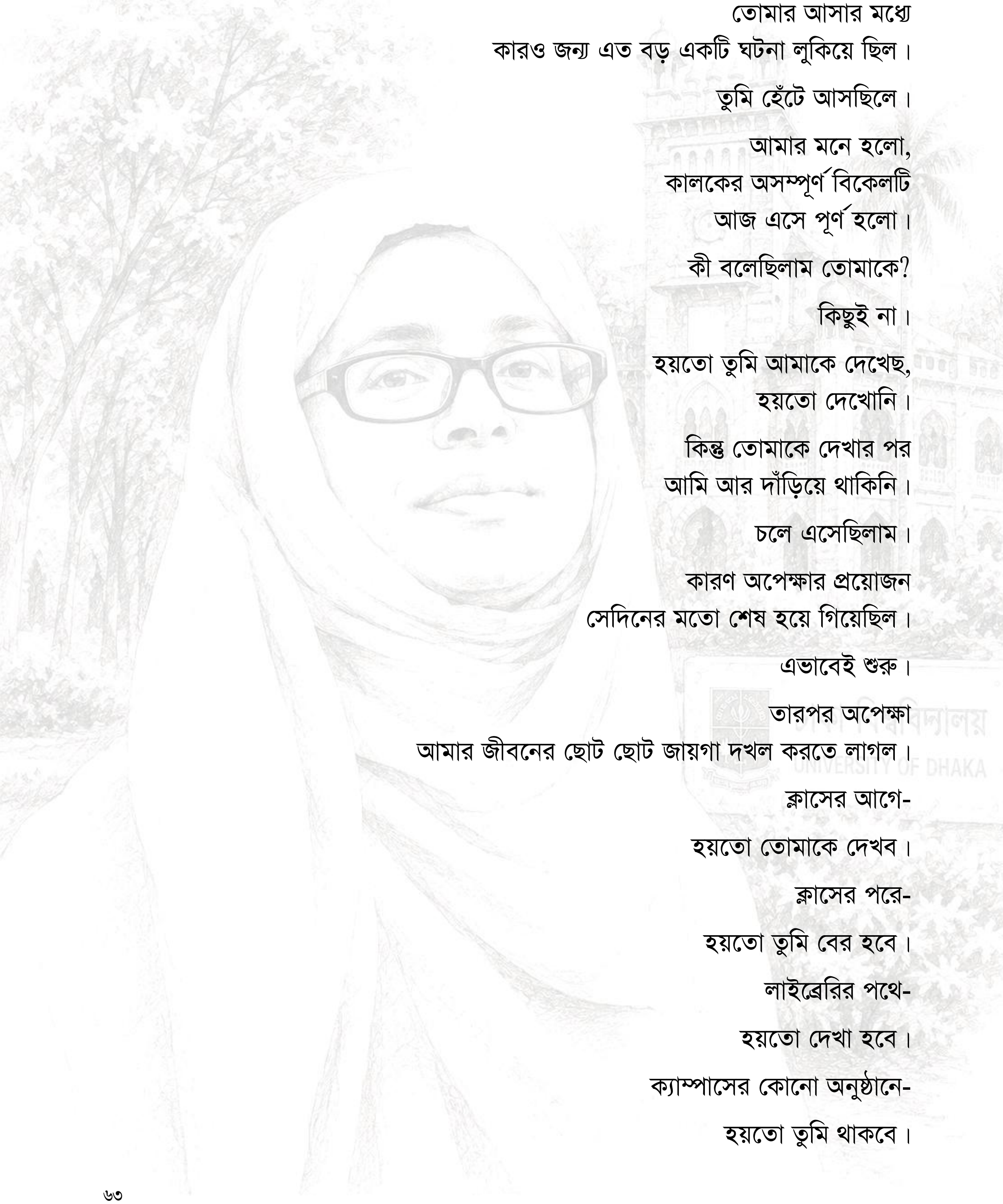

তুমি জানতেই পারলে না
তোমার আসার মধ্যে
কারও জন্য এত বড় একটি ঘটনা লুকিয়ে ছিল।

তুমি হেঁটে আসছিলে।

আমার মনে হলো,
কালকের অসম্পূর্ণ বিকেলটি
আজ এসে পূর্ণ হলো।

কী বলেছিলাম তোমাকে?

কিছুই না।

হয়তো তুমি আমাকে দেখেছ,
হয়তো দেখোনি।

কিন্তু তোমাকে দেখার পর
আমি আর দাঁড়িয়ে থাকিনি।

চলে এসেছিলাম।

কারণ অপেক্ষার প্রয়োজন
সেদিনের মতো শেষ হয়ে গিয়েছিল।

এভাবেই শুরু।

তারপর অপেক্ষা
আমার জীবনের ছোট ছোট জায়গা দখল করতে লাগল।

ক্লাসের আগে-

হয়তো তোমাকে দেখব।

ক্লাসের পরে-

হয়তো তুমি বের হবে।

লাইব্রেরির পথে-

হয়তো দেখা হবে।

ক্যাম্পাসের কোনো অনুষ্ঠানে-

হয়তো তুমি থাকবে।

একটি "হয়তো"
কীভাবে যে এতগুলো দিনের সঙ্গে
জড়িয়ে গেল!

কখনো অপেক্ষা সফল হয়েছে।

কখনো হয়নি।

যেদিন তোমাকে দেখেছি,
মনে হয়েছে-

এই তো,
এতটুকুর জন্যই তো দাঁড়িয়ে ছিলাম।

আর যেদিন দেখিনি,
নিজেকে বলেছি-

কাল দেখা যাবে।

'কাল'-
প্রেমে পড়া মানুষের কাছে
কী আশ্চর্য একটি শব্দ!

আজ না-পাওয়ার কষ্টটুকুকে
সে একটি ছোট্ট আশ্বাস দেয়-

কাল।

তখন জানতাম না
এই ছোট ছোট অপেক্ষাগুলো
একদিন আমাকে
বড় অপেক্ষার জন্য তৈরি করছে।

জানতাম না
একসময় এমন দিন আসবে
যখন তোমার জন্য অপেক্ষা মানে
ক্যাম্পাসের কোনো পথে দাঁড়িয়ে থাকা নয়।

বরং-

দূরে থাকা।

না-দেখা।

না-ডাকা।

নিজেকে থামিয়ে রাখা।

তুমি যখন আমাকে
তোমার কাছ থেকে দূরে থাকতে বললে,
আমি প্রথমবার বুঝলাম-

অপেক্ষারও বয়স বাড়ে।

তরুণ বয়সের অপেক্ষা বলে-

"কখন আসবে?"

পরিণত বয়সের অপেক্ষা বলে-

"না এলেও ভালো থেকো।"

এই দুই বাক্যের মাঝখানে
একটি মানুষের প্রায় পুরো জীবন
পেরিয়ে যেতে পারে।

প্রথম দিকে হয়তো মনে হয়েছিল,
সময় সবকিছু মুছে দেবে।

এক বছর।

দুই বছর।

পাঁচ বছর।

দশ বছর।

মানুষ তো বদলায়।

স্মৃতি ফিকে হয়।

জীবন নতুন দায়িত্বে ভরে যায়।

আমি ভেবেছিলাম-
একদিন হয়তো সকালে উঠে দেখব
তোমাকে আর মনে পড়ছে না।

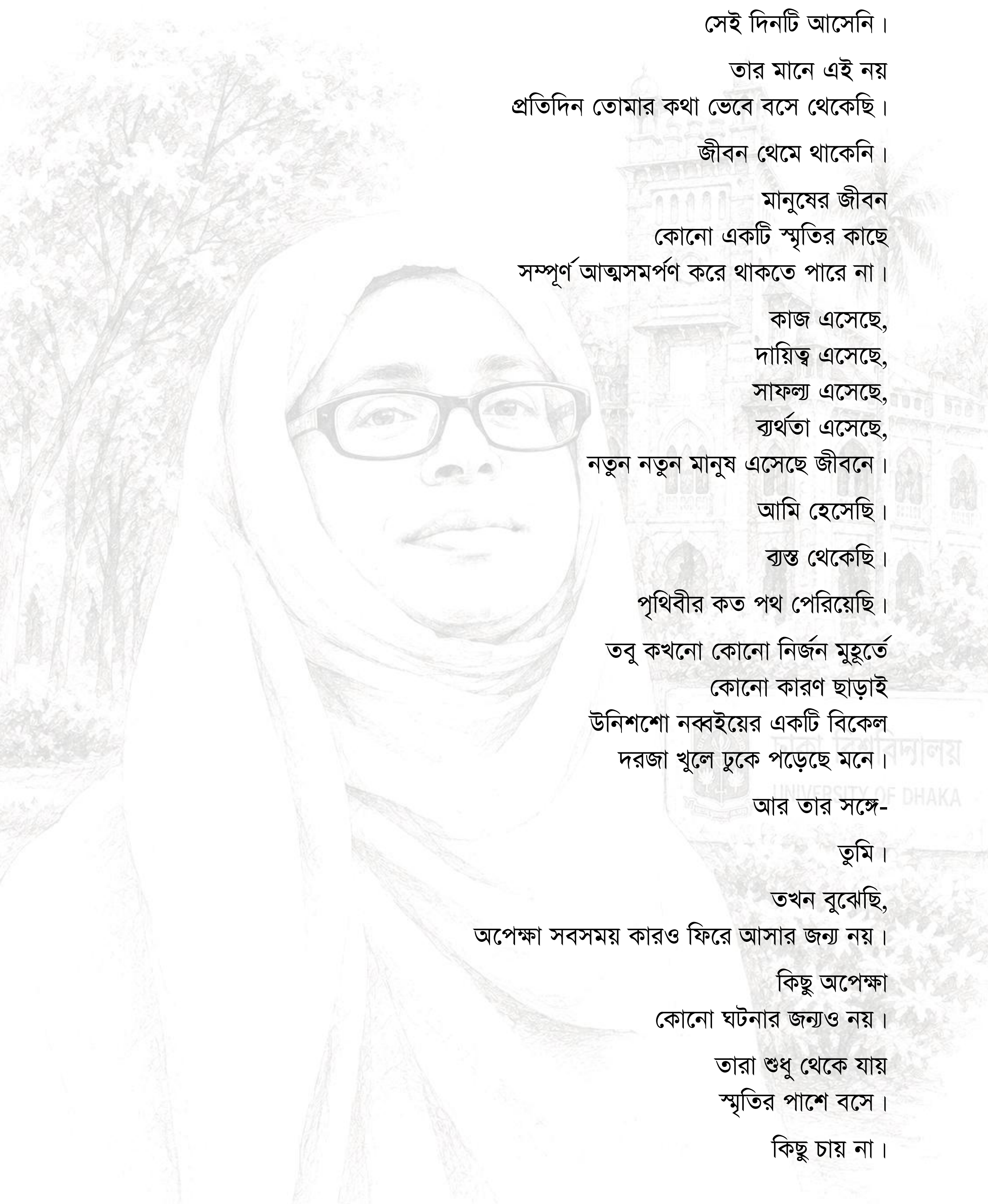

সেই দিনটি আসেনি।

তার মানে এই নয়
প্রতিদিন তোমার কথা ভেবে বসে থেকেছি।

জীবন থেমে থাকেনি।

মানুষের জীবন
কোনো একটি স্মৃতির কাছে
সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করে থাকতে পারে না।

কাজ এসেছে,
দায়িত্ব এসেছে,
সাফল্য এসেছে,
ব্যর্থতা এসেছে,
নতুন নতুন মানুষ এসেছে জীবনে।

আমি হেসেছি।

ব্যস্ত থেকেছি।

পৃথিবীর কত পথ পেরিয়েছি।

তবু কখনো কোনো নির্জন মুহূর্তে
কোনো কারণ ছাড়াই
উনিশশো নব্বইয়ের একটি বিকেল
দরজা খুলে ঢুকে পড়েছে মনে।

আর তার সঙ্গে-

তুমি।

তখন বুঝেছি,
অপেক্ষা সবসময় কারও ফিরে আসার জন্য নয়।

কিছু অপেক্ষা
কোনো ঘটনার জন্যও নয়।

তারা শুধু থেকে যায়
স্মৃতির পাশে বসে।

কিছু চায় না।

দরজায় শব্দ হলেই ছুটে যায় না।

কোনো ফোনের অপেক্ষায় থাকে না।

কোনো চিঠিরও নয়।

শুধু মানুষের ভেতরে
একটি ছোট আলো জ্বালিয়ে রাখে-

যে আলো বলে,

একদিন
তুমি কাউকে খুব গভীরভাবে
ভালোবাসতে পেরেছিলে।

আজ আমাদের বয়স
ষাটের কাছাকাছি।

এখন 'অপেক্ষা' শব্দটির অর্থ
আমার কাছে সম্পূর্ণ অন্যরকম।

আজ আর অপেক্ষা করি না
তুমি কোনো পথ দিয়ে আসবে বলে।

অপেক্ষা করি না
তুমি কোনোদিন ফিরে তাকাবে বলে।

অপেক্ষা করি না
আমার হারিয়ে যাওয়া পাণ্ডুলিপির
কোনো উত্তর পাওয়ার জন্য।

এমনকি এই কবিতাগুলোও
তোমার কাছে পৌঁছাবে-
সেই প্রত্যাশাও এদের জন্মের শর্ত নয়।

কারণ এত বছরে
একটি কথা শিখেছি-

যে ভালোবাসার সঙ্গে দাবি নেই,
তার অপেক্ষারও কোনো পাওনা থাকে না।

তবু যদি আমাকে প্রশ্ন করো-

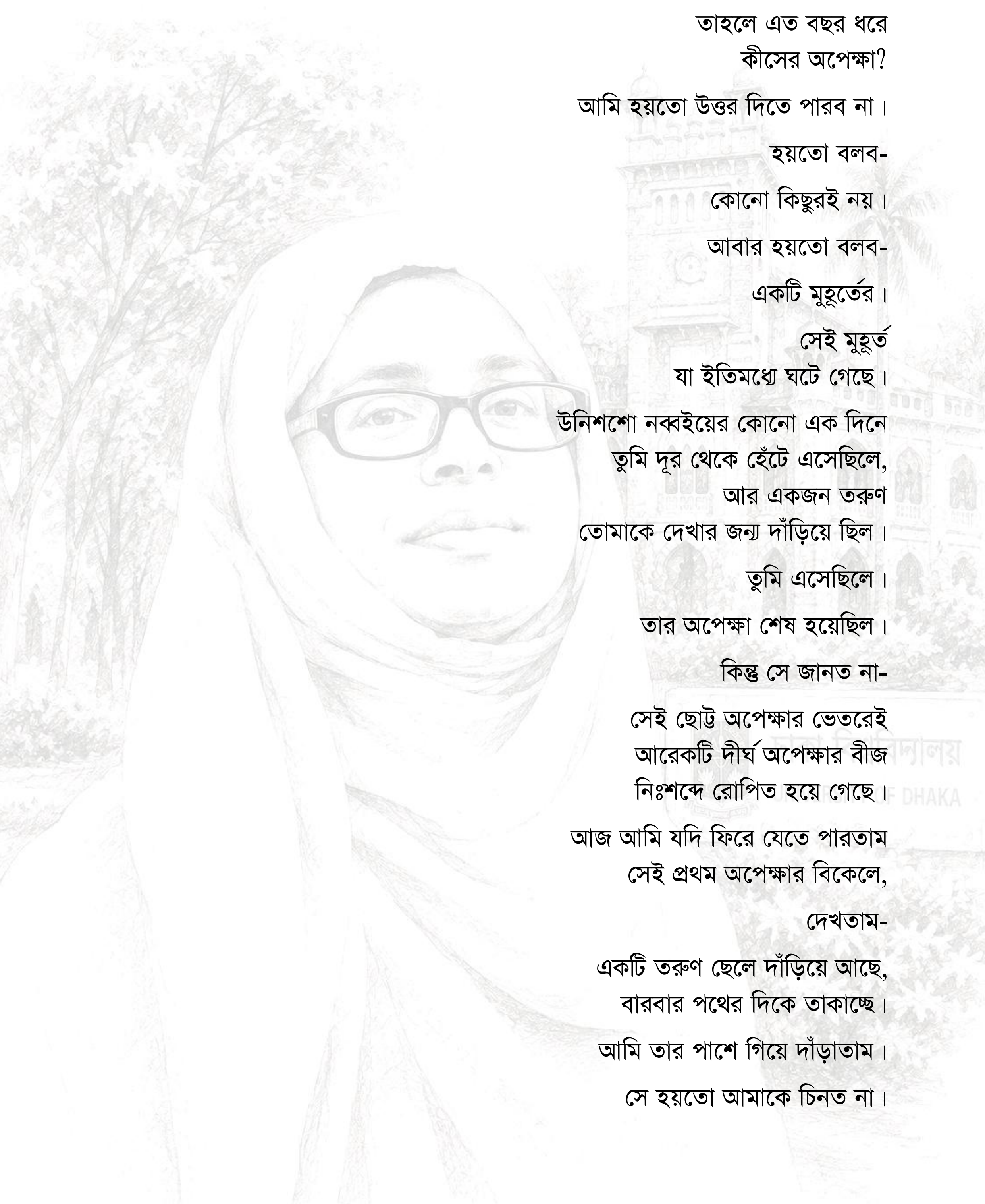

তাহলে এত বছর ধরে
কীসের অপেক্ষা?

আমি হয়তো উত্তর দিতে পারব না।

হয়তো বলব-

কোনো কিছুরই নয়।

আবার হয়তো বলব-

একটি মুহূর্তের।

সেই মুহূর্ত
যা ইতিমধ্যে ঘটে গেছে।

উনিশশো নব্বইয়ের কোনো এক দিনে
তুমি দূর থেকে হেঁটে এসেছিলে,
আর একজন তরুণ
তোমাকে দেখার জন্য দাঁড়িয়ে ছিল।

তুমি এসেছিলে।

তার অপেক্ষা শেষ হয়েছিল।

কিন্তু সে জানত না-

সেই ছোট্ট অপেক্ষার ভেতরেই
আরেকটি দীর্ঘ অপেক্ষার বীজ
নিঃশব্দে রোপিত হয়ে গেছে।

আজ আমি যদি ফিরে যেতে পারতাম
সেই প্রথম অপেক্ষার বিকেলে,

দেখতাম-

একটি তরুণ ছেলে দাঁড়িয়ে আছে,
বারবার পথের দিকে তাকাচ্ছে।

আমি তার পাশে গিয়ে দাঁড়াতাম।

সে হয়তো আমাকে চিনত না।

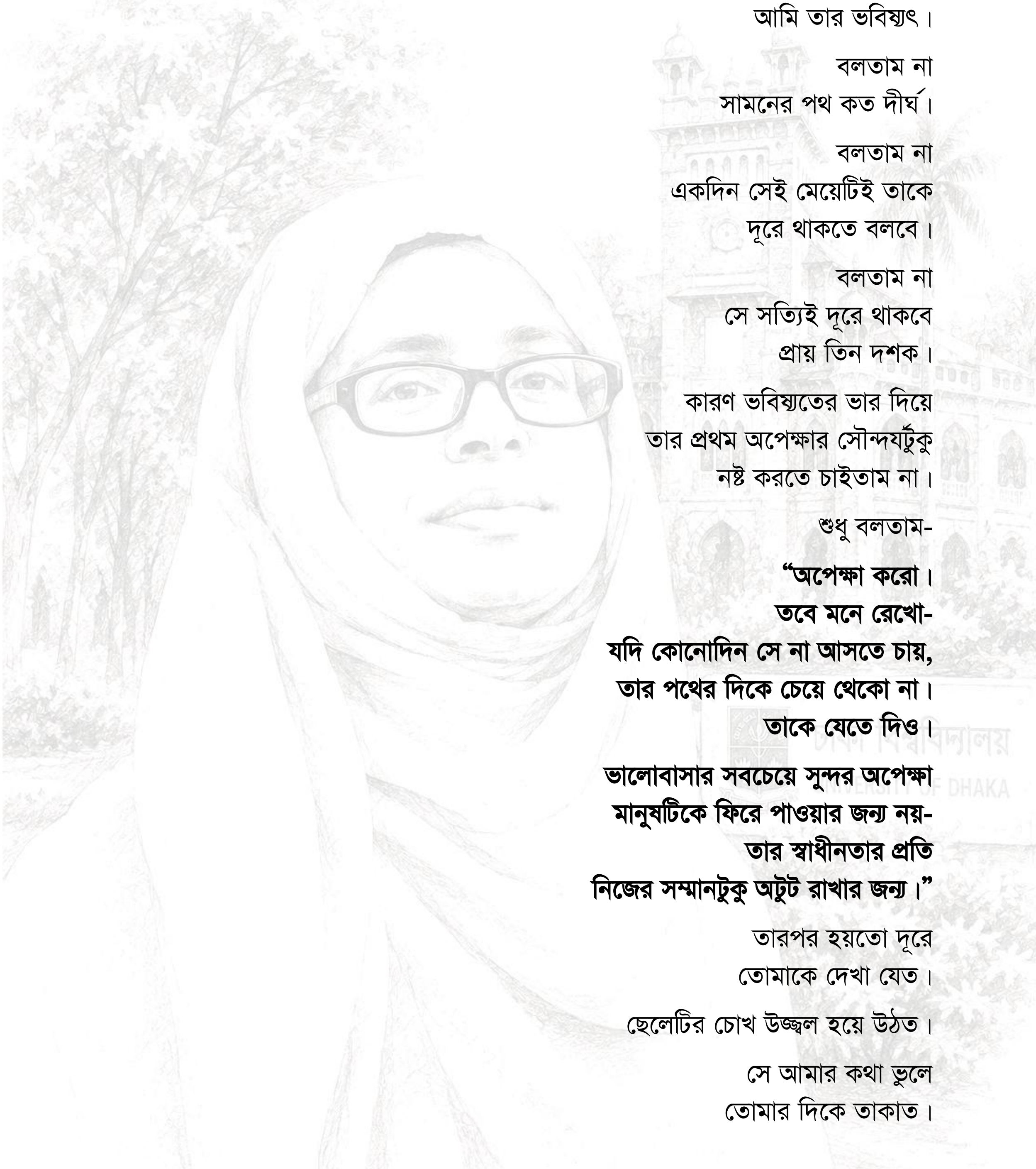

আমি বলতাম না
আমি তার ভবিষ্যৎ।

বলতাম না
সামনের পথ কত দীর্ঘ।

বলতাম না
একদিন সেই মেয়েটিই তাকে
দূরে থাকতে বলবে।

বলতাম না
সে সত্যিই দূরে থাকবে
প্রায় তিন দশক।

কারণ ভবিষ্যতের ভার দিয়ে
তার প্রথম অপেক্ষার সৌন্দর্যটুকু
নষ্ট করতে চাইতাম না।

শুধু বলতাম-

"অপেক্ষা করো।
তবে মনে রেখো-
যদি কোনোদিন সে না আসতে চায়,
তার পথের দিকে চেয়ে থেকো না।
তাকে যেতে দিও।

ভালোবাসার সবচেয়ে সুন্দর অপেক্ষা
মানুষটিকে ফিরে পাওয়ার জন্য নয়-
তার স্বাধীনতার প্রতি
নিজের সম্মানটুকু অটুট রাখার জন্য।"

তারপর হয়তো দূরে
তোমাকে দেখা যেত।

ছেলেটির চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠত।

সে আমার কথা ভুলে
তোমার দিকে তাকাত।

আর আমি
আজকের এই বয়স নিয়ে
ধীরে ধীরে সেখান থেকে চলে আসতাম।

কারণ আমি জানি-

সেদিন তুমি এসে
তার কয়েক মিনিটের অপেক্ষা শেষ করেছিলে।

কিন্তু একই সঙ্গে
তার হৃদয়ে এমন এক অনুভূতির জন্ম দিয়েছিলে,
যার শেষের তারিখ
কোনো ক্যালেন্ডারে লেখা ছিল না।

সেদিন তাই শুধু প্রেম নয়-

অপেক্ষারও জন্ম হয়েছিল।

আর এত বছর পরে
আমি প্রথমবার বুঝেছি-

তোমার জন্য অপেক্ষা করতে করতে নয়,
তোমাকে অপেক্ষা থেকে মুক্তি দিতে শিখেই
আমার ভালোবাসা বড় হয়েছে।

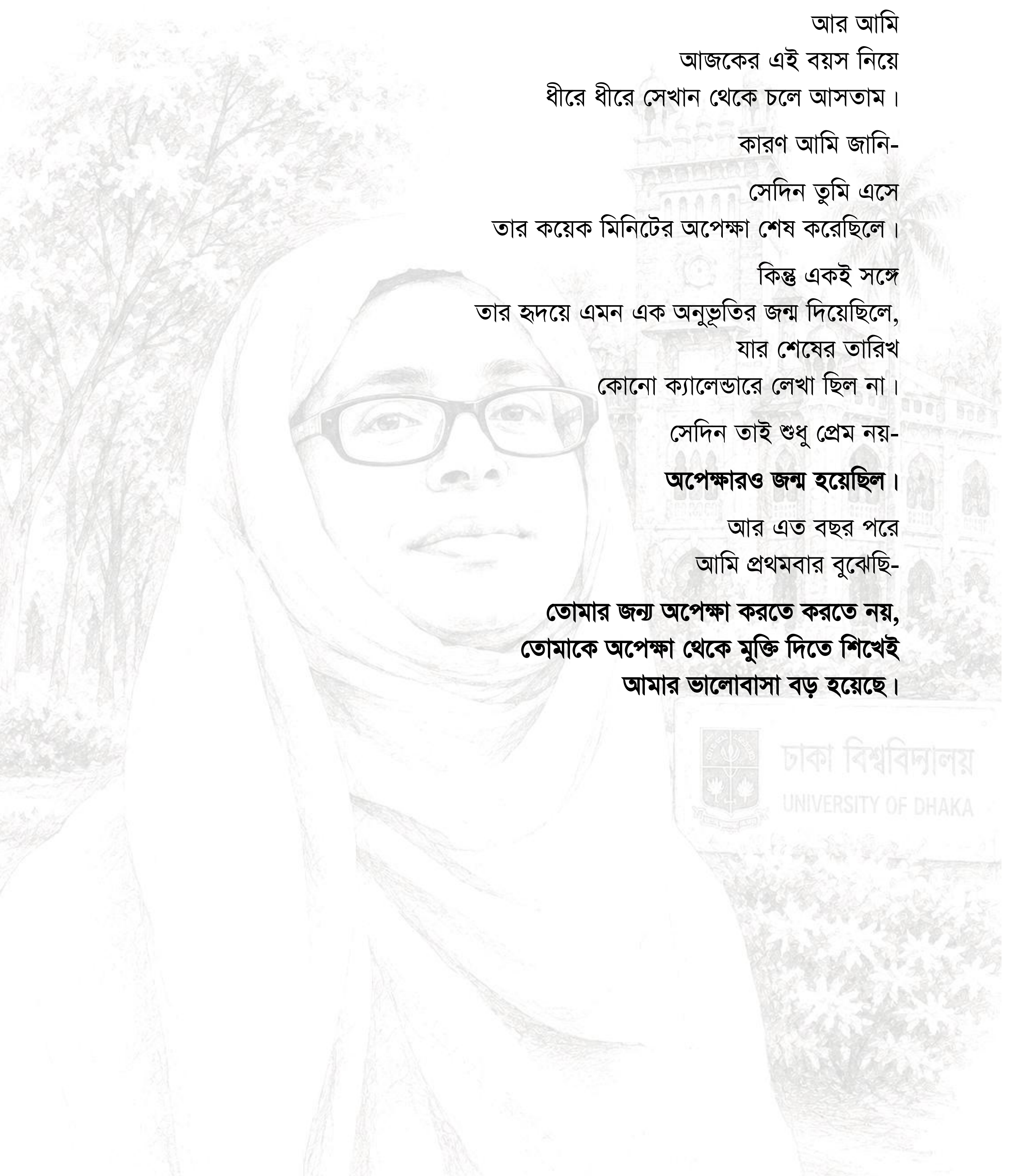

তোমার নাম লিখিনি

তোমার নাম লিখিনি-
অথচ কতবার লিখেছি তোমাকে।

পাতার পর পাতা ভরে গেছে,
রাতের পর রাত ফুরিয়েছে,
কলমের কালি শুকিয়েছে কতবার-
শুধু তোমার নামটি
কেমন করে যেন
প্রতিটি কবিতার বাইরে থেকে গেছে।

কেন লিখিনি?

ভয় ছিল?

হয়তো।

লজ্জা?

তাও হয়তো।

কিংবা মনে হয়েছিল-
নাম লিখে দিলে
আমার একান্ত গোপন অনুভূতিটি
হঠাৎ পৃথিবীর সম্পত্তি হয়ে যাবে।

তাই তোমাকে নাম দিইনি।

শুধু লিখেছি-

তুমি।

‘তুমি’-

কী ছোট্ট একটি শব্দ!

মাত্র দুটি অক্ষরের মধ্যে
কী করে যে একজন সম্পূর্ণ মানুষ

জায়গা করে নিতে পারে,
তখন প্রথম শিখেছিলাম।

আমার কবিতায়
‘তুমি’ মানেই তুমি।

অন্য কারও হওয়ার
কোনো সুযোগ ছিল না।

কেউ যদি সেই পাণ্ডুলিপি পড়ত,
হয়তো জিজ্ঞেস করত-

“এই তুমি কে?”

আমি হয়তো হেসে বলতাম-

“কেউ না।”

কী সহজ মিথ্যা!

যে ‘কেউ না’কে নিয়ে
একজন তরুণ রাত জেগে লিখছে,
সে কী করে কেউ না হয়?

সে তো তখন
তার অক্ষরের সবচেয়ে জীবন্ত মানুষ।

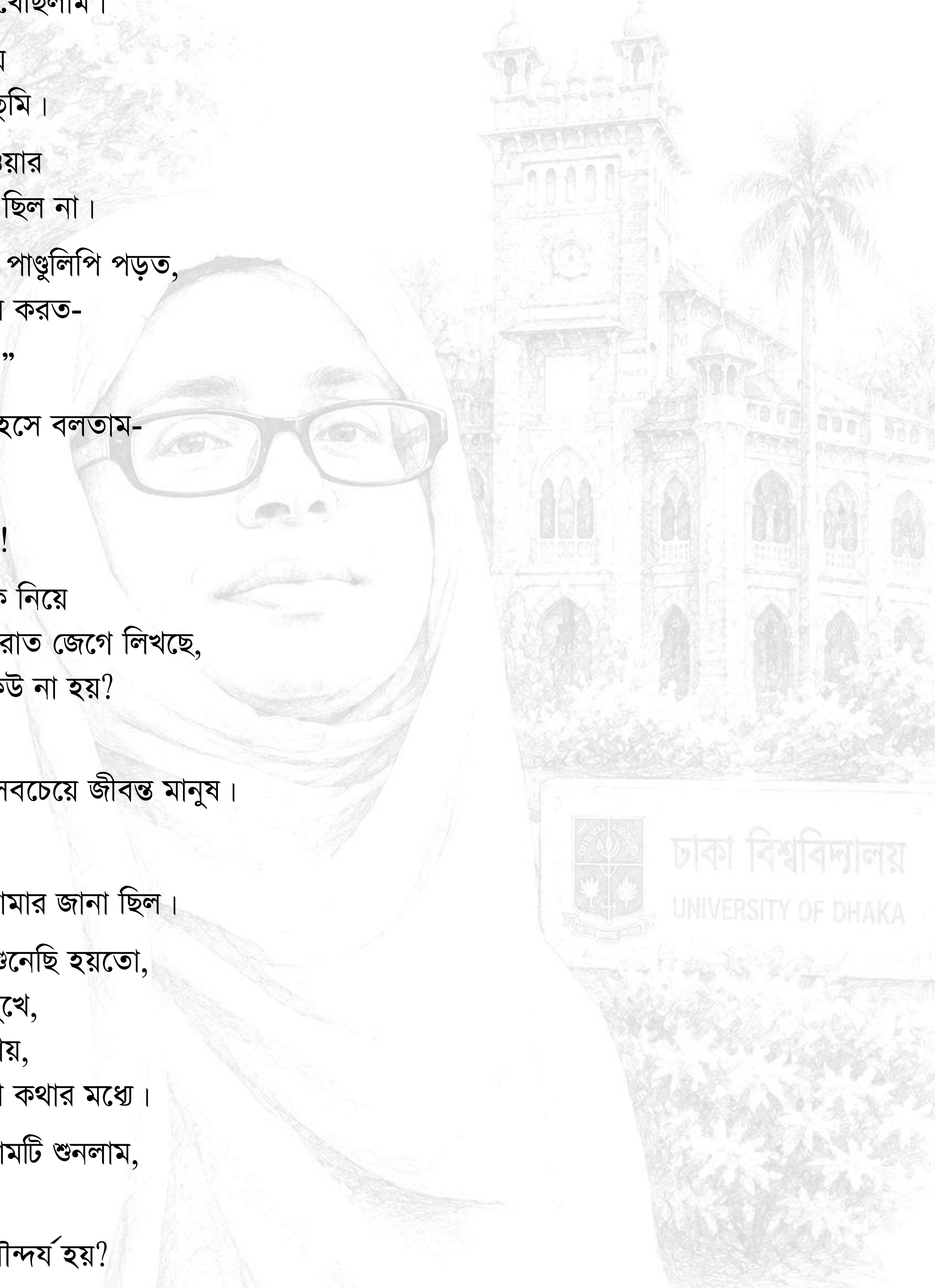

তোমার নাম আমার জানা ছিল।

ক্লাসের ভিড়ে শুনেছি হয়তো,
কোনো বন্ধুর মুখে,
কোনো তালিকায়,
কোনো সাধারণ কথার মধ্যে।

প্রথম যেদিন নামটি শুনলাম,
মনে হয়েছিল-

নামেরও কি সৌন্দর্য হয়?

তারপর বুঝলাম,
নামটি সুন্দর ছিল কি না জানি না,

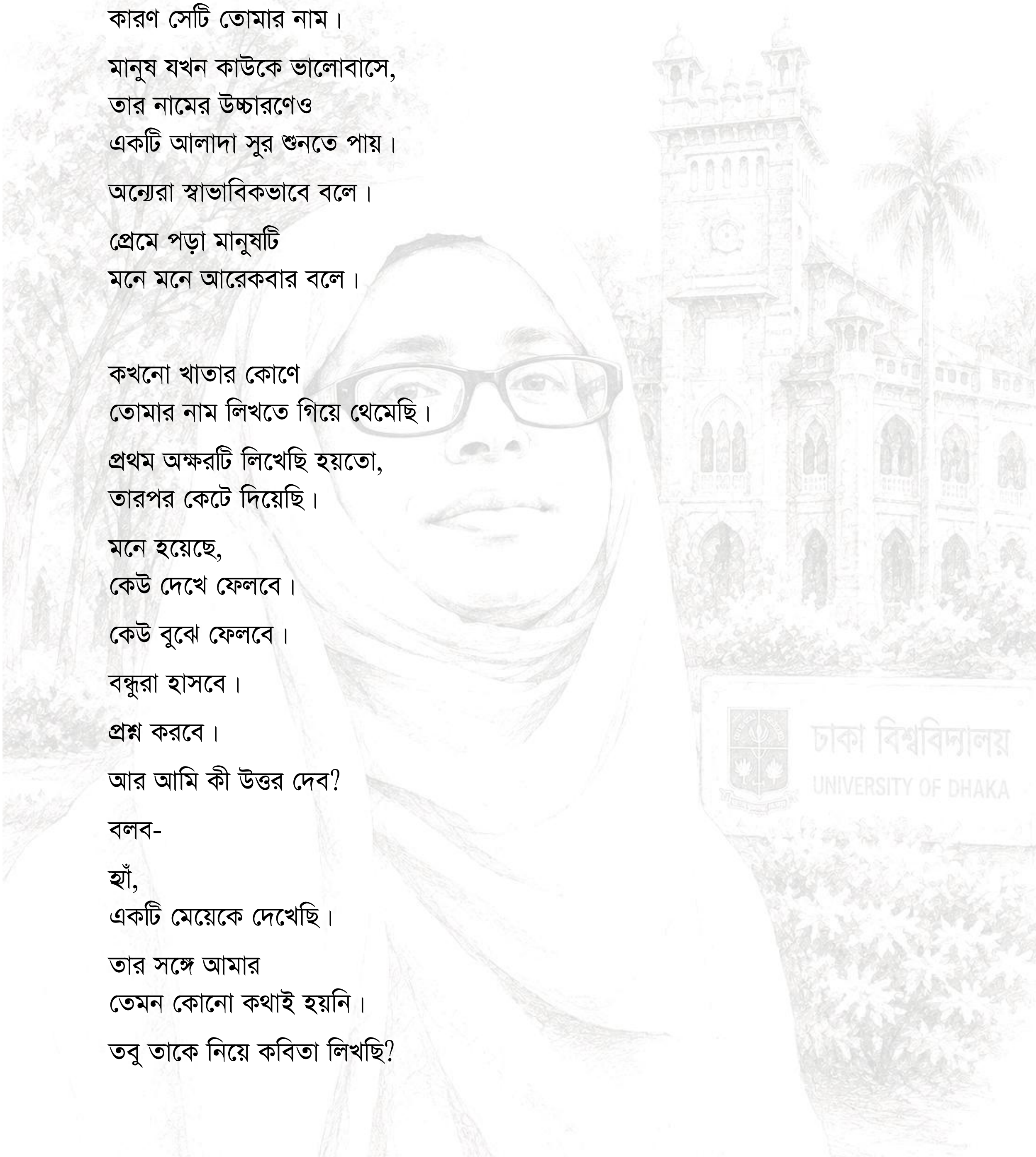

আমি তাকে সুন্দর শুনেছিলাম
কারণ সেটি তোমার নাম।

মানুষ যখন কাউকে ভালোবাসে,
তার নামের উচ্চারণেও
একটি আলাদা সুর শুনতে পায়।

অন্যেরা স্বাভাবিকভাবে বলে।

প্রেমে পড়া মানুষটি
মনে মনে আরেকবার বলে।

কখনো খাতার কোণে
তোমার নাম লিখতে গিয়ে থেমেছি।

প্রথম অক্ষরটি লিখেছি হয়তো,
তারপর কেটে দিয়েছি।

মনে হয়েছে,
কেউ দেখে ফেলবে।

কেউ বুঝে ফেলবে।

বন্ধুরা হাসবে।

প্রশ্ন করবে।

আর আমি কী উত্তর দেব?

বলব-

হ্যাঁ,
একটি মেয়েকে দেখেছি।

তার সঙ্গে আমার
তেমন কোনো কথাই হয়নি।

তবু তাকে নিয়ে কবিতা লিখছি?

তরুণ বয়সে
নিজের গভীরতম অনুভূতিকে
মানুষ কত যত্নে লুকিয়ে রাখে!

যেন প্রকাশ পেলেই
তার সৌন্দর্য কমে যাবে।

তাই তোমার জন্য
আমি কত নাম বানিয়েছিলাম মনে মনে।

কখনো তুমি ছিলে
'অচেনা'।

কখনো
'প্রথম আলো'।

কখনো
'দূরের মানুষ'।

কখনো
'নীরবতা'।

কখনো আবার
কোনো সম্বোধনই ছিল না।

কবিতা শুরু হয়েছে সরাসরি-

"তোমায়..."

হয়তো সেইভাবেই এসেছিল-

"তোমায় দেবো নাকো তৃপ্তি বিভোর সুখের মেতে,
অন্তর আমার সইবে নাকো তোমার বেদনার চিৎকারে।"

এখানেও তোমার নাম নেই।

আজ ভাবি-
কী আশ্চর্যভাবে
আমার সেই তরুণ হৃদয়টি
নিজেই যেন বুঝেছিল-

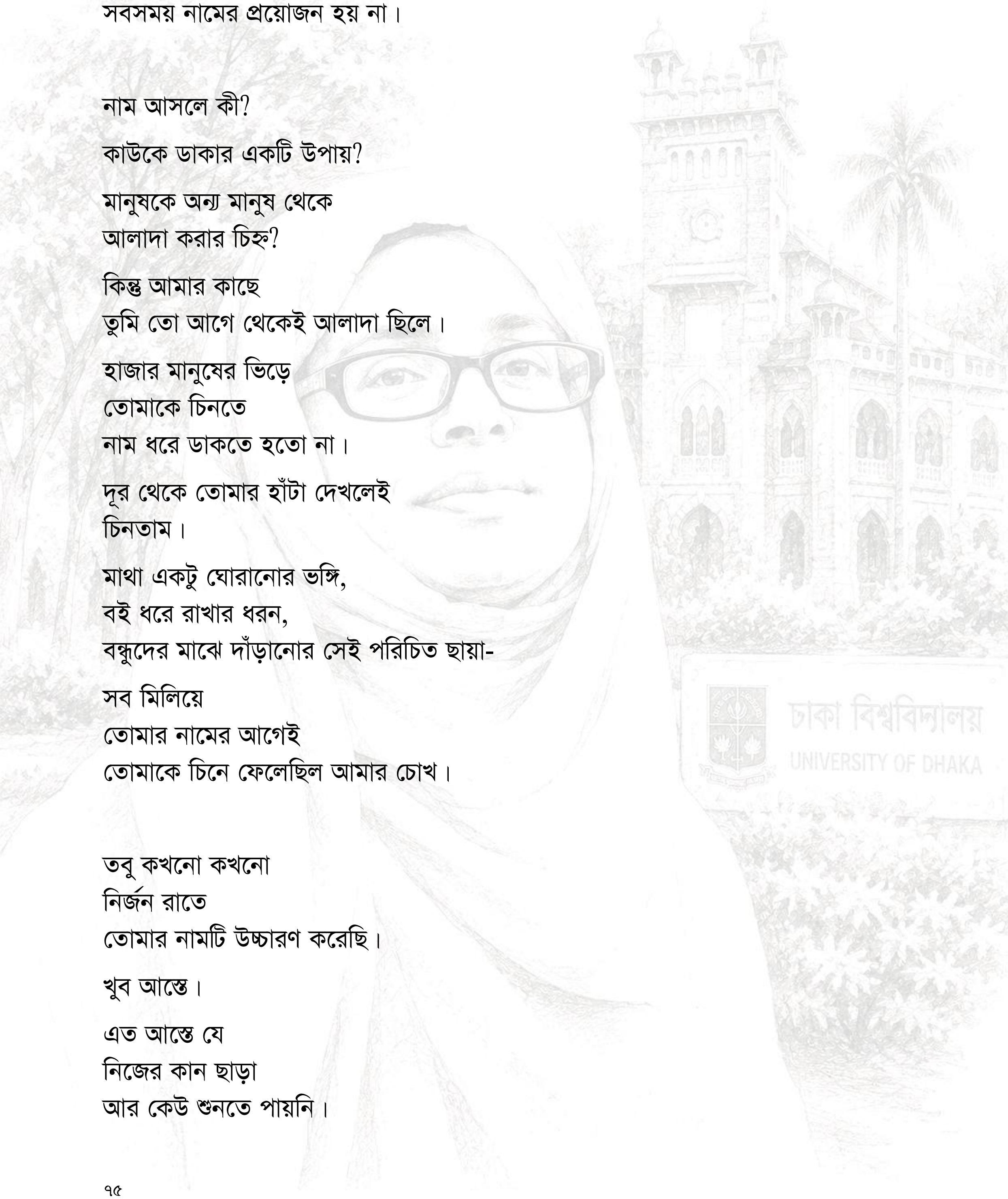

ভালোবাসার জন্য
সবসময় নামের প্রয়োজন হয় না।

নাম আসলে কী?

কাউকে ডাকার একটি উপায়?

মানুষকে অন্য মানুষ থেকে
আলাদা করার চিহ্ন?

কিন্তু আমার কাছে
তুমি তো আগে থেকেই আলাদা ছিলে।

হাজার মানুষের ভিড়ে
তোমাকে চিনতে
নাম ধরে ডাকতে হতো না।

দূর থেকে তোমার হাঁটা দেখলেই
চিনতাম।

মাথা একটু ঘোরানোর ভঙ্গি,
বই ধরে রাখার ধরন,
বন্ধুদের মাঝে দাঁড়ানোর সেই পরিচিত ছায়া-

সব মিলিয়ে
তোমার নামের আগেই
তোমাকে চিনে ফেলেছিল আমার চোখ।

তবু কখনো কখনো
নির্জন রাতে
তোমার নামটি উচ্চারণ করেছি।

খুব আস্তে।

এত আস্তে যে
নিজের কান ছাড়া
আর কেউ শুনতে পায়নি।

নামটি বলেই চুপ হয়ে গেছি।

মনে হয়েছে-
এই একটি শব্দের পরে
আর কোনো বাক্যের প্রয়োজন নেই।

কী বলব?

ভালোবাসি?

তখনও কি নিশ্চিত ছিলাম
এটাই ভালোবাসা?

তোমাকে চাই?

'চাওয়া' শব্দটিই
কেমন যেন কঠিন মনে হতো।

কারণ তোমাকে চাওয়ার সঙ্গে
তোমাকে পাওয়ার দাবি
জুড়ে দিতে মন চাইত না।

তাই শুধু নামটি বলতাম।

তারপর নীরবতা।

একদিন হয়তো
সেই নামের পাশে
আমার নাম লিখে দেখেছিলাম।

দুটি নাম পাশাপাশি।

তরুণ বয়সের
নিরীহ এক কল্পনা।

কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে থেকে
আবার মুছে দিয়েছি।

কারণ বাস্তবের পৃথিবীতে
দুটি নাম পাশাপাশি থাকবে কি না
তা শুধু একজনের ইচ্ছায় হয় না।

এই সাধারণ সত্যটি
হয়তো তখন পুরোপুরি বুঝিনি।

কিন্তু কোথাও যেন অনুভব করেছিলাম।

তাই কাগজেও
তোমাকে নিজের পাশে
জোর করে রাখিনি।

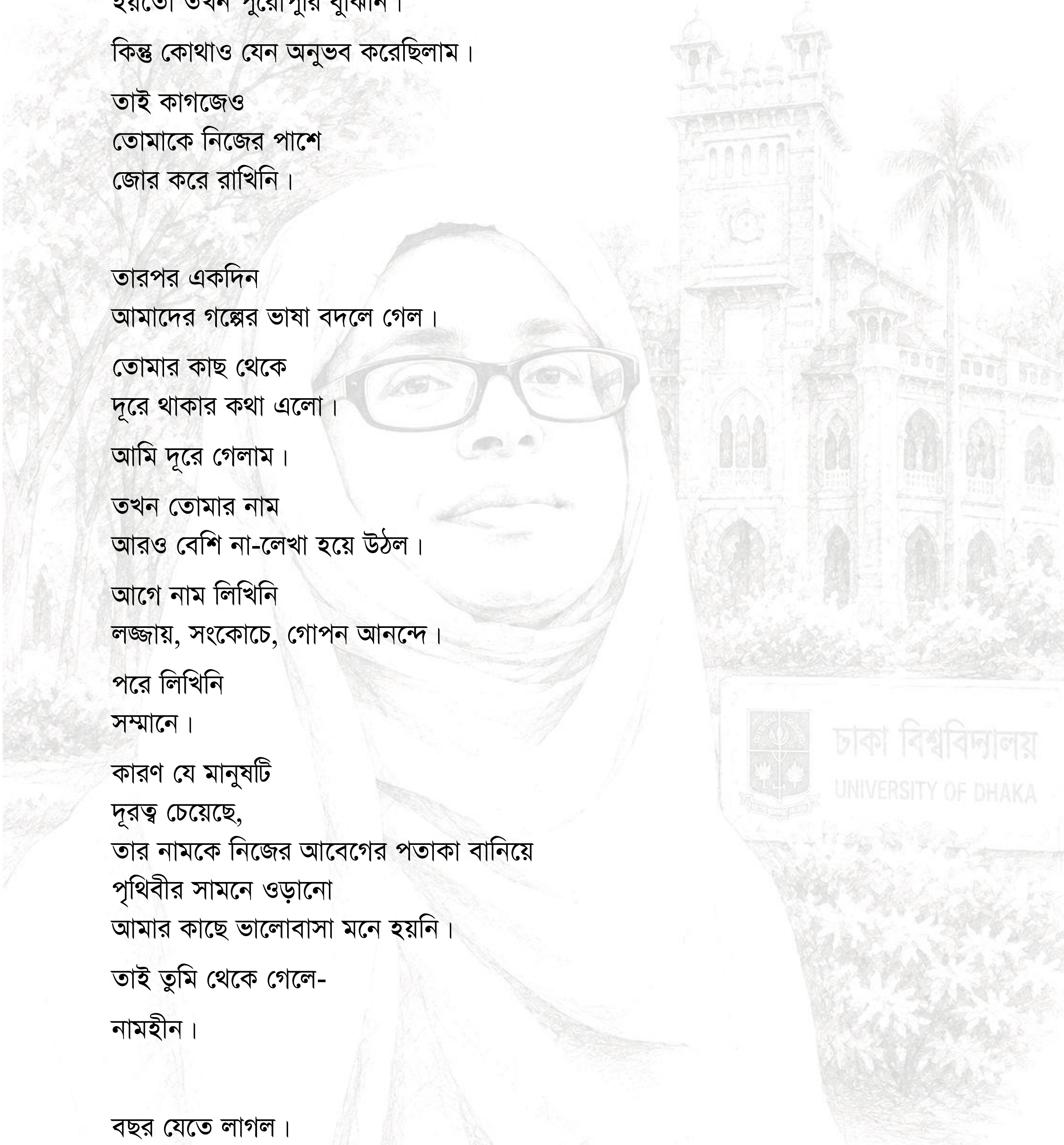

তারপর একদিন
আমাদের গল্পের ভাষা বদলে গেল।

তোমার কাছ থেকে
দূরে থাকার কথা এলো।

আমি দূরে গেলাম।

তখন তোমার নাম
আরও বেশি না-লেখা হয়ে উঠল।

আগে নাম লিখিনি
লজ্জায়, সংকোচে, গোপন আনন্দে।

পরে লিখিনি
সম্মানে।

কারণ যে মানুষটি
দূরত্ব চেয়েছে,
তার নামকে নিজের আবেগের পতাকা বানিয়ে
পৃথিবীর সামনে ওড়ানো
আমার কাছে ভালোবাসা মনে হয়নি।

তাই তুমি থেকে গেলে-

নামহীন।

বছর যেতে লাগল।

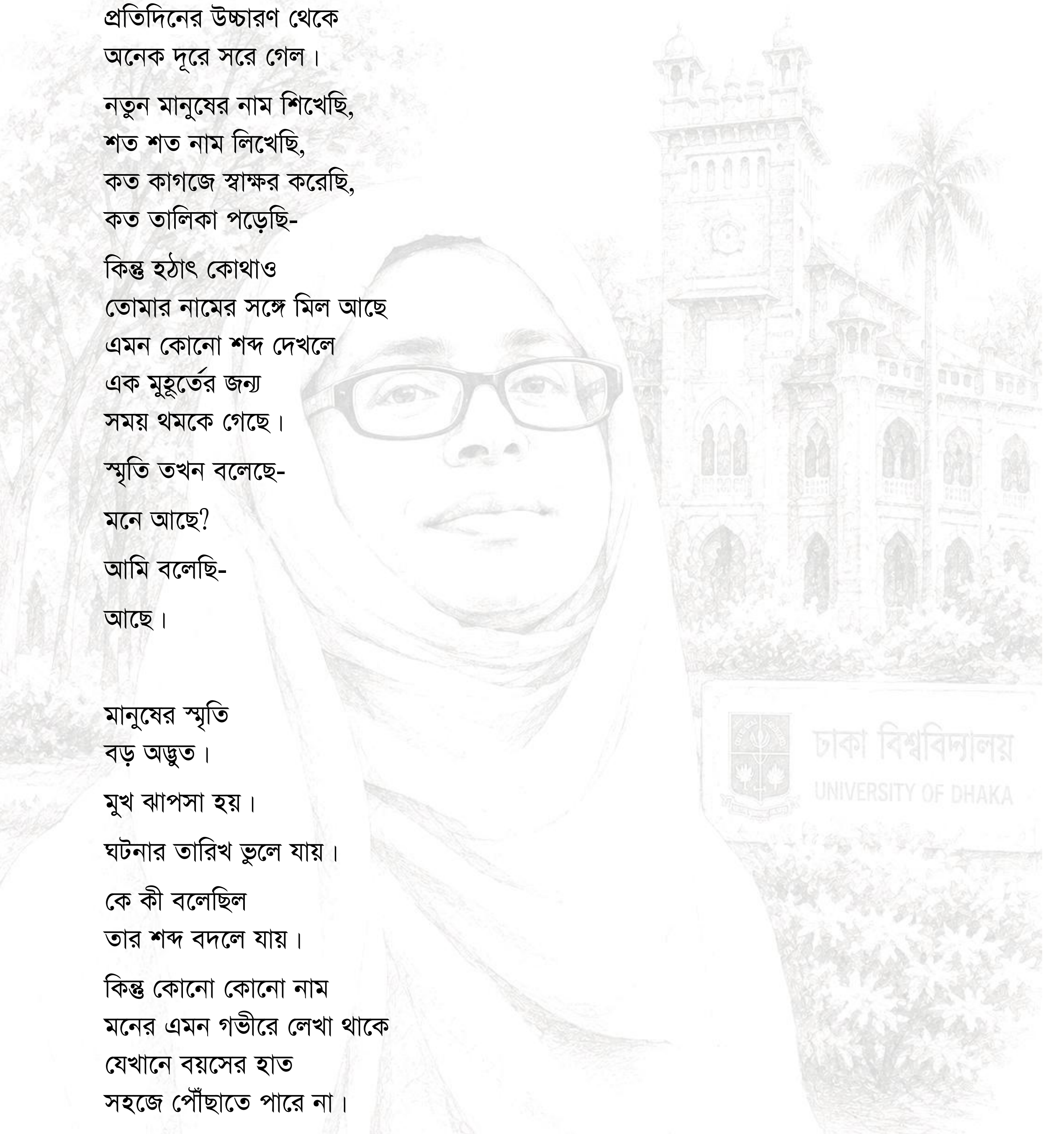

একসময় তোমার নাম
প্রতিদিনের উচ্চারণ থেকে
অনেক দূরে সরে গেল।

নতুন মানুষের নাম শিখেছি,
শত শত নাম লিখেছি,
কত কাগজে স্বাক্ষর করেছি,
কত তালিকা পড়েছি-

কিন্তু হঠাৎ কোথাও
তোমার নামের সঙ্গে মিল আছে
এমন কোনো শব্দ দেখলে
এক মুহূর্তের জন্য
সময় থমকে গেছে।

স্মৃতি তখন বলেছে-

মনে আছে?

আমি বলেছি-

আছে।

মানুষের স্মৃতি
বড় অদ্ভুত।

মুখ ঝাপসা হয়।

ঘটনার তারিখ ভুলে যায়।

কে কী বলেছিল
তার শব্দ বদলে যায়।

কিন্তু কোনো কোনো নাম
মনের এমন গভীরে লেখা থাকে
যেখানে বয়সের হাত
সহজে পৌঁছাতে পারে না।

আমি তোমার নাম লিখিনি।

তবু ভুলিনি।

এ কি তবে
না-লেখারই আরেক রকম লেখা?

কাগজে লিখলে
কালি মুছে যেতে পারে।

খাতা হারাতে পারে।

যেমন হারিয়েছে
আমার সেই বিশাল পাণ্ডুলিপি।

কিন্তু যে নামটি
কাগজে লিখিনি,
সে নামই হয়তো
সবচেয়ে নিরাপদ জায়গায় থেকে গেছে।

আজ সেই হারানো পাণ্ডুলিপির কথা ভাবলে
মাঝে মাঝে কল্পনা করি-

যদি কোনোদিন
কোথাও থেকে সেটি ফিরে আসে?

পুরোনো কাগজ,
হলদে হয়ে যাওয়া পাতা,
কালি ফিকে,
কোনো কোনো শব্দ আর পড়া যায় না।

আমি পাতা উল্টাব।

একটি কবিতা।

আরেকটি কবিতা।

তারপর আরও একটি।

সবখানে তুমি।

কিন্তু কোথাও তোমার নাম নেই।

কেউ পড়লে হয়তো বলবে-

“কাকে নিয়ে এত লেখা?”

আমি এবারও হয়তো
তোমার নাম বলব না।

শুধু বলব-

“একজন ছিল।”

‘ছিল’ বলাটা অবশ্য ভুল।

কারণ মানুষটি তো আছে।

নিজের জীবনে,
নিজের পৃথিবীতে,
নিজের আনন্দ-বেদনা নিয়ে।

শুধু আমার কাছ থেকে দূরে।

তাই হয়তো বলা উচিত-

“একজন আছে-
যাকে আমি আমার স্মৃতির চেয়ে
আমার বাস্তবতায় কম দেখেছি।”

কী অদ্ভুত সম্পর্ক!

দেখা নেই।

কথা নেই।

কোনো দাবি নেই।

তবু নামটি মনে আছে।

আজ আমাদের বয়স
ষাটের কাছাকাছি।

এখন নামের সঙ্গে
অনেক পরিচয় যুক্ত হয়েছে নিশ্চয়ই।

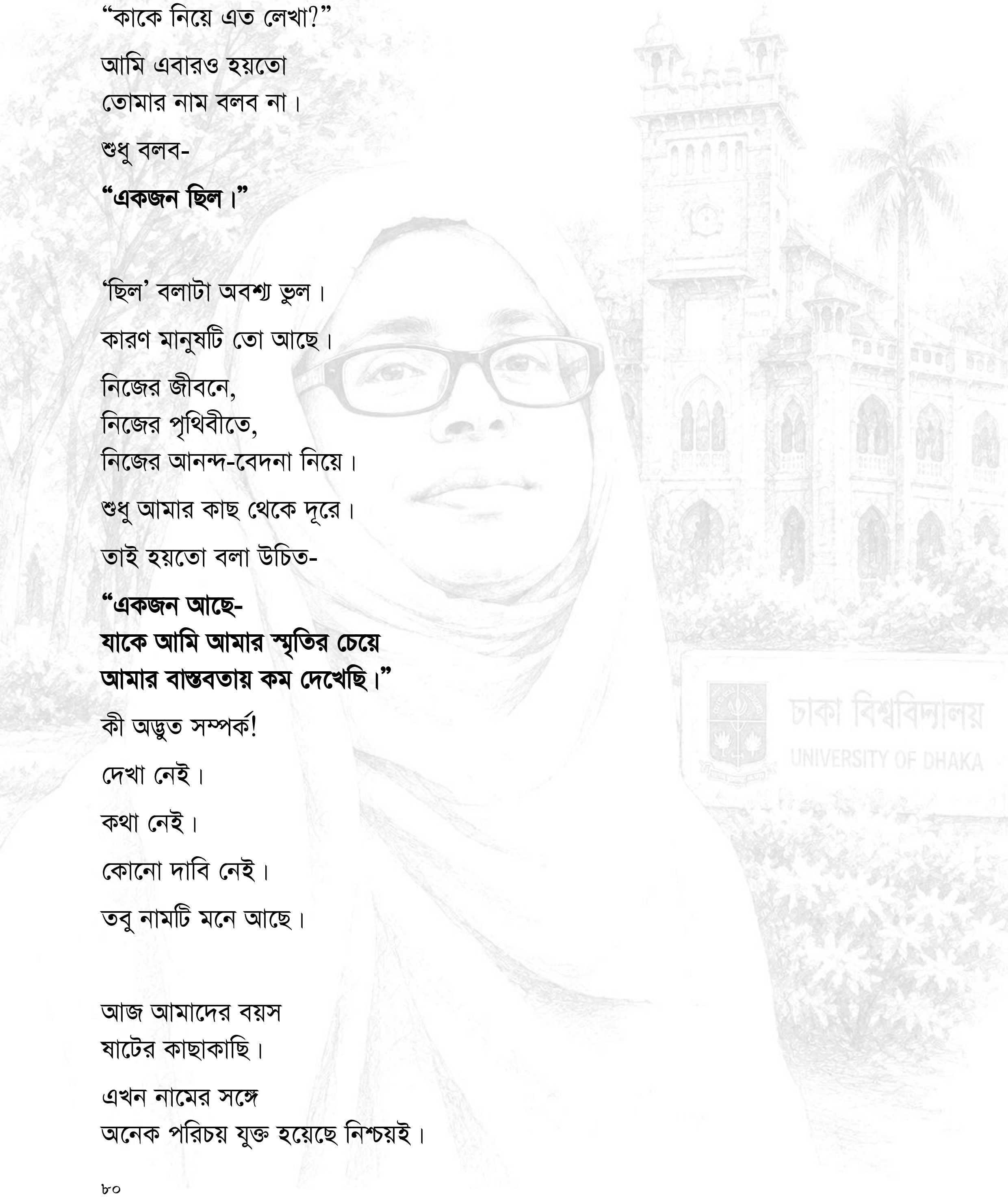

জীবন আমাদের প্রত্যেককে
কত ভূমিকা দিয়েছে।

মানুষ আর শুধু
বিশ্ববিদ্যালয়ের সেই তরুণ বা তরুণী থাকে না।

সময় তাকে
অনেক সম্পর্কের,
অনেক দায়িত্বের মানুষ করে তোলে।

আমি সেই সমস্ত পরিচয়ের প্রতি
সম্মান রেখেই
তোমাকে স্মরণ করতে চাই।

তাই আজও
তোমার নাম লিখছি না।

এ কবিতায়ও নয়।

পরের কবিতাতেও হয়তো নয়।

কারণ এই কাব্যের পাঠকের
তোমার নাম জানার প্রয়োজন নেই।

তারা শুধু জানুক-

উনিশশো নব্বইয়ে
একটি বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে
একজন তরুণ একটি মেয়েকে দেখেছিল।

তারপর একদিন
তার খাতা খুলে লিখেছিল-

‘তুমি’।

আর সেই ‘তুমি’ শব্দটি
কীভাবে যেন
একটি জীবনের চেয়েও দীর্ঘ হয়ে গেল।

যদি কোনোদিন
এই কবিতাগুলো তোমার চোখে পড়ে,
তুমি হয়তো নিজের নাম খুঁজবে।

পাবে না।

তখন হয়তো ভাববে-

এ কি সত্যিই আমাকে নিয়ে?

আমি কোনো উত্তর দেব না।

কারণ তোমার মনে যদি প্রশ্নটি জন্মায়,
তার উত্তরও তোমার কাছেই থাকুক।

আমি শুধু এতটুকু চাই-

কোনো একটি পঙ্ক্তি পড়ে
যদি হঠাৎ উনিশশো নব্বইয়ের
সেই ক্যাম্পাসটি তোমার মনে পড়ে,

যদি এক মুহূর্তের জন্য
তোমার মনে হয়-

কেউ একজন কি সত্যিই
এত নীরবে আমাকে ভালোবেসেছিল?

তবে নামের আর কী প্রয়োজন?

আজ তাই
সাদা পাতার সামনে বসে
আমি আবার লিখি-

তোমার চোখ,
তোমার হেঁটে যাওয়া,
ক্লাস শেষে তোমার চলে যাওয়া,
একটি বেঞ্চের পাশে তোমার নীরবতা,
আমার অপেক্ষা-

সব লিখি।

শুধু তোমার নাম লিখি না।

কারণ এতদিনে বুঝেছি-

কিছু নাম কাগজে লিখলে
শুধু একটি শব্দ হয়,
আর না লিখে সারাজীবন বহন করলে
একটি সম্পূর্ণ কবিতা হয়ে যায়।

তোমার নামটি তাই
আমার কবিতার কোথাও নেই-

অথচ,

আমার সমস্ত কবিতার
সবচেয়ে স্পষ্ট নাম
তুমিই।

অপ্রেরিত প্রথম চিঠি

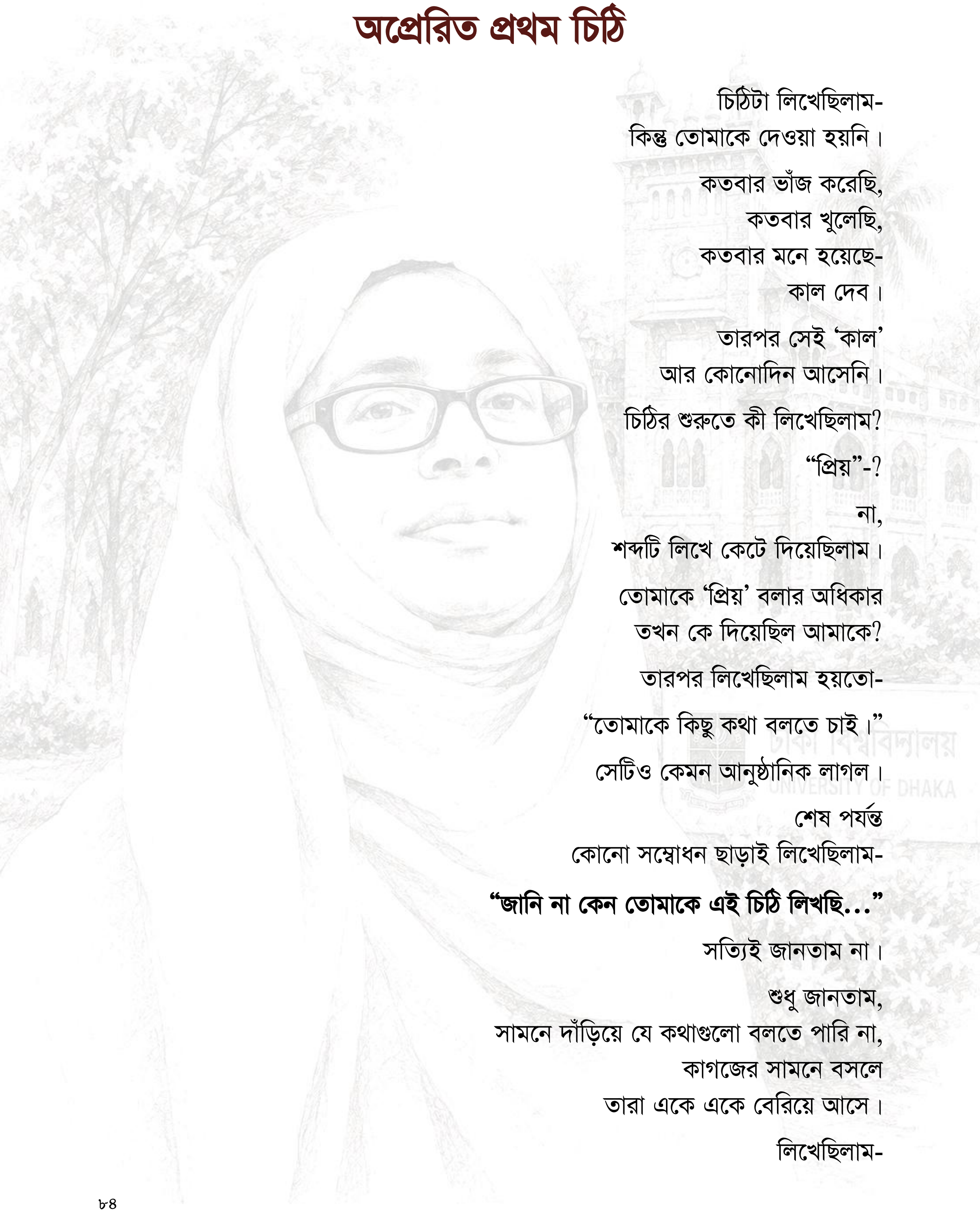

চিঠিটা লিখেছিলাম-
কিন্তু তোমাকে দেওয়া হয়নি।

কতবার ভাঁজ করেছি,
কতবার খুলেছি,
কতবার মনে হয়েছে-
কাল দেব।

তারপর সেই 'কাল'
আর কোনোদিন আসেনি।

চিঠির শুরুতে কী লিখেছিলাম?

"প্রিয়"-?

না,
শব্দটি লিখে কেটে দিয়েছিলাম।

তোমাকে 'প্রিয়' বলার অধিকার
তখন কে দিয়েছিল আমাকে?

তারপর লিখেছিলাম হয়তো-

"তোমাকে কিছু কথা বলতে চাই।"

সেটিও কেমন আনুষ্ঠানিক লাগল।

শেষ পর্যন্ত
কোনো সম্বোধন ছাড়াই লিখেছিলাম-

"জানি না কেন তোমাকে এই চিঠি লিখছি..."

সত্যিই জানতাম না।

শুধু জানতাম,
সামনে দাঁড়িয়ে যে কথাগুলো বলতে পারি না,
কাগজের সামনে বসলে
তারা একে একে বেরিয়ে আসে।

লিখেছিলাম-

তোমাকে প্রথম দেখার কথা।

লিখেছিলাম-
তোমার পাশ দিয়ে গেলে
কেন হঠাৎ আমার স্বাভাবিক হাঁটা
অস্বাভাবিক হয়ে যায়।

লিখেছিলাম-
ক্লাস শেষে তোমাকে দেখলে
কেন দিনটাকে পূর্ণ মনে হয়।

হয়তো লিখেছিলাম-

"তুমি এসব কিছু জানো না।
জানার প্রয়োজনও নেই।
শুধু আমার মনে হলো,
কথাগুলো কোথাও বলা দরকার।"

তারপর কলম থেমেছিল।

কারণ একটি প্রশ্ন
বারবার সামনে এসে দাঁড়াচ্ছিল-

চিঠিটি দিলে তুমি কী ভাববে?

তুমি কি অবাক হবে?

বিরক্ত?

অস্বস্তিতে পড়বে?

নাকি হেসে উড়িয়ে দেবে?

আমার নিজের কষ্টের চেয়ে
সেদিন হঠাৎ তোমার অস্বস্তির কথাটিই
বড় হয়ে উঠেছিল।

তাই চিঠিটা ভাঁজ করলাম।

বইয়ের মধ্যে রেখে দিলাম।

পরদিন সঙ্গে নিলাম।

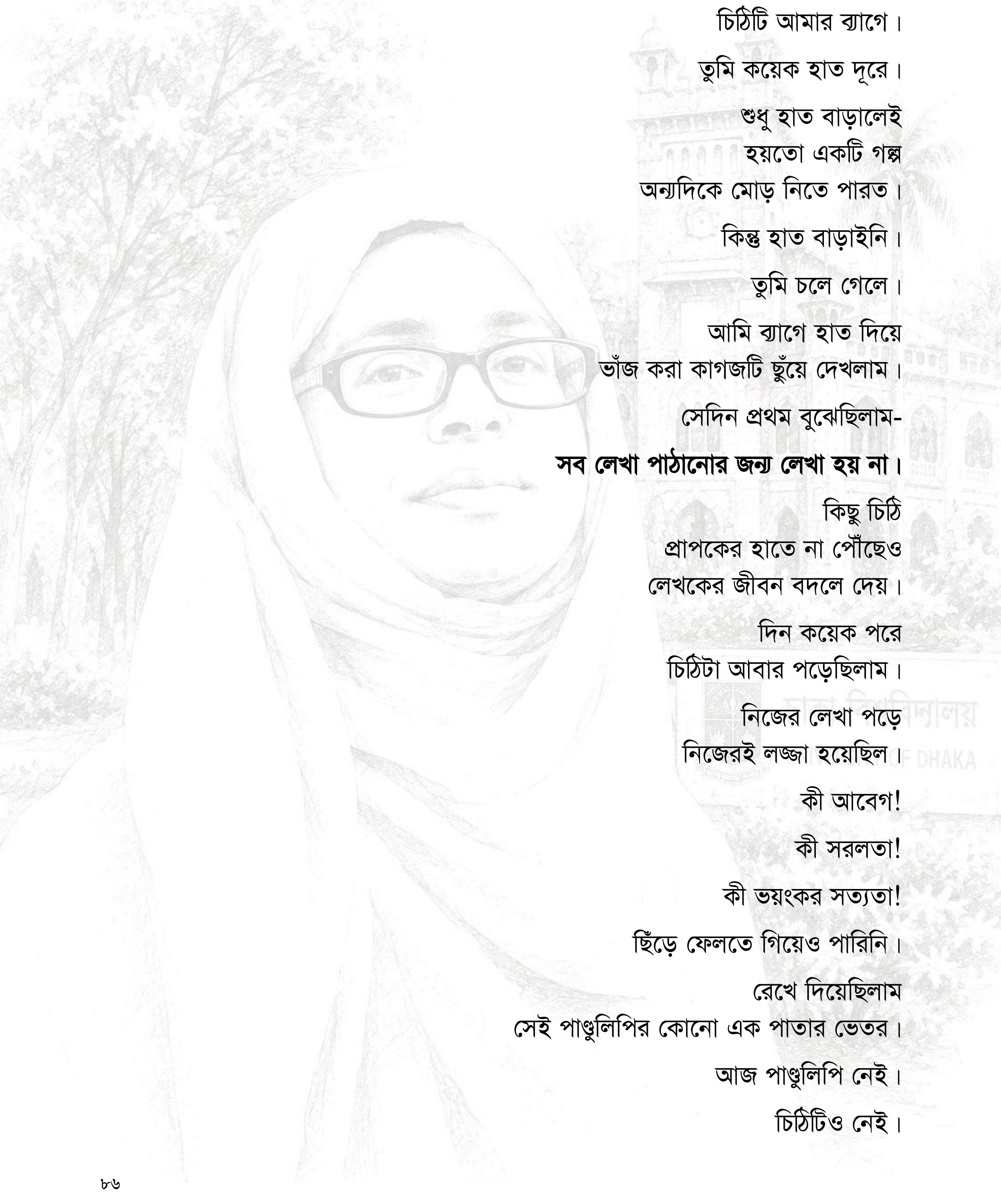

তুমি সামনে দিয়ে গেলে।

চিঠিটি আমার ব্যাগে।

তুমি কয়েক হাত দূরে।

শুধু হাত বাড়ালেই
হয়তো একটি গল্প
অন্যদিকে মোড় নিতে পারত।

কিন্তু হাত বাড়াইনি।

তুমি চলে গেলে।

আমি ব্যাগে হাত দিয়ে
ভাঁজ করা কাগজটি ছুঁয়ে দেখলাম।

সেদিন প্রথম বুঝেছিলাম-

সব লেখা পাঠানোর জন্য লেখা হয় না।

কিছু চিঠি
প্রাপকের হাতে না পৌঁছেও
লেখকের জীবন বদলে দেয়।

দিন কয়েক পরে
চিঠিটা আবার পড়েছিলাম।

নিজের লেখা পড়ে
নিজেরই লজ্জা হয়েছিল।

কী আবেগ!

কী সরলতা!

কী ভয়ংকর সত্যতা!

ছিঁড়ে ফেলতে গিয়েও পারিনি।

রেখে দিয়েছিলাম
সেই পাণ্ডুলিপির কোনো এক পাতার ভেতর।

আজ পাণ্ডুলিপি নেই।

চিঠিটিও নেই।

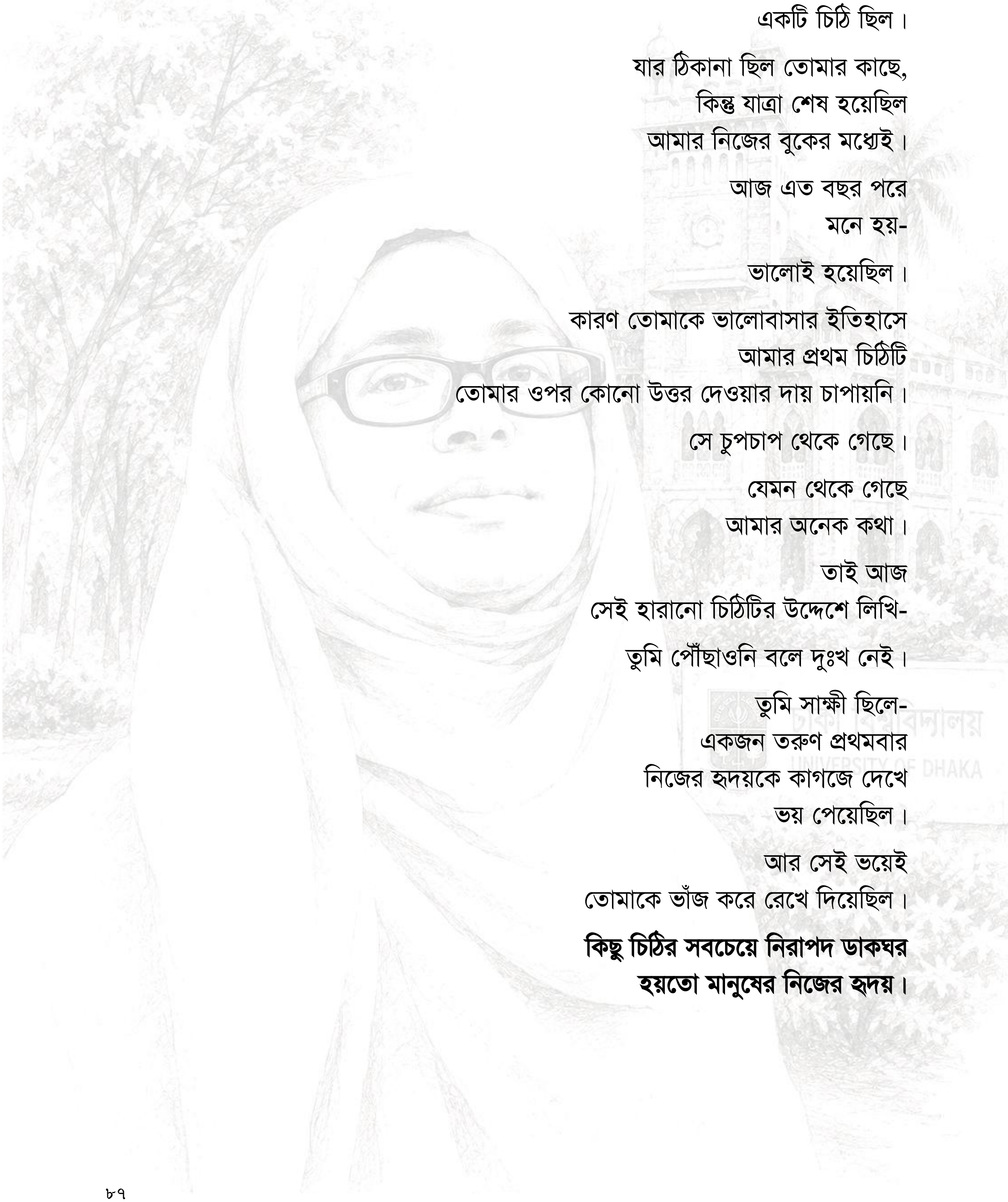

শুধু মনে আছে-
একটি চিঠি ছিল।

যার ঠিকানা ছিল তোমার কাছে,
কিন্তু যাত্রা শেষ হয়েছিল
আমার নিজের বুকের মধ্যেই।

আজ এত বছর পরে
মনে হয়-

ভালোই হয়েছিল।

কারণ তোমাকে ভালোবাসার ইতিহাসে
আমার প্রথম চিঠিটি
তোমার ওপর কোনো উত্তর দেওয়ার দায় চাপায়নি।

সে চুপচাপ থেকে গেছে।

যেমন থেকে গেছে
আমার অনেক কথা।

তাই আজ
সেই হারানো চিঠিটির উদ্দেশে লিখি-

তুমি পৌঁছাওনি বলে দুঃখ নেই।

তুমি সাক্ষী ছিলে-
একজন তরুণ প্রথমবার
নিজের হৃদয়কে কাগজে দেখে
ভয় পেয়েছিল।

আর সেই ভয়েই
তোমাকে ভাঁজ করে রেখে দিয়েছিল।

কিছু চিঠির সবচেয়ে নিরাপদ ডাকঘর
হয়তো মানুষের নিজের হৃদয়।

একটু কথা বলবে?

"একটু কথা বলবে?"

মাত্র তিনটি শব্দ।

কিন্তু এই তিনটি শব্দ বলতে
কত দিন লেগেছিল আমার!

রাতে ঠিক করতাম-
কাল বলব।

সকালে বিশ্ববিদ্যালয়ে যাওয়ার পথে
নিজেকে বোঝাতাম-

এতে এমন কী আছে?

একজন মানুষ
আরেকজন মানুষের সঙ্গে
কথা বলতেই পারে।

তুমি তো কোনো দূরের নক্ষত্র নও।

তুমিও মানুষ।

আমিও মানুষ।

তবু তোমাকে সামনে দেখামাত্র
আমার সমস্ত যুক্তি
কোথায় যেন পালিয়ে যেত।

তুমি চলে যেতে।

আমি দাঁড়িয়ে থাকতাম।

তারপর মনে মনে বলতাম-

"একটু কথা বলবে?"

তুমি তখন অনেক দূরে।

কী অদ্ভুত!

মানুষ সামনে থাকলে
যে বাক্য বলা যায় না,
সে চলে গেলে
সেই বাক্য কত সহজ হয়ে যায়!

একদিন ঠিক করলাম-

আজ বলবই।

আর পিছিয়ে আসব না।

তোমাকে দূর থেকে দেখলাম।

তুমি এগিয়ে আসছ।

আমার বুকের মধ্যে
কেউ যেন দ্রুত ঘণ্টা বাজাচ্ছে।

আর কয়েক পা।

আমি প্রস্তুত।

তুমি কাছে এলে।

আমি মুখ তুললাম।

হয়তো বলেছিলাম-

“শুনবেন...”

তারপর?

আজ আর মনে নেই
ঠিক কী ঘটেছিল।

হয়তো তুমি থেমেছিলে।

হয়তো বলেছিলে-“জি?”

হয়তো আমাদের প্রথম সামান্য কথোপকথন
এভাবেই শুরু হয়েছিল।

স্মৃতি শব্দগুলো হারিয়েছে।

কিন্তু অনুভূতিটা রেখে দিয়েছে।

তোমার সামনে দাঁড়িয়ে
প্রথম কয়েকটি কথা বলার সময়
মনে হয়েছিল-

এতদিন যে মানুষটিকে
কবিতার মধ্যে রেখেছি,
সে আজ আমার সামনে
বাস্তব কণ্ঠে কথা বলছে!

তোমার কণ্ঠস্বর-

সেটিও কি
আমি পরে কবিতায় লিখেছিলাম?

নিশ্চয়ই।

কারণ তখন তোমার সঙ্গে যুক্ত
প্রতিটি নতুন আবিষ্কারই
আমার কাছে কবিতার বিষয় ছিল।

কথা খুব বেশি হয়নি।

হওয়ার কথাও নয়।

হয়তো কয়েকটি সাধারণ বাক্য।

পড়াশোনা নিয়ে।

ক্লাস নিয়ে।

অথবা এমন কোনো বিষয়
যার কথা আজ আর একেবারেই মনে নেই।

কিন্তু কথার বিষয়টি হারিয়ে গেলেও
সেই কথার আনন্দ
কী করে যেন থেকে গেছে।

সেদিন বাড়ি ফেরার পথে
নিজেকে পৃথিবীর সবচেয়ে সফল মানুষ
মনে হয়েছিল কি?

হয়তো।

অথচ অর্জন?

মাত্র কয়েকটি বাক্য!

আজকের বয়সে
ভাবলে মৃদু হাসি আসে।

কিন্তু সেই হাসির সঙ্গে
একটু মায়াও মিশে থাকে।

কারণ এখন বুঝি-

যৌবনের আনন্দের জন্য
বড় ঘটনার প্রয়োজন হয় না।

প্রিয় মানুষের সঙ্গে
দুই মিনিট কথা বলাও
একটি সম্পূর্ণ বিকেলকে
আলোকিত করে দিতে পারে।

সেদিনের পর
"একটু কথা বলবে?"
আর শুধু প্রশ্ন ছিল না।

সেটি হয়ে উঠেছিল
আমার সাহসের প্রথম ছোট্ট পরীক্ষা।

আমি পাশ করেছিলাম কি না জানি না।

শুধু জানি-

সেদিন কয়েকটি কথা বলার পর
আমার হারানো পাণ্ডুলিপিতে
আরও কয়েকটি পৃষ্ঠা বেড়েছিল।

আর আজ এত বছর পরে
সেই কথাগুলোর একটিও মনে নেই।

শুধু মনে আছে-

তুমি কথা বলেছিলে।

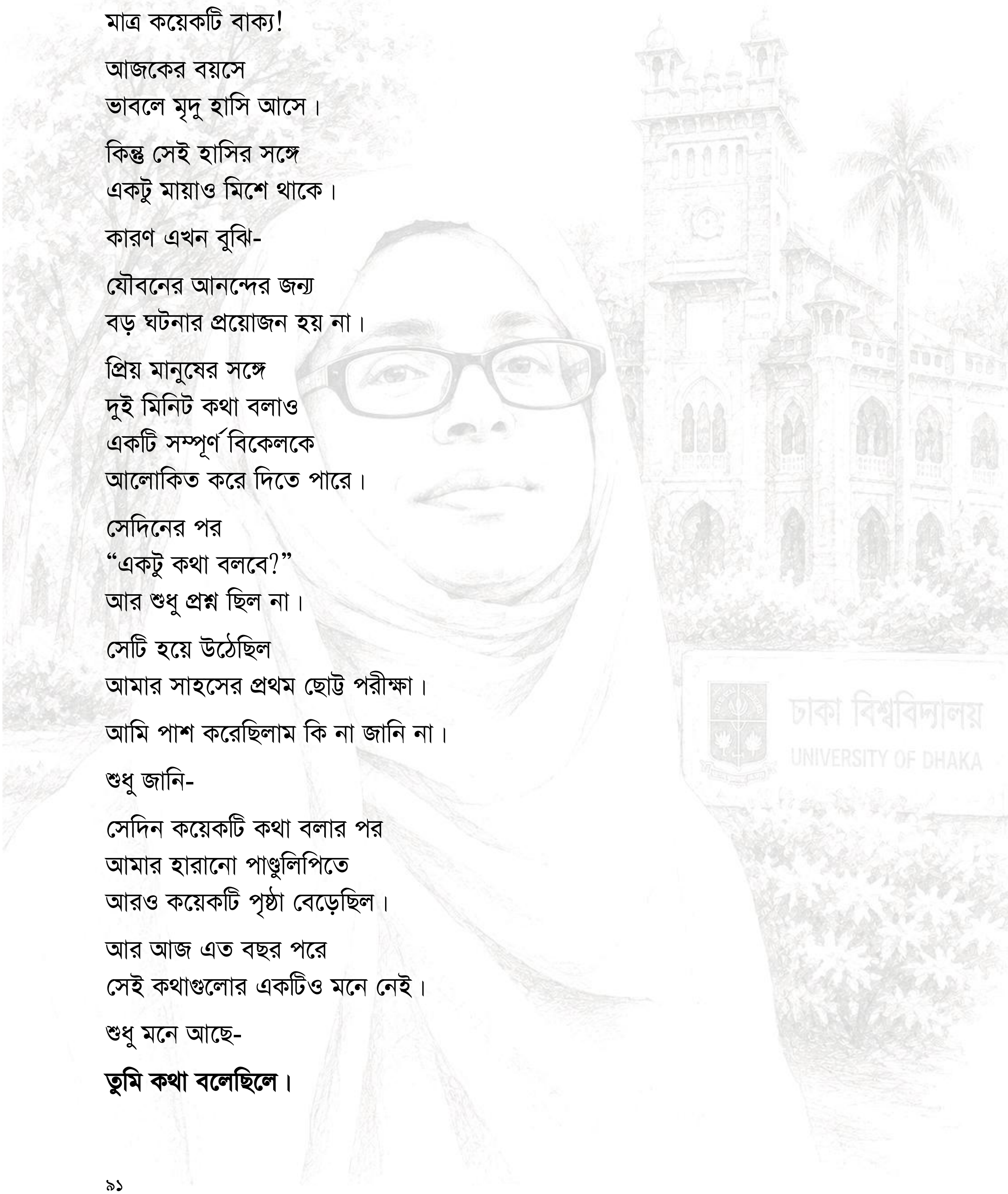

কখনো কখনো
মানুষ কথাগুলো ভুলে যায়,
কিন্তু যার কণ্ঠে শুনেছিল-
তাকে ভুলতে পারে না।

তোমার হাসির দিন

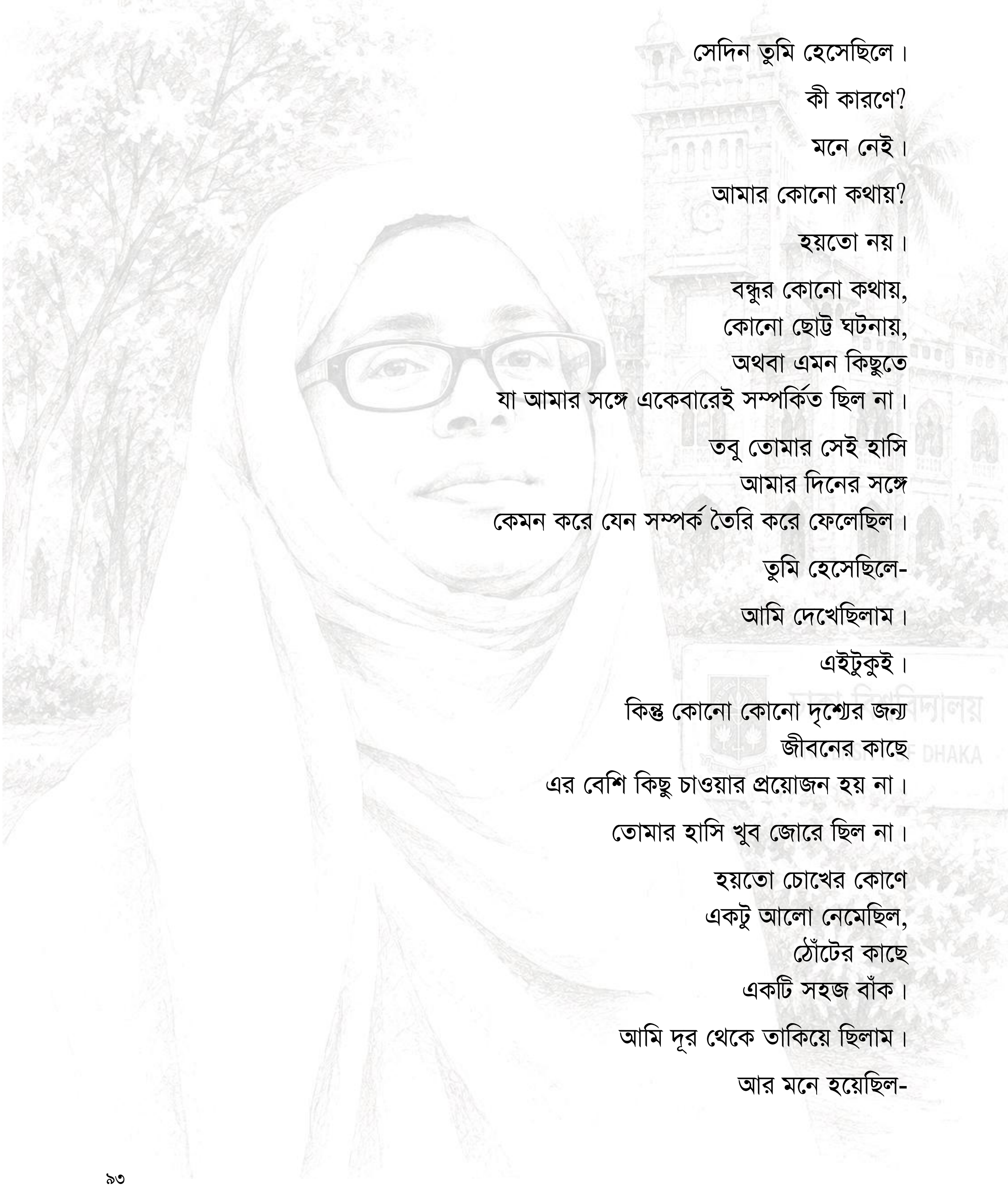

সেদিন তুমি হেসেছিলে।

কী কারণে?

মনে নেই।

আমার কোনো কথায়?

হয়তো নয়।

বন্ধুর কোনো কথায়,
কোনো ছোট্ট ঘটনায়,
অথবা এমন কিছুতে
যা আমার সঙ্গে একেবারেই সম্পর্কিত ছিল না।

তবু তোমার সেই হাসি
আমার দিনের সঙ্গে
কেমন করে যেন সম্পর্ক তৈরি করে ফেলেছিল।

তুমি হেসেছিলে-

আমি দেখেছিলাম।

এইটুকুই।

কিন্তু কোনো কোনো দৃশ্যের জন্য
জীবনের কাছে
এর বেশি কিছু চাওয়ার প্রয়োজন হয় না।

তোমার হাসি খুব জোরে ছিল না।

হয়তো চোখের কোণে
একটু আলো নেমেছিল,
ঠোঁটের কাছে
একটি সহজ বাঁক।

আমি দূর থেকে তাকিয়ে ছিলাম।

আর মনে হয়েছিল-

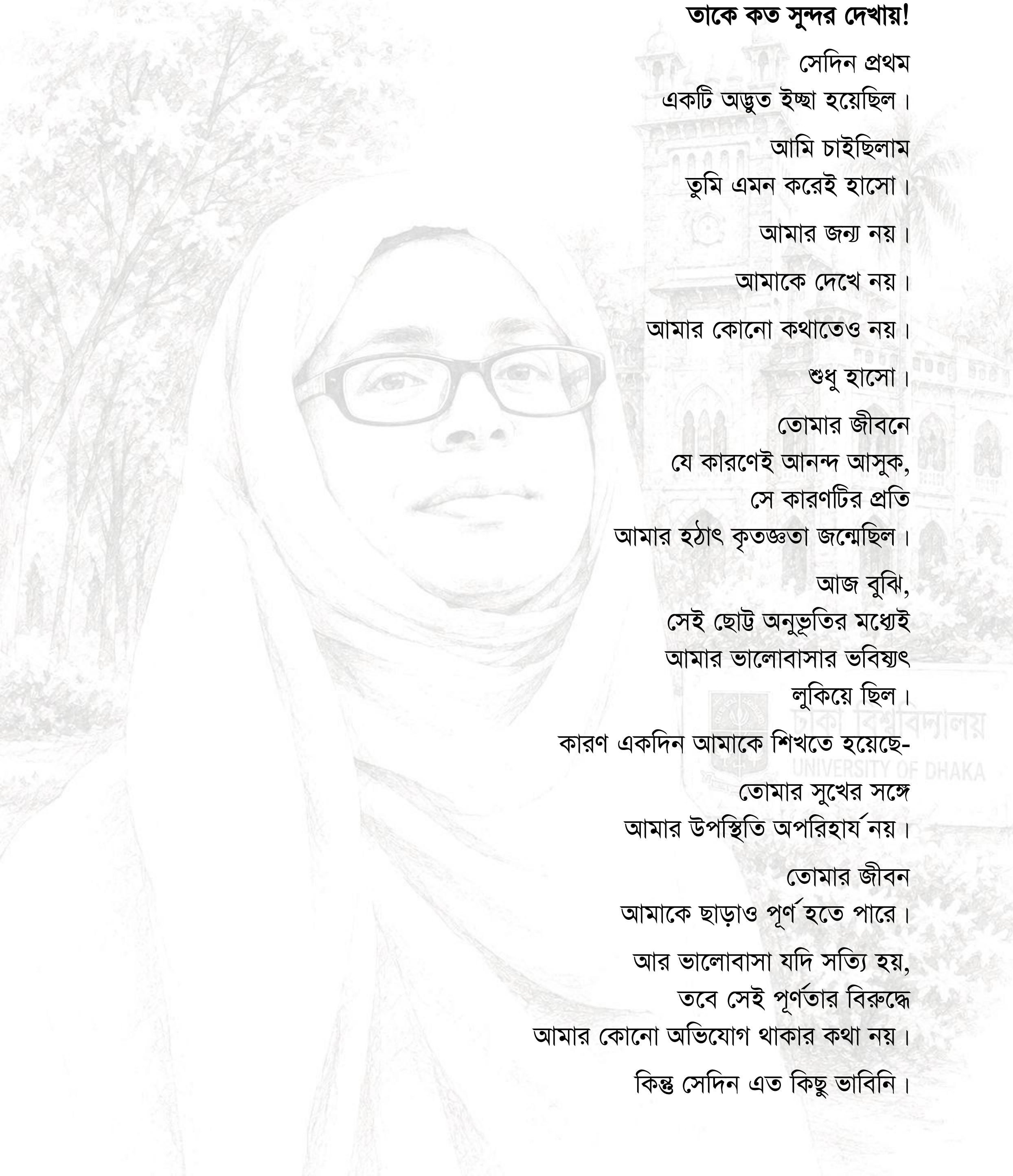

মানুষ সুখী হলে
তাকে কত সুন্দর দেখায়!

সেদিন প্রথম
একটি অদ্ভুত ইচ্ছা হয়েছিল।

আমি চাইছিলাম
তুমি এমন করেই হাসো।

আমার জন্য নয়।

আমাকে দেখে নয়।

আমার কোনো কথাতেও নয়।

শুধু হাসো।

তোমার জীবনে
যে কারণেই আনন্দ আসুক,
সে কারণটির প্রতি
আমার হঠাৎ কৃতজ্ঞতা জন্মেছিল।

আজ বুঝি,
সেই ছোট্ট অনুভূতির মধ্যেই
আমার ভালোবাসার ভবিষ্যৎ
লুকিয়ে ছিল।
কারণ একদিন আমাকে শিখতে হয়েছে-
তোমার সুখের সঙ্গে
আমার উপস্থিতি অপরিহার্য নয়।

তোমার জীবন
আমাকে ছাড়াও পূর্ণ হতে পারে।

আর ভালোবাসা যদি সত্যি হয়,
তবে সেই পূর্ণতার বিরুদ্ধে
আমার কোনো অভিযোগ থাকার কথা নয়।

কিন্তু সেদিন এত কিছু ভাবিনি।

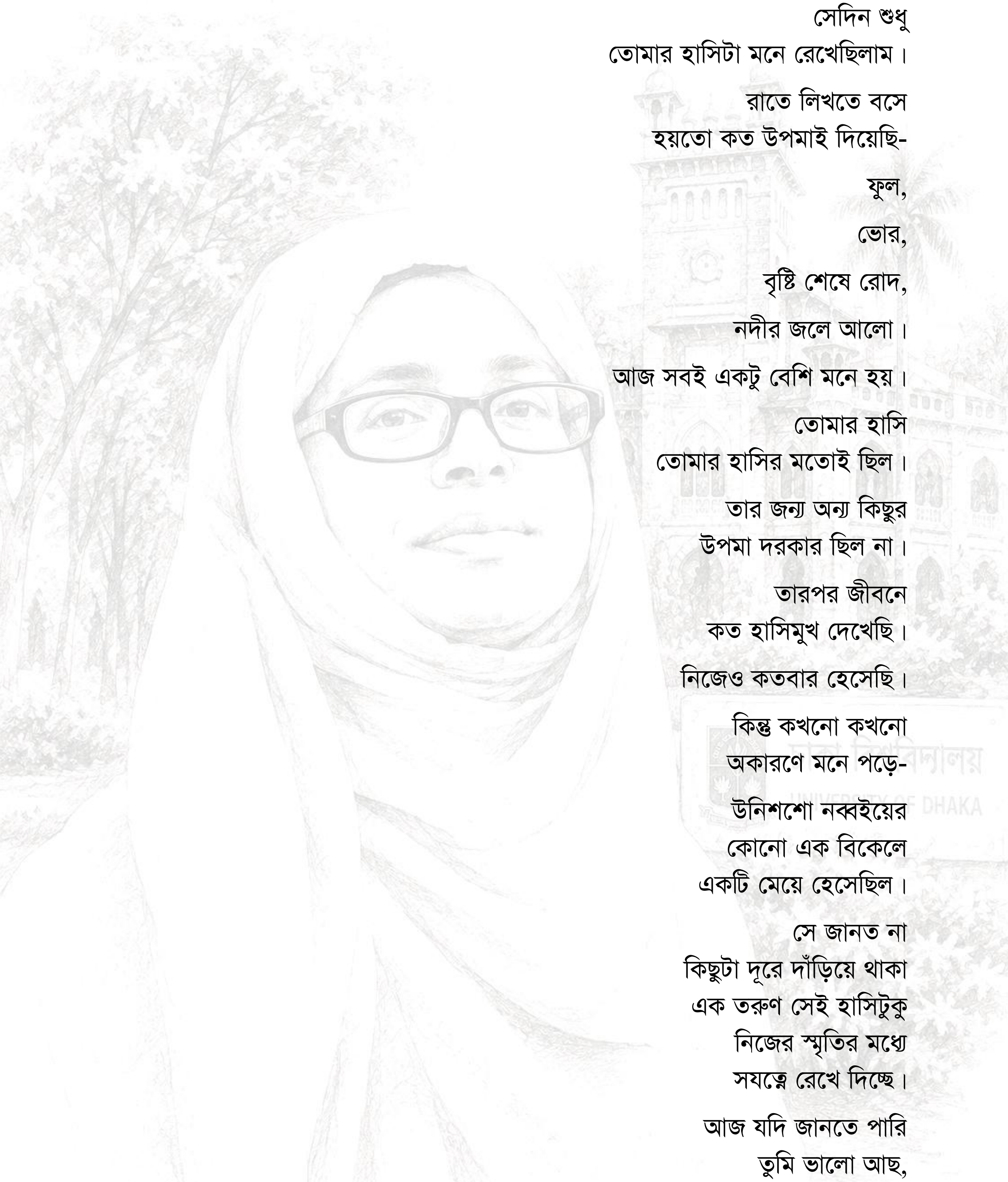

সেদিন শুধু
তোমার হাসিটা মনে রেখেছিলাম।

রাতে লিখতে বসে
হয়তো কত উপমাই দিয়েছি-

ফুল,

ভোর,

বৃষ্টি শেষে রোদ,

নদীর জলে আলো।

আজ সবই একটু বেশি মনে হয়।

তোমার হাসি
তোমার হাসির মতোই ছিল।

তার জন্য অন্য কিছুর
উপমা দরকার ছিল না।

তারপর জীবনে
কত হাসিমুখ দেখেছি।

নিজেও কতবার হেসেছি।

কিন্তু কখনো কখনো
অকারণে মনে পড়ে-

উনিশশো নব্বইয়ের
কোনো এক বিকেলে
একটি মেয়ে হেসেছিল।

সে জানত না
কিছুটা দূরে দাঁড়িয়ে থাকা
এক তরুণ সেই হাসিটুকু
নিজের স্মৃতির মধ্যে
সযত্নে রেখে দিচ্ছে।

আজ যদি জানতে পারি
তুমি ভালো আছ,

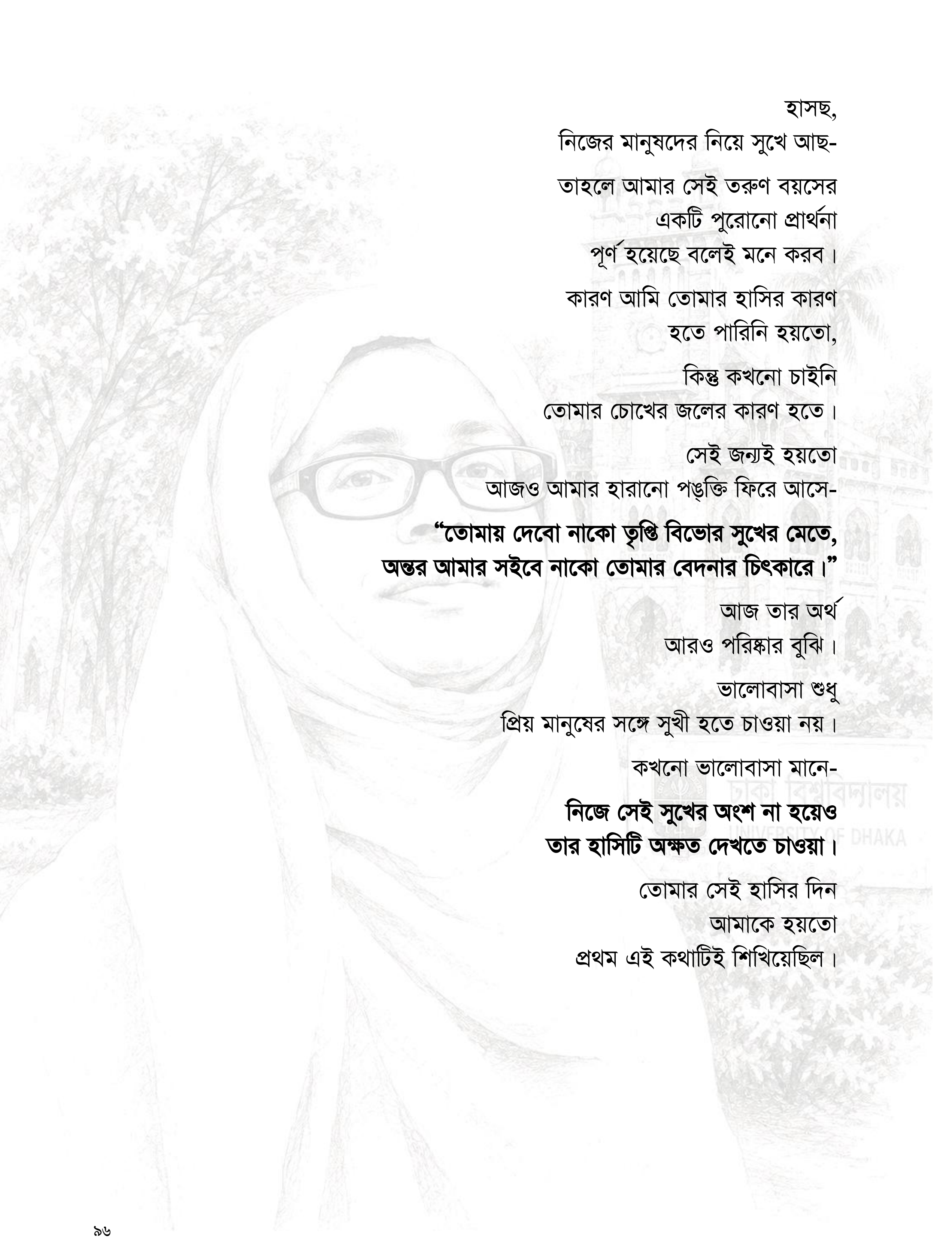

হাসছ,
নিজের মানুষদের নিয়ে সুখে আছ-

তাহলে আমার সেই তরুণ বয়সের
একটি পুরোনো প্রার্থনা
পূর্ণ হয়েছে বলেই মনে করব।

কারণ আমি তোমার হাসির কারণ
হতে পারিনি হয়তো,

কিন্তু কখনো চাইনি
তোমার চোখের জলের কারণ হতে।

সেই জন্যই হয়তো
আজও আমার হারানো পঙ্‌ক্তি ফিরে আসে-

"তোমায় দেবো নাকো তৃপ্তি বিভোর সুখের মেতে,
অন্তর আমার সইবে নাকো তোমার বেদনার চিৎকারে।"

আজ তার অর্থ
আরও পরিষ্কার বুঝি।

ভালোবাসা শুধু
প্রিয় মানুষের সঙ্গে সুখী হতে চাওয়া নয়।

কখনো ভালোবাসা মানে-

নিজে সেই সুখের অংশ না হয়েও
তার হাসিটি অক্ষত দেখতে চাওয়া।

তোমার সেই হাসির দিন
আমাকে হয়তো
প্রথম এই কথাটিই শিখিয়েছিল।

যে বিকেল আর ফেরেনি

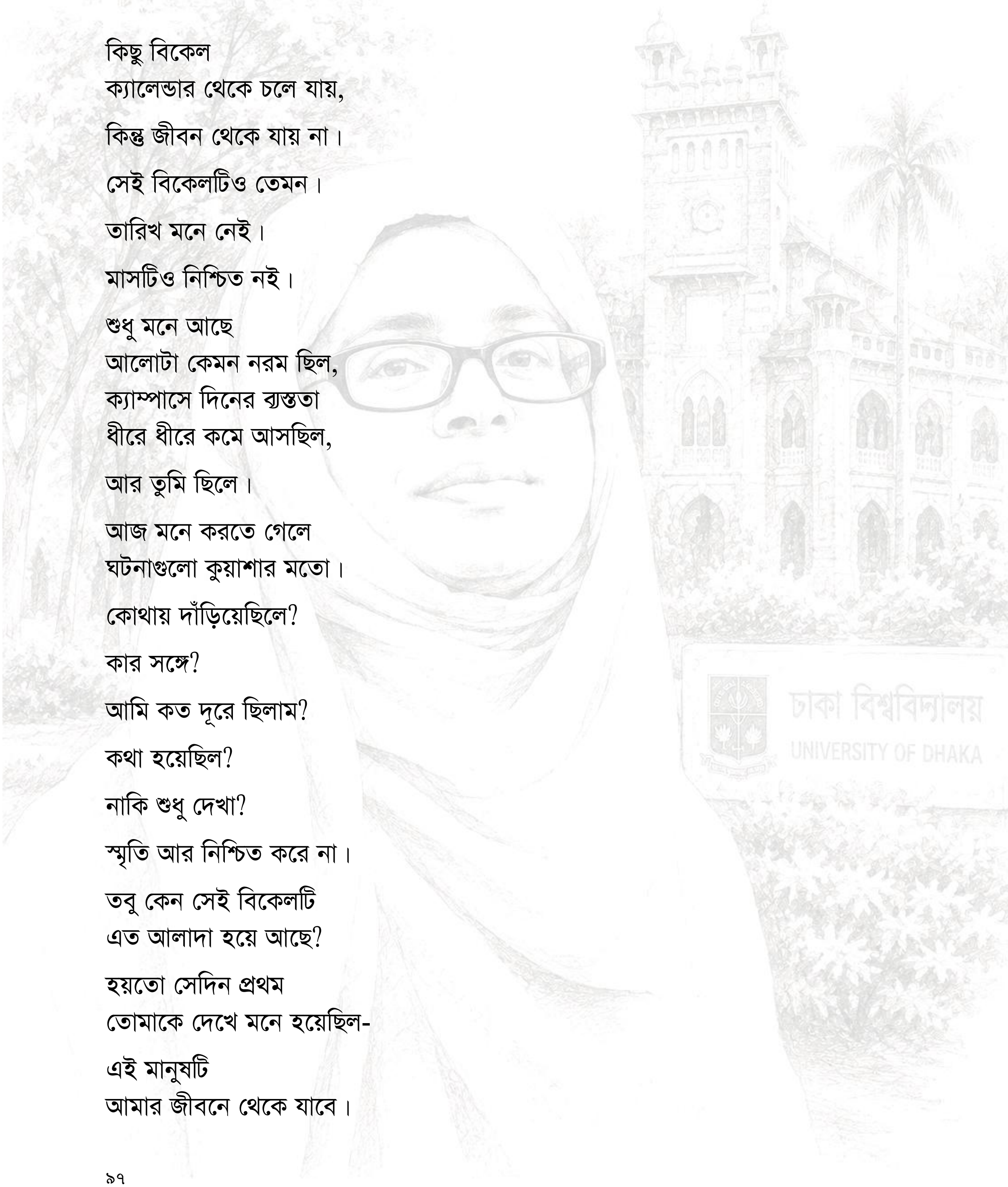

কিছু বিকেল
ক্যালেন্ডার থেকে চলে যায়,

কিন্তু জীবন থেকে যায় না।

সেই বিকেলটিও তেমন।

তারিখ মনে নেই।

মাসটিও নিশ্চিত নই।

শুধু মনে আছে
আলোটা কেমন নরম ছিল,
ক্যাম্পাসে দিনের ব্যস্ততা
ধীরে ধীরে কমে আসছিল,

আর তুমি ছিলে।

আজ মনে করতে গেলে
ঘটনাগুলো কুয়াশার মতো।

কোথায় দাঁড়িয়েছিলে?

কার সঙ্গে?

আমি কত দূরে ছিলাম?

কথা হয়েছিল?

নাকি শুধু দেখা?

স্মৃতি আর নিশ্চিত করে না।

তবু কেন সেই বিকেলটি
এত আলাদা হয়ে আছে?

হয়তো সেদিন প্রথম
তোমাকে দেখে মনে হয়েছিল-

এই মানুষটি
আমার জীবনে থেকে যাবে।

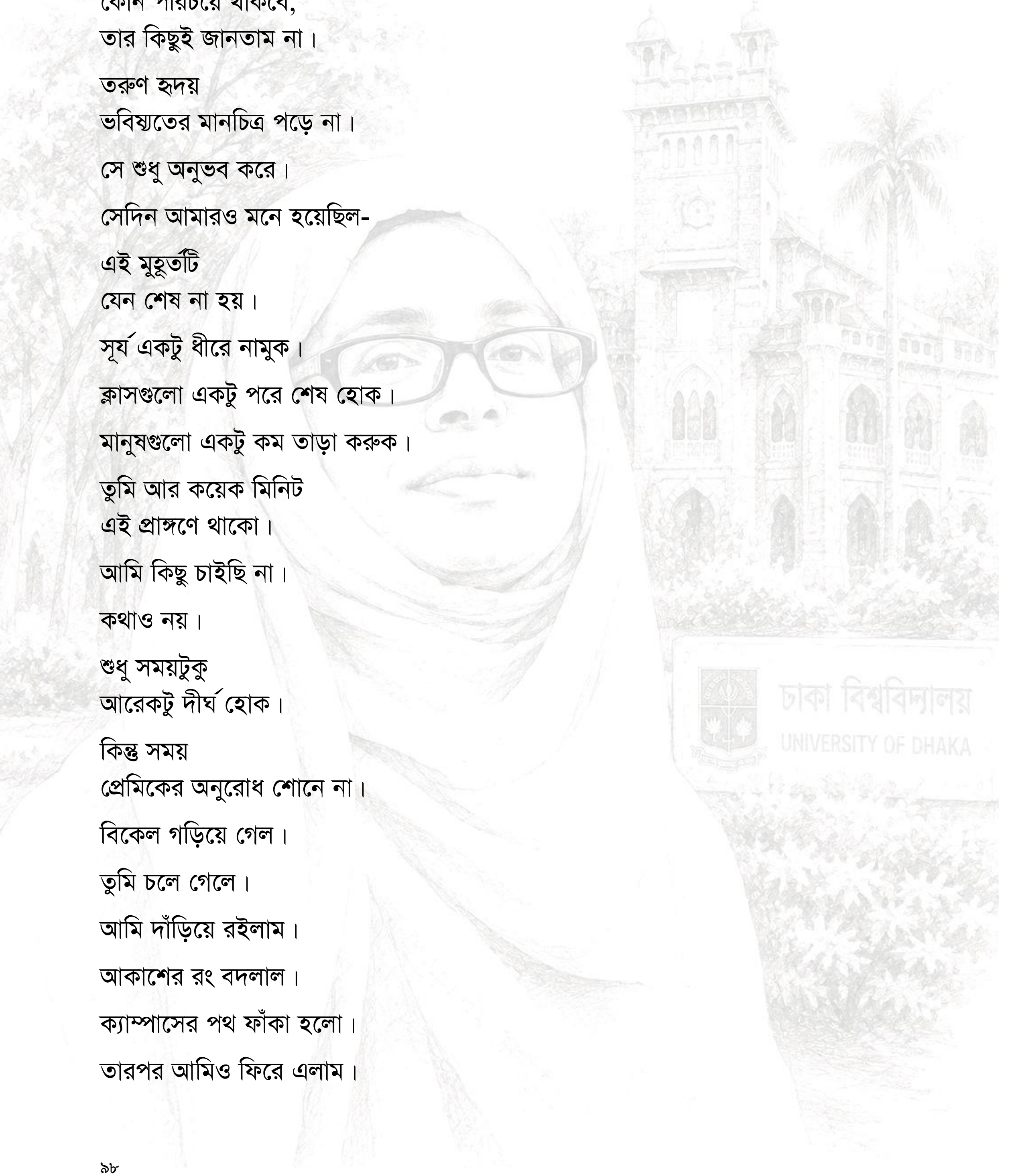

কীভাবে থাকবে,
কোন পরিচয়ে থাকবে,
তার কিছুই জানতাম না।

তরুণ হৃদয়
ভবিষ্যতের মানচিত্র পড়ে না।

সে শুধু অনুভব করে।

সেদিন আমারও মনে হয়েছিল-

এই মুহূর্তটি
যেন শেষ না হয়।

সূর্য একটু ধীরে নামুক।

ক্লাসগুলো একটু পরে শেষ হোক।

মানুষগুলো একটু কম তাড়া করুক।

তুমি আর কয়েক মিনিট
এই প্রাঙ্গণে থাকো।

আমি কিছু চাইছি না।

কথাও নয়।

শুধু সময়টুকু
আরেকটু দীর্ঘ হোক।

কিন্তু সময়
প্রেমিকের অনুরোধ শোনে না।

বিকেল গড়িয়ে গেল।

তুমি চলে গেলে।

আমি দাঁড়িয়ে রইলাম।

আকাশের রং বদলাল।

ক্যাম্পাসের পথ ফাঁকা হলো।

তারপর আমিও ফিরে এলাম।

জানতাম না-

কোনো একটি সাধারণ বিকেলকে
শেষবারের মতো দেখছি কি না
মানুষ কখনো আগে থেকে বুঝতে পারে না।

পরে আরও বিকেল এসেছে।

তোমাকে দেখেছি।

হয়তো কথা হয়েছে।

আরও কবিতা লিখেছি।

তবু সেই একটি বিকেল
কীভাবে যেন
নিজের জন্য আলাদা একটি জায়গা বানিয়ে নিয়েছে।

হয়তো কারণ
সেদিন ভালোবাসা ছিল
একেবারেই নির্ভার।

তখনও ভবিষ্যতের জটিলতা আসেনি।

কোনো নিষেধ ছিল না।

কোনো দীর্ঘ দূরত্ব ছিল না।

ত্রিশ বছরের না-দেখা
তখনো আমাদের সামনে
অদৃশ্য হয়ে অপেক্ষা করছিল।

সেদিনের আমি জানতাম না
একদিন তোমাকে না-দেখাই
আমার ভালোবাসার সবচেয়ে দীর্ঘ অধ্যায় হবে।

সে শুধু জানত-

তুমি আছ।

এই ক্যাম্পাসে।

এই শহরে।

হয়তো আগামীকালও দেখা হবে।

মানুষের জীবনে
'আগামীকাল' শব্দটি
তখন কত নিশ্চিন্ত ছিল!

আজ জানি-

সব আগামীকাল
গতকালের পুনরাবৃত্তি নয়।

একদিন শেষ দেখা হয়।

শেষ কথা হয়।

শেষবার কেউ
একটি পরিচিত পথ দিয়ে চলে যায়।

কিন্তু আমরা জানি না
সেটিই শেষ।

তাই বিদায়ও বলা হয় না।

আজ যদি সেই বিকেলটি
আর একবার ফিরে পেতাম?

না-

তোমার কাছে যেতাম না।

ইতিহাস বদলানোর চেষ্টাও করতাম না।

শুধু দূর থেকে
আরেকটু মন দিয়ে দেখতাম।

গাছগুলো।

আলো।

ক্যাম্পাসের পথ।

তোমার হেঁটে যাওয়া।

আমার তরুণ বয়স।

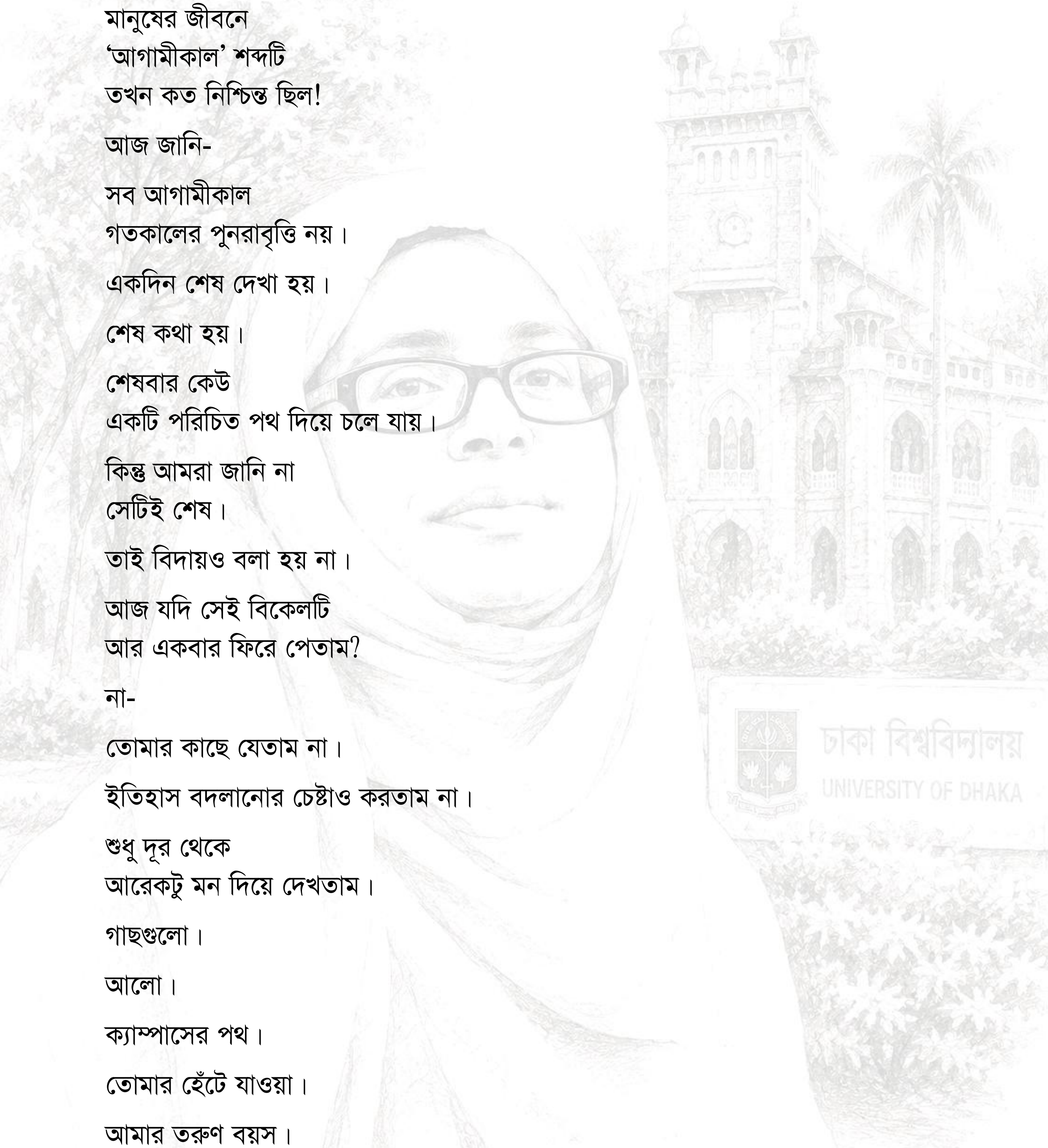

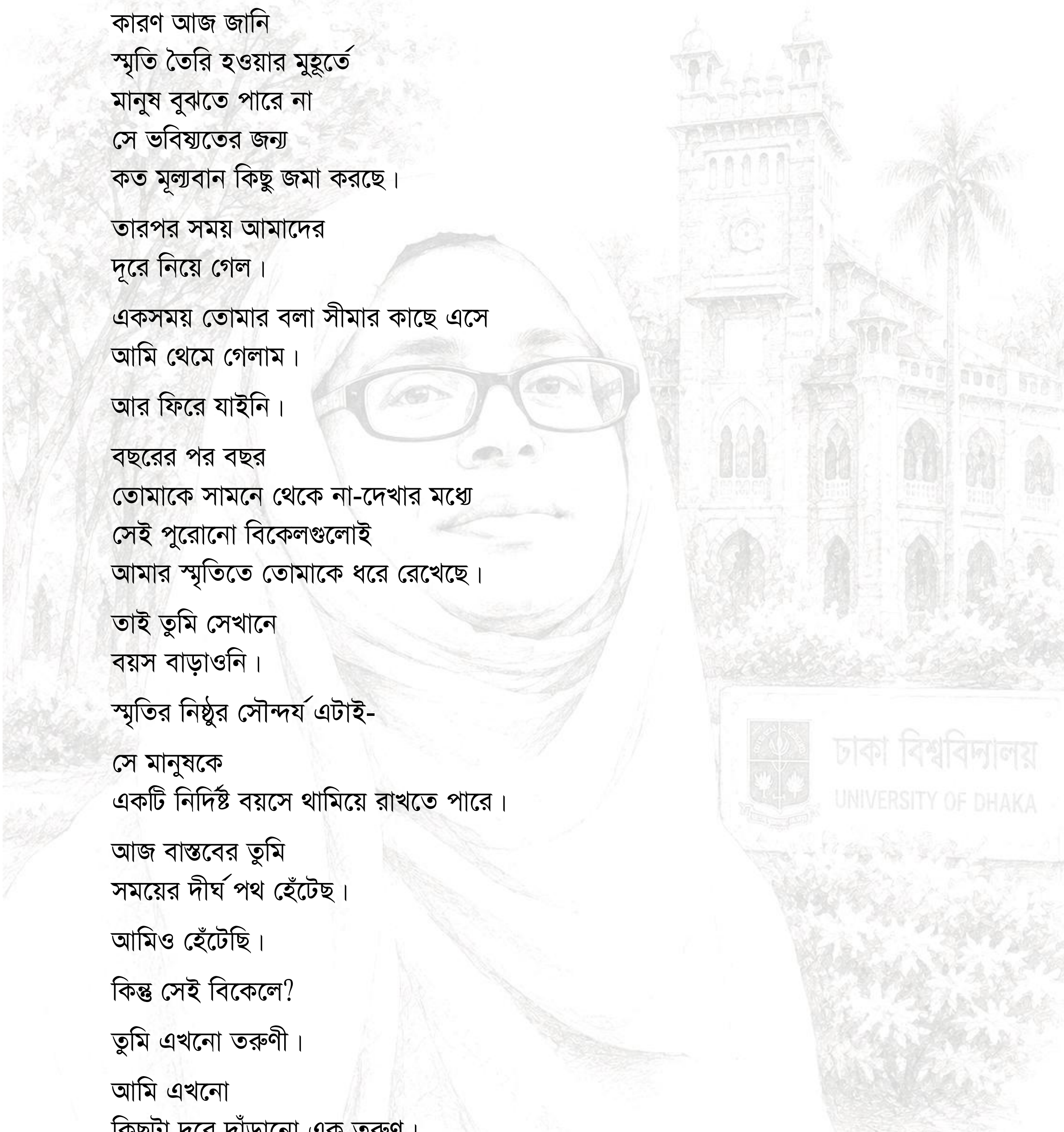

সবকিছু।

কারণ আজ জানি
স্মৃতি তৈরি হওয়ার মুহূর্তে
মানুষ বুঝতে পারে না
সে ভবিষ্যতের জন্য
কত মূল্যবান কিছু জমা করছে।

তারপর সময় আমাদের
দূরে নিয়ে গেল।

একসময় তোমার বলা সীমার কাছে এসে
আমি থেমে গেলাম।

আর ফিরে যাইনি।

বছরের পর বছর
তোমাকে সামনে থেকে না-দেখার মধ্যে
সেই পুরোনো বিকেলগুলোই
আমার স্মৃতিতে তোমাকে ধরে রেখেছে।

তাই তুমি সেখানে
বয়স বাড়াওনি।

স্মৃতির নিষ্ঠুর সৌন্দর্য এটাই-

সে মানুষকে
একটি নির্দিষ্ট বয়সে থামিয়ে রাখতে পারে।

আজ বাস্তবের তুমি
সময়ের দীর্ঘ পথ হেঁটেছ।

আমিও হেঁটেছি।

কিন্তু সেই বিকেলে?

তুমি এখনো তরুণী।

আমি এখনো
কিছুটা দূরে দাঁড়ানো এক তরুণ।

সূর্য নামছে।

ক্যাম্পাস ফাঁকা হচ্ছে।

আমাদের কেউ জানে না
সামনে কত বছর অপেক্ষা করছে।

কখনো খুব ইচ্ছে করে
সেই তরুণটির কাছে গিয়ে বলি-

"এই বিকেলটা ভালো করে দেখে রাখো।
একদিন পৃথিবীর অনেক কিছু তোমার থাকবে,
অনেক কিছু হারিয়েও যাবে;
কিন্তু এই কয়েক মিনিট
কোনোদিন ফিরে পাবে না।"

তারপর তাকে আর কিছু বলব না।

ভবিষ্যতের দুঃখ জানাব না।

কারণ সেদিনের আনন্দের ওপর
আগামীর ছায়া ফেলার অধিকার
আমারও নেই।

আমি শুধু দূরে দাঁড়িয়ে দেখব-

তুমি চলে যাচ্ছ।

তরুণ আমি তাকিয়ে আছে।

বিকেলটি ধীরে ধীরে
সন্ধ্যার মধ্যে মিলিয়ে যাচ্ছে।

আর সময়
নিঃশব্দে একটি দরজা বন্ধ করছে।

যে দরজা খুলে
আজও মাঝে মাঝে ফিরে যাই-

কিন্তু যার ওপারে গিয়ে
কিছু ছুঁতে পারি না।

শুধু দেখতে পাই।

আর বুঝতে পারি-

জীবনে কিছু বিকেল দ্বিতীয়বার আসে না,
কারণ তারা ফিরে আসার জন্য নয়-
সারাজীবন মনে থাকার জন্য আসে।

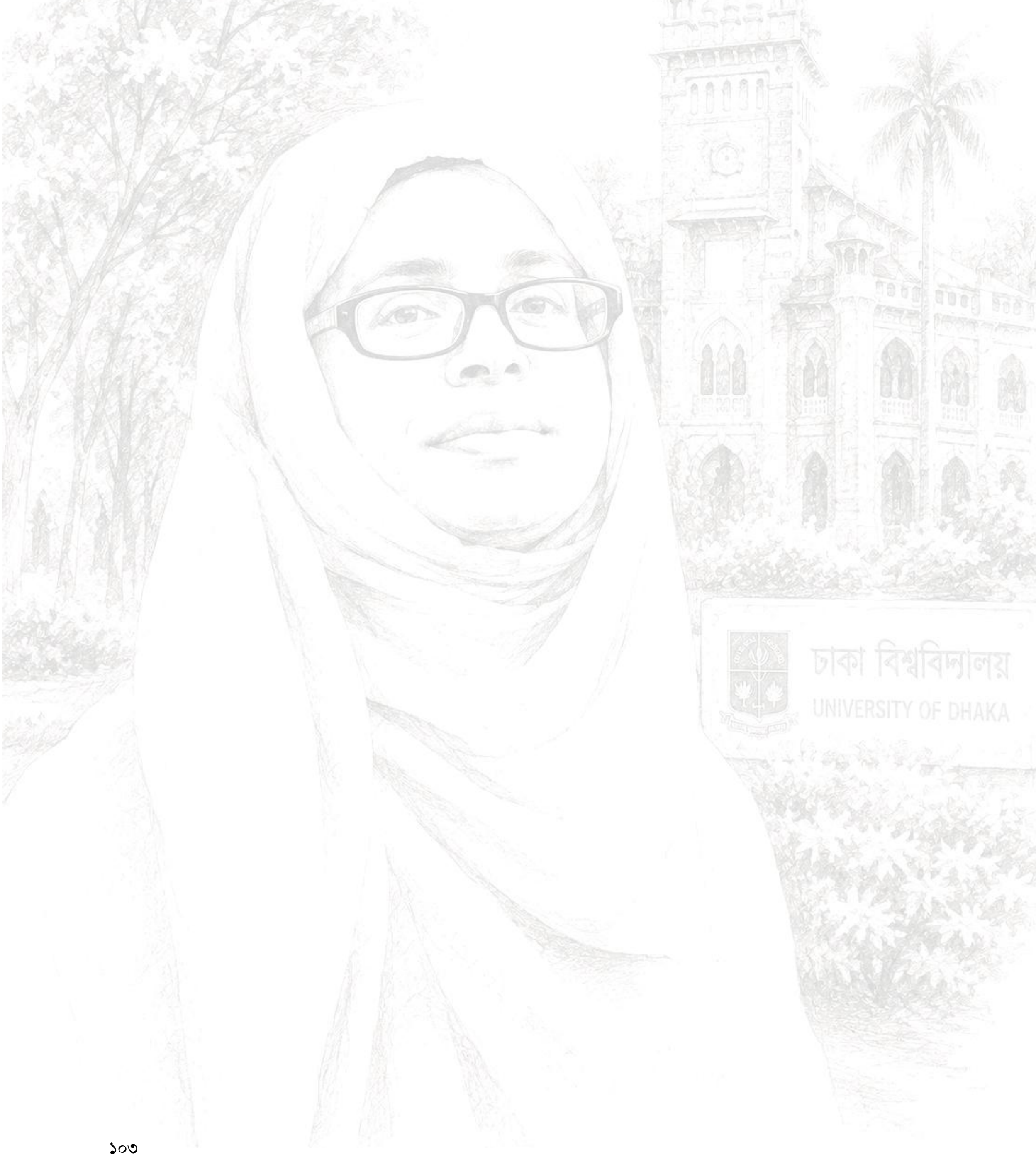

আমার গোপন পাণ্ডুলিপি

কখন যে কয়েকটি কবিতা
একটি পাণ্ডুলিপি হয়ে উঠল-
আমি নিজেও বুঝিনি।

প্রথমে ছিল একটি সাদা পাতা,
তারপর আরেকটি,
তারপর রাতের পর রাত
তোমাকে না-বলা কথাগুলো
নিজেদের জন্য জায়গা করে নিল কাগজে।

একদিন হঠাৎ দেখি-
পাতাগুলো আর আলাদা নেই।

তারা যেন পরস্পরের হাত ধরে
একটি দীর্ঘ গল্প হয়ে গেছে।

সেই গল্পের কোনো নাম ছিল না,
প্রকাশকের ঠিকানা ছিল না,
পাঠকের অপেক্ষাও ছিল না।

ছিল শুধু একজন লেখক-

আর একজন মানুষ,
যে জানতই না
তাকে নিয়ে একটি বই লেখা হচ্ছে।

পাণ্ডুলিপিটি লুকিয়ে রাখতাম।

কেন?

কেউ পড়ে ফেলবে বলে।

বন্ধুরা জানলে হাসবে,
পরিবারের কেউ দেখলে প্রশ্ন করবে-

“এত কবিতা কাকে নিয়ে?”

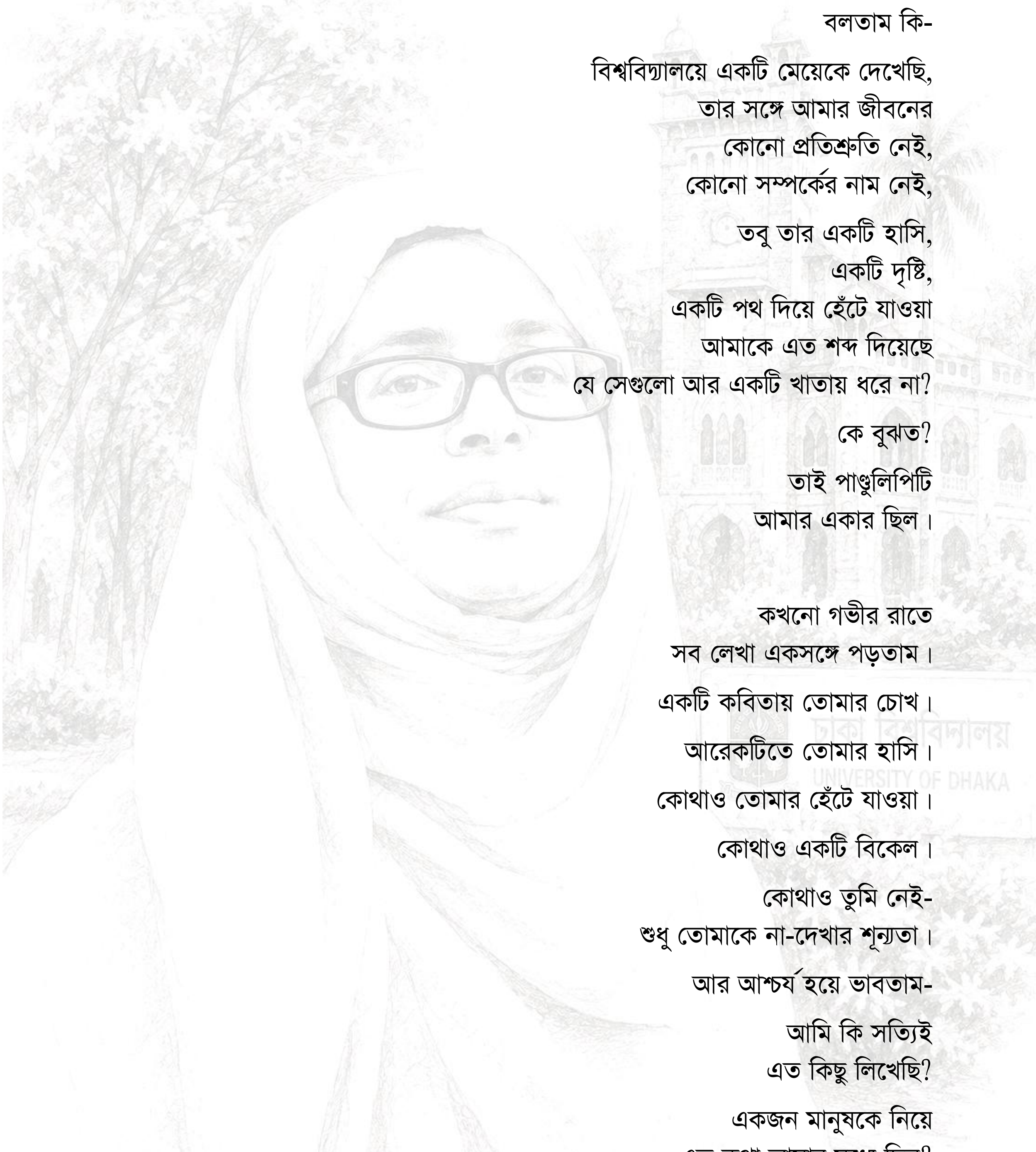

আমি কী বলতাম?

বলতাম কি-

বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি মেয়েকে দেখেছি,
তার সঙ্গে আমার জীবনের
কোনো প্রতিশ্রুতি নেই,
কোনো সম্পর্কের নাম নেই,

তবু তার একটি হাসি,
একটি দৃষ্টি,
একটি পথ দিয়ে হেঁটে যাওয়া
আমাকে এত শব্দ দিয়েছে
যে সেগুলো আর একটি খাতায় ধরে না?

কে বুঝত?

তাই পাণ্ডুলিপিটি
আমার একার ছিল।

কখনো গভীর রাতে
সব লেখা একসঙ্গে পড়তাম।

একটি কবিতায় তোমার চোখ।

আরেকটিতে তোমার হাসি।

কোথাও তোমার হেঁটে যাওয়া।

কোথাও একটি বিকেল।

কোথাও তুমি নেই-
শুধু তোমাকে না-দেখার শূন্যতা।

আর আশ্চর্য হয়ে ভাবতাম-

আমি কি সত্যিই
এত কিছু লিখেছি?

একজন মানুষকে নিয়ে
এত কথা আমার মধ্যে ছিল?

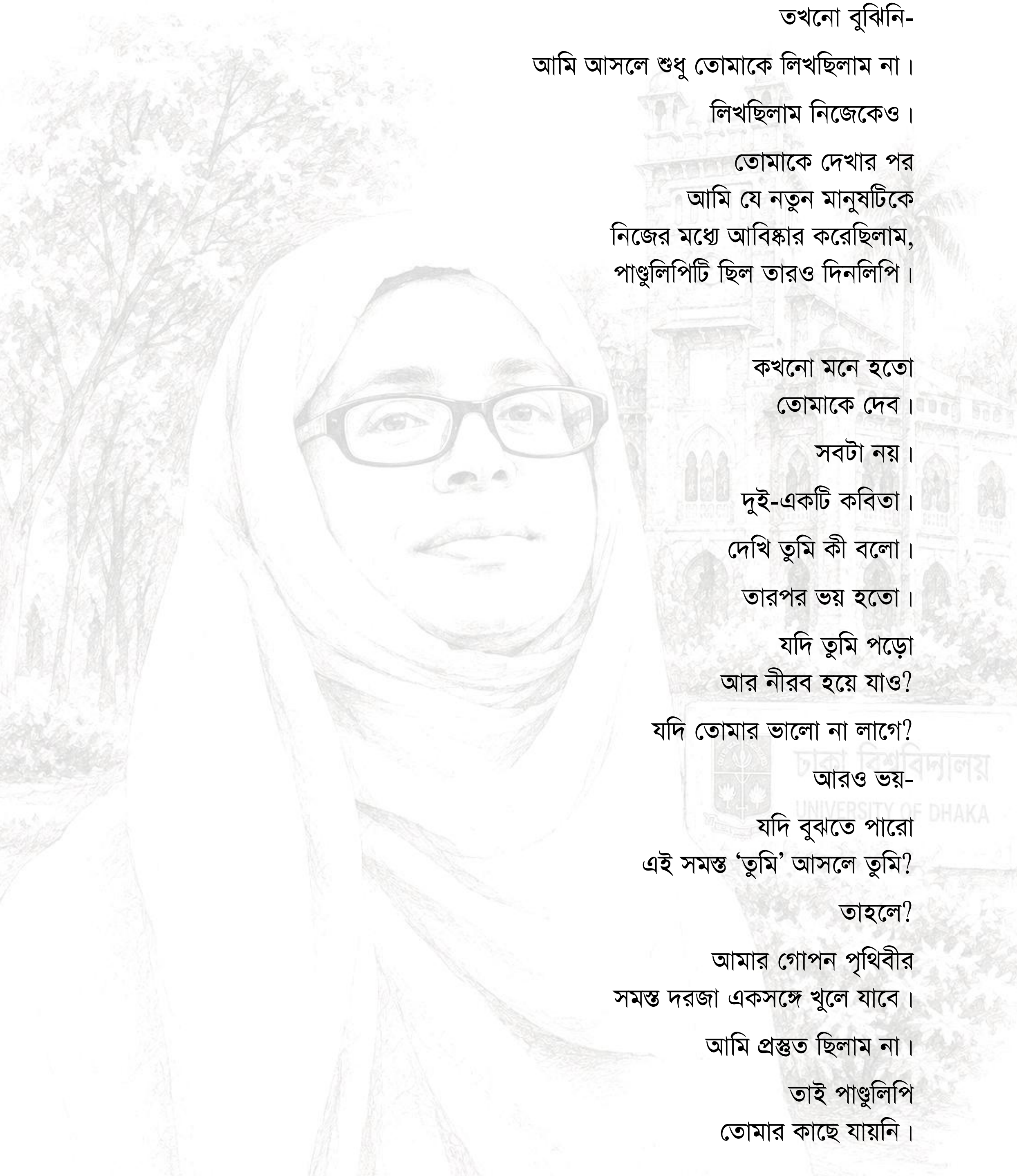

তখনো বুঝিনি-

আমি আসলে শুধু তোমাকে লিখছিলাম না।

লিখছিলাম নিজেকেও।

তোমাকে দেখার পর
আমি যে নতুন মানুষটিকে
নিজের মধ্যে আবিষ্কার করেছিলাম,
পাণ্ডুলিপিটি ছিল তারও দিনলিপি।

কখনো মনে হতো
তোমাকে দেব।

সবটা নয়।

দুই-একটি কবিতা।

দেখি তুমি কী বলো।

তারপর ভয় হতো।

যদি তুমি পড়ো
আর নীরব হয়ে যাও?

যদি তোমার ভালো না লাগে?

আরও ভয়-

যদি বুঝতে পারো
এই সমস্ত ‘তুমি’ আসলে তুমি?

তাহলে?

আমার গোপন পৃথিবীর
সমস্ত দরজা একসঙ্গে খুলে যাবে।

আমি প্রস্তুত ছিলাম না।

তাই পাণ্ডুলিপি
তোমার কাছে যায়নি।

তবু মনে মনে
তোমাকে তার প্রথম পাঠক বানিয়েছিলাম।

একটি কবিতা লিখে ভাবতাম-

এটা পড়লে তুমি কী বলতে?

কোনো পঙ্‌ক্তিতে কি হাসতে?

কোনোটিতে বিরক্ত হতে?

কোনো একটি জায়গায় এসে
এক মুহূর্ত থামতে?

হয়তো বলতে-

"এত কিছু কেন লিখেছ?"

আমি কী উত্তর দিতাম?

হয়তো বলতাম-

"কারণ তোমাকে যতটুকু বলতে পেরেছি,
তার চেয়ে অনেক বেশি
না-বলা থেকে গেছে।"

পাণ্ডুলিপিটি বড় হতে থাকল।

আমার বয়সও।

একসময় মনে হলো
এটি শুধু কবিতার খাতা নয়-

আমার তরুণ জীবনের
একটি গোপন দেশ।

সেখানে প্রবেশের
একটিই দরজা ছিল-

তুমি।

অথচ সেই দেশের নাগরিকত্ব
তোমাকে কোনোদিন দেওয়া হয়নি।

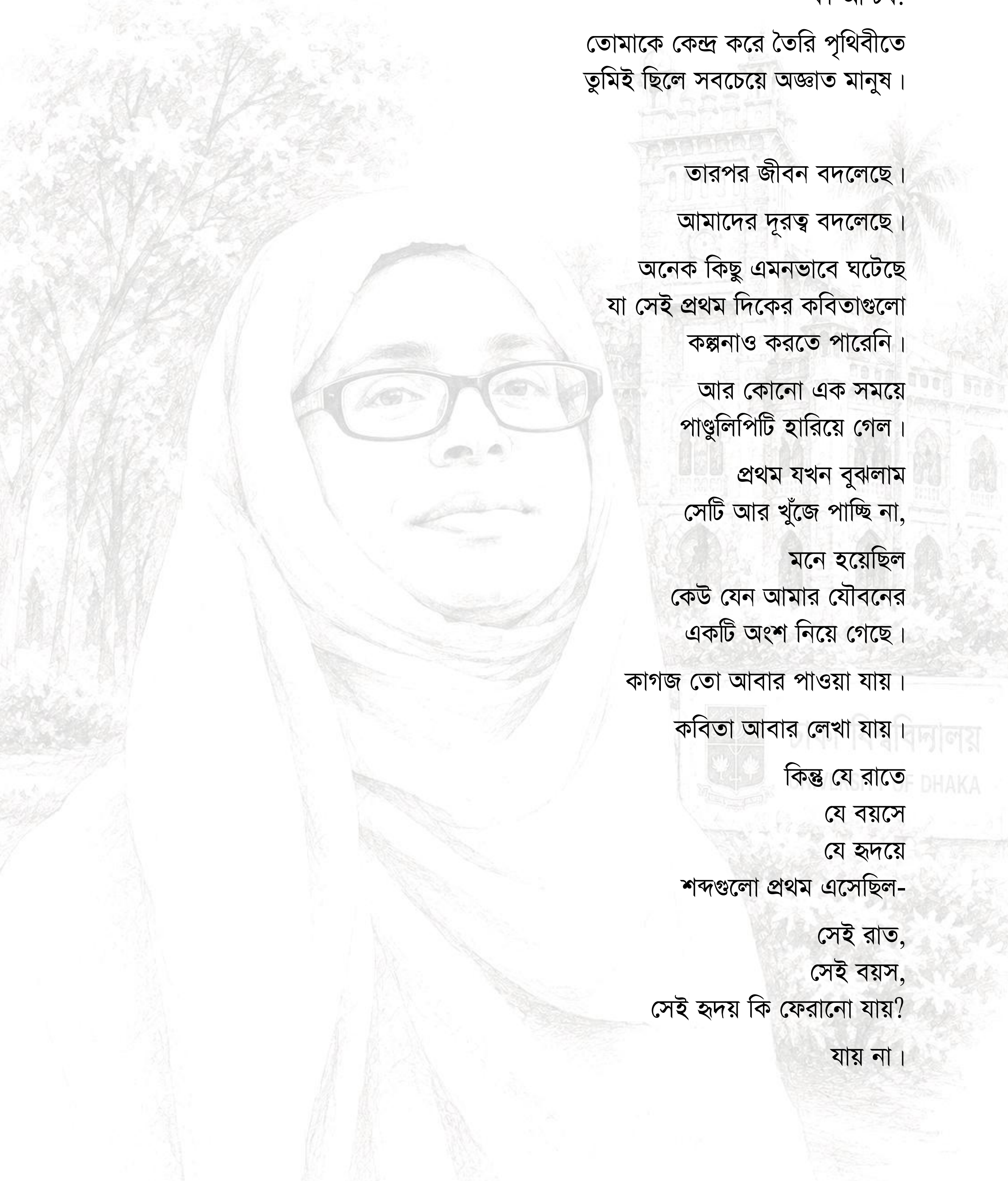

কী আশ্চর্য!

তোমাকে কেন্দ্র করে তৈরি পৃথিবীতে
তুমিই ছিলে সবচেয়ে অজ্ঞাত মানুষ।

তারপর জীবন বদলেছে।

আমাদের দূরত্ব বদলেছে।

অনেক কিছু এমনভাবে ঘটেছে
যা সেই প্রথম দিকের কবিতাগুলো
কল্পনাও করতে পারেনি।

আর কোনো এক সময়ে
পাণ্ডুলিপিটি হারিয়ে গেল।

প্রথম যখন বুঝলাম
সেটি আর খুঁজে পাচ্ছি না,

মনে হয়েছিল
কেউ যেন আমার যৌবনের
একটি অংশ নিয়ে গেছে।

কাগজ তো আবার পাওয়া যায়।

কবিতা আবার লেখা যায়।

কিন্তু যে রাতে
যে বয়সে
যে হৃদয়ে
শব্দগুলো প্রথম এসেছিল-

সেই রাত,
সেই বয়স,
সেই হৃদয় কি ফেরানো যায়?

যায় না।

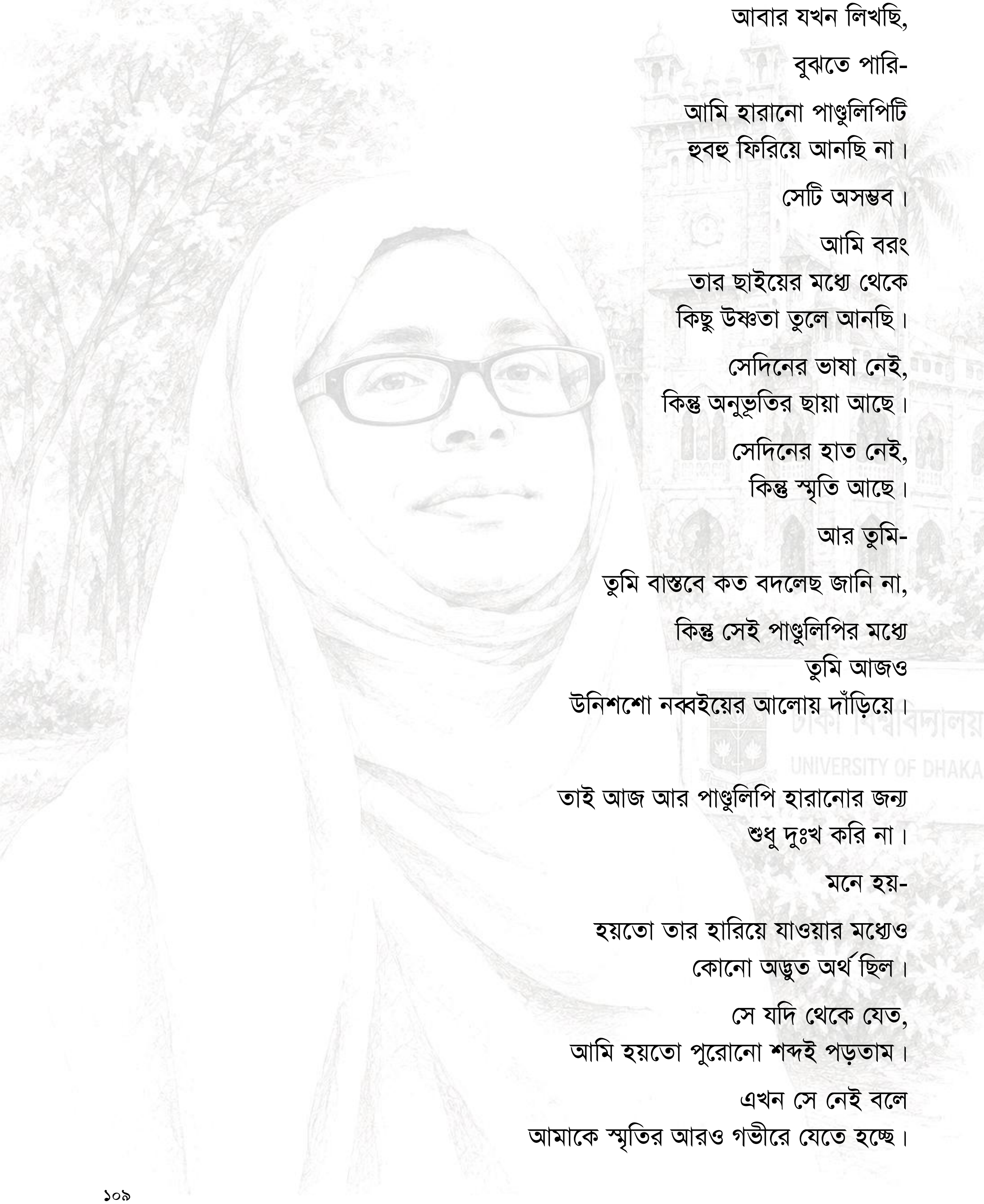

আজ এত বছর পরে
আবার যখন লিখছি,

বুঝতে পারি-

আমি হারানো পাণ্ডুলিপিটি
হুবহু ফিরিয়ে আনছি না।

সেটি অসম্ভব।

আমি বরং
তার ছাইয়ের মধ্যে থেকে
কিছু উষ্ণতা তুলে আনছি।

সেদিনের ভাষা নেই,
কিন্তু অনুভূতির ছায়া আছে।

সেদিনের হাত নেই,
কিন্তু স্মৃতি আছে।

আর তুমি-

তুমি বাস্তবে কত বদলেছ জানি না,

কিন্তু সেই পাণ্ডুলিপির মধ্যে
তুমি আজও
উনিশশো নব্বইয়ের আলোয় দাঁড়িয়ে।

তাই আজ আর পাণ্ডুলিপি হারানোর জন্য
শুধু দুঃখ করি না।

মনে হয়-

হয়তো তার হারিয়ে যাওয়ার মধ্যেও
কোনো অদ্ভুত অর্থ ছিল।

সে যদি থেকে যেত,
আমি হয়তো পুরোনো শব্দই পড়তাম।

এখন সে নেই বলে
আমাকে স্মৃতির আরও গভীরে যেতে হচ্ছে।

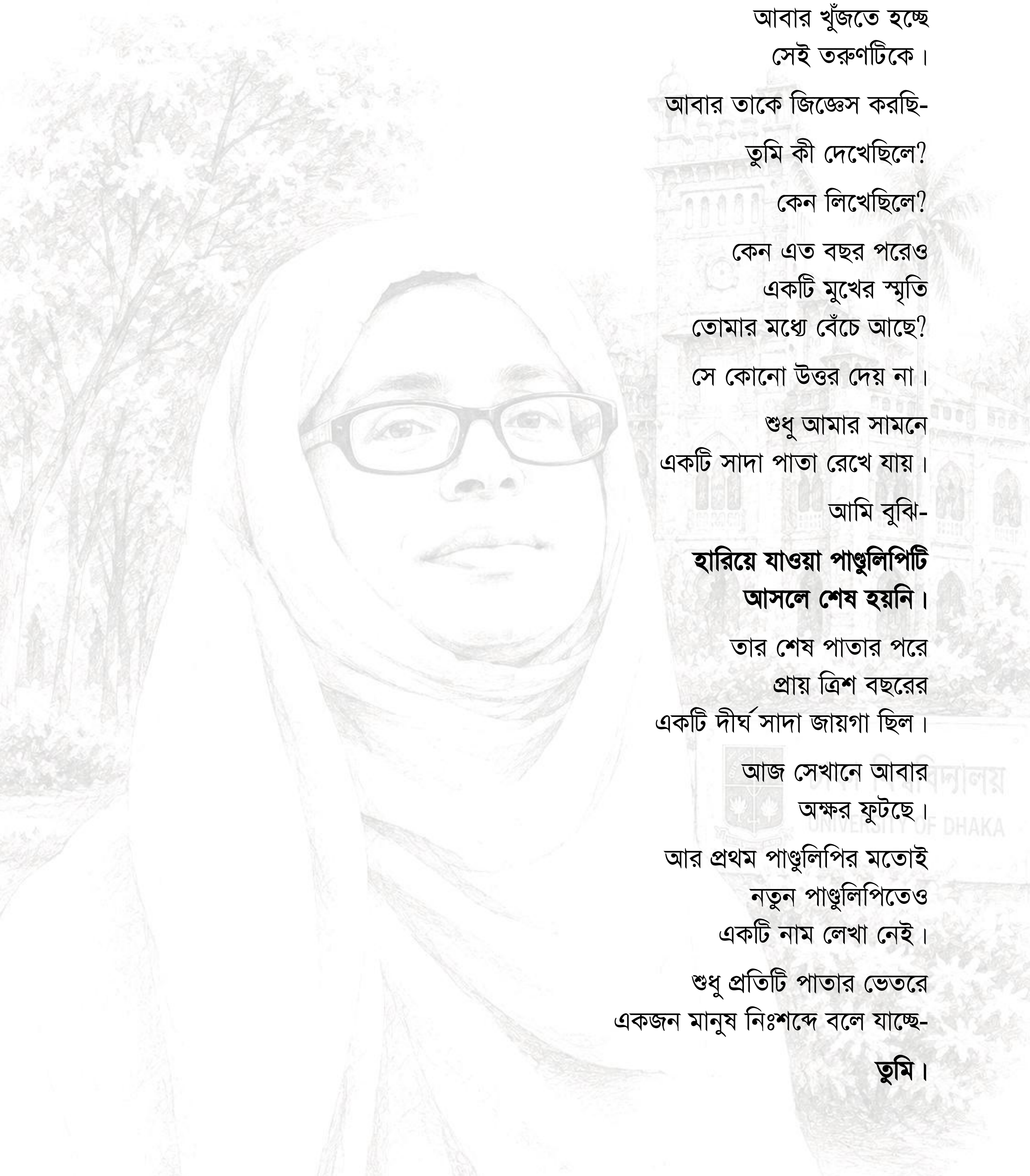

আবার খুঁজতে হচ্ছে
সেই তরুণটিকে।

আবার তাকে জিজ্ঞেস করছি-

তুমি কী দেখেছিলে?

কেন লিখেছিলে?

কেন এত বছর পরেও
একটি মুখের স্মৃতি
তোমার মধ্যে বেঁচে আছে?

সে কোনো উত্তর দেয় না।

শুধু আমার সামনে
একটি সাদা পাতা রেখে যায়।

আমি বুঝি-

হারিয়ে যাওয়া পাণ্ডুলিপিটি
আসলে শেষ হয়নি।

তার শেষ পাতার পরে
প্রায় ত্রিশ বছরের
একটি দীর্ঘ সাদা জায়গা ছিল।

আজ সেখানে আবার
অক্ষর ফুটছে।

আর প্রথম পাণ্ডুলিপির মতোই
নতুন পাণ্ডুলিপিতেও
একটি নাম লেখা নেই।

শুধু প্রতিটি পাতার ভেতরে
একজন মানুষ নিঃশব্দে বলে যাচ্ছে-

তুমি।

পাতার পর পাতায় তুমি

একটি পাতা লিখে
থামতে চেয়েছিলাম।

পারিনি।

দ্বিতীয় পাতায় গেলে
মনে হয়েছিল-

এই তো শেষ।

তারপর তৃতীয়।

চতুর্থ।

কখন যে গুনতে ভুলে গেলাম
জানি না।

শুধু দেখলাম-

পাতার পর পাতায় তুমি।

একই মানুষকে নিয়ে
এত কী লেখা যায়?

আজ প্রশ্নটি সহজ।

তখন উত্তরও সহজ ছিল-

তুমি প্রতিদিন একই ছিলে না।

একদিন তোমার হাসি লিখেছি।

একদিন নীরবতা।

একদিন তোমাকে দেখেছি
রোদের মধ্যে।

আরেকদিন হয়তো
মেঘলা বিকেলে।

একদিন তুমি খুব কাছে দিয়ে গেছ।

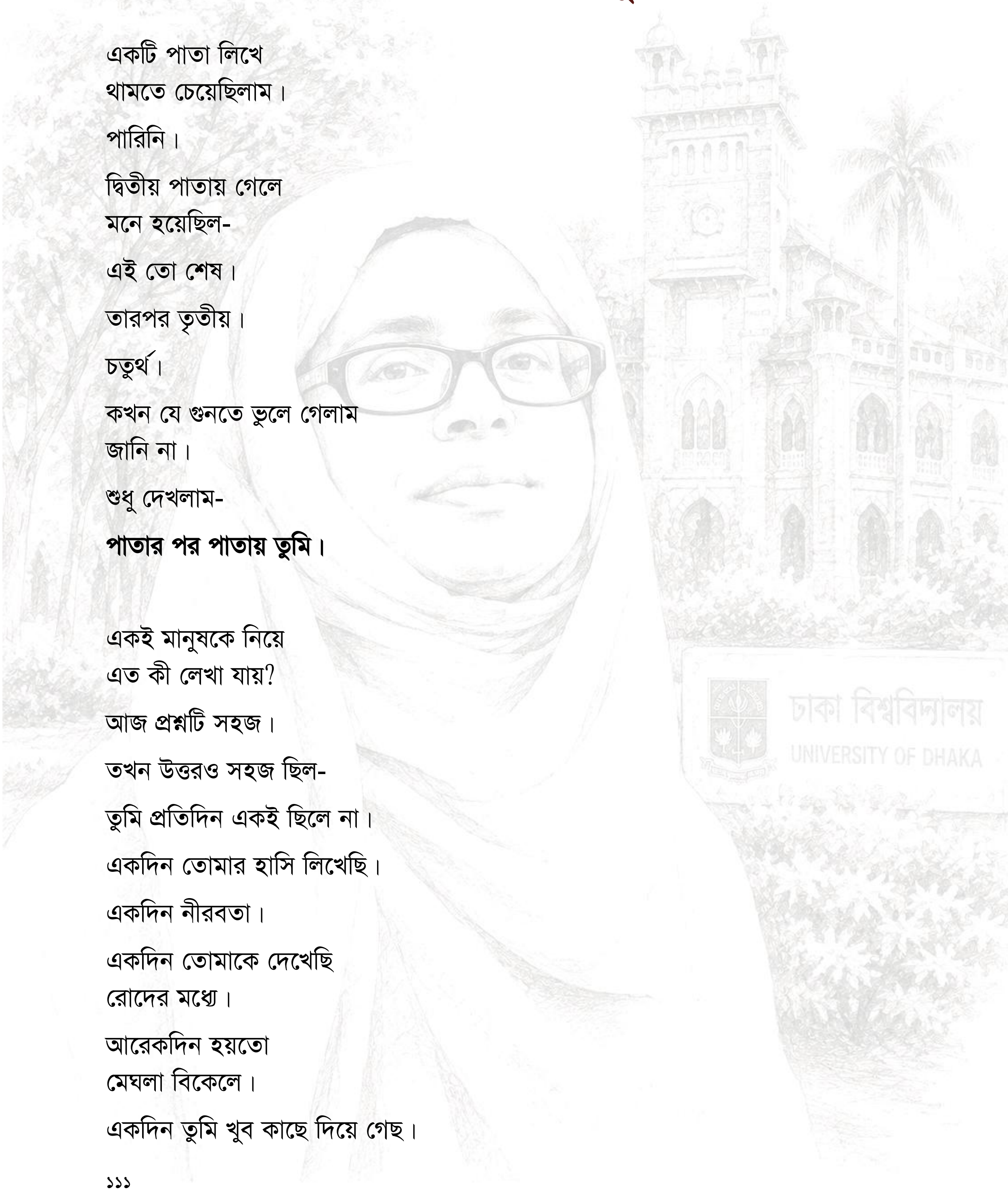

আরেকদিন
সারাদিন তোমাকে দেখিনি।

তোমার উপস্থিতি যেমন কবিতা ছিল,
তোমার অনুপস্থিতিও
কম কবিতা ছিল না।

কখনো একটি পৃষ্ঠা জুড়ে
শুধু অপেক্ষা।

কখনো অভিমান-

যার কোনো অধিকারই ছিল না আমার।

কখনো আনন্দ-

যার কারণ তুমি জানতেই না।

কখনো এমন কথাও লিখেছি
যা বাস্তবে তোমাকে
কোনোদিন বলতে পারতাম না।

কাগজ বড় সহনশীল।

সে প্রশ্ন করে না-

"তোমার অধিকার কী?"

সে বলে না-

"এত আবেগ কেন?"

সে শুধু জায়গা দেয়।

আর আমি
সেই জায়গার মধ্যে
তোমাকে লিখে গেছি।

একদিন হয়তো লিখেছি-

তোমাকে চাই।

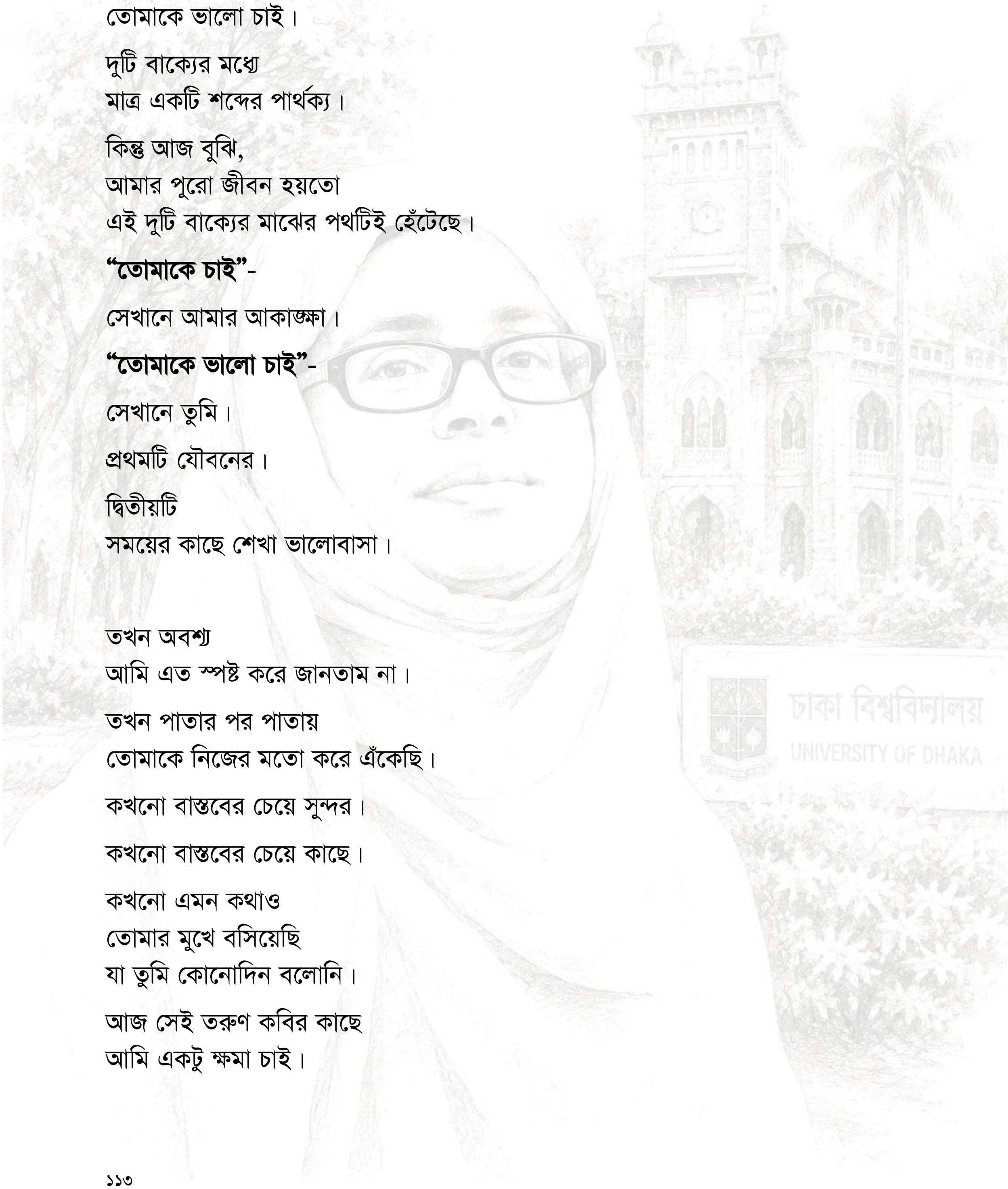

পরদিন সেই শব্দ কেটে দিয়ে লিখেছি-

তোমাকে ভালো চাই।

দুটি বাক্যের মধ্যে
মাত্র একটি শব্দের পার্থক্য।

কিন্তু আজ বুঝি,
আমার পুরো জীবন হয়তো
এই দুটি বাক্যের মাঝের পথটিই হেঁটেছে।

“তোমাকে চাই”-

সেখানে আমার আকাঙ্ক্ষা।

“তোমাকে ভালো চাই”-

সেখানে তুমি।

প্রথমটি যৌবনের।

দ্বিতীয়টি
সময়ের কাছে শেখা ভালোবাসা।

তখন অবশ্য
আমি এত স্পষ্ট করে জানতাম না।

তখন পাতার পর পাতায়
তোমাকে নিজের মতো করে এঁকেছি।

কখনো বাস্তবের চেয়ে সুন্দর।

কখনো বাস্তবের চেয়ে কাছে।

কখনো এমন কথাও
তোমার মুখে বসিয়েছি
যা তুমি কোনোদিন বলোনি।

আজ সেই তরুণ কবির কাছে
আমি একটু ক্ষমা চাই।

কারণ ভালোবাসা মানুষকে
কখনো কখনো কল্পনায়
অন্য মানুষটির হয়ে কথা বলায়।

কিন্তু বাস্তবের তুমি
তোমার নিজের।

তোমার নীরবতার অর্থও
তোমারই।

আজ তাই তোমাকে নিয়ে লিখলেও
তোমার হয়ে কোনো উত্তর লিখতে চাই না।

শুধু আমার অনুভূতিটুকু লিখি।

পাতাগুলো জমেছিল।

কোনো কোনো পাতায়
কালির দাগ।

কোথাও কাটাকাটি।

কোথাও একটি শব্দ
বারবার বদলানো।

কোনো কবিতার পাশে হয়তো
তারিখ লিখেছিলাম।

কোনোটির পাশে কিছুই না।

আজ যদি পাণ্ডুলিপিটি পেতাম,
আমি কি সেই তারিখগুলো দেখে
নিজের জীবন পুনর্গঠন করতে পারতাম?

হয়তো।

বলতে পারতাম-

এই দিনে তাকে দেখেছিলাম।

এই দিনে কথা হয়েছিল।

এই কবিতাটি লিখেছিলাম
তাকে না-দেখার রাতে।

কিন্তু পাণ্ডুলিপি নেই।

তাই এখন তারিখ নয়-
শুধু অনুভূতি দিয়ে
সময় চিনতে হয়।

কী আশ্চর্য-

কাগজে লেখা তুমি হারিয়ে গেছ,
স্মৃতিতে লেখা তুমি রয়ে গেছ।

তাই কখনো মনে হয়
মানুষ ভুল জায়গায়
স্থায়িত্ব খোঁজে।

আমরা ভাবি-

লিখে রাখলে থাকবে।

ছবি তুললে থাকবে।

কাগজ সংরক্ষণ করলে থাকবে।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত
কত দলিল হারায়,
কত ছবি নষ্ট হয়,
কত পাণ্ডুলিপি উধাও হয়ে যায়।

আর একটি সাধারণ বিকেল
মস্তিষ্কের কোনো অদৃশ্য কোণে
চল্লিশ বছর বেঁচে থাকে।

আজ নতুন করে
পাতার পর পাতা লিখছি।

তবে এবার পার্থক্য আছে।

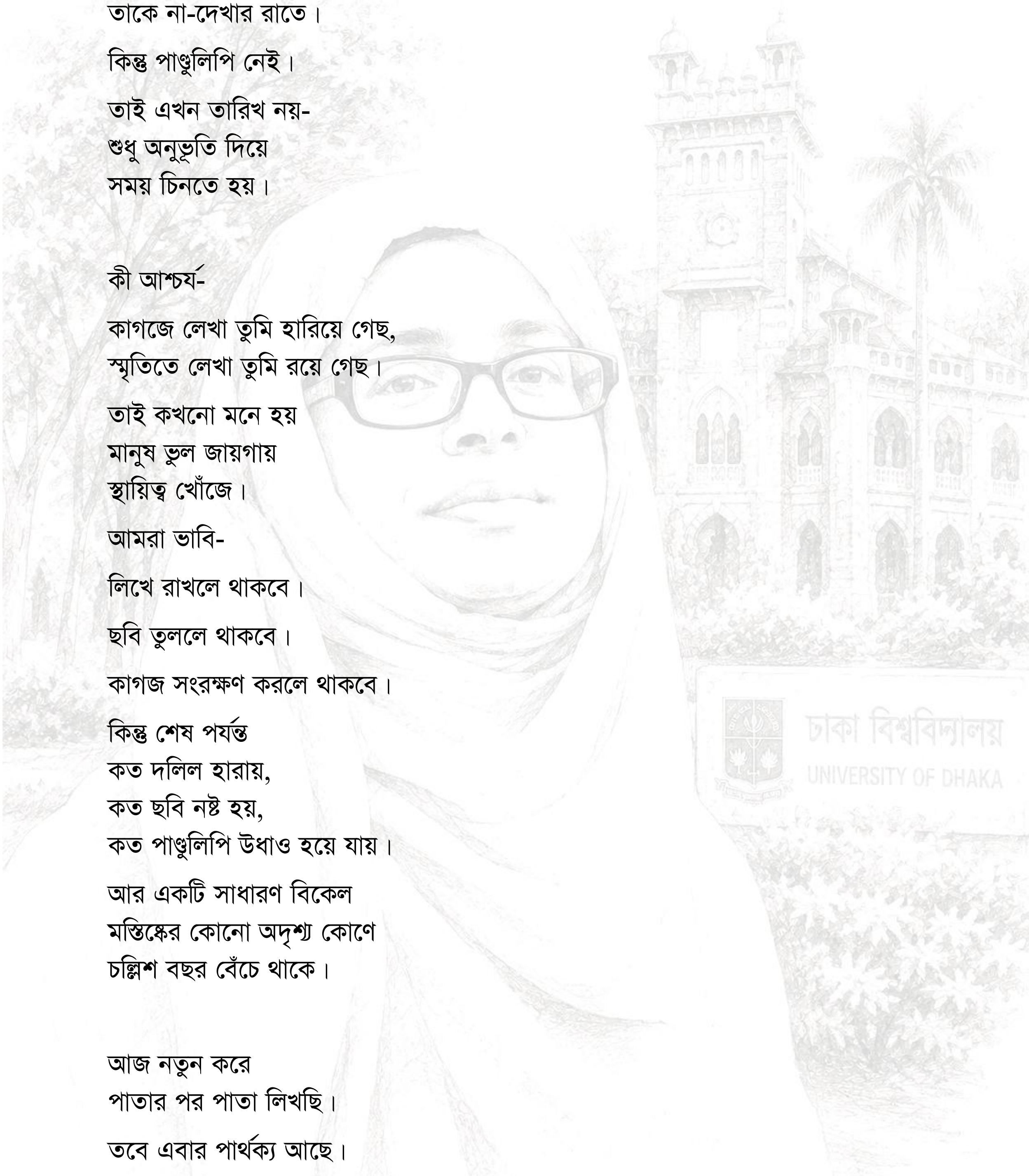

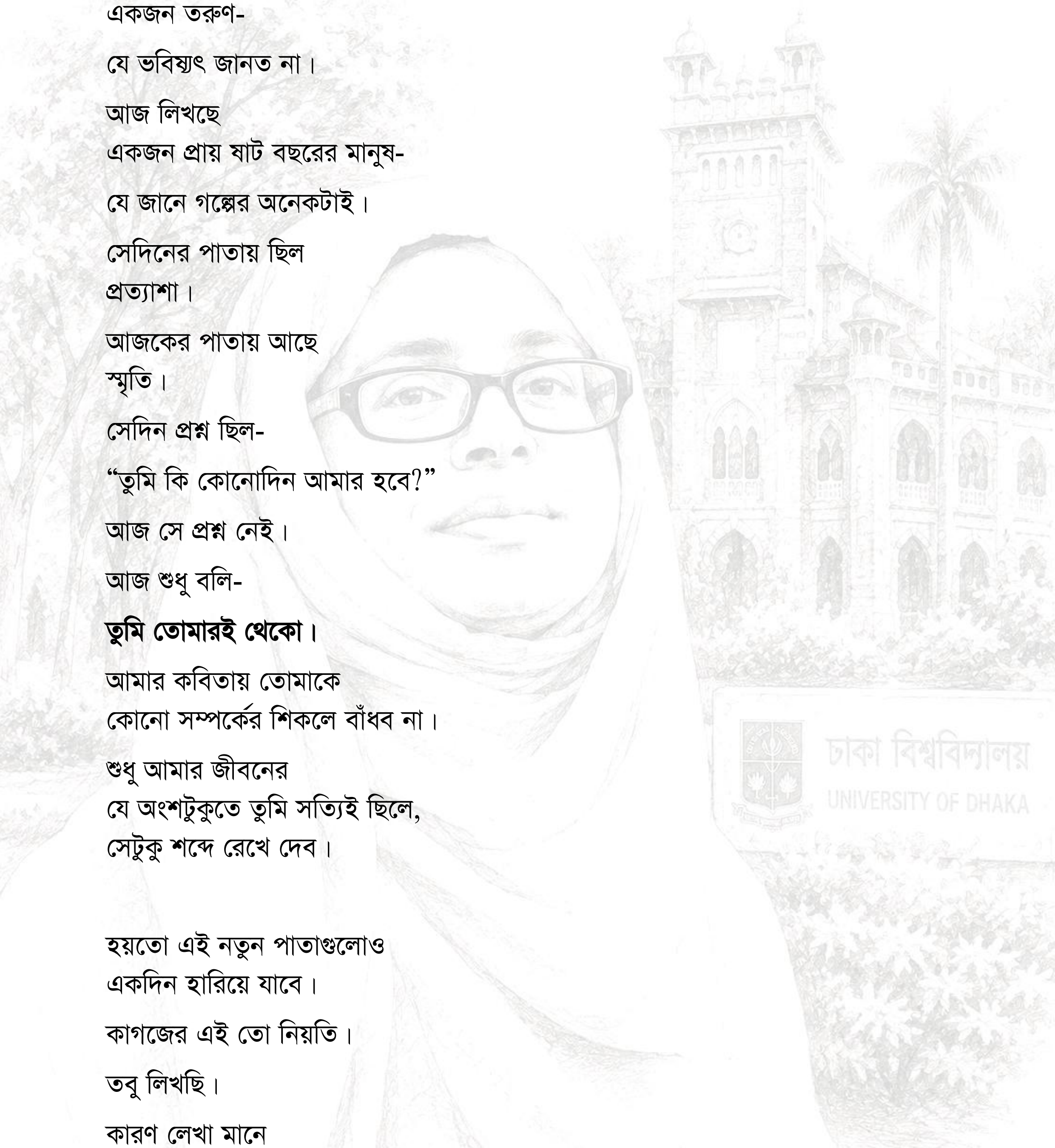

সেদিন লিখেছিল
একজন তরুণ-

যে ভবিষ্যৎ জানত না।

আজ লিখছে
একজন প্রায় ষাট বছরের মানুষ-

যে জানে গল্পের অনেকটাই।

সেদিনের পাতায় ছিল
প্রত্যাশা।

আজকের পাতায় আছে
স্মৃতি।

সেদিন প্রশ্ন ছিল-

"তুমি কি কোনোদিন আমার হবে?"

আজ সে প্রশ্ন নেই।

আজ শুধু বলি-

তুমি তোমারই থেকো।

আমার কবিতায় তোমাকে
কোনো সম্পর্কের শিকলে বাঁধব না।

শুধু আমার জীবনের
যে অংশটুকুতে তুমি সত্যিই ছিলে,
সেটুকু শব্দে রেখে দেব।

হয়তো এই নতুন পাতাগুলোও
একদিন হারিয়ে যাবে।

কাগজের এই তো নিয়তি।

তবু লিখছি।

কারণ লেখা মানে
সবসময় কিছু সংরক্ষণ করা নয়।

কখনো লেখা মানে
নিজের ভেতরের একটি দীর্ঘ নীরবতাকে
একটি ভাষা দেওয়া।

আর আমার সেই নীরবতার
প্রায় প্রতিটি পাতায়-

এখনো তুমি।

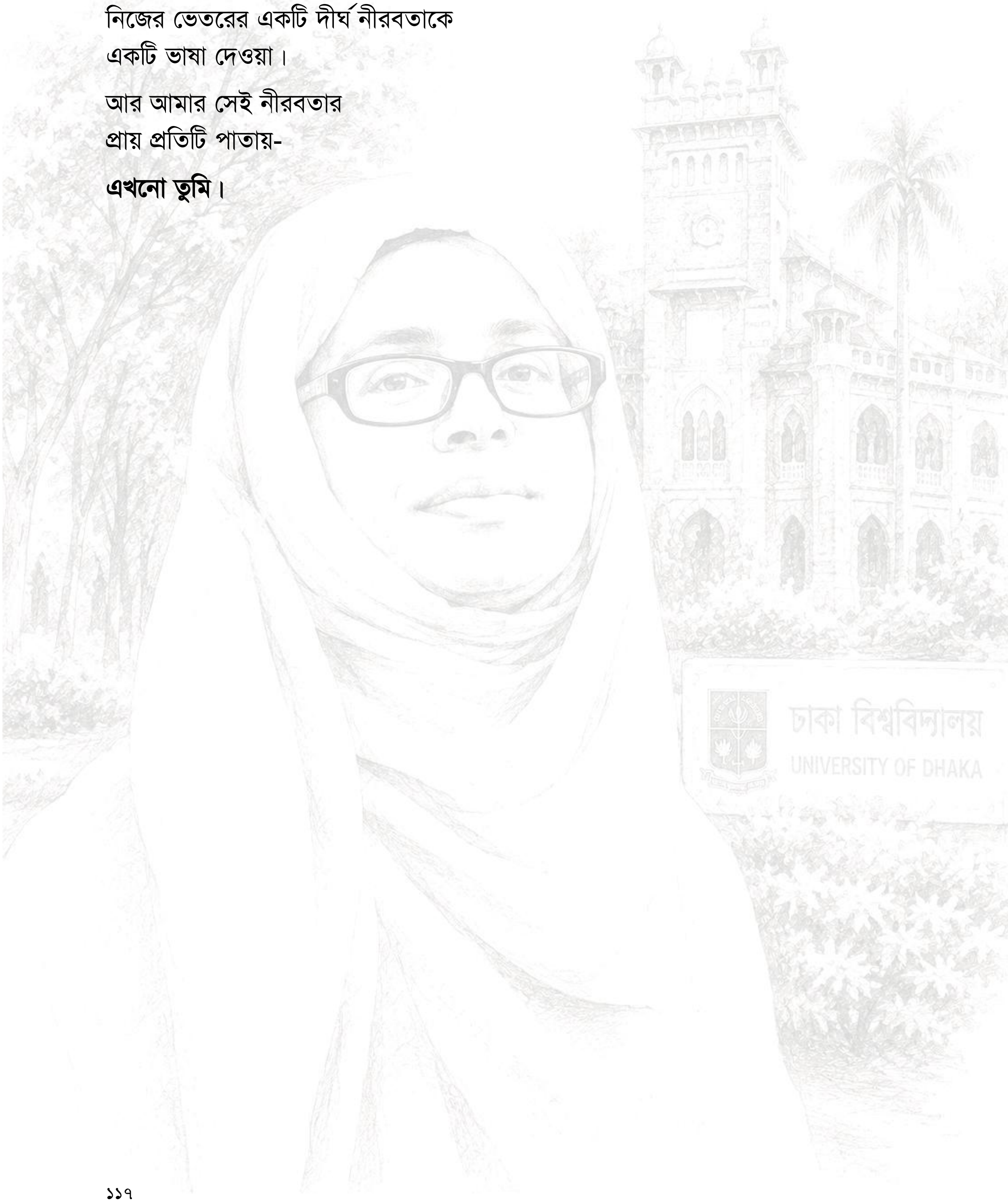

তুমি কি কিছু বুঝেছিলে?

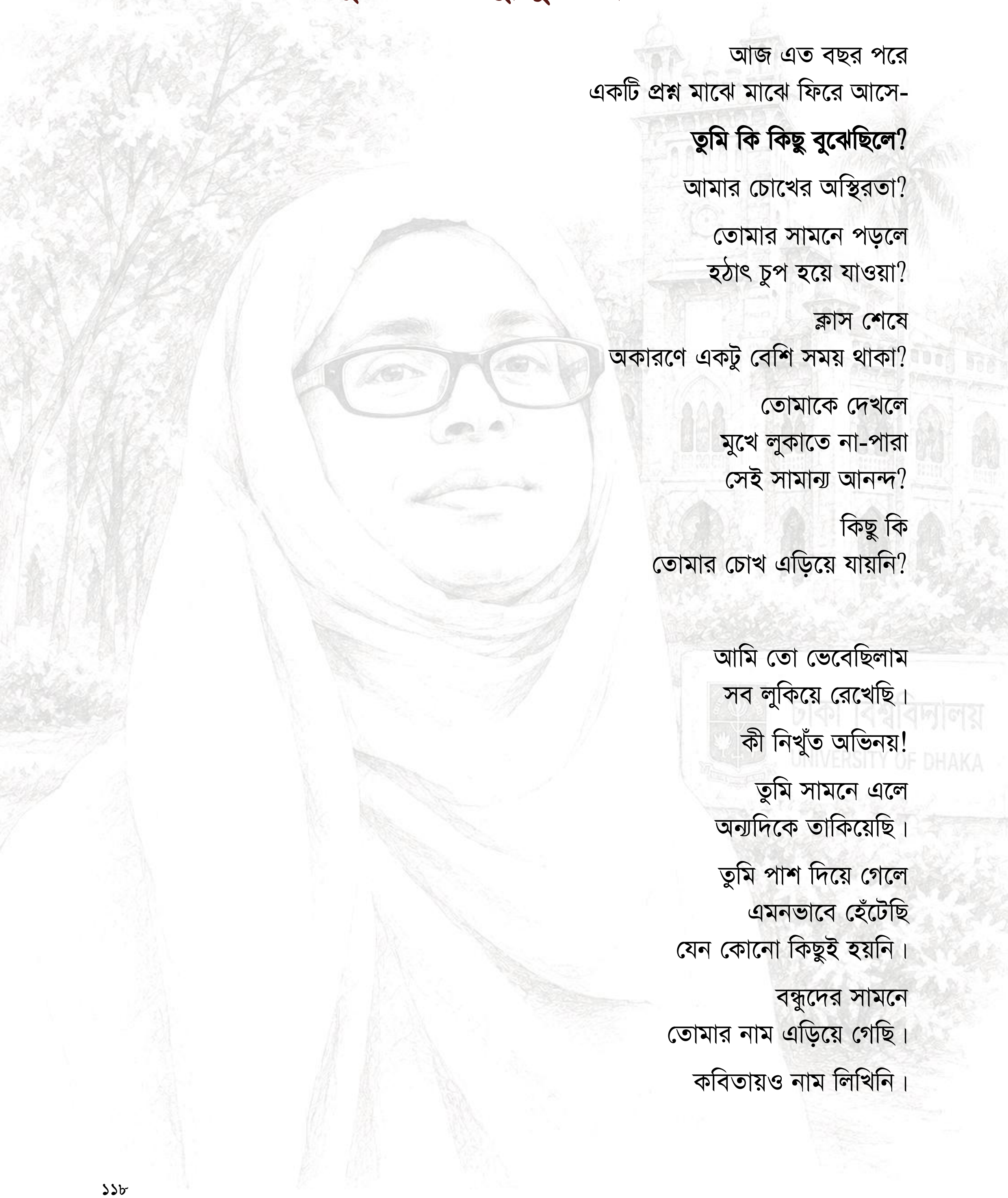

আজ এত বছর পরে
একটি প্রশ্ন মাঝে মাঝে ফিরে আসে-

তুমি কি কিছু বুঝেছিলে?

আমার চোখের অস্থিরতা?

তোমার সামনে পড়লে
হঠাৎ চুপ হয়ে যাওয়া?

ক্লাস শেষে
অকারণে একটু বেশি সময় থাকা?

তোমাকে দেখলে
মুখে লুকাতে না-পারা
সেই সামান্য আনন্দ?

কিছু কি
তোমার চোখ এড়িয়ে যায়নি?

আমি তো ভেবেছিলাম
সব লুকিয়ে রেখেছি।

কী নিখুঁত অভিনয়!

তুমি সামনে এলে
অন্যদিকে তাকিয়েছি।

তুমি পাশ দিয়ে গেলে
এমনভাবে হেঁটেছি
যেন কোনো কিছুই হয়নি।

বন্ধুদের সামনে
তোমার নাম এড়িয়ে গেছি।

কবিতায়ও নাম লিখিনি।

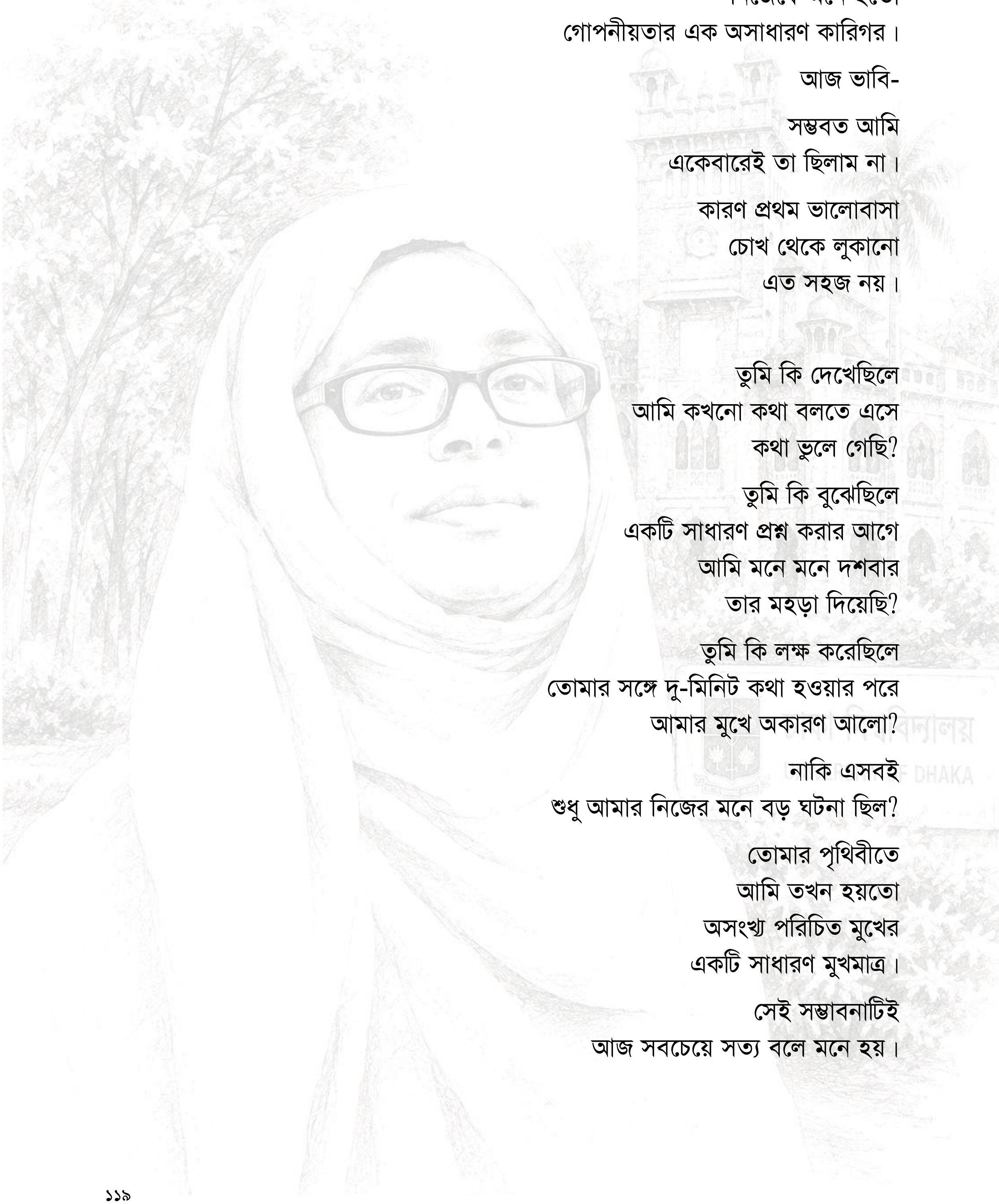

নিজেকে মনে হতো
গোপনীয়তার এক অসাধারণ কারিগর।

আজ ভাবি-

সম্ভবত আমি
একেবারেই তা ছিলাম না।

কারণ প্রথম ভালোবাসা
চোখ থেকে লুকানো
এত সহজ নয়।

তুমি কি দেখেছিলে
আমি কখনো কথা বলতে এসে
কথা ভুলে গেছি?

তুমি কি বুঝেছিলে
একটি সাধারণ প্রশ্ন করার আগে
আমি মনে মনে দশবার
তার মহড়া দিয়েছি?

তুমি কি লক্ষ করেছিলে
তোমার সঙ্গে দু-মিনিট কথা হওয়ার পরে
আমার মুখে অকারণ আলো?

নাকি এসবই
শুধু আমার নিজের মনে বড় ঘটনা ছিল?

তোমার পৃথিবীতে
আমি তখন হয়তো
অসংখ্য পরিচিত মুখের
একটি সাধারণ মুখমাত্র।

সেই সম্ভাবনাটিই
আজ সবচেয়ে সত্য বলে মনে হয়।

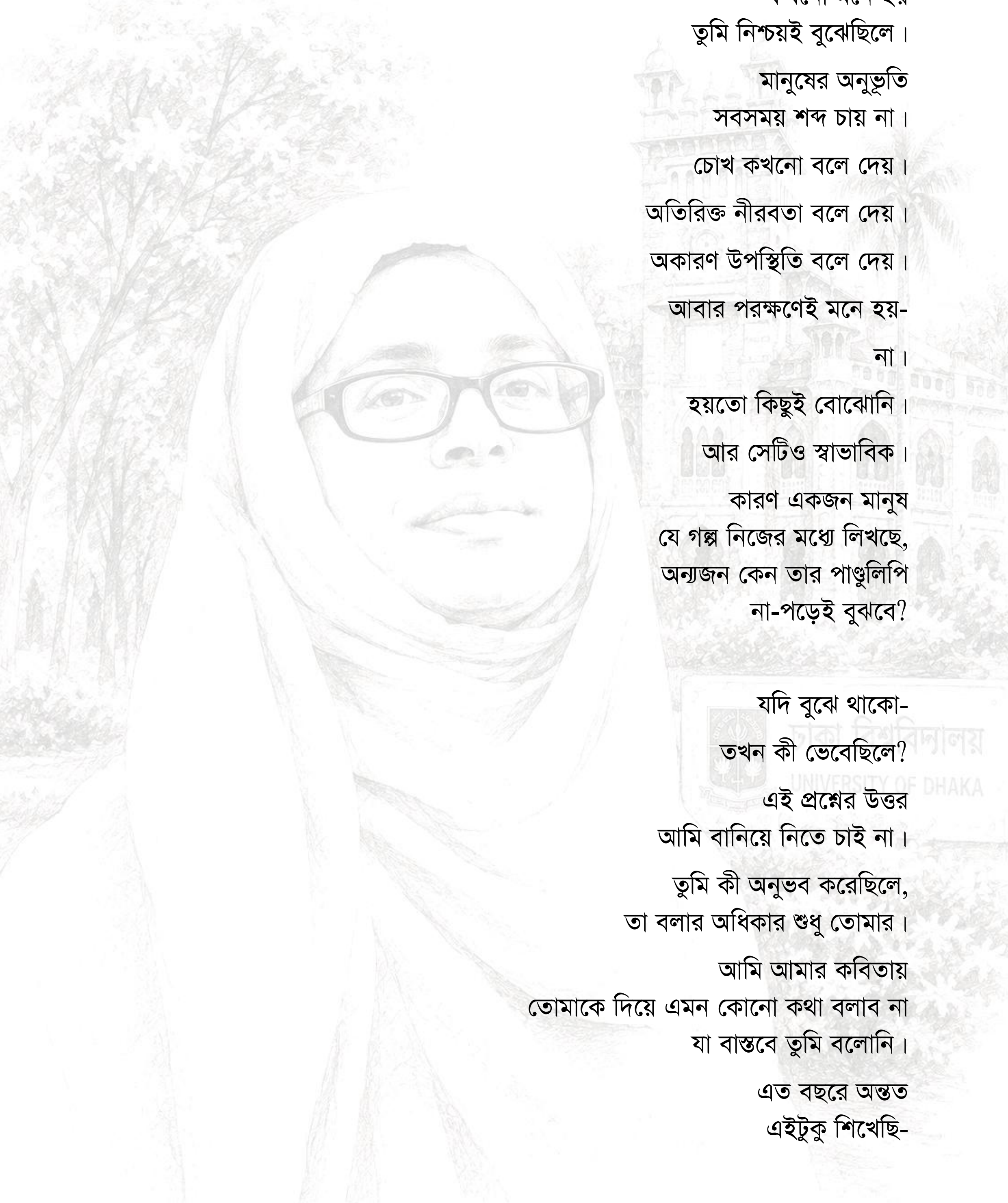

কখনো মনে হয়
তুমি নিশ্চয়ই বুঝেছিলে।

মানুষের অনুভূতি
সবসময় শব্দ চায় না।

চোখ কখনো বলে দেয়।

অতিরিক্ত নীরবতা বলে দেয়।

অকারণ উপস্থিতি বলে দেয়।

আবার পরক্ষণেই মনে হয়-

না।

হয়তো কিছুই বোঝোনি।

আর সেটিও স্বাভাবিক।

কারণ একজন মানুষ
যে গল্প নিজের মধ্যে লিখছে,
অন্যজন কেন তার পাণ্ডুলিপি
না-পড়েই বুঝবে?

যদি বুঝে থাকো-

তখন কী ভেবেছিলে?

এই প্রশ্নের উত্তর
আমি বানিয়ে নিতে চাই না।

তুমি কী অনুভব করেছিলে,
তা বলার অধিকার শুধু তোমার।

আমি আমার কবিতায়
তোমাকে দিয়ে এমন কোনো কথা বলাব না
যা বাস্তবে তুমি বলোনি।

এত বছরে অন্তত
এইটুকু শিখেছি-

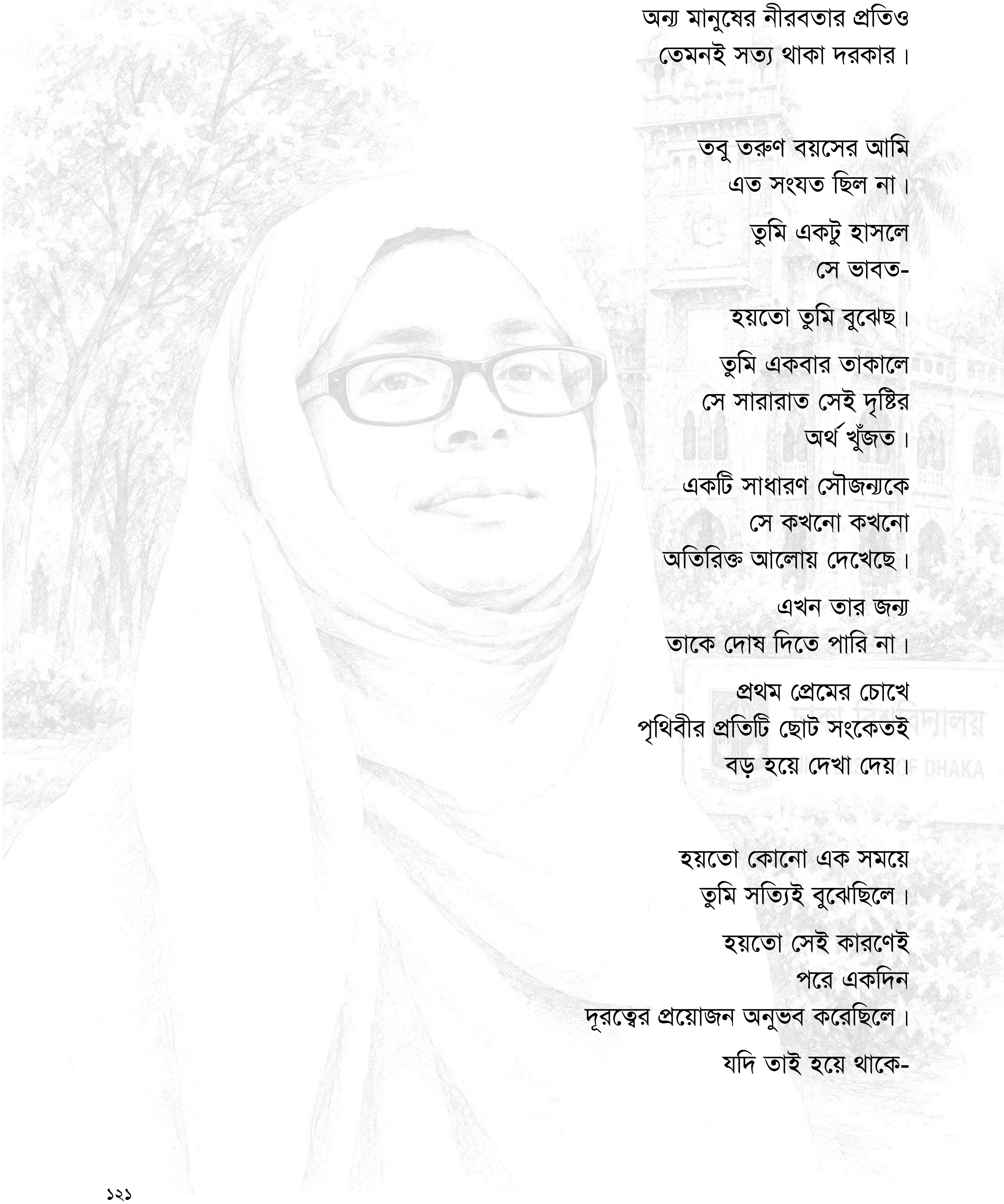

স্মৃতির প্রতি যেমন সত্য থাকা দরকার,
অন্য মানুষের নীরবতার প্রতিও
তেমনই সত্য থাকা দরকার।

তবু তরুণ বয়সের আমি
এত সংযত ছিল না।

তুমি একটু হাসলে
সে ভাবত-

হয়তো তুমি বুঝেছ।

তুমি একবার তাকালে
সে সারারাত সেই দৃষ্টির
অর্থ খুঁজত।

একটি সাধারণ সৌজন্যকে
সে কখনো কখনো
অতিরিক্ত আলোয় দেখেছে।

এখন তার জন্য
তাকে দোষ দিতে পারি না।

প্রথম প্রেমের চোখে
পৃথিবীর প্রতিটি ছোট সংকেতই
বড় হয়ে দেখা দেয়।

হয়তো কোনো এক সময়ে
তুমি সত্যিই বুঝেছিলে।

হয়তো সেই কারণেই
পরে একদিন
দূরত্বের প্রয়োজন অনুভব করেছিলে।

যদি তাই হয়ে থাকে-

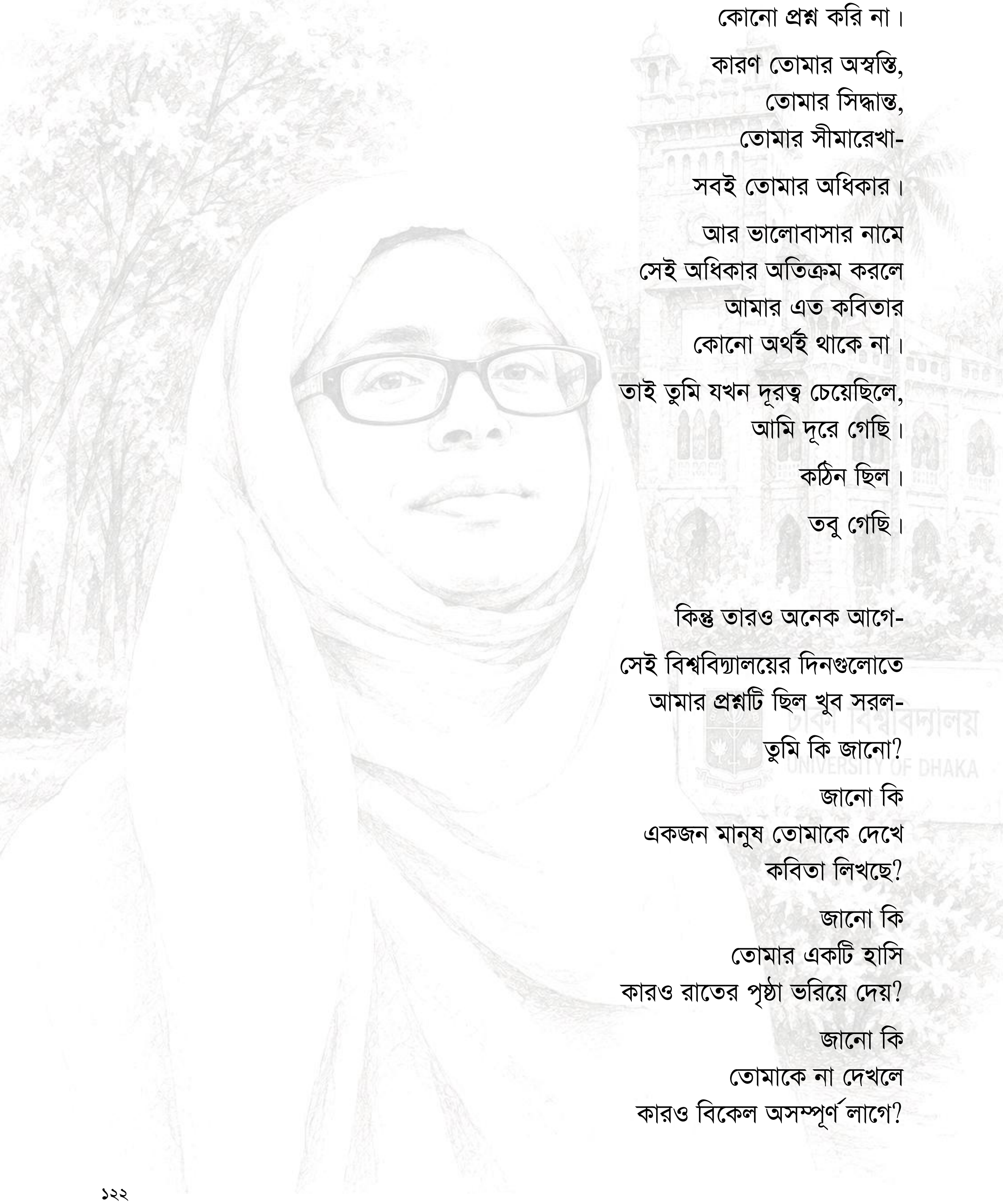

আজ আমি তোমাকে
কোনো প্রশ্ন করি না।

কারণ তোমার অস্বস্তি,
তোমার সিদ্ধান্ত,
তোমার সীমারেখা-

সবই তোমার অধিকার।

আর ভালোবাসার নামে
সেই অধিকার অতিক্রম করলে
আমার এত কবিতার
কোনো অর্থই থাকে না।

তাই তুমি যখন দূরত্ব চেয়েছিলে,
আমি দূরে গেছি।

কঠিন ছিল।

তবু গেছি।

কিন্তু তারও অনেক আগে-

সেই বিশ্ববিদ্যালয়ের দিনগুলোতে
আমার প্রশ্নটি ছিল খুব সরল-

তুমি কি জানো?
জানো কি
একজন মানুষ তোমাকে দেখে
কবিতা লিখছে?

জানো কি
তোমার একটি হাসি
কারও রাতের পৃষ্ঠা ভরিয়ে দেয়?

জানো কি
তোমাকে না দেখলে
কারও বিকেল অসম্পূর্ণ লাগে?

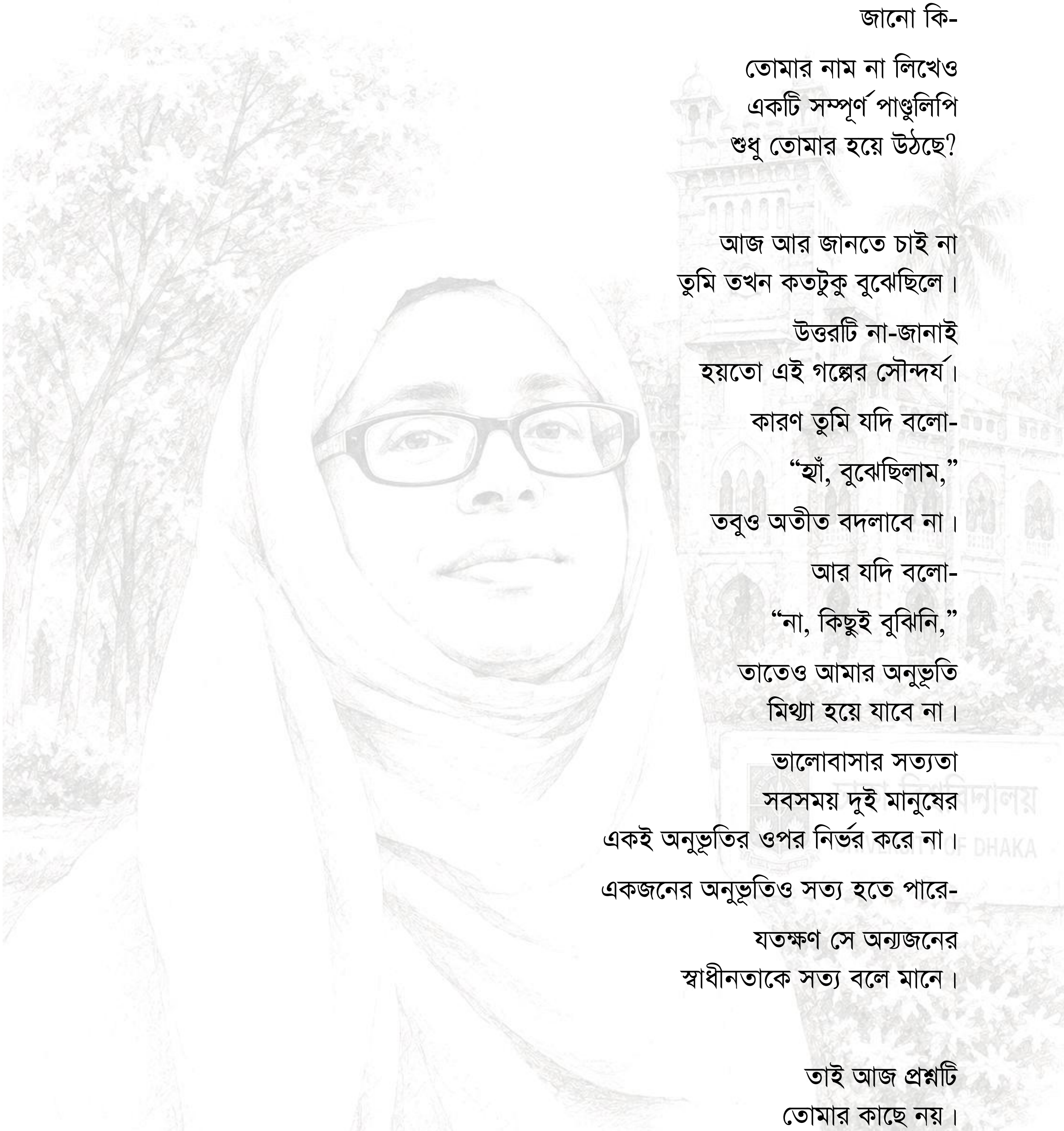

জানো কি-

তোমার নাম না লিখেও
একটি সম্পূর্ণ পাণ্ডুলিপি
শুধু তোমার হয়ে উঠছে?

আজ আর জানতে চাই না
তুমি তখন কতটুকু বুঝেছিলে।

উত্তরটি না-জানাই
হয়তো এই গল্পের সৌন্দর্য।

কারণ তুমি যদি বলো-

"হ্যাঁ, বুঝেছিলাম,"

তবুও অতীত বদলাবে না।

আর যদি বলো-

"না, কিছুই বুঝিনি,"

তাতেও আমার অনুভূতি
মিথ্যা হয়ে যাবে না।

ভালোবাসার সত্যতা
সবসময় দুই মানুষের
একই অনুভূতির ওপর নির্ভর করে না।

একজনের অনুভূতিও সত্য হতে পারে-

যতক্ষণ সে অন্যজনের
স্বাধীনতাকে সত্য বলে মানে।

তাই আজ প্রশ্নটি
তোমার কাছে নয়।

আমি প্রশ্ন করি
উনিশশো নব্বইয়ের সেই তরুণটিকে-

“তুমি কি চেয়েছিলে
সে বুঝুক?”

সে হয়তো কিছুক্ষণ চুপ থেকে বলবে-

“চেয়েছিলাম।

আবার ভয়ও পেয়েছিলাম।”

“কেন?”

“কারণ সে বুঝে ফেললে
আমাকে উত্তর দিতে হতো
একটি আরও বড় প্রশ্নের।”

“কোন প্রশ্ন?”

সে মাথা নিচু করবে।

তারপর খুব আস্তে বলবে-

“আমি কি সত্যিই তাকে ভালোবাসি?”

আমি আজকের বয়স থেকে
তার দিকে তাকিয়ে থাকব।

উত্তর দেব না।

কারণ পরের অধ্যায়ে
সেই উত্তরটি
তাকেই খুঁজে পেতে হবে।

ভালোবাসি-বলতে পারিনি

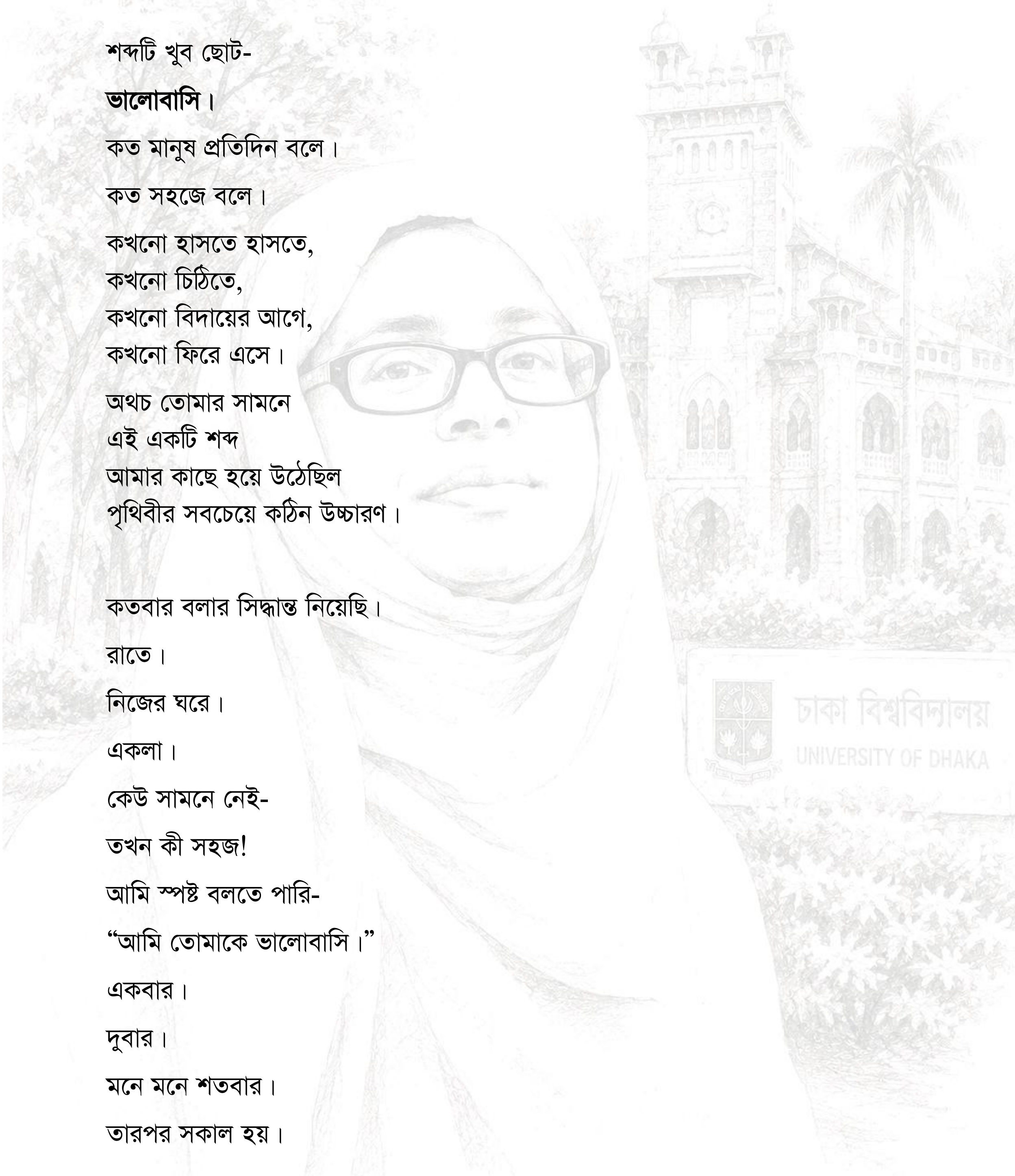

শব্দটি খুব ছোট-

ভালোবাসি।

কত মানুষ প্রতিদিন বলে।

কত সহজে বলে।

কখনো হাসতে হাসতে,
কখনো চিঠিতে,
কখনো বিদায়ের আগে,
কখনো ফিরে এসে।

অথচ তোমার সামনে
এই একটি শব্দ
আমার কাছে হয়ে উঠেছিল
পৃথিবীর সবচেয়ে কঠিন উচ্চারণ।

কতবার বলার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।

রাতে।

নিজের ঘরে।

একলা।

কেউ সামনে নেই-

তখন কী সহজ!

আমি স্পষ্ট বলতে পারি-

"আমি তোমাকে ভালোবাসি।"

একবার।

দুবার।

মনে মনে শতবার।

তারপর সকাল হয়।

বিশ্ববিদ্যালয়ে যাই।

তুমি সামনে আসো।

আর সেই একই বাক্য
হঠাৎ এত ভারী হয়ে যায়
যে আমার কণ্ঠ
তাকে বহন করতে পারে না।

কেন বলতে পারিনি?

শুধু ভয়?

প্রত্যাখ্যানের ভয় নিশ্চয়ই ছিল।

তুমি যদি বলো-

"না"?

তাহলে?

তোমাকে দেখার
এই ছোট ছোট আনন্দগুলোও
কি হারিয়ে যাবে?

তোমার পাশ দিয়ে
স্বাভাবিকভাবে হাঁটার সুযোগটুকুও
কি থাকবে না?

এই ভয় আমাকে থামিয়েছে।

কিন্তু শুধু এই ভয় নয়।

আরেকটি প্রশ্নও ছিল-

আমি বললে
তোমাকে কি উত্তর দিতেই হবে?

আমার একটি অনুভূতি
তোমার ওপর কি
একটি সিদ্ধান্তের বোঝা হয়ে যাবে?

তখন হয়তো
এত সুন্দর ভাষায় ভাবিনি।

শুধু অনুভব করেছিলাম-

তাড়াহুড়া করতে চাই না।

তাই ‘ভালোবাসি’ শব্দটি
কাগজে গেছে।

তোমার কাছে যায়নি।

কখনো লিখেছি সরাসরি।

তারপর কেটে দিয়েছি।

কখনো উপমার আড়ালে রেখেছি।

কখনো লিখেছি-

তোমাকে দেখলে ভালো লাগে।

কখনো-

তোমাকে না দেখলে দিন ফাঁকা।

কখনো-

তোমার সুখ চাই।

সবই বলেছি।

শুধু মূল কথাটি ছাড়া।

যেন একটি নদী
সমুদ্রের খুব কাছে এসে
বারবার দিক বদলে ফেলছে।

একদিন হয়তো সুযোগ ছিল।

তুমি সামনে।

চারপাশে খুব বেশি মানুষ নেই।

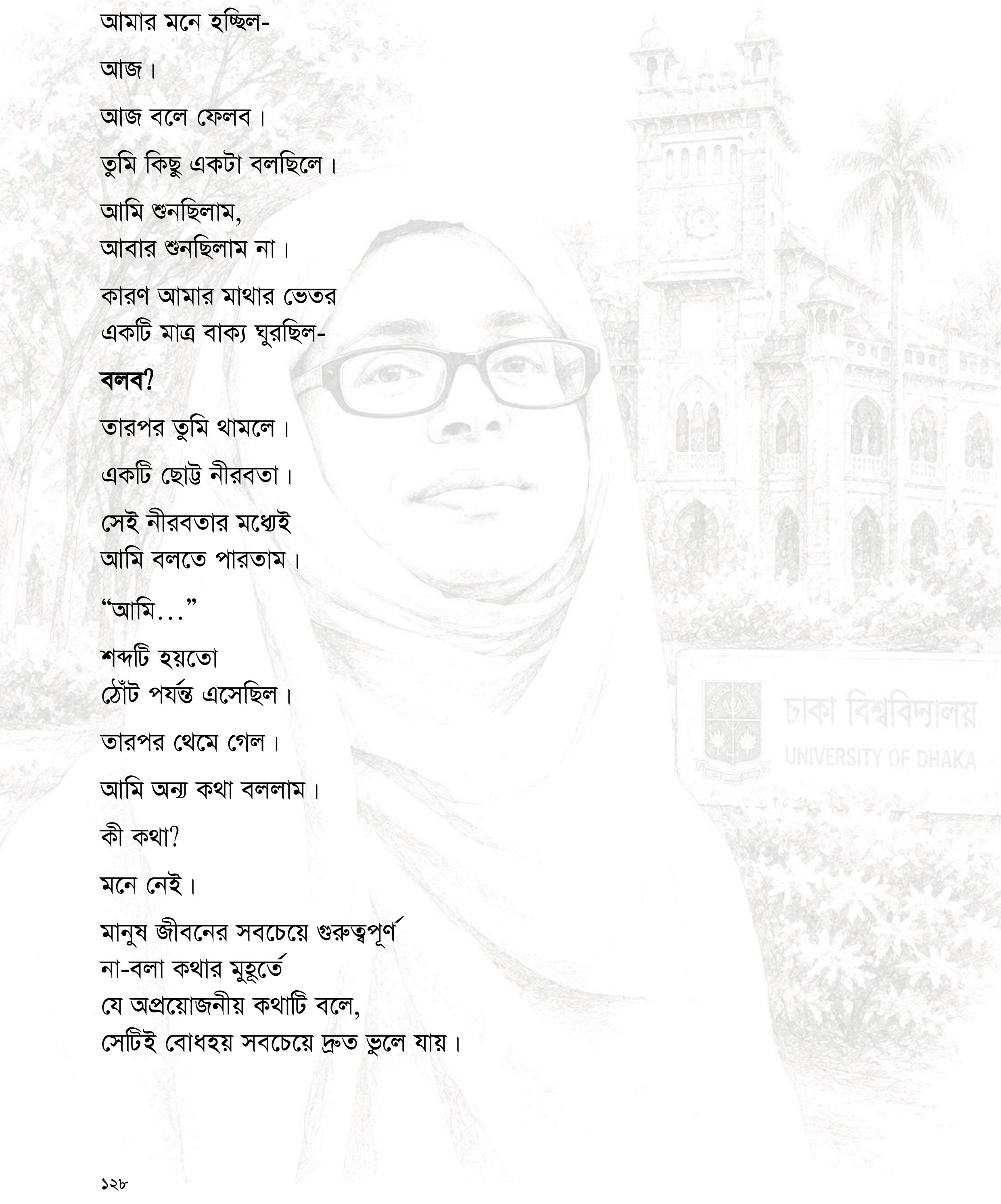

কথাও হচ্ছিল।

আমার মনে হচ্ছিল-

আজ।

আজ বলে ফেলব।

তুমি কিছু একটা বলছিলে।

আমি শুনছিলাম,
আবার শুনছিলাম না।

কারণ আমার মাথার ভেতর
একটি মাত্র বাক্য ঘুরছিল-

বলব?

তারপর তুমি থামলে।

একটি ছোট্ট নীরবতা।

সেই নীরবতার মধ্যেই
আমি বলতে পারতাম।

"আমি..."

শব্দটি হয়তো
ঠোঁট পর্যন্ত এসেছিল।

তারপর থেমে গেল।

আমি অন্য কথা বললাম।

কী কথা?

মনে নেই।

মানুষ জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ
না-বলা কথার মুহূর্তে
যে অপ্রয়োজনীয় কথাটি বলে,
সেটিই বোধহয় সবচেয়ে দ্রুত ভুলে যায়।

তুমি চলে গেলে।

আমি নিজের ওপর রাগ করলাম।

কেন বললাম না?

আর কতদিন?

পরেরবার বলব।

নিশ্চয়ই বলব।

কিন্তু পরেরবারও
একই ঘটনা।

তারপর আরও একবার।

এভাবে ‘পরেরবার’
আমার জীবনের সবচেয়ে দীর্ঘ
অসমাপ্ত প্রতিশ্রুতিগুলোর একটি হয়ে গেল।

আজ এত বছর পরে
আমি কি অনুতপ্ত?

প্রশ্নটি সহজ নয়।

আমার একটি অংশ বলে-

বললে কী ক্ষতি হতো?

অন্তত তুমি জানতে।

হারিয়ে যাওয়া পাণ্ডুলিপির
হাজার পঙ্‌ক্তির বদলে
মাত্র একটি বাক্যই তো যথেষ্ট ছিল।

আমি তোমাকে ভালোবাসি।

কিন্তু আমার আরেকটি অংশ বলে-

না-বলাটিও
আমাদের গল্পের অংশ।

সেই নীরবতা না থাকলে
এই কবিতাগুলো কি জন্মাত?

কে জানে।

তবে একটি কথা আজ স্পষ্ট-

ভালোবাসি বলা মানে
কাউকে পাওয়া নয়।

এটি কোনো দাবি নয়।

কোনো চুক্তিও নয়।

একজন মানুষ বলতে পারে-

আমি তোমাকে ভালোবাসি।

অন্যজন বলতে পারে-

আমি তোমাকে ভালোবাসি না।

দুটি বাক্যই সত্য হতে পারে।

দুটি সত্য পাশাপাশি থেকেও
কেউ অপরাধী হয় না।

এই সহজ জ্ঞানটি
তখন যদি থাকত!

হয়তো প্রত্যাখ্যানকে
এত ভয় পেতাম না।

হয়তো বুঝতাম-

তোমার ‘না’
আমার অনুভূতিকে অপমান করে না;

যেমন আমার ‘ভালোবাসি’
তোমাকে ‘হ্যাঁ’ বলতে বাধ্য করে না।

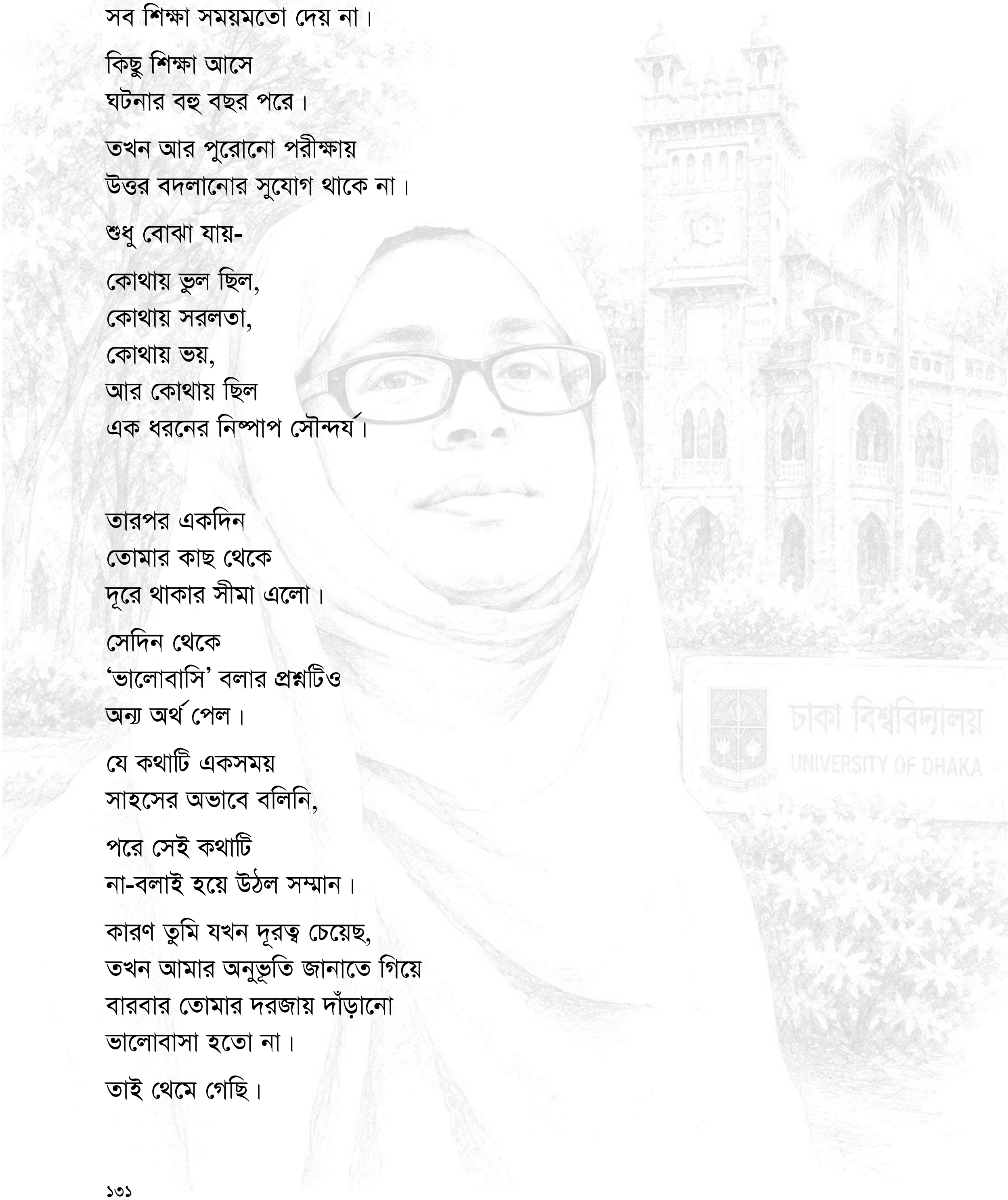

কিন্তু জীবন
সব শিক্ষা সময়মতো দেয় না।

কিছু শিক্ষা আসে
ঘটনার বহু বছর পরে।

তখন আর পুরোনো পরীক্ষায়
উত্তর বদলানোর সুযোগ থাকে না।

শুধু বোঝা যায়-

কোথায় ভুল ছিল,
কোথায় সরলতা,
কোথায় ভয়,
আর কোথায় ছিল
এক ধরনের নিষ্পাপ সৌন্দর্য।

তারপর একদিন
তোমার কাছ থেকে
দূরে থাকার সীমা এলো।

সেদিন থেকে
'ভালোবাসি' বলার প্রশ্নটিও
অন্য অর্থ পেল।

যে কথাটি একসময়
সাহসের অভাবে বলিনি,

পরে সেই কথাটি
না-বলাই হয়ে উঠল সম্মান।

কারণ তুমি যখন দূরত্ব চেয়েছ,
তখন আমার অনুভূতি জানাতে গিয়ে
বারবার তোমার দরজায় দাঁড়ানো
ভালোবাসা হতো না।

তাই থেমে গেছি।

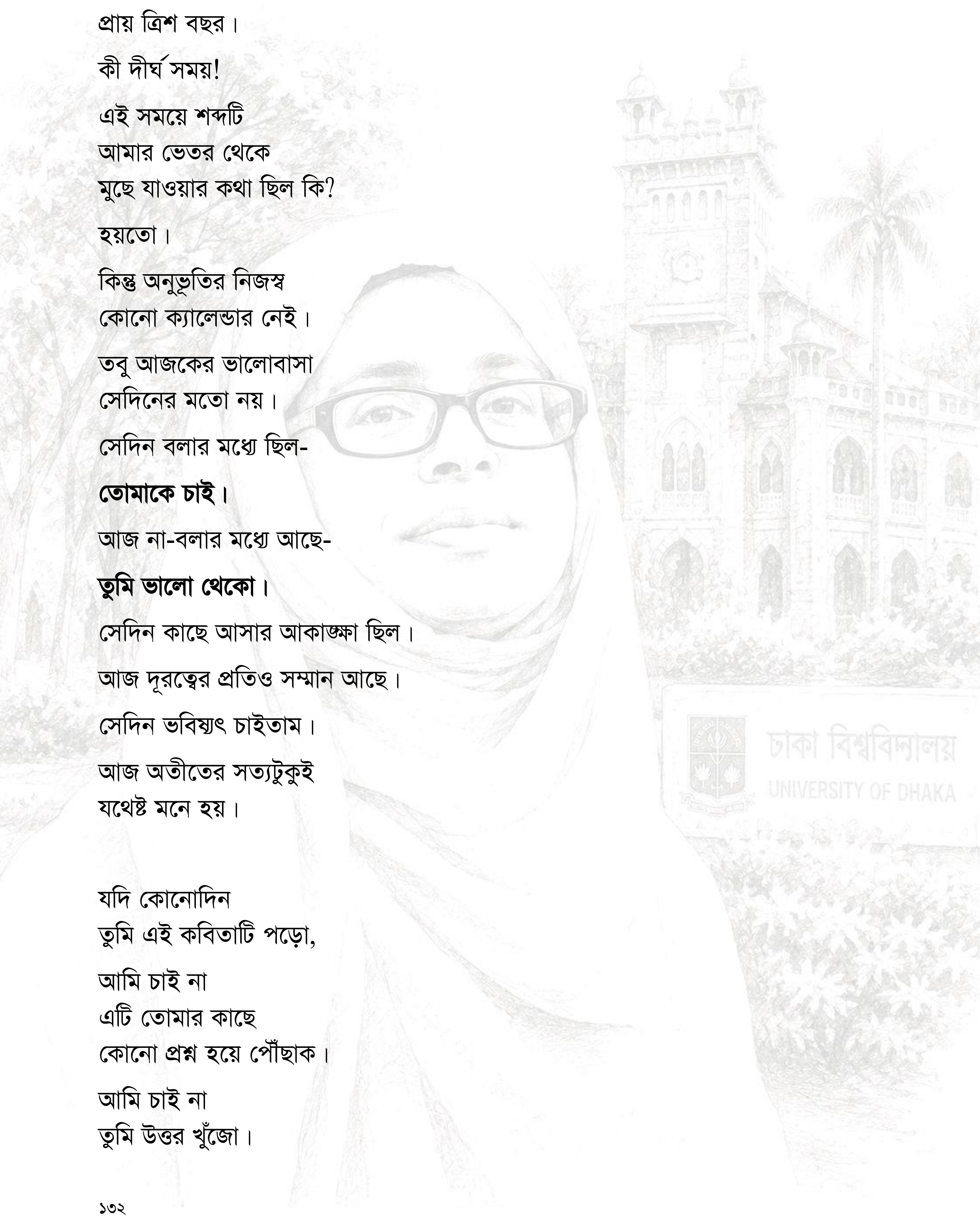

প্রায় ত্রিশ বছর।

কী দীর্ঘ সময়!

এই সময়ে শব্দটি
আমার ভেতর থেকে
মুছে যাওয়ার কথা ছিল কি?

হয়তো।

কিন্তু অনুভূতির নিজস্ব
কোনো ক্যালেন্ডার নেই।

তবু আজকের ভালোবাসা
সেদিনের মতো নয়।

সেদিন বলার মধ্যে ছিল-

তোমাকে চাই।

আজ না-বলার মধ্যে আছে-

তুমি ভালো থেকো।

সেদিন কাছে আসার আকাঙ্ক্ষা ছিল।

আজ দূরত্বের প্রতিও সম্মান আছে।

সেদিন ভবিষ্যৎ চাইতাম।

আজ অতীতের সত্যটুকুই
যথেষ্ট মনে হয়।

যদি কোনোদিন
তুমি এই কবিতাটি পড়ো,

আমি চাই না
এটি তোমার কাছে
কোনো প্রশ্ন হয়ে পৌঁছাক।

আমি চাই না
তুমি উত্তর খুঁজো।

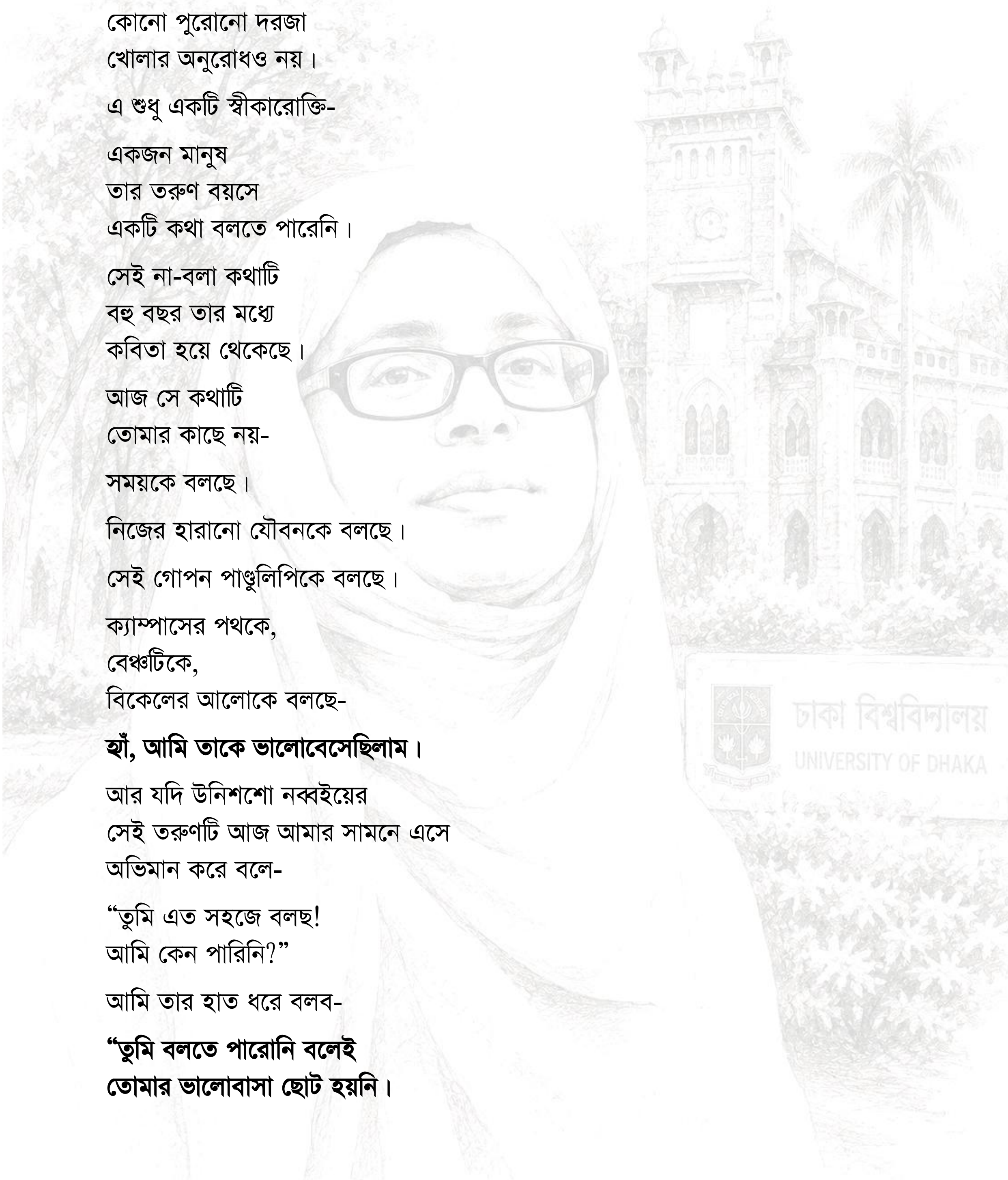

এটি কোনো নতুন প্রস্তাব নয়।

কোনো পুরোনো দরজা
খোলার অনুরোধও নয়।

এ শুধু একটি স্বীকারোক্তি-

একজন মানুষ
তার তরুণ বয়সে
একটি কথা বলতে পারেনি।

সেই না-বলা কথাটি
বহু বছর তার মধ্যে
কবিতা হয়ে থেকেছে।

আজ সে কথাটি
তোমার কাছে নয়-

সময়কে বলছে।

নিজের হারানো যৌবনকে বলছে।

সেই গোপন পাণ্ডুলিপিকে বলছে।

ক্যাম্পাসের পথকে,
বেঞ্চটিকে,
বিকেলের আলোকে বলছে-

হ্যাঁ, আমি তাকে ভালোবেসেছিলাম।

আর যদি উনিশশো নব্বইয়ের
সেই তরুণটি আজ আমার সামনে এসে
অভিমান করে বলে-

“তুমি এত সহজে বলছ!
আমি কেন পারিনি?”

আমি তার হাত ধরে বলব-

**“তুমি বলতে পারোনি বলেই
তোমার ভালোবাসা ছোট হয়নি।**

কিছু 'ভালোবাসি'
মানুষের মুখ থেকে বেরোয়,
কিছু চিঠিতে পৌঁছায়,
কিছু উত্তর পায়-

আর কিছু 'ভালোবাসি'
সারাজীবন উচ্চারিত না হয়েও
একজন মানুষের সমস্ত কবিতার মধ্যে
নিঃশব্দে উচ্চারিত হতে থাকে।"

তোমাকে সেই কথাটি
আমি তখন বলতে পারিনি।

আজও তোমার সামনে দাঁড়িয়ে
বলতে যাচ্ছি না।

শুধু আমার কবিতার কাছে
এত বছর পরে স্বীকার করছি-

যে শব্দটি মুখে বলতে পারিনি,
আমার হারিয়ে যাওয়া পাণ্ডুলিপির
প্রতিটি পাতাই আসলে
সেই একটি শব্দের দীর্ঘ উচ্চারণ ছিল-

ভালোবাসি।

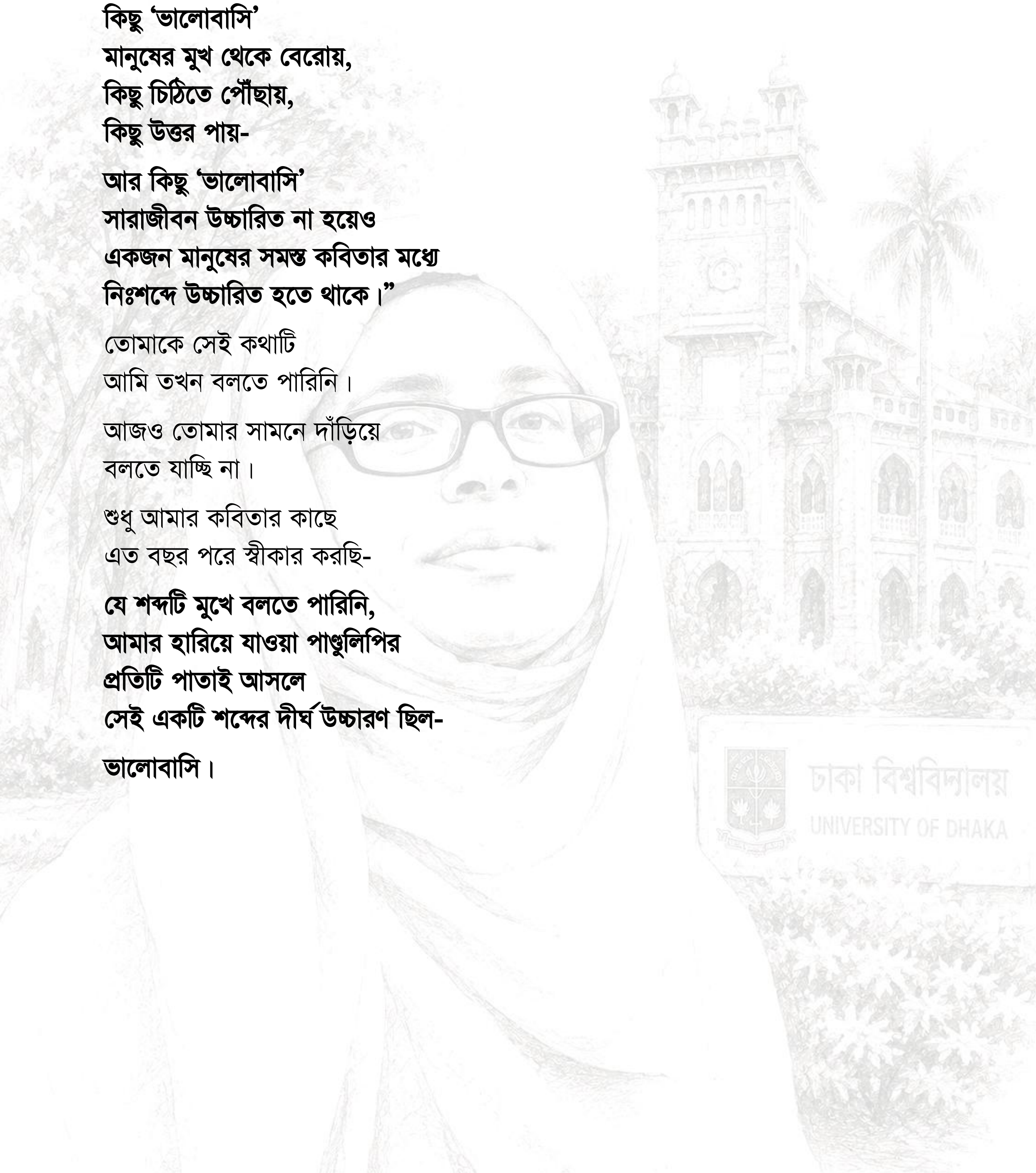

তোমার নীরব উত্তর

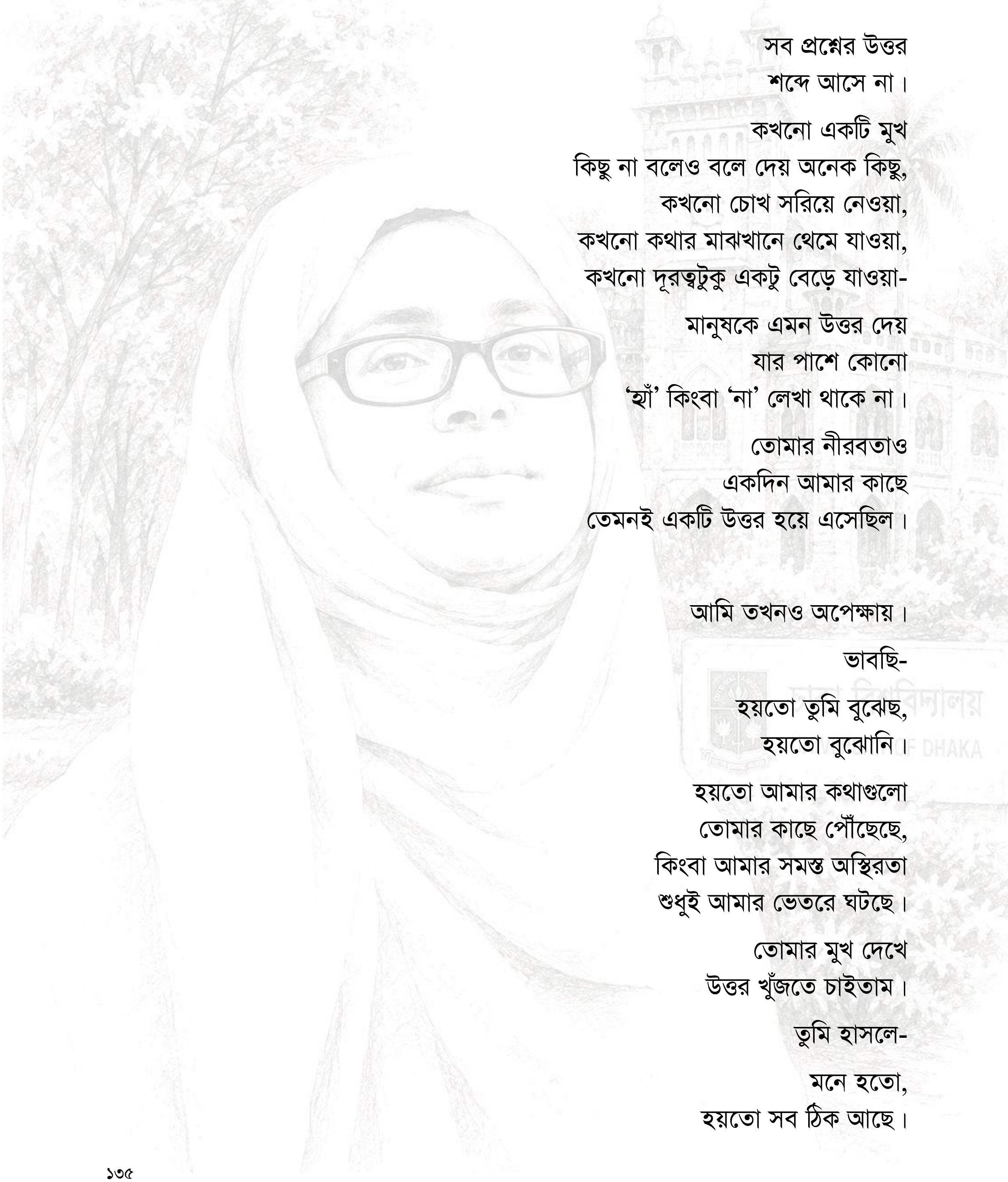

সব প্রশ্নের উত্তর
শব্দে আসে না।

কখনো একটি মুখ
কিছু না বলেও বলে দেয় অনেক কিছু,
কখনো চোখ সরিয়ে নেওয়া,
কখনো কথার মাঝখানে থেমে যাওয়া,
কখনো দূরত্বটুকু একটু বেড়ে যাওয়া-

মানুষকে এমন উত্তর দেয়
যার পাশে কোনো
'হ্যাঁ' কিংবা 'না' লেখা থাকে না।

তোমার নীরবতাও
একদিন আমার কাছে
তেমনই একটি উত্তর হয়ে এসেছিল।

আমি তখনও অপেক্ষায়।

ভাবছি-

হয়তো তুমি বুঝেছ,
হয়তো বুঝোনি।

হয়তো আমার কথাগুলো
তোমার কাছে পৌঁছেছে,
কিংবা আমার সমস্ত অস্থিরতা
শুধুই আমার ভেতরে ঘটছে।

তোমার মুখ দেখে
উত্তর খুঁজতে চাইতাম।

তুমি হাসলে-

মনে হতো,
হয়তো সব ঠিক আছে।

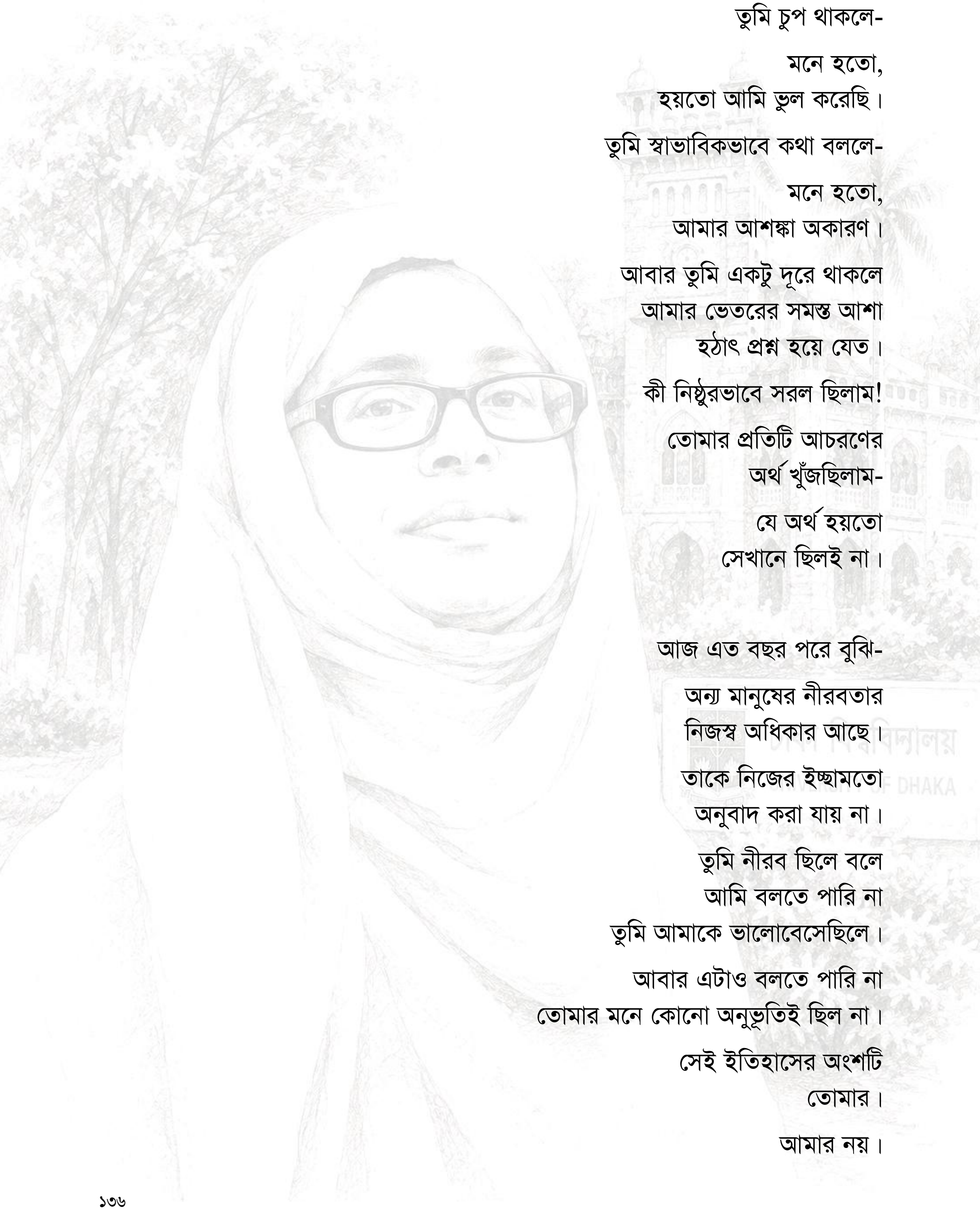

তুমি চুপ থাকলে-

মনে হতো,
হয়তো আমি ভুল করেছি।

তুমি স্বাভাবিকভাবে কথা বললে-

মনে হতো,
আমার আশঙ্কা অকারণ।

আবার তুমি একটু দূরে থাকলে
আমার ভেতরের সমস্ত আশা
হঠাৎ প্রশ্ন হয়ে যেত।

কী নিষ্ঠুরভাবে সরল ছিলাম!

তোমার প্রতিটি আচরণের
অর্থ খুঁজছিলাম-

যে অর্থ হয়তো
সেখানে ছিলই না।

আজ এত বছর পরে বুঝি-

অন্য মানুষের নীরবতার
নিজস্ব অধিকার আছে।

তাকে নিজের ইচ্ছামতো
অনুবাদ করা যায় না।

তুমি নীরব ছিলে বলে
আমি বলতে পারি না
তুমি আমাকে ভালোবেসেছিলে।

আবার এটাও বলতে পারি না
তোমার মনে কোনো অনুভূতিই ছিল না।

সেই ইতিহাসের অংশটি
তোমার।

আমার নয়।

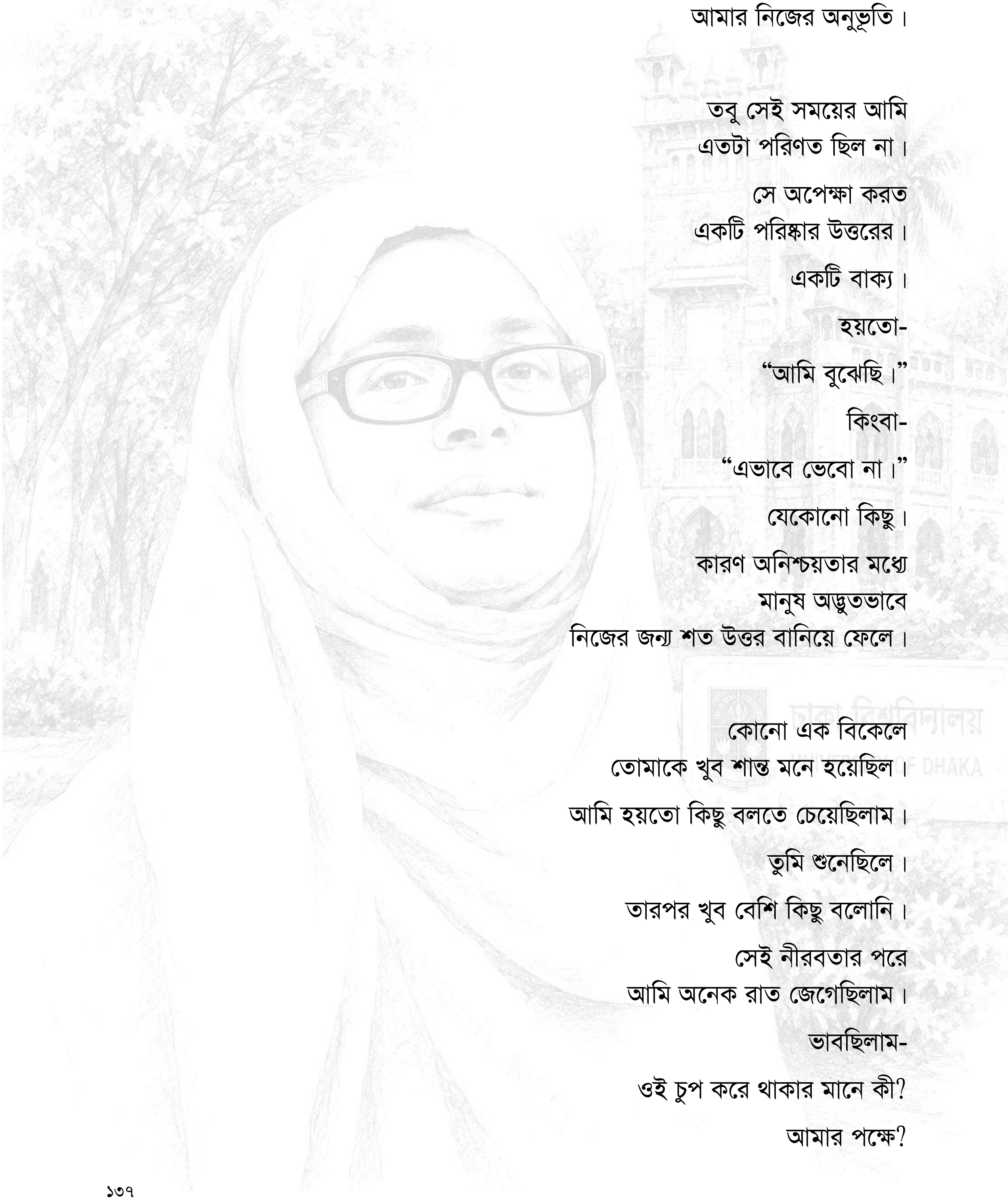

আমার কাছে শুধু সত্য
আমার নিজের অনুভূতি।

তবু সেই সময়ের আমি
এতটা পরিণত ছিল না।

সে অপেক্ষা করত
একটি পরিষ্কার উত্তরের।

একটি বাক্য।

হয়তো-

"আমি বুঝেছি।"

কিংবা-

"এভাবে ভেবো না।"

যেকোনো কিছু।

কারণ অনিশ্চয়তার মধ্যে
মানুষ অদ্ভুতভাবে
নিজের জন্য শত উত্তর বানিয়ে ফেলে।

কোনো এক বিকেলে
তোমাকে খুব শান্ত মনে হয়েছিল।

আমি হয়তো কিছু বলতে চেয়েছিলাম।

তুমি শুনেছিলে।

তারপর খুব বেশি কিছু বলোনি।

সেই নীরবতার পরে
আমি অনেক রাত জেগেছিলাম।

ভাবছিলাম-

ওই চুপ করে থাকার মানে কী?

আমার পক্ষে?

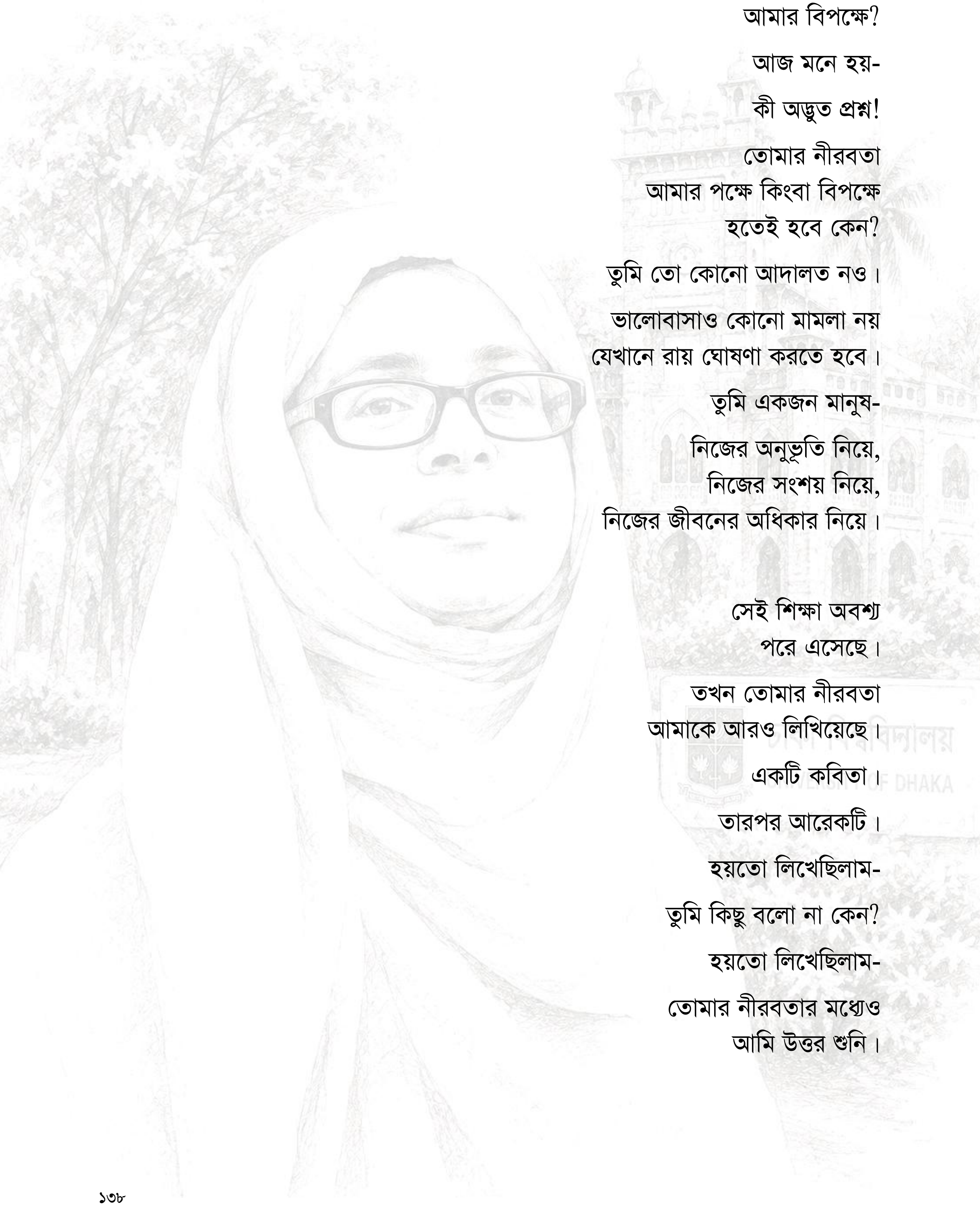

আমার বিপক্ষে?

আজ মনে হয়-

কী অদ্ভুত প্রশ্ন!

তোমার নীরবতা
আমার পক্ষে কিংবা বিপক্ষে
হতেই হবে কেন?

তুমি তো কোনো আদালত নও।

ভালোবাসাও কোনো মামলা নয়
যেখানে রায় ঘোষণা করতে হবে।

তুমি একজন মানুষ-

নিজের অনুভূতি নিয়ে,
নিজের সংশয় নিয়ে,
নিজের জীবনের অধিকার নিয়ে।

সেই শিক্ষা অবশ্য
পরে এসেছে।

তখন তোমার নীরবতা
আমাকে আরও লিখিয়েছে।

একটি কবিতা।

তারপর আরেকটি।

হয়তো লিখেছিলাম-

তুমি কিছু বলো না কেন?

হয়তো লিখেছিলাম-

তোমার নীরবতার মধ্যেও
আমি উত্তর শুনি।

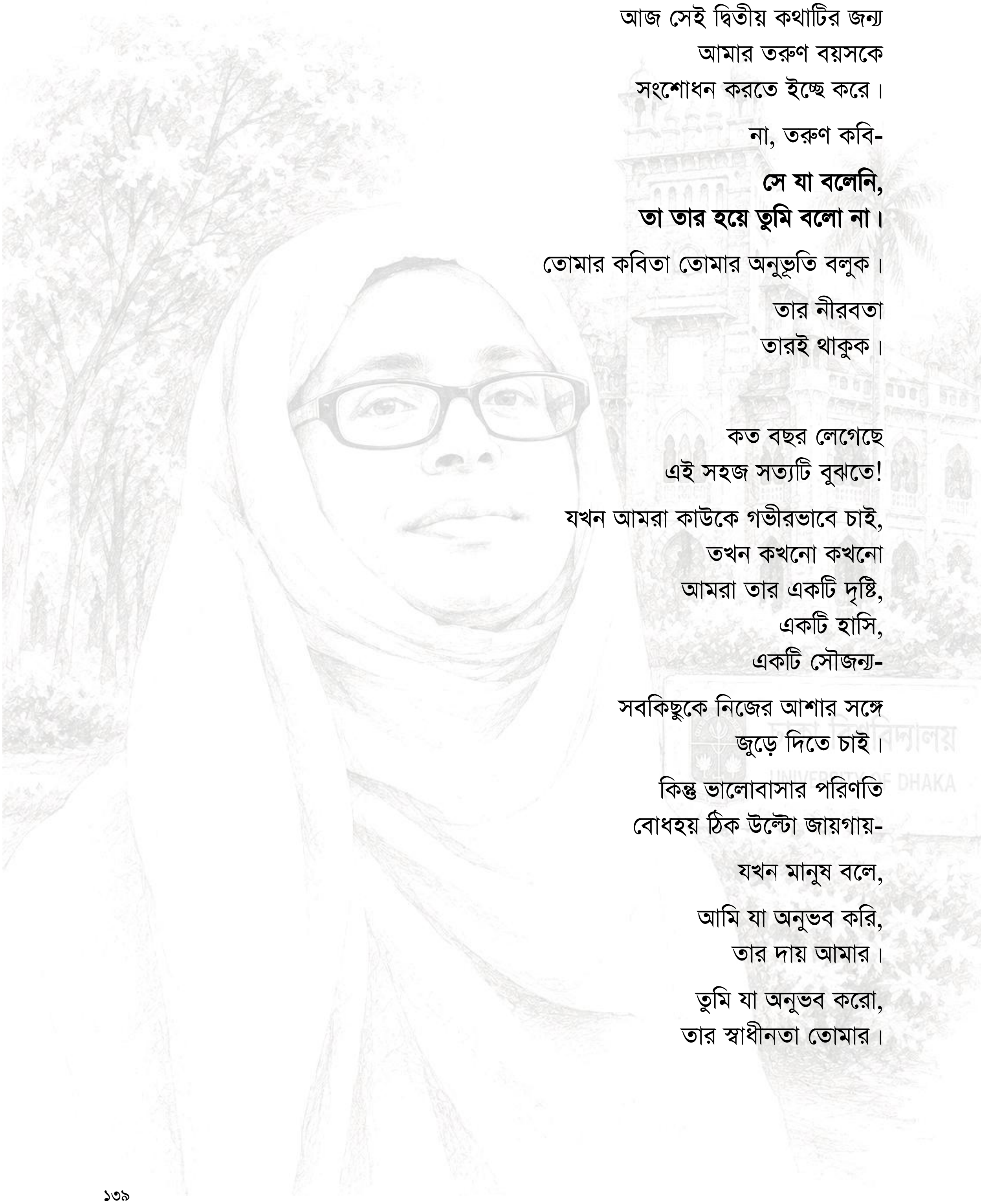

আজ সেই দ্বিতীয় কথাটির জন্যে
আমার তরুণ বয়সকে
সংশোধন করতে ইচ্ছে করে।

না, তরুণ কবি-

সে যা বলেনি,
তা তার হয়ে তুমি বলো না।

তোমার কবিতা তোমার অনুভূতি বলুক।

তার নীরবতা
তারই থাকুক।

কত বছর লেগেছে
এই সহজ সত্যটি বুঝতে!

যখন আমরা কাউকে গভীরভাবে চাই,
তখন কখনো কখনো
আমরা তার একটি দৃষ্টি,
একটি হাসি,
একটি সৌজন্য-

সবকিছুকে নিজের আশার সঙ্গে
জুড়ে দিতে চাই।

কিন্তু ভালোবাসার পরিণতি
বোধহয় ঠিক উল্টো জায়গায়-

যখন মানুষ বলে,

আমি যা অনুভব করি,
তার দায় আমার।

তুমি যা অনুভব করো,
তার স্বাধীনতা তোমার।

তোমার নীরব উত্তর তাই
আজ আর আমাকে প্রশ্নে রাখে না।

বরং মনে হয়-

সেটি হয়তো
আমার জন্য প্রয়োজনীয় একটি বিরতি ছিল।

কারণ তার পরে
একদিন শব্দও এসেছিল।

স্পষ্ট শব্দ।

একটি সীমারেখা।

যা আর অনুমান করার মতো ছিল না।

সেদিন তোমার নীরবতার
সব অস্পষ্টতা শেষ হয়ে গেল।

তার আগের রাত পর্যন্ত
হয়তো আমি ভাবতে পেরেছি-

হয়তো।

হয়তো কোনোদিন।

হয়তো সময় লাগবে।

মানুষের আশা
'হয়তো' শব্দটিকে খুব ভালোবাসে।

একটি বন্ধ দরজার সামনেও
সে ভাবতে পারে-

দরজাটি পুরোপুরি বন্ধ হয়নি।

কিন্তু কোনো একদিন
তুমি সেই 'হয়তো'-এর জায়গায়
একটি স্পষ্ট সীমা এঁকে দিলে।

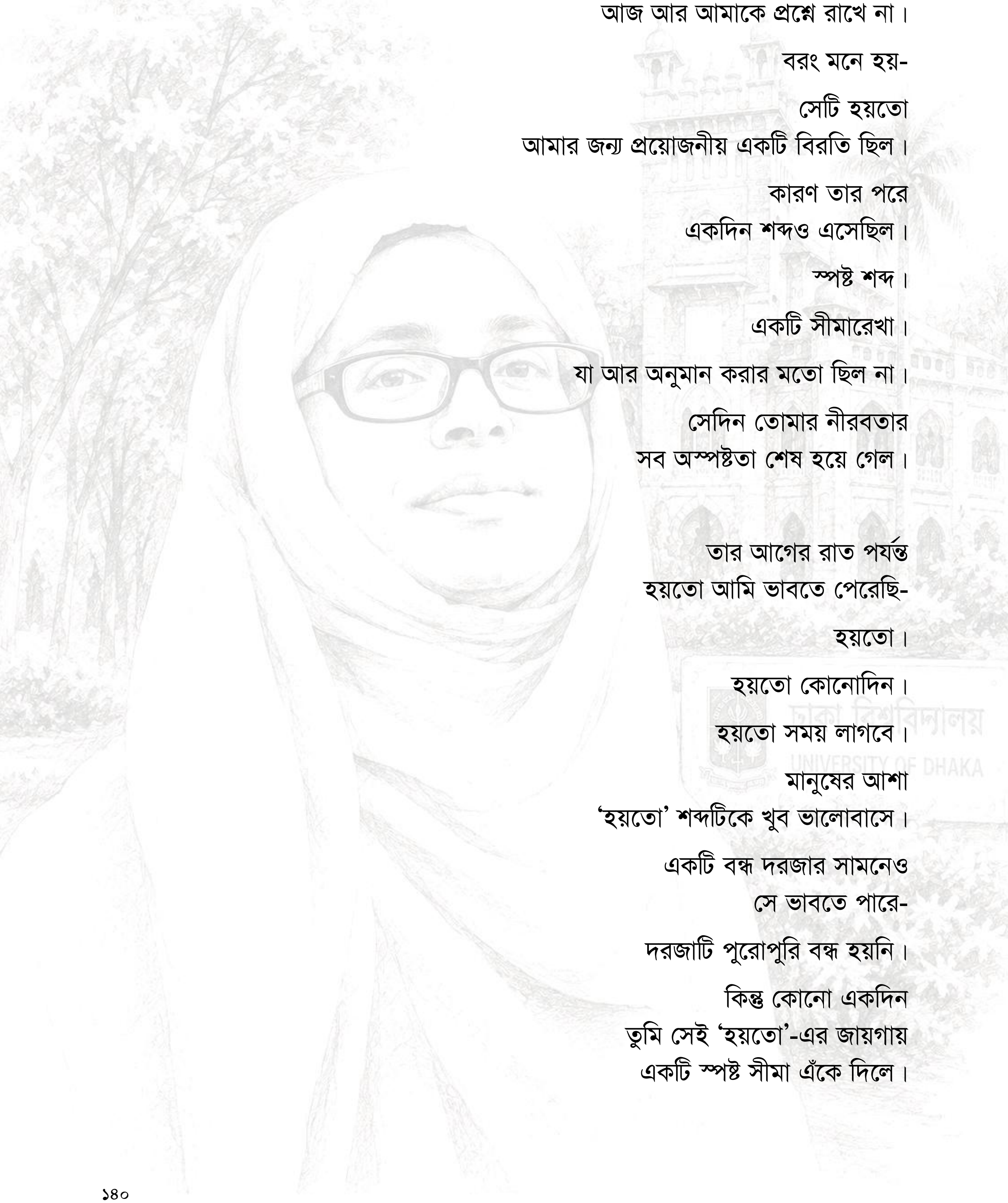

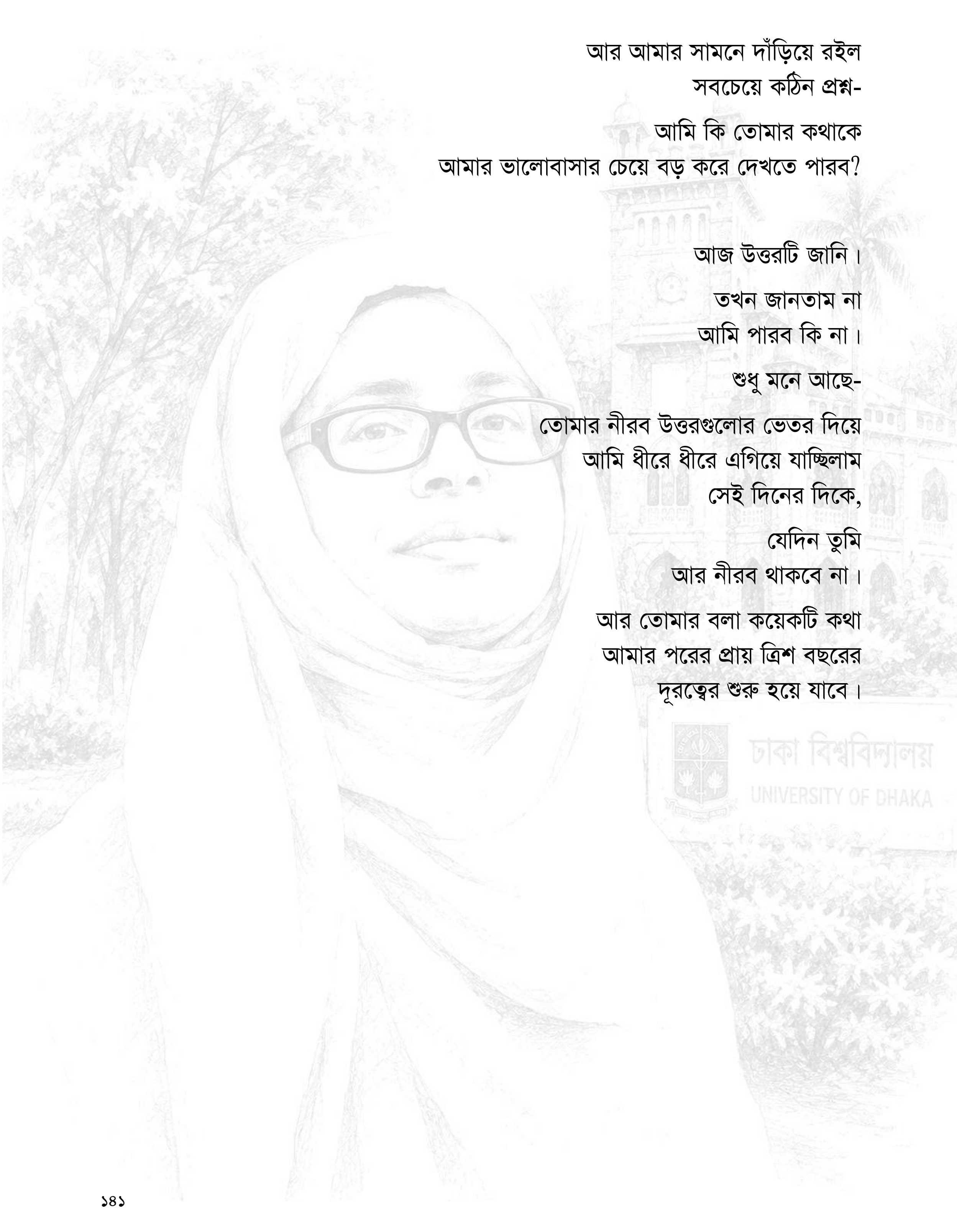

আর আমার সামনে দাঁড়িয়ে রইল
সবচেয়ে কঠিন প্রশ্ন-

আমি কি তোমার কথাকে
আমার ভালোবাসার চেয়ে বড় করে দেখতে পারব?

আজ উত্তরটি জানি।

তখন জানতাম না
আমি পারব কি না।

শুধু মনে আছে-

তোমার নীরব উত্তরগুলোর ভেতর দিয়ে
আমি ধীরে ধীরে এগিয়ে যাচ্ছিলাম
সেই দিনের দিকে,

যেদিন তুমি
আর নীরব থাকবে না।

আর তোমার বলা কয়েকটি কথা
আমার পরের প্রায় ত্রিশ বছরের
দূরত্বের শুরু হয়ে যাবে।

যেদিন তুমি বারণ করলে

দিনটির তারিখ
আজ আর মনে নেই।

কিন্তু কিছু তারিখ
ক্যালেন্ডারে না থাকলেও
মানুষের জীবনে লেখা থাকে।

সেই দিনটি তেমন।

তুমি আমাকে বারণ করলে।

ঠিক কোন শব্দে বলেছিলে-
আজ হুবহু বলতে পারব না।

স্মৃতি দীর্ঘ সময় পেরোলে
বাক্যের শব্দ বদলে দেয়,
কিন্তু তার অর্থটুকু
অদ্ভুতভাবে অক্ষত রাখে।

আমি শুধু মনে রেখেছি-

তুমি দূরত্ব চেয়েছিলে।

আমার উপস্থিতি থেকে,
আমার অনুভূতি থেকে,
হয়তো আমার সেই নীরব অপেক্ষা থেকেও।

আর হঠাৎ
এতদিনের সমস্ত 'হয়তো'
একটি স্পষ্ট বাস্তবতার সামনে
চুপ হয়ে গেল।

তোমার কথাগুলো শোনার মুহূর্তে
আমি কি কিছু বলেছিলাম?

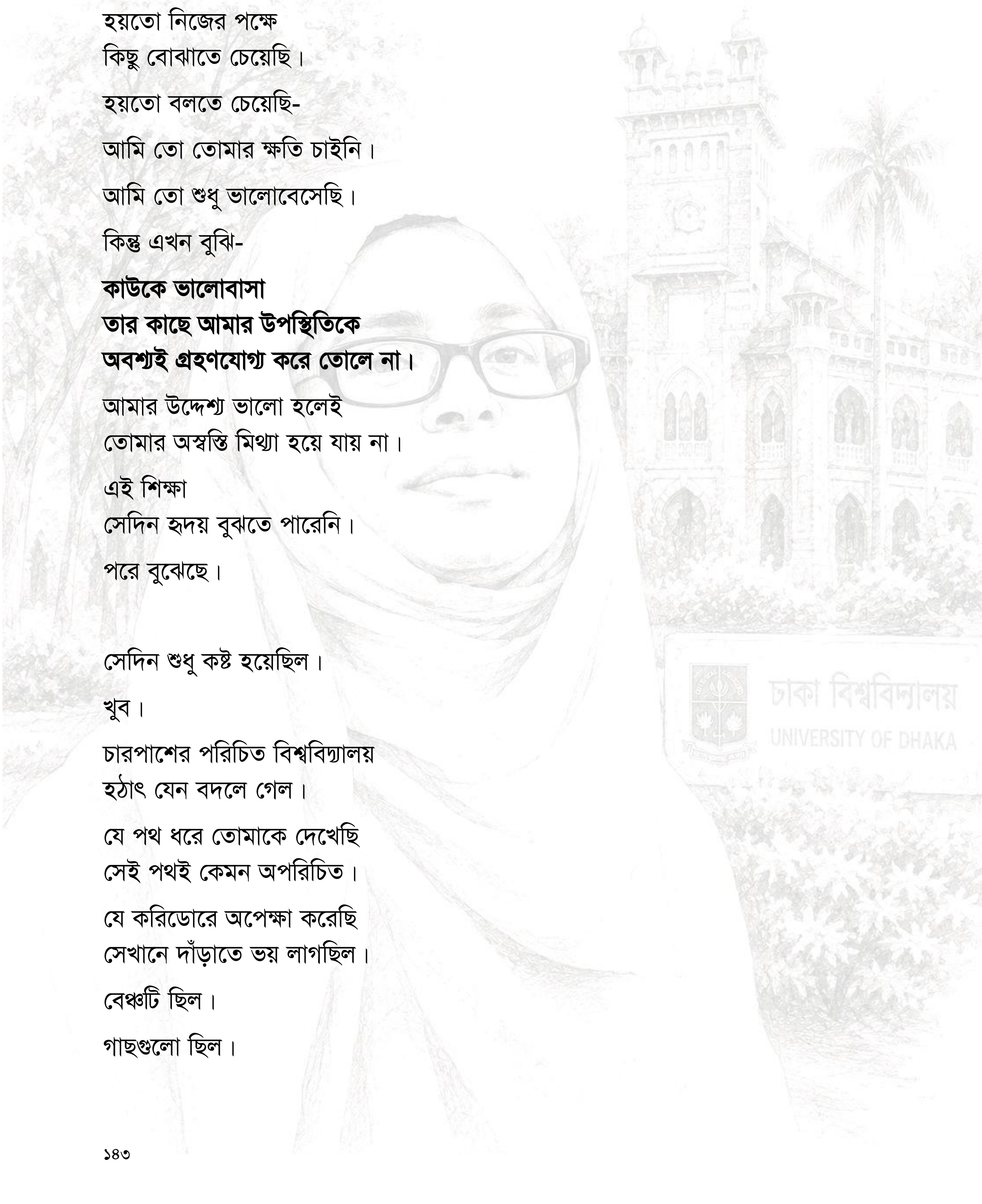

হয়তো বলেছি।

হয়তো নিজের পক্ষে
কিছু বোঝাতে চেয়েছি।

হয়তো বলতে চেয়েছি-

আমি তো তোমার ক্ষতি চাইনি।

আমি তো শুধু ভালোবেসেছি।

কিন্তু এখন বুঝি-

কাউকে ভালোবাসা
তার কাছে আমার উপস্থিতিকে
অবশ্যই গ্রহণযোগ্য করে তোলে না।

আমার উদ্দেশ্য ভালো হলেই
তোমার অস্বস্তি মিথ্যা হয়ে যায় না।

এই শিক্ষা
সেদিন হৃদয় বুঝতে পারেনি।

পরে বুঝেছে।

সেদিন শুধু কষ্ট হয়েছিল।

খুব।

চারপাশের পরিচিত বিশ্ববিদ্যালয়
হঠাৎ যেন বদলে গেল।

যে পথ ধরে তোমাকে দেখেছি
সেই পথই কেমন অপরিচিত।

যে করিডোরে অপেক্ষা করেছি
সেখানে দাঁড়াতে ভয় লাগছিল।

বেঞ্চটি ছিল।

গাছগুলো ছিল।

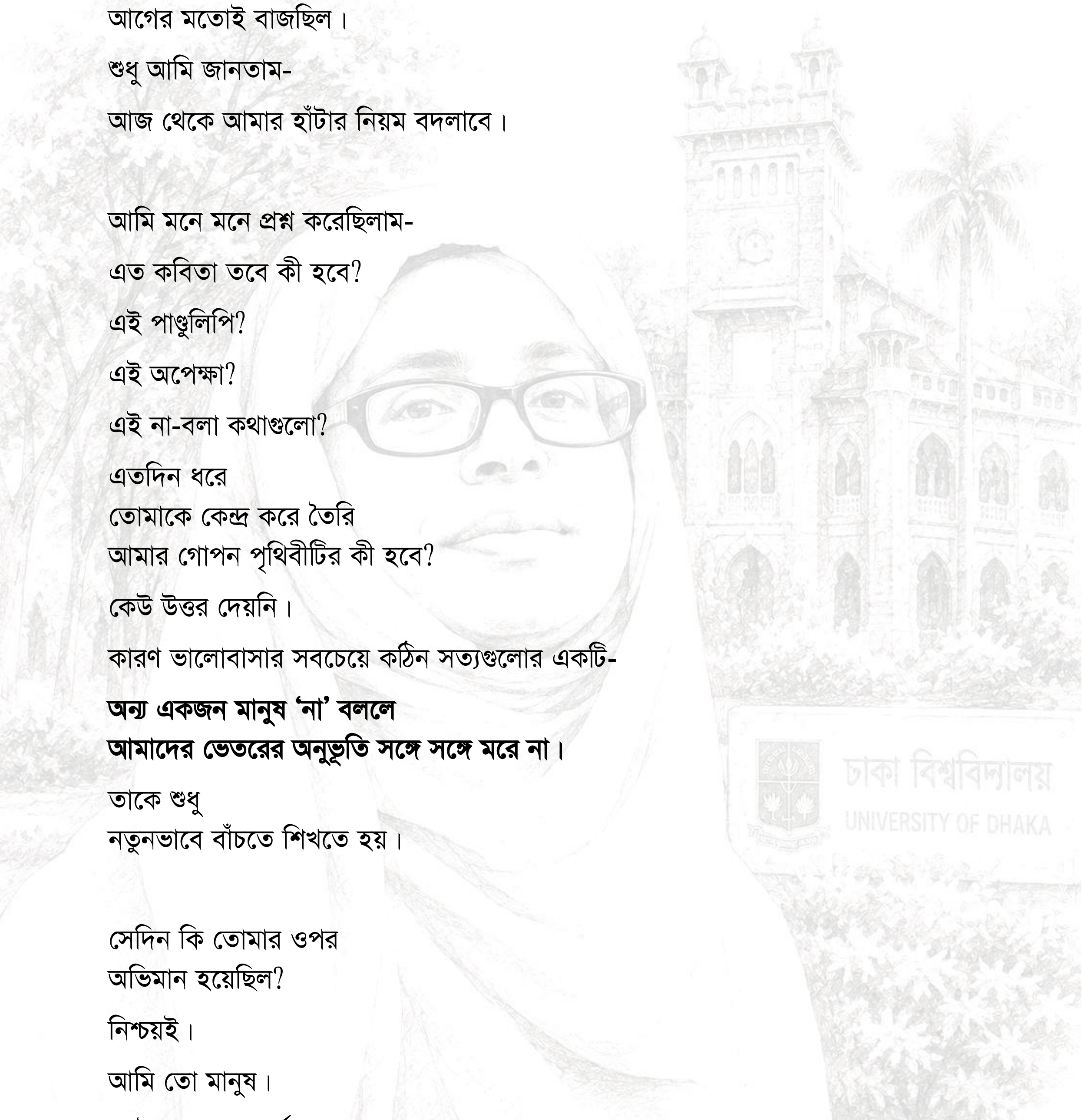

ক্লাসের ঘণ্টাও
আগের মতোই বাজছিল।

শুধু আমি জানতাম-

আজ থেকে আমার হাঁটার নিয়ম বদলাবে।

আমি মনে মনে প্রশ্ন করেছিলাম-

এত কবিতা তবে কী হবে?

এই পাণ্ডুলিপি?

এই অপেক্ষা?

এই না-বলা কথাগুলো?

এতদিন ধরে
তোমাকে কেন্দ্র করে তৈরি
আমার গোপন পৃথিবীটির কী হবে?

কেউ উত্তর দেয়নি।

কারণ ভালোবাসার সবচেয়ে কঠিন সত্যগুলোর একটি-

অন্য একজন মানুষ 'না' বললে
আমাদের ভেতরের অনুভূতি সঙ্গে সঙ্গে মরে না।

তাকে শুধু
নতুনভাবে বাঁচতে শিখতে হয়।

সেদিন কি তোমার ওপর
অভিমান হয়েছিল?

নিশ্চয়ই।

আমি তো মানুষ।

কষ্টের প্রথম মুহূর্তে
যুক্তির চেয়ে অভিমানই আগে আসে।

মনে হয়েছিল-

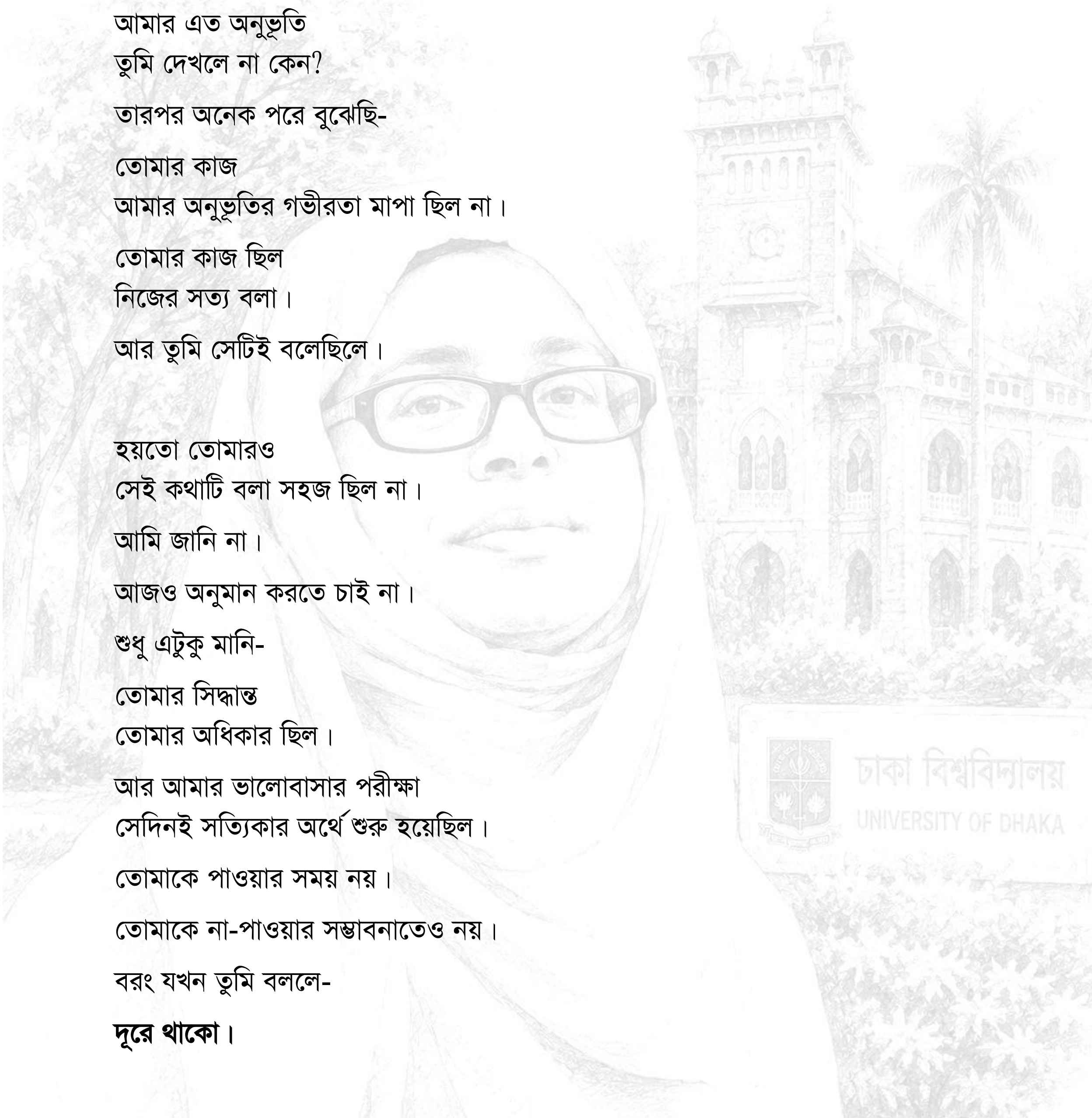

তুমি বুঝলে না কেন?

আমার এত অনুভূতি
তুমি দেখলে না কেন?

তারপর অনেক পরে বুঝেছি-

তোমার কাজ
আমার অনুভূতির গভীরতা মাপা ছিল না।

তোমার কাজ ছিল
নিজের সত্য বলা।

আর তুমি সেটিই বলেছিলে।

হয়তো তোমারও
সেই কথাটি বলা সহজ ছিল না।

আমি জানি না।

আজও অনুমান করতে চাই না।

শুধু এটুকু মানি-

তোমার সিদ্ধান্ত
তোমার অধিকার ছিল।

আর আমার ভালোবাসার পরীক্ষা
সেদিনই সত্যিকার অর্থে শুরু হয়েছিল।

তোমাকে পাওয়ার সময় নয়।

তোমাকে না-পাওয়ার সম্ভাবনাতেও নয়।

বরং যখন তুমি বললে-

দূরে থাকো।

আমি কি সঙ্গে সঙ্গে
মেনে নিতে পেরেছিলাম?

মনের ভেতরে-না।

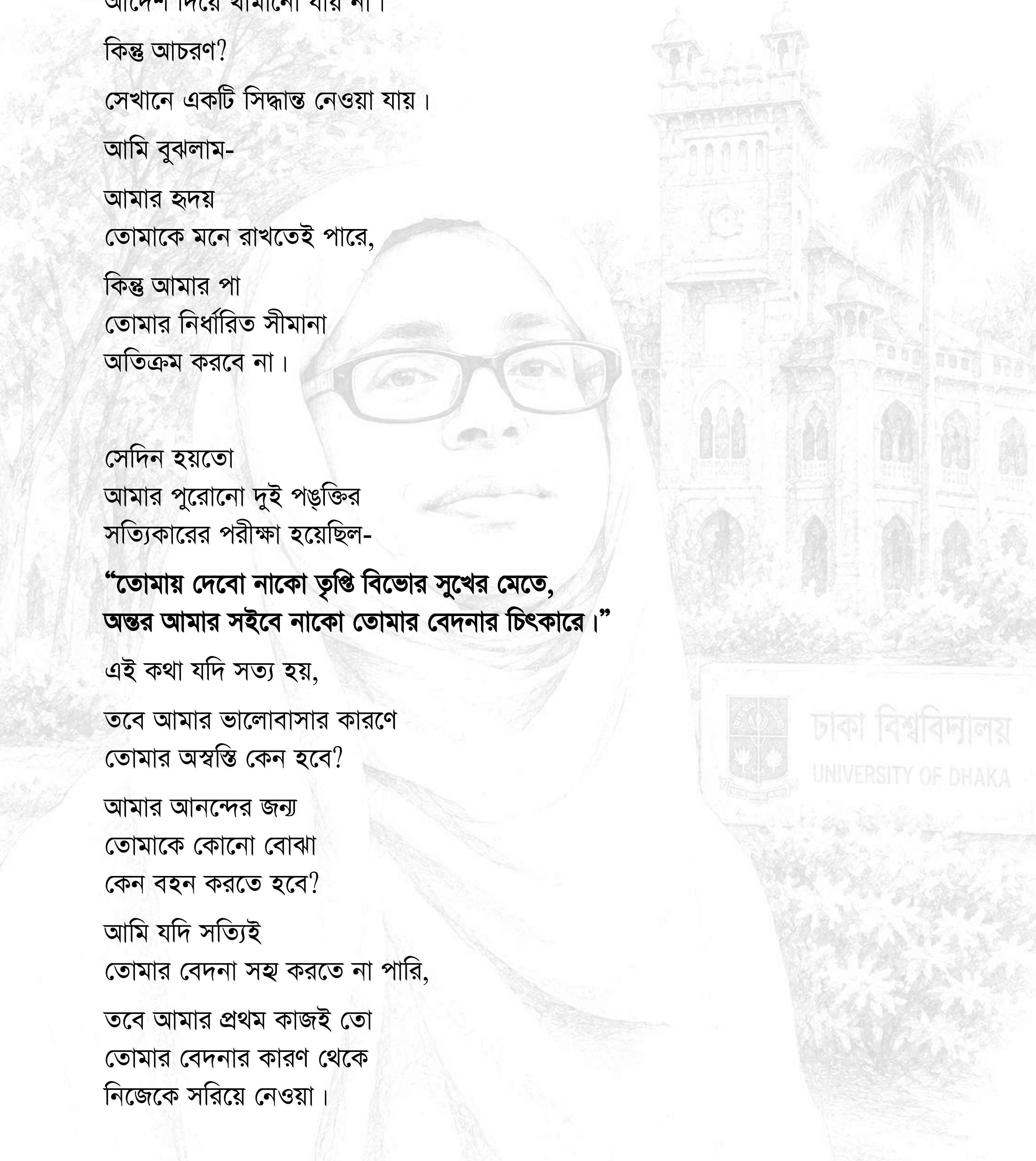

মানুষের অনুভূতিকে তো
আদেশ দিয়ে থামানো যায় না।

কিন্তু আচরণ?

সেখানে একটি সিদ্ধান্ত নেওয়া যায়।

আমি বুঝলাম-

আমার হৃদয়
তোমাকে মনে রাখতেই পারে,

কিন্তু আমার পা
তোমার নির্ধারিত সীমানা
অতিক্রম করবে না।

সেদিন হয়তো
আমার পুরোনো দুই পঙ্ক্তির
সত্যিকারের পরীক্ষা হয়েছিল-

"তোমায় দেবো নাকো তৃপ্তি বিভোর সুখের মেতে,
অন্তর আমার সইবে নাকো তোমার বেদনার চিৎকারে।"

এই কথা যদি সত্য হয়,

তবে আমার ভালোবাসার কারণে
তোমার অস্বস্তি কেন হবে?

আমার আনন্দের জন্য
তোমাকে কোনো বোঝা
কেন বহন করতে হবে?

আমি যদি সত্যিই
তোমার বেদনা সহ্য করতে না পারি,

তবে আমার প্রথম কাজই তো
তোমার বেদনার কারণ থেকে
নিজেকে সরিয়ে নেওয়া।

এই উপলব্ধি
সেদিনই এত পরিষ্কার ছিল না।

সে এসেছে ধীরে।

কষ্টের ভেতর দিয়ে।

সময় নিয়ে।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত
এই একটি সত্যই
আমাকে ধরে রেখেছে-

তোমাকে ভালোবাসার অধিকার
আমার হৃদয়ের থাকতে পারে,
কিন্তু তোমাকে বিরক্ত করার অধিকার
আমার নেই।

সেদিন তাই
একটি গল্প শেষ হয়নি।

বরং গল্পটির ধরন বদলে গেল।

তার আগে প্রেম ছিল
দেখার।

অপেক্ষার।

কথা বলার চেষ্টা।

কাছে যাওয়ার আকাঙ্ক্ষা।

সেদিনের পরে
প্রেম হয়ে গেল-

নিজেকে থামানো।

দূর থেকে থাকা।

না-দেখার অভ্যাস করা।

নিজের অনুভূতির ভার
নিজেই বহন করা।

তুমি হয়তো ভেবেছিলে
তোমার বারণের পরে
একদিন সব মুছে যাবে।

হয়তো আমিও তাই ভেবেছিলাম।

কিন্তু মুছে যায়নি।

তবু সেই না-মুছে যাওয়া
তোমার জন্য কোনো দাবি হয়ে ওঠেনি।

এই পার্থক্যটিই
সম্ভবত আমার জীবনের
সবচেয়ে দীর্ঘ শিক্ষা।

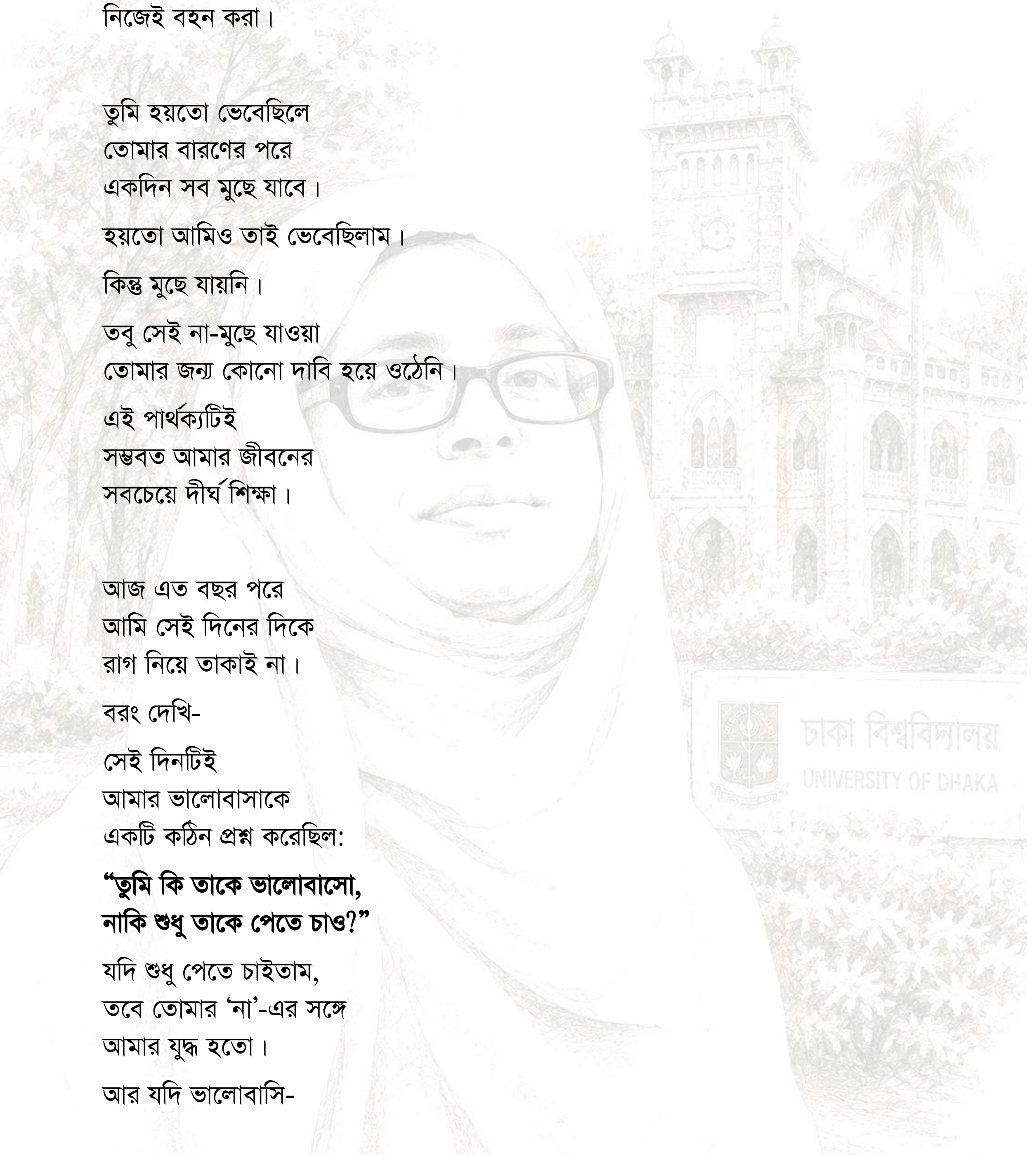

আজ এত বছর পরে
আমি সেই দিনের দিকে
রাগ নিয়ে তাকাই না।

বরং দেখি-

সেই দিনটিই
আমার ভালোবাসাকে
একটি কঠিন প্রশ্ন করেছিল:

"তুমি কি তাকে ভালোবাসো,
নাকি শুধু তাকে পেতে চাও?"

যদি শুধু পেতে চাইতাম,
তবে তোমার 'না'-এর সঙ্গে
আমার যুদ্ধ হতো।

আর যদি ভালোবাসি-

তবে তোমার 'না'কেও
তোমার অংশ হিসেবে
সম্মান করতে হবে।

সেদিন তুমি বারণ করলে।

আমি আহত হয়েছিলাম।

কিন্তু সময়ের দীর্ঘ পথে
একটি আশ্চর্য সত্য শিখলাম-

তোমার সেই বারণ
আমার ভালোবাসাকে শেষ করেনি।

বরং তার সামনে
একটি সীমারেখা এঁকে দিয়ে বলেছিল-

**"এখান থেকে যদি সত্যিই ভালোবাসো,
তবে আর এক পা এগিয়ো না।"**

আর আমি-

কষ্ট নিয়ে,
অসংখ্য না-বলা কথা নিয়ে,
হারিয়ে যেতে থাকা পাণ্ডুলিপি নিয়ে-

সেই রেখাটির সামনে
দাঁড়িয়ে গেলাম।

আমি থেমে গেলাম

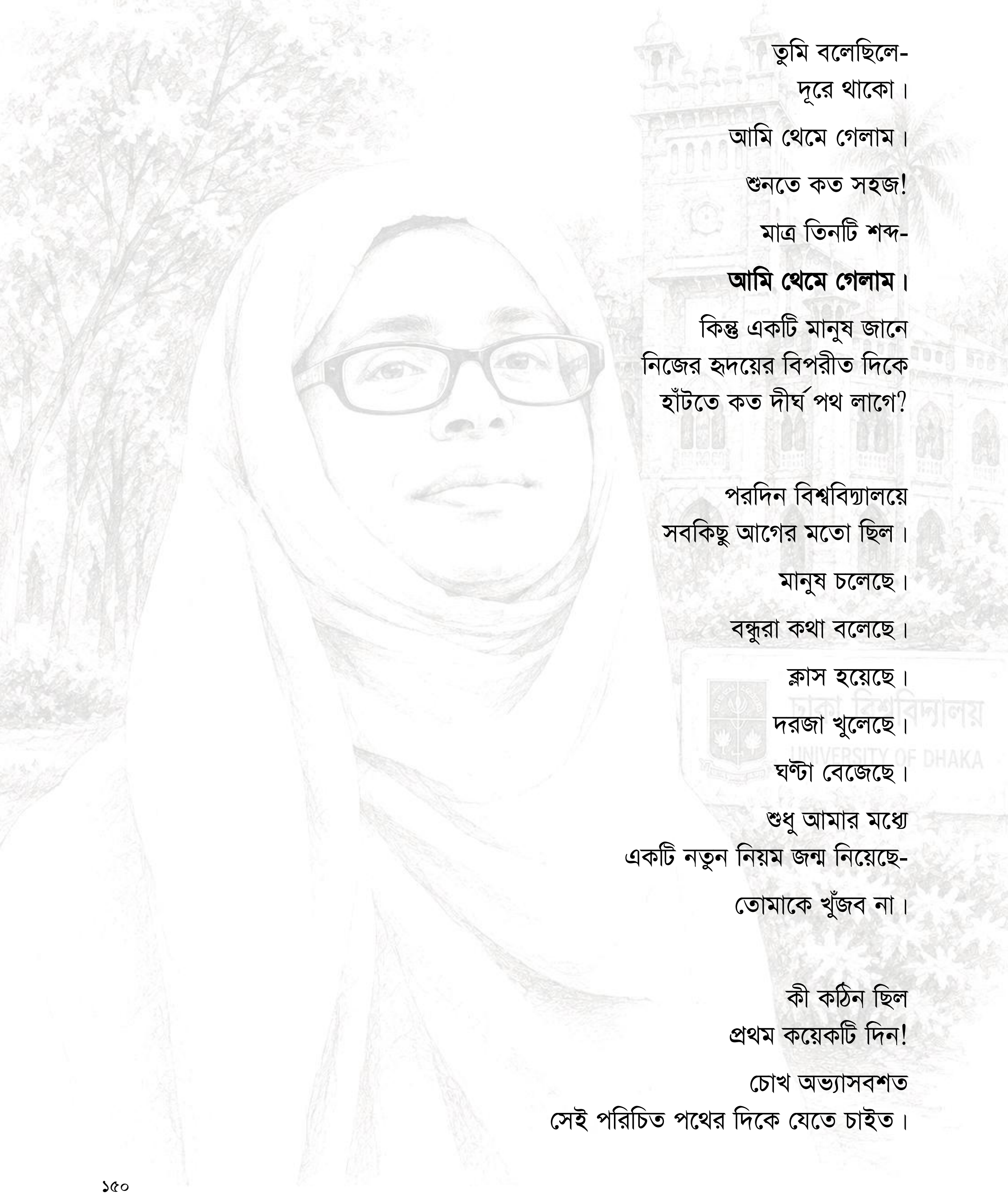

তুমি বলেছিলে-
দূরে থাকো।

আমি থেমে গেলাম।

শুনতে কত সহজ!

মাত্র তিনটি শব্দ-

আমি থেমে গেলাম।

কিন্তু একটি মানুষ জানে
নিজের হৃদয়ের বিপরীত দিকে
হাঁটতে কত দীর্ঘ পথ লাগে?

পরদিন বিশ্ববিদ্যালয়ে
সবকিছু আগের মতো ছিল।

মানুষ চলেছে।

বন্ধুরা কথা বলেছে।

ক্লাস হয়েছে।

দরজা খুলেছে।

ঘণ্টা বেজেছে।

শুধু আমার মধ্যে
একটি নতুন নিয়ম জন্ম নিয়েছে-

তোমাকে খুঁজব না।

কী কঠিন ছিল
প্রথম কয়েকটি দিন!

চোখ অভ্যাসবশত
সেই পরিচিত পথের দিকে যেতে চাইত।

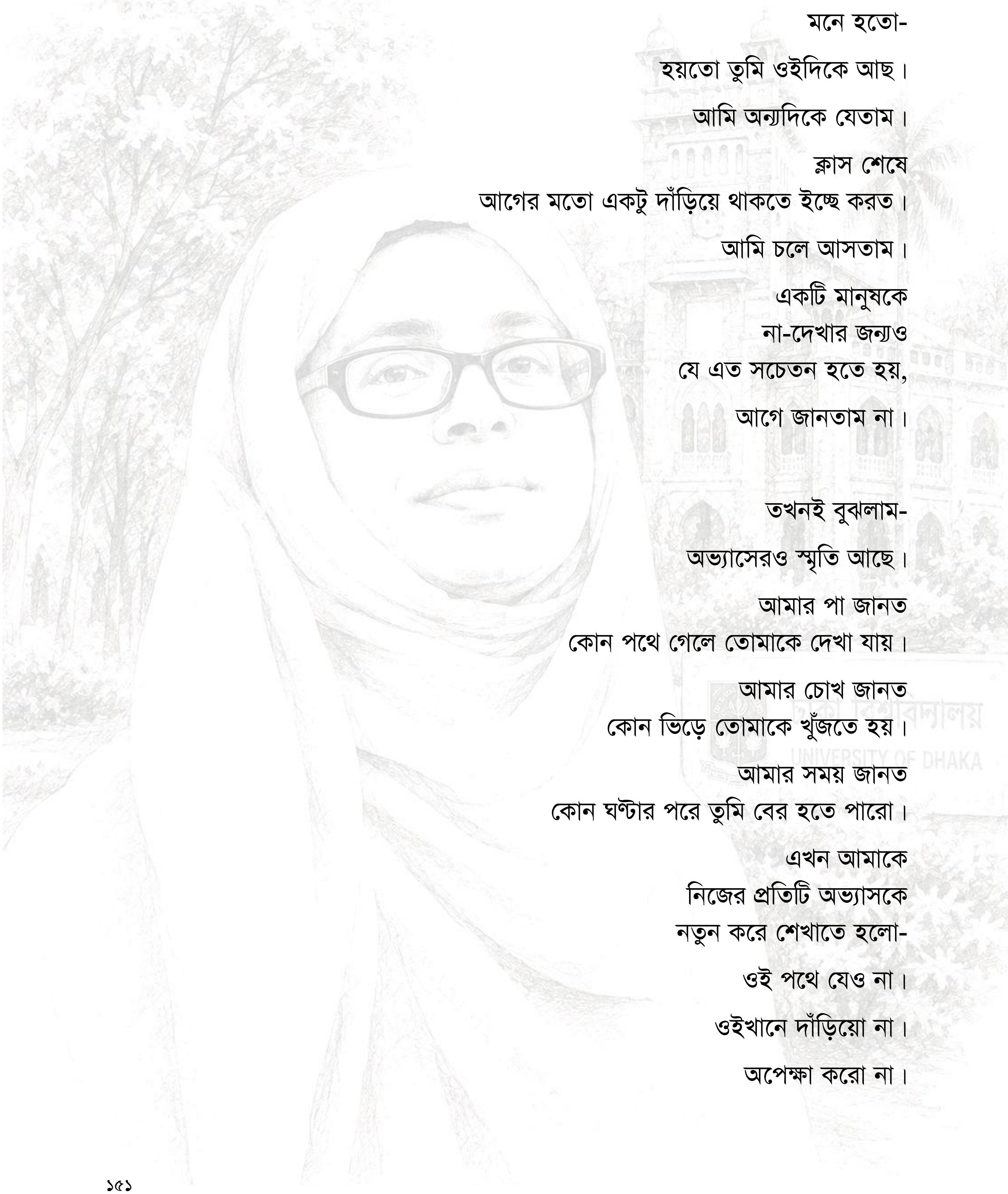

আমি ফিরিয়ে আনতাম।

মনে হতো-

হয়তো তুমি ওইদিকে আছ।

আমি অন্যদিকে যেতাম।

ক্লাস শেষে
আগের মতো একটু দাঁড়িয়ে থাকতে ইচ্ছে করত।

আমি চলে আসতাম।

একটি মানুষকে
না-দেখার জন্যও
যে এত সচেতন হতে হয়,

আগে জানতাম না।

তখনই বুঝলাম-

অভ্যাসেরও স্মৃতি আছে।

আমার পা জানত
কোন পথে গেলে তোমাকে দেখা যায়।

আমার চোখ জানত
কোন ভিড়ে তোমাকে খুঁজতে হয়।

আমার সময় জানত
কোন ঘণ্টার পরে তুমি বের হতে পারো।

এখন আমাকে
নিজের প্রতিটি অভ্যাসকে
নতুন করে শেখাতে হলো-

ওই পথে যেও না।

ওইখানে দাঁড়িয়ো না।

অপেক্ষা করো না।

কতবার দূর থেকে
তোমার মতো কাউকে দেখে
হৃদয় চমকে উঠেছে!

তারপর সঙ্গে সঙ্গে
নিজেকে বলেছি-

না।

এখন তোমাকে দেখার জন্য
কাছে যাওয়া যাবে না।

তুমি যে দূরত্ব চেয়েছ,
সে দূরত্বের দায়িত্বও
আমার।

আমি থেমে গেলাম-

কিন্তু কবিতা?

সে থামল না।

রাতে এসে সে প্রশ্ন করত-

আজ তাকে দেখোনি?

আমি বলতাম-

না।

সে লিখত-

“আজ তাকে দেখিনি।”

পরদিন-

“আজও না।”

একসময় না-দেখাটিই
আমার লেখার নতুন বিষয় হয়ে গেল।

আগে লিখতাম
তোমার উপস্থিতি।

এখন লিখি
তোমার অনুপস্থিতির আকৃতি।

কী আশ্চর্য-

একজন মানুষ সামনে না থাকলেও
তার জন্য একটি শূন্য জায়গা
কী স্পষ্টভাবে দেখা যায়!

ক্যাম্পাসের ভিড়ে
হাজার মানুষ আছে।

তবু মনে হয়-

কেউ নেই।

কারণ যাকে চোখ
অভ্যাস করে ফেলেছিল,

সে আর চোখের সামনে নেই।

তুমি হয়তো কাছে কোথাও ছিলে।

একই শহরে।

হয়তো একই ক্যাম্পাসের
অন্য কোনো প্রান্তে।

তবু আমি নিজেকে বোঝালাম-

কাছে থাকা মানেই
দেখার অধিকার নয়।

এই কথাটি
তরুণ হৃদয়কে বোঝানো সহজ ছিল না।

সে প্রশ্ন করত-

শুধু একবার দেখলে কী হবে?

দূর থেকেই তো দেখব।

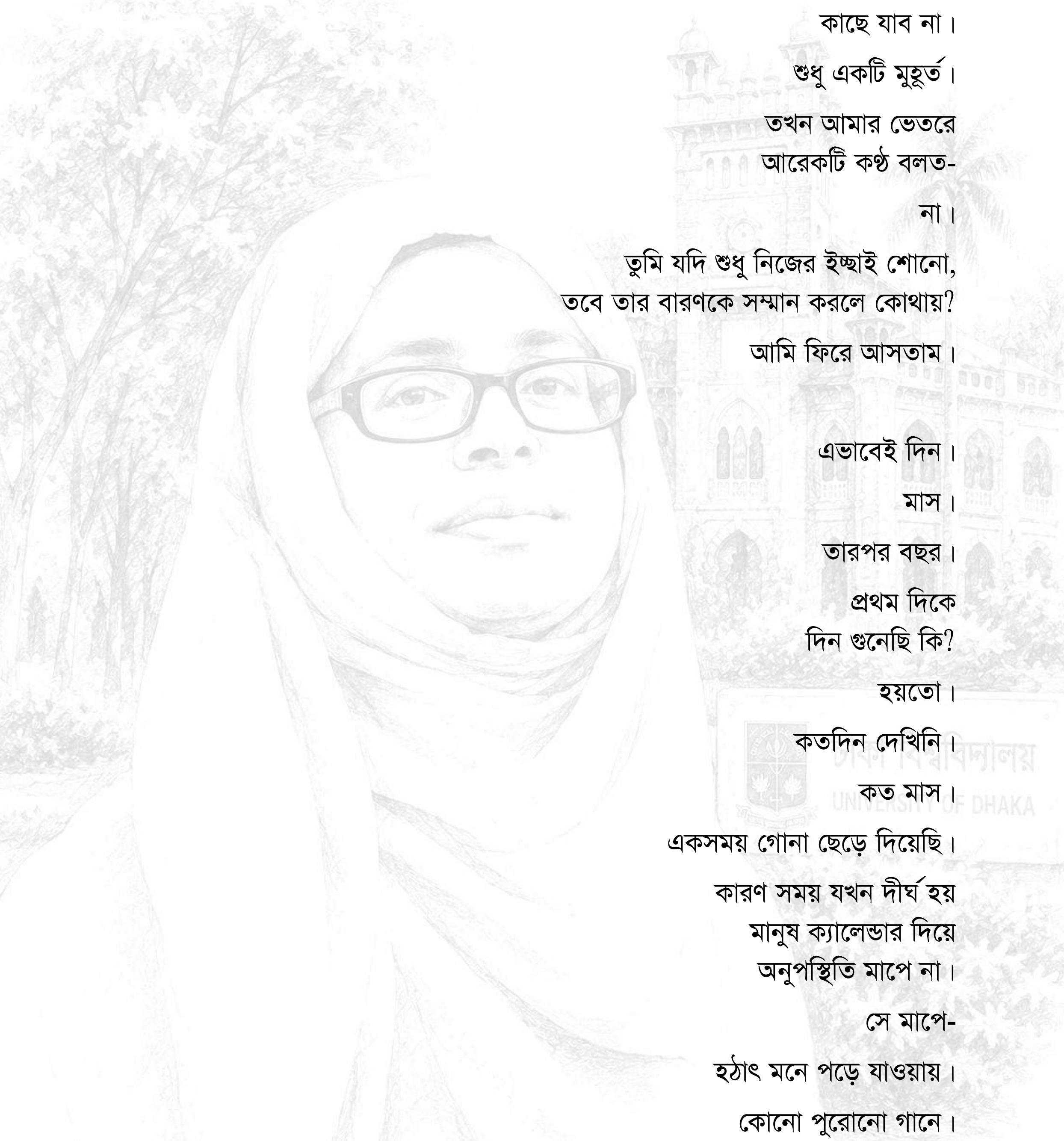

কথা বলব না।

কাছে যাব না।

শুধু একটি মুহূর্ত।

তখন আমার ভেতরে
আরেকটি কণ্ঠ বলত-

না।

তুমি যদি শুধু নিজের ইচ্ছাই শোনো,
তবে তার বারণকে সম্মান করলে কোথায়?

আমি ফিরে আসতাম।

এভাবেই দিন।

মাস।

তারপর বছর।

প্রথম দিকে
দিন গুনেছি কি?

হয়তো।

কতদিন দেখিনি।

কত মাস।

একসময় গোনা ছেড়ে দিয়েছি।

কারণ সময় যখন দীর্ঘ হয়
মানুষ ক্যালেন্ডার দিয়ে
অনুপস্থিতি মাপে না।

সে মাপে-

হঠাৎ মনে পড়ে যাওয়ায়।

কোনো পুরোনো গানে।

কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের পথে।

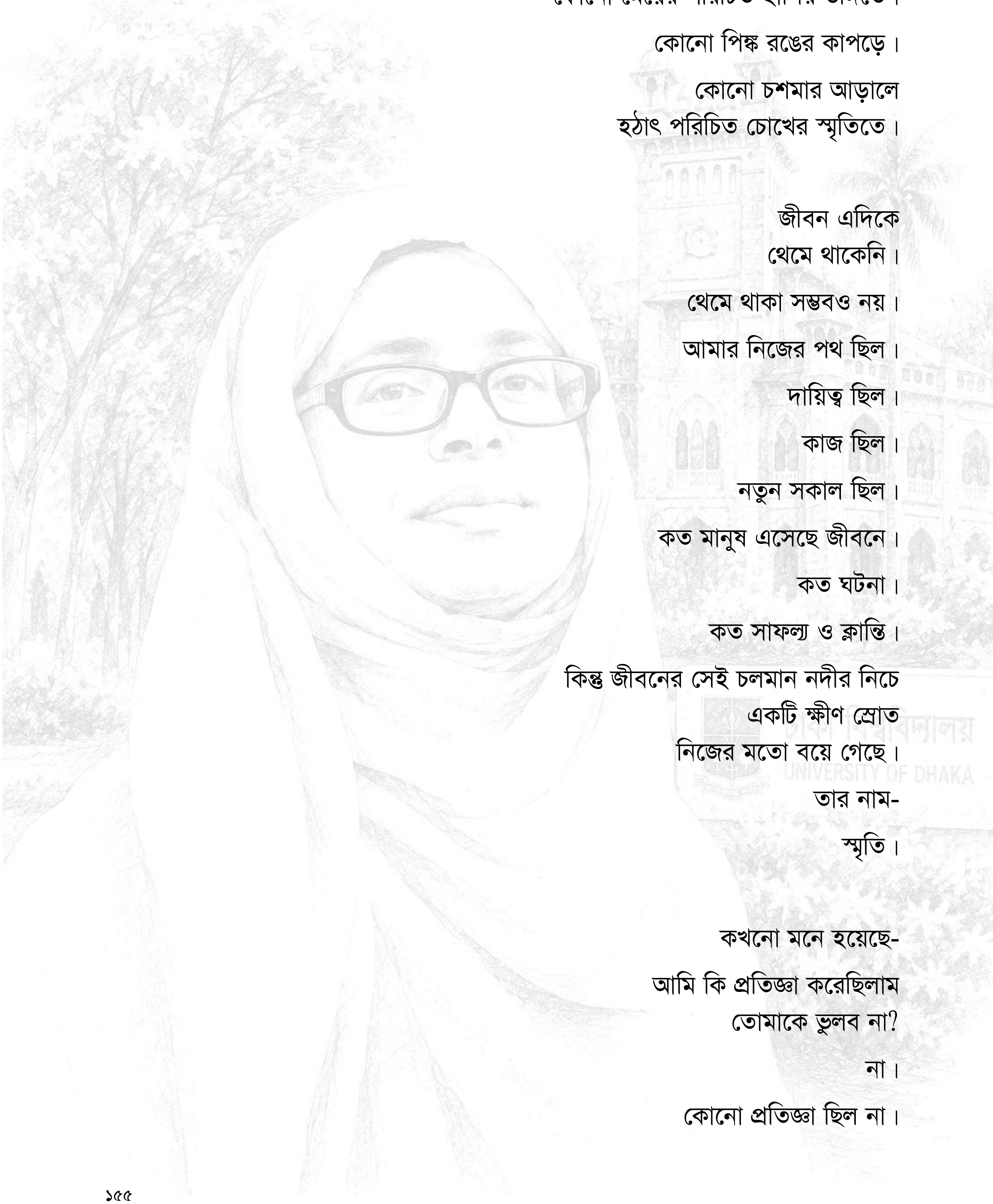

কোনো মেয়ের পরিচিত হাসির ভঙ্গিতে।

কোনো পিঙ্ক রঙের কাপড়ে।

কোনো চশমার আড়ালে
হঠাৎ পরিচিত চোখের স্মৃতিতে।

জীবন এদিকে
থেমে থাকেনি।

থেমে থাকা সম্ভবও নয়।

আমার নিজের পথ ছিল।

দায়িত্ব ছিল।

কাজ ছিল।

নতুন সকাল ছিল।

কত মানুষ এসেছে জীবনে।

কত ঘটনা।

কত সাফল্য ও ক্লান্তি।

কিন্তু জীবনের সেই চলমান নদীর নিচে
একটি ক্ষীণ স্রোত
নিজের মতো বয়ে গেছে।
তার নাম-
স্মৃতি।

কখনো মনে হয়েছে-

আমি কি প্রতিজ্ঞা করেছিলাম
তোমাকে ভুলব না?

না।

কোনো প্রতিজ্ঞা ছিল না।

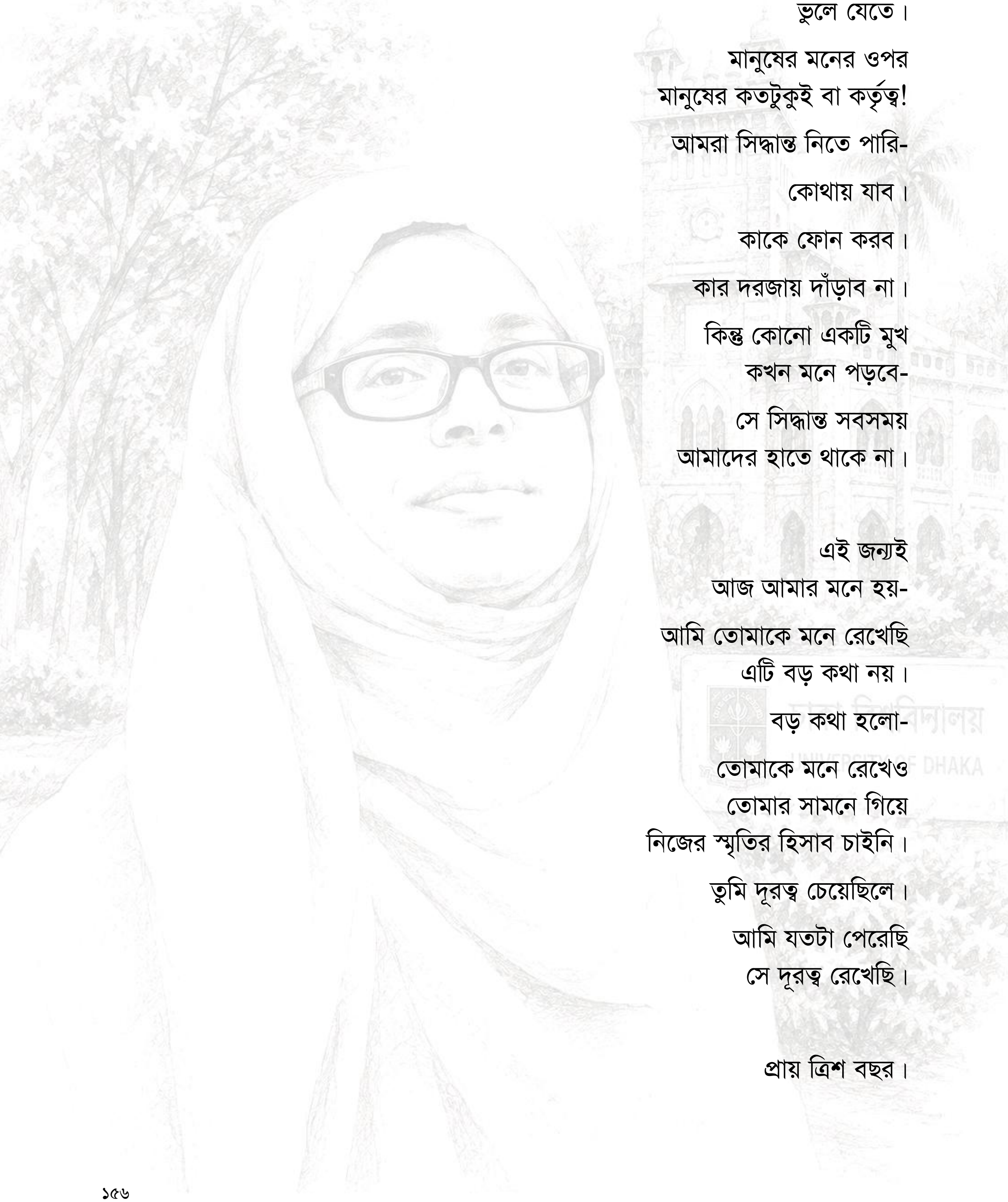

বরং হয়তো চেয়েছি
ভুলে যেতে।

মানুষের মনের ওপর
মানুষের কতটুকুই বা কর্তৃত্ব!

আমরা সিদ্ধান্ত নিতে পারি-

কোথায় যাব।

কাকে ফোন করব।

কার দরজায় দাঁড়াব না।

কিন্তু কোনো একটি মুখ
কখন মনে পড়বে-

সে সিদ্ধান্ত সবসময়
আমাদের হাতে থাকে না।

এই জন্যই
আজ আমার মনে হয়-

আমি তোমাকে মনে রেখেছি
এটি বড় কথা নয়।

বড় কথা হলো-

তোমাকে মনে রেখেও
তোমার সামনে গিয়ে
নিজের স্মৃতির হিসাব চাইনি।

তুমি দূরত্ব চেয়েছিলে।

আমি যতটা পেরেছি
সে দূরত্ব রেখেছি।

প্রায় ত্রিশ বছর।

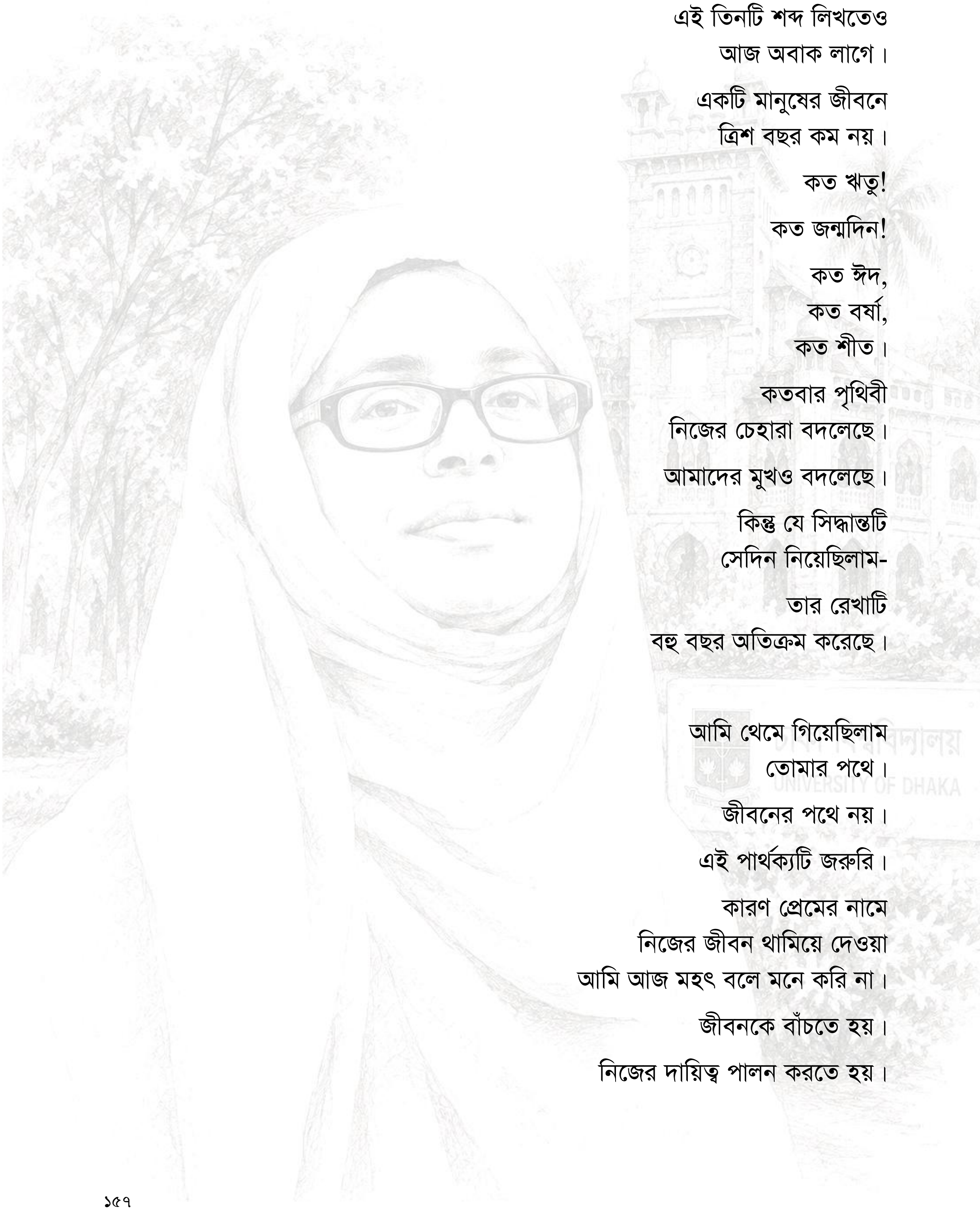

এই তিনটি শব্দ লিখতেও
আজ অবাক লাগে।

একটি মানুষের জীবনে
ত্রিশ বছর কম নয়।

কত ঋতু!

কত জন্মদিন!

কত ঈদ,
কত বর্ষা,
কত শীত।

কতবার পৃথিবী
নিজের চেহারা বদলেছে।

আমাদের মুখও বদলেছে।

কিন্তু যে সিদ্ধান্তটি
সেদিন নিয়েছিলাম-

তার রেখাটি
বহু বছর অতিক্রম করেছে।

আমি থেমে গিয়েছিলাম
তোমার পথে।

জীবনের পথে নয়।

এই পার্থক্যটি জরুরি।

কারণ প্রেমের নামে
নিজের জীবন থামিয়ে দেওয়া
আমি আজ মহৎ বলে মনে করি না।

জীবনকে বাঁচতে হয়।

নিজের দায়িত্ব পালন করতে হয়।

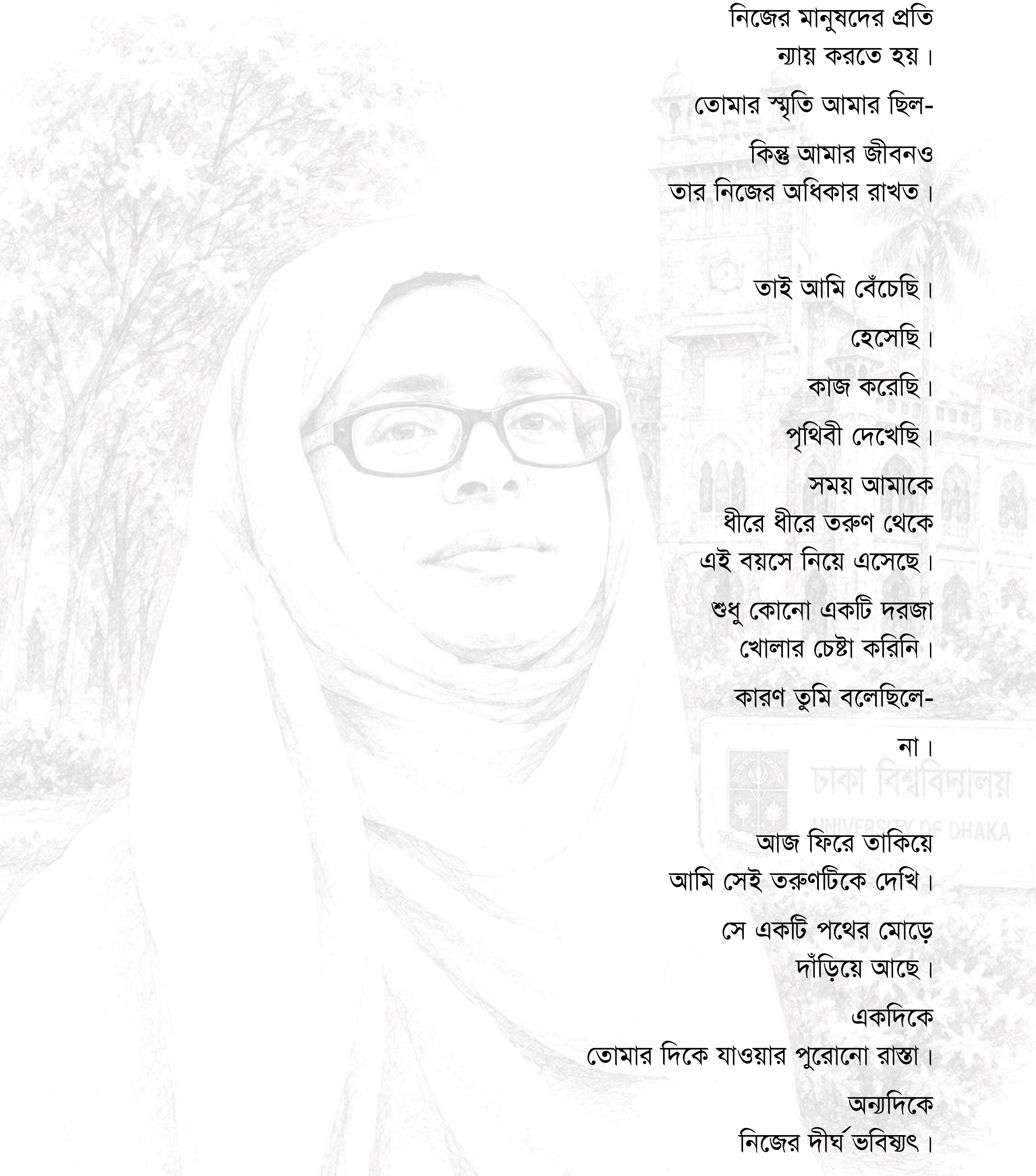

নিজের মানুষদের প্রতি
ন্যায় করতে হয়।

তোমার স্মৃতি আমার ছিল-

কিন্তু আমার জীবনও
তার নিজের অধিকার রাখত।

তাই আমি বেঁচেছি।

হেসেছি।

কাজ করেছি।

পৃথিবী দেখেছি।

সময় আমাকে
ধীরে ধীরে তরুণ থেকে
এই বয়সে নিয়ে এসেছে।

শুধু কোনো একটি দরজা
খোলার চেষ্টা করিনি।

কারণ তুমি বলেছিলে-

না।

আজ ফিরে তাকিয়ে
আমি সেই তরুণটিকে দেখি।

সে একটি পথের মোড়ে
দাঁড়িয়ে আছে।

একদিকে
তোমার দিকে যাওয়ার পুরোনো রাস্তা।

অন্যদিকে
নিজের দীর্ঘ ভবিষ্যৎ।

সে পেছন ফিরে
আরেকবার তাকায়।

তারপর ধীরে ধীরে
অন্য পথে হাঁটা শুরু করে।

তার চোখে জল আছে কি না
আমি জানি না।

কিন্তু তার পা আর ফিরে যায় না।

আমি আজ তার পাশে গিয়ে বলি-

"তুমি ভালোবাসা থামাতে পারোনি।
তার প্রয়োজনও ছিল না।

তুমি শুধু নিজেকে থামিয়েছিলে
যেখানে তোমার আর এগোনোর অধিকার ছিল না।

সেদিন তুমি তাকে হারাওনি শুধু-
সেদিন প্রথম শিখেছিলে,
কখন থেমে যেতে হয়।"

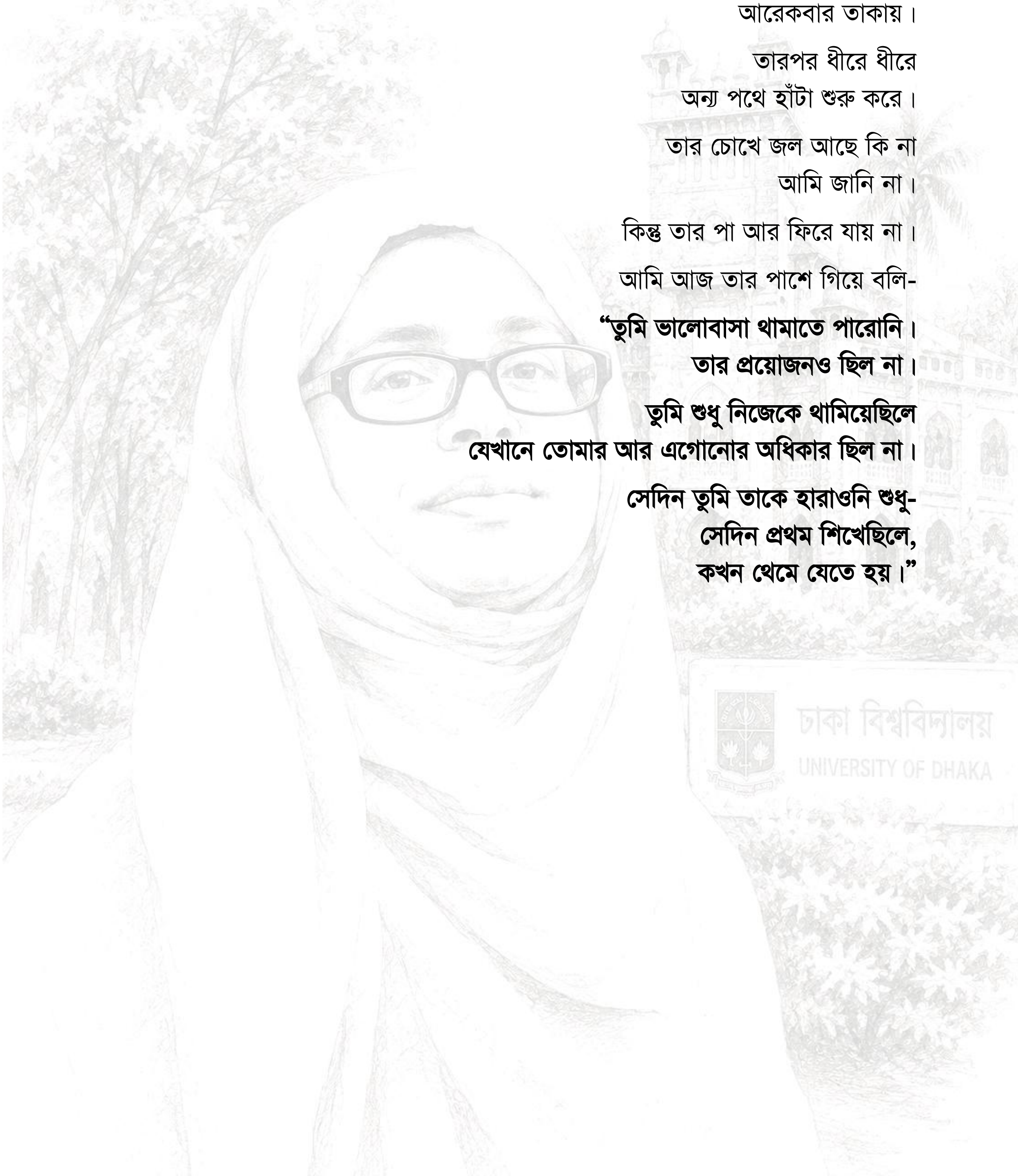

তোমার সীমানার বাইরে

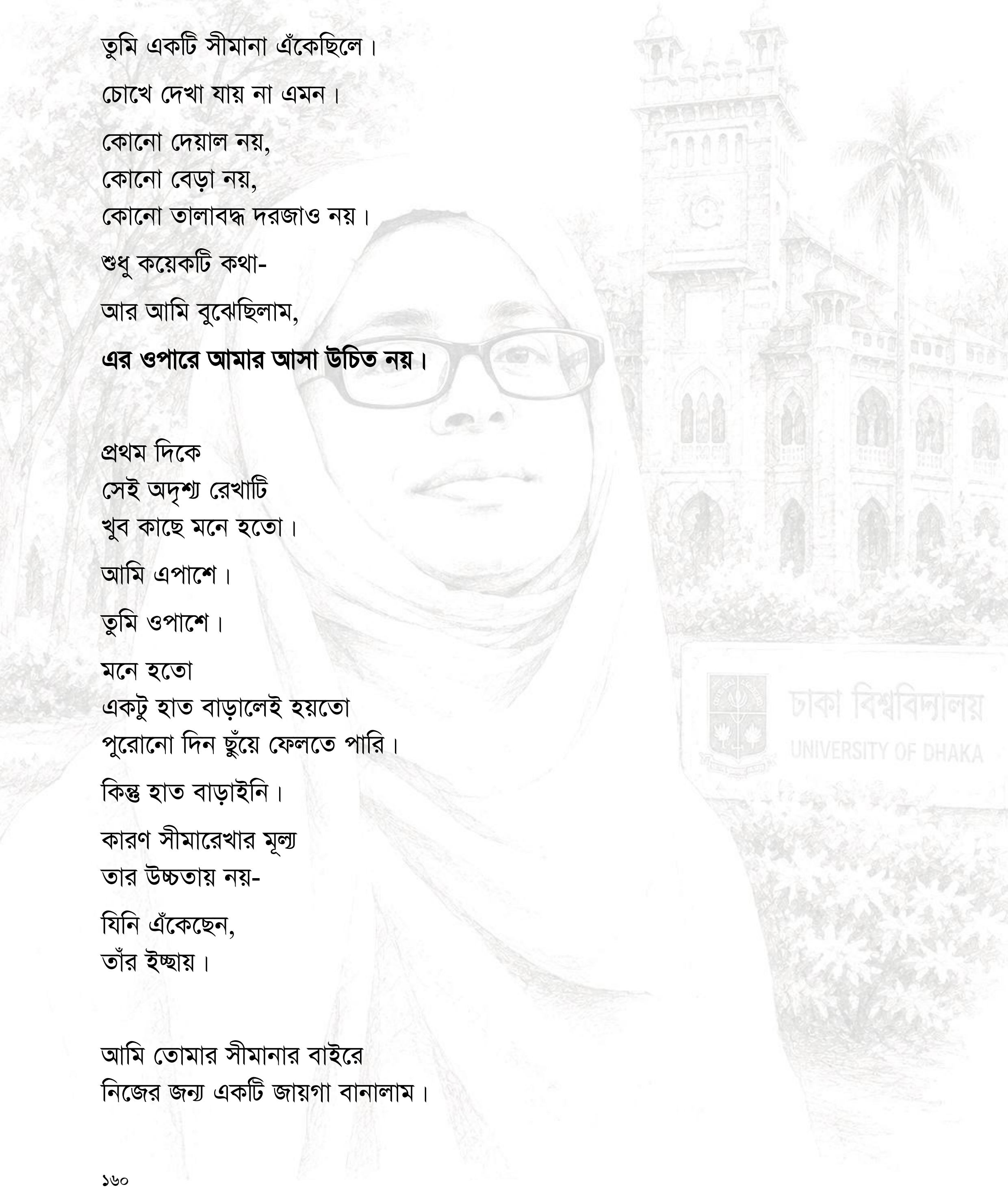

তুমি একটি সীমানা এঁকেছিলে।

চোখে দেখা যায় না এমন।

কোনো দেয়াল নয়,
কোনো বেড়া নয়,
কোনো তালাবদ্ধ দরজাও নয়।

শুধু কয়েকটি কথা-

আর আমি বুঝেছিলাম,

এর ওপারে আমার আসা উচিত নয়।

প্রথম দিকে
সেই অদৃশ্য রেখাটি
খুব কাছে মনে হতো।

আমি এপাশে।

তুমি ওপাশে।

মনে হতো
একটু হাত বাড়ালেই হয়তো
পুরোনো দিন ছুঁয়ে ফেলতে পারি।

কিন্তু হাত বাড়াইনি।

কারণ সীমারেখার মূল্য
তার উচ্চতায় নয়-

যিনি এঁকেছেন,
তাঁর ইচ্ছায়।

আমি তোমার সীমানার বাইরে
নিজের জন্য একটি জায়গা বানালাম।

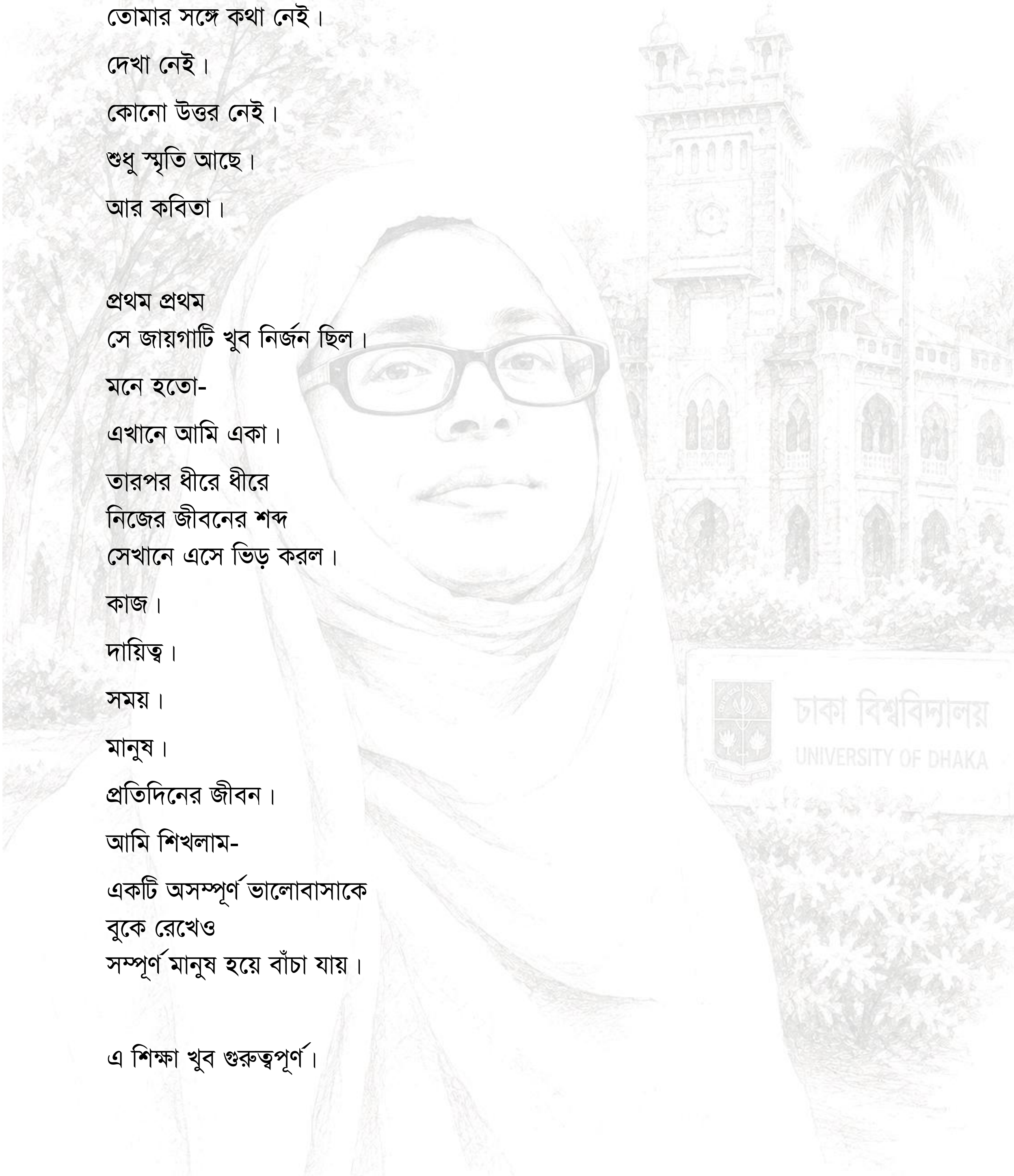

সেখানে তোমাকে পাওয়া যায় না।

তোমার সঙ্গে কথা নেই।

দেখা নেই।

কোনো উত্তর নেই।

শুধু স্মৃতি আছে।

আর কবিতা।

প্রথম প্রথম
সে জায়গাটি খুব নির্জন ছিল।

মনে হতো-

এখানে আমি একা।

তারপর ধীরে ধীরে
নিজের জীবনের শব্দ
সেখানে এসে ভিড় করল।

কাজ।

দায়িত্ব।

সময়।

মানুষ।

প্রতিদিনের জীবন।

আমি শিখলাম-

একটি অসম্পূর্ণ ভালোবাসাকে
বুকে রেখেও
সম্পূর্ণ মানুষ হয়ে বাঁচা যায়।

এ শিক্ষা খুব গুরুত্বপূর্ণ।

কারণ আমি চাই না
আমার এই কবিতাগুলো
কখনো এমন কথা বলুক-

যেন তোমাকে না-পাওয়া
আমার জীবনকে অর্থহীন করেছে।

তা সত্য নয়।

জীবন অনেক বড়।

একটি মানুষকে ভালোবাসা
তার একটি গভীর অংশ হতে পারে,

কিন্তু জীবন শুধু
একটি মানুষ নয়।

আমি বেঁচেছি।

আমার নিজস্ব আনন্দ ছিল।

নিজস্ব অর্জন।

নিজস্ব ব্যর্থতা।

নিজস্ব সম্পর্ক ও দায়িত্ব।

তুমি ছিলে
আমার স্মৃতির একটি গভীর নদী-

সমস্ত পৃথিবী নও।

হয়তো এই কারণেই
তোমাকে এত বছর মনে রেখেও
তোমার দরজায় যাইনি।

আমার জীবনকে
তোমার উত্তর পাওয়ার অপেক্ষায়
স্থির করে রাখিনি।

আমি জানতাম-

তোমার সীমানার বাইরে
আমারও একটি পৃথিবী আছে।

সেখানে আমাকে
আমার মতো করেই বাঁচতে হবে।

তবু কখনো গভীর রাতে
সেই সীমানার কাছে এসে দাঁড়িয়েছে স্মৃতি।

সে বলেছে-

একবার?

একবার শুধু খবর নিই?

দেখি কেমন আছে?

আমি নিজেকে জিজ্ঞেস করেছি-

এই ইচ্ছাটি কার জন্য?

তার জন্য?

নাকি আমার জন্য?

যদি শুধু আমার কৌতূহল মেটাতে
তার চাওয়া দূরত্ব ভাঙতে হয়,

তবে না।

আমি ফিরে এসেছি।

ভালোবাসা তখন
একটি নতুন ভাষা শিখল।

আগে তার ভাষা ছিল-

“দেখতে চাই।”

তারপর হলো-

“কথা বলতে চাই।”

আরও পরে-

"তোমাকে চাই।"

শেষ পর্যন্ত এসে দাঁড়াল-

"তোমার শান্তি নষ্ট করতে চাই না।"

এই শেষ বাক্যটি বলতে
আমার বহু বছর লেগেছে।

তোমার সীমানার বাইরে থেকে
আমি একসময় বুঝলাম-

ভালোবাসা সবসময়
দুটি মানুষের মাঝের সম্পর্ক নয়।

কখনো সেটি
নিজের ভেতরের একটি নৈতিক অবস্থানও।

আমি কাউকে ভালোবাসি-

তাই তার স্বাধীনতা
আমার কাছে গুরুত্বপূর্ণ।

আমি তাকে ভালোবাসি-

তাই তার অস্বস্তিকে
ছোট করে দেখব না।

আমি তাকে ভালোবাসি-

তাই সে যে দরজা বন্ধ করেছে
তার সামনে বারবার
কড়া নাড়ব না।

এই কবিতাগুলো লিখছি-

এটিও তাই
তোমার সীমানার ভেতরে প্রবেশ নয়।

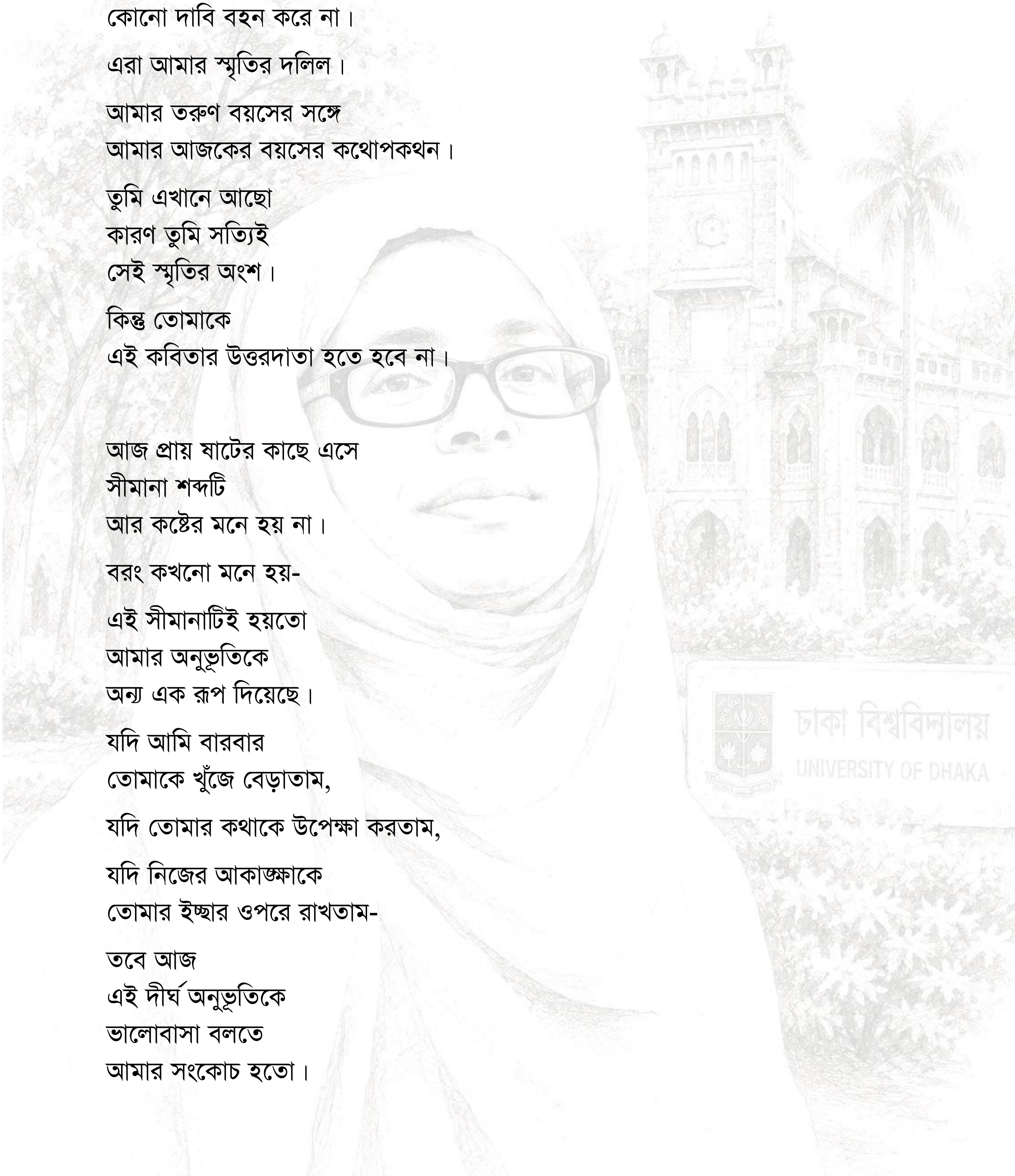

এগুলো তোমার কাছে
কোনো দাবি বহন করে না।

এরা আমার স্মৃতির দলিল।

আমার তরুণ বয়সের সঙ্গে
আমার আজকের বয়সের কথোপকথন।

তুমি এখানে আছো
কারণ তুমি সত্যিই
সেই স্মৃতির অংশ।

কিন্তু তোমাকে
এই কবিতার উত্তরদাতা হতে হবে না।

আজ প্রায় ষাটের কাছে এসে
সীমানা শব্দটি
আর কষ্টের মনে হয় না।

বরং কখনো মনে হয়-

এই সীমানাটিই হয়তো
আমার অনুভূতিকে
অন্য এক রূপ দিয়েছে।

যদি আমি বারবার
তোমাকে খুঁজে বেড়াতাম,

যদি তোমার কথাকে উপেক্ষা করতাম,

যদি নিজের আকাঙ্ক্ষাকে
তোমার ইচ্ছার ওপরে রাখতাম-

তবে আজ
এই দীর্ঘ অনুভূতিকে
ভালোবাসা বলতে
আমার সংকোচ হতো।

তুমি আমাকে একটি দূরত্ব দিয়েছিলে।

সময় সেই দূরত্বকে
বছরে পরিণত করেছে।

এক বছর।

পাঁচ।

দশ।

বিশ।

প্রায় ত্রিশ।

দূরত্ব এত দীর্ঘ হয়েছে
যে এখন আমাদের মাঝখানে
শুধু রাস্তা বা শহর নয়-

একটি সম্পূর্ণ জীবনকাল দাঁড়িয়ে।

তবু দূরত্বের একটি
আশ্চর্য ক্ষমতা আছে।

সে মানুষকে বুঝিয়ে দেয়-

কোন জিনিসটি কাছে থাকার
অভ্যাস ছিল,

আর কোনটি সত্যিই
হৃদয়ে ছিল।

অনেক কিছু
দূরে গেলে মুছে যায়।

তুমি পুরোপুরি মুছে যাওনি।

কিন্তু তোমাকে মনে থাকা মানেই
তোমার কাছে ফিরে যাওয়ার
অধিকার তৈরি হয় না।

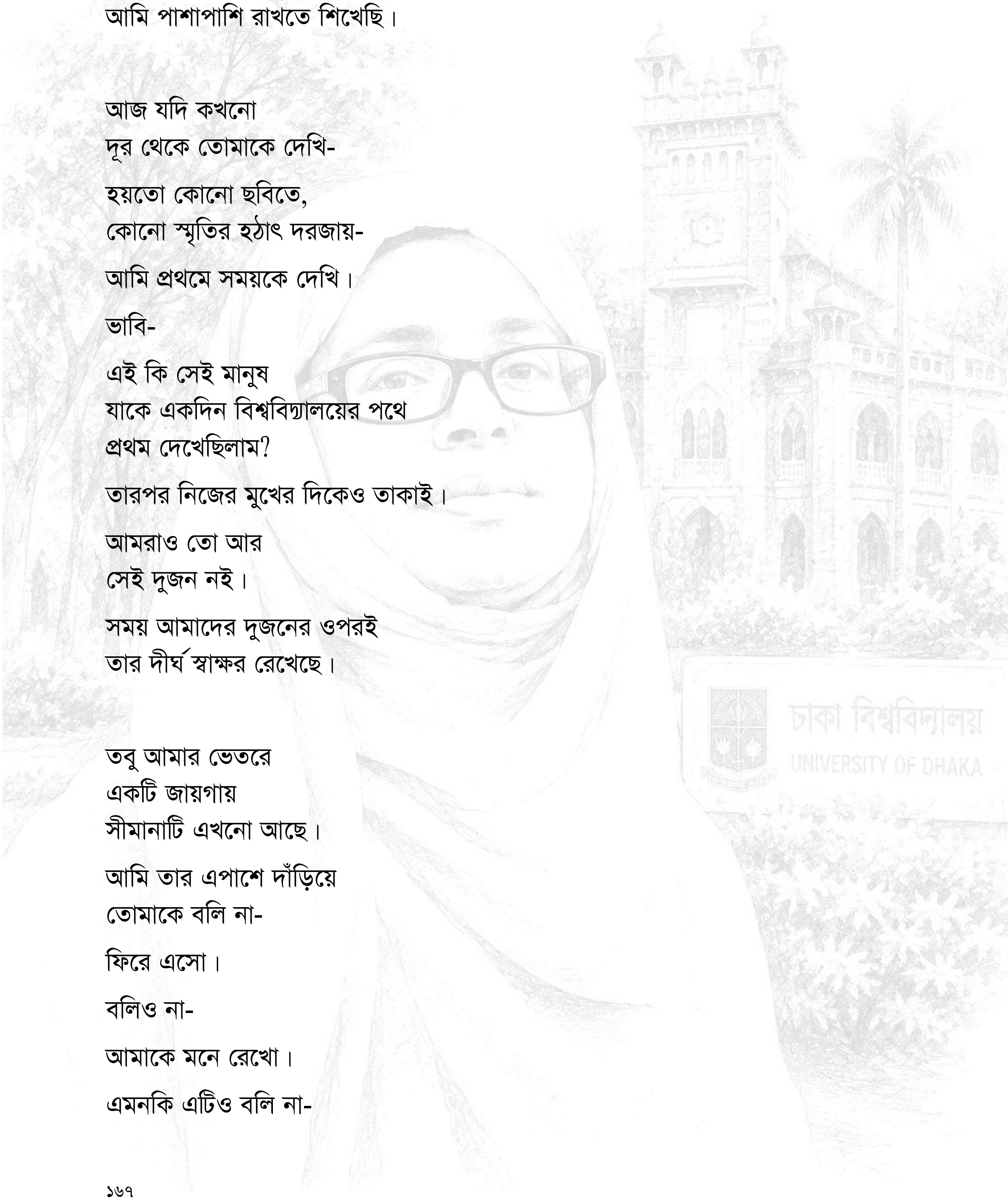

এই দুটি সত্য
আমি পাশাপাশি রাখতে শিখেছি।

আজ যদি কখনো
দূর থেকে তোমাকে দেখি-

হয়তো কোনো ছবিতে,
কোনো স্মৃতির হঠাৎ দরজায়-

আমি প্রথমে সময়কে দেখি।

ভাবি-

এই কি সেই মানুষ
যাকে একদিন বিশ্ববিদ্যালয়ের পথে
প্রথম দেখেছিলাম?

তারপর নিজের মুখের দিকেও তাকাই।

আমরাও তো আর
সেই দুজন নই।

সময় আমাদের দুজনের ওপরই
তার দীর্ঘ স্বাক্ষর রেখেছে।

তবু আমার ভেতরে
একটি জায়গায়
সীমানাটি এখনো আছে।

আমি তার এপাশে দাঁড়িয়ে
তোমাকে বলি না-

ফিরে এসো।

বলিও না-

আমাকে মনে রেখো।

এমনকি এটিও বলি না-

আমার কবিতা পড়ো।

শুধু মনে মনে বলি-

তুমি ভালো থেকো।

এই চারটি শব্দের মধ্যে
এখন আমার প্রায় সমস্ত
ভালোবাসা এসে আশ্রয় নিয়েছে।

তোমার সীমানার বাইরে
এত বছর দাঁড়িয়ে থেকে
আমি একটি কথা শিখেছি-

দূরত্ব সবসময়
প্রেমের বিপরীত নয়।

কখনো দূরত্বই
প্রেমকে তার সবচেয়ে কঠিন
সত্যটি শেখায়-

যাকে ভালোবাসি,
তার জীবনে আমার জন্য জায়গা থাকতেই হবে-
এমন কোনো নিয়ম নেই।

কিন্তু আমার হৃদয়ে
তার জন্য একটি জায়গা আছে-

সেটি রাখব কি না,
সেটি আমার দায়িত্ব।

আমি রেখেছি।

চুপচাপ।

তোমার সীমানার বাইরে।

কোনো দরজা না ঠেলে,
কোনো উত্তর না চেয়ে,
কোনো অধিকার ঘোষণা না করে।

শুধু কখনো কোনো রাতে
পুরোনো পাণ্ডুলিপির হারানো শব্দেরা
ফিরে এলে লিখেছি-

"তুমি তোমার পৃথিবীতে স্বাধীন থেকো;
আমি আমার পৃথিবীতে তোমার স্মৃতিটুকু রাখি।
দুটি পৃথিবীর মাঝখানে যে সীমানা তুমি এঁকেছিলে,
আমার ভালোবাসা আজও তার কাছে এসে থামে-
কিন্তু তাকে অতিক্রম করে না।"

শেষবার সামনে থেকে

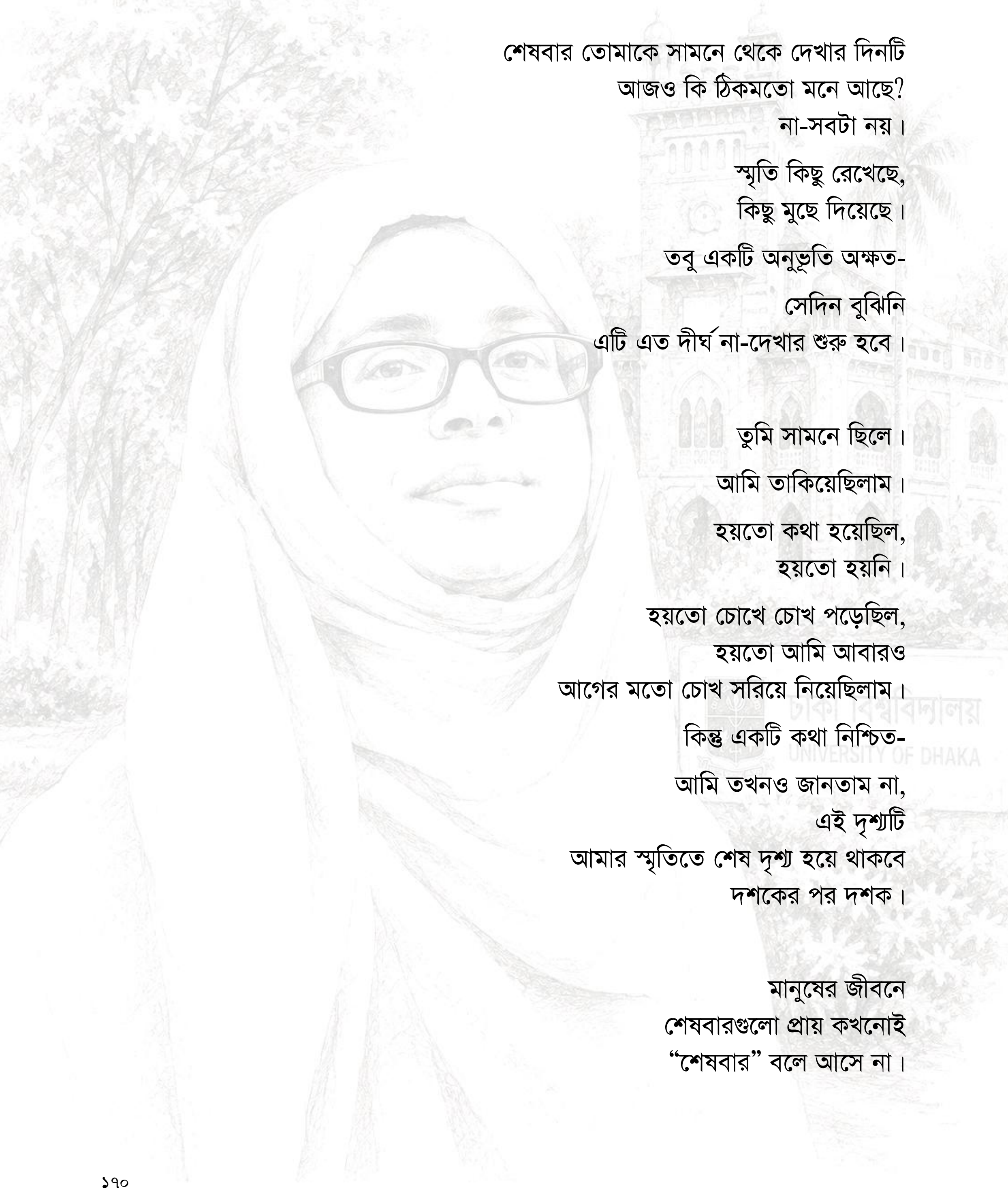

শেষবার তোমাকে সামনে থেকে দেখার দিনটি
আজও কি ঠিকমতো মনে আছে?
না-সবটা নয়।

স্মৃতি কিছু রেখেছে,
কিছু মুছে দিয়েছে।

তবু একটি অনুভূতি অক্ষত-

সেদিন বুঝিনি
এটি এত দীর্ঘ না-দেখার শুরু হবে।

তুমি সামনে ছিলে।

আমি তাকিয়েছিলাম।

হয়তো কথা হয়েছিল,
হয়তো হয়নি।

হয়তো চোখে চোখ পড়েছিল,
হয়তো আমি আবারও
আগের মতো চোখ সরিয়ে নিয়েছিলাম।

কিন্তু একটি কথা নিশ্চিত-
আমি তখনও জানতাম না,
এই দৃশ্যটি
আমার স্মৃতিতে শেষ দৃশ্য হয়ে থাকবে
দশকের পর দশক।

মানুষের জীবনে
শেষবারগুলো প্রায় কখনোই
“শেষবার” বলে আসে না।

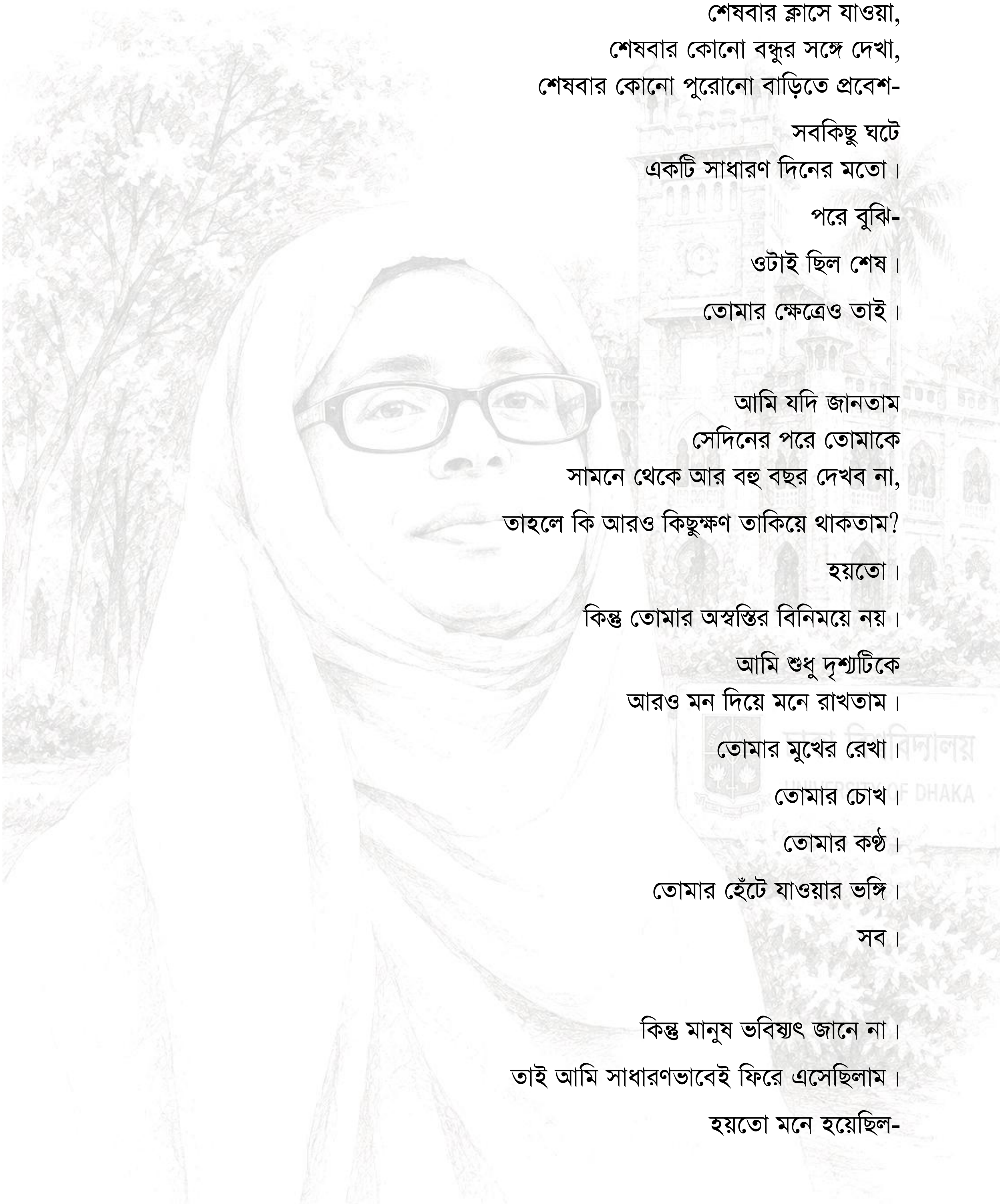

শেষবার ক্লাসে যাওয়া,
শেষবার কোনো বন্ধুর সঙ্গে দেখা,
শেষবার কোনো পুরোনো বাড়িতে প্রবেশ-
সবকিছু ঘটে
একটি সাধারণ দিনের মতো।
পরে বুঝি-
ওটাই ছিল শেষ।
তোমার ক্ষেত্রেও তাই।

আমি যদি জানতাম
সেদিনের পরে তোমাকে
সামনে থেকে আর বহু বছর দেখব না,
তাহলে কি আরও কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকতাম?
হয়তো।
কিন্তু তোমার অস্বস্তির বিনিময়ে নয়।
আমি শুধু দৃশ্যটিকে
আরও মন দিয়ে মনে রাখতাম।
তোমার মুখের রেখা।
তোমার চোখ।
তোমার কণ্ঠ।
তোমার হেঁটে যাওয়ার ভঙ্গি।
সব।

কিন্তু মানুষ ভবিষ্যৎ জানে না।
তাই আমি সাধারণভাবেই ফিরে এসেছিলাম।
হয়তো মনে হয়েছিল-

আবার কখনো দেখা হবে।

এই তো একই শহর,
একই পৃথিবী।

কোথায় যাবে মানুষ?

আজ এত বছর পরে
এই প্রশ্ন শুনলে
সময় যেন মৃদু হেসে ওঠে।

মানুষ একই পৃথিবীতে থেকেও
এক জীবনের দূরত্বে চলে যেতে পারে।

তারপর সত্যিই দূরত্ব এল।

প্রথমে দিন।

তারপর মাস।

তারপর বছর।

একসময় "শেষবার দেখা"
একটি স্মৃতি হয়ে গেল।

আর সেই স্মৃতির ওপর
সময় ধুলো ফেলতে লাগল।

কিন্তু পুরোপুরি ঢাকতে পারল না।

কখনো মনে হয়েছে-

শেষবার তোমার মুখে
কী অভিব্যক্তি ছিল?

তুমি কি ক্লান্ত ছিলে?

শান্ত?

অভিমানী?

নাকি একেবারেই স্বাভাবিক?

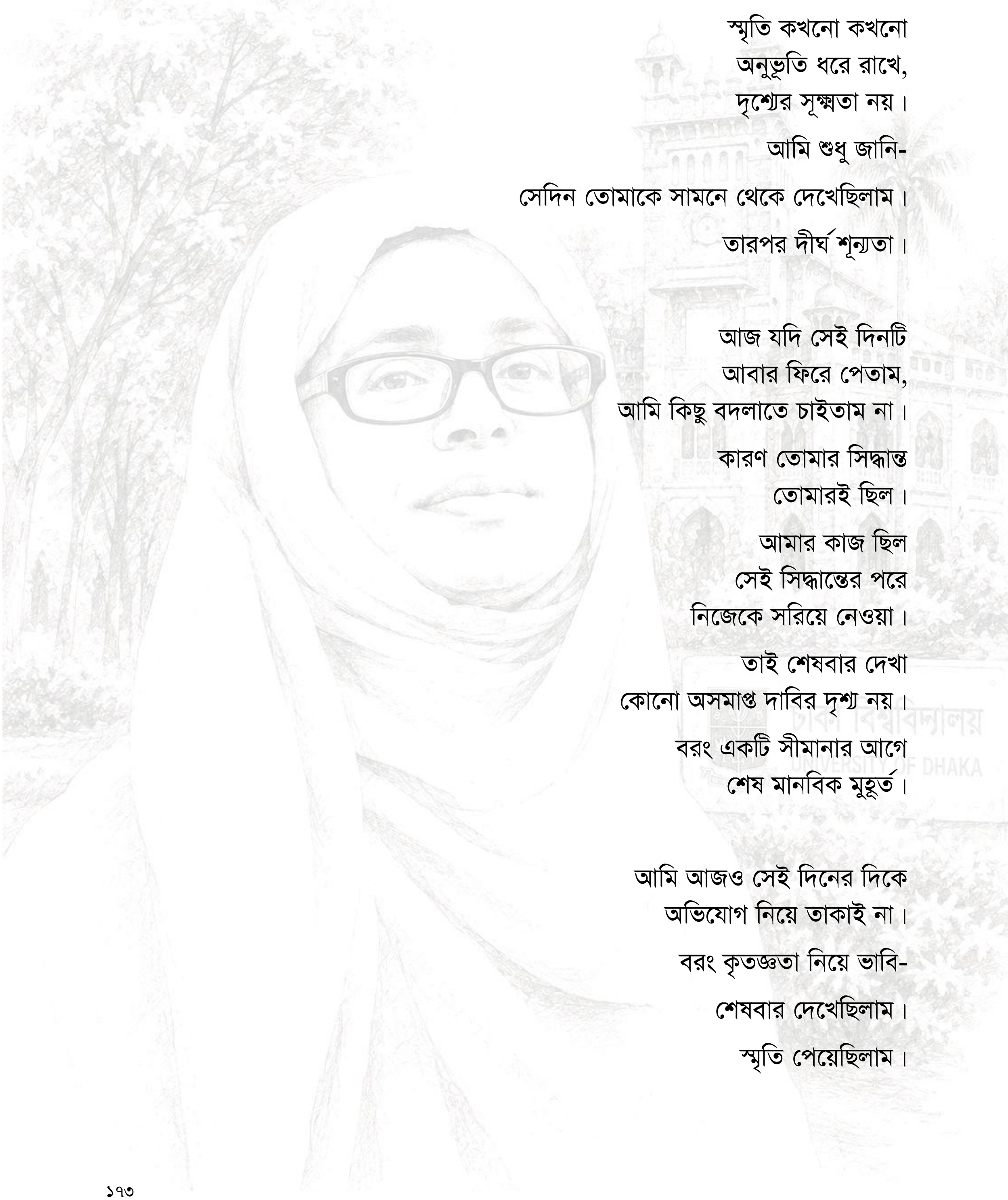

জানি না।

স্মৃতি কখনো কখনো
অনুভূতি ধরে রাখে,
দৃশ্যের সূক্ষ্মতা নয়।

আমি শুধু জানি-

সেদিন তোমাকে সামনে থেকে দেখেছিলাম।

তারপর দীর্ঘ শূন্যতা।

আজ যদি সেই দিনটি
আবার ফিরে পেতাম,
আমি কিছু বদলাতে চাইতাম না।

কারণ তোমার সিদ্ধান্ত
তোমারই ছিল।

আমার কাজ ছিল
সেই সিদ্ধান্তের পরে
নিজেকে সরিয়ে নেওয়া।

তাই শেষবার দেখা
কোনো অসমাপ্ত দাবির দৃশ্য নয়।

বরং একটি সীমানার আগে
শেষ মানবিক মুহূর্ত।

আমি আজও সেই দিনের দিকে
অভিযোগ নিয়ে তাকাই না।

বরং কৃতজ্ঞতা নিয়ে ভাবি-

শেষবার দেখেছিলাম।

স্মৃতি পেয়েছিলাম।

একটি মুখ
আমার জীবনের এক অংশ হয়ে
থেকে গিয়েছিল।

সময়ের কাছে
আমার শুধু একটি অনুরোধ ছিল যেন-
মুখটি পুরোপুরি মুছে দিও না।
কিছু রেখো।
একটু আলো।
একটু দৃষ্টি।
একটি বিকেল।
একটি হাঁটা।
এইটুকুই।
সময় সব শোনেনি।
অনেক কিছু নিয়ে গেছে।
তবু কিছু রেখেছে।

আজ যদি আয়নায় নিজের মুখ দেখি
এবং সময়ের রেখা দেখি,
ভাবি-
তোমার মুখেও নিশ্চয়ই
সময় তার দীর্ঘ স্বাক্ষর রেখেছে।
আমরা দুজনেই বদলেছি।
শুধু আমার স্মৃতির শেষ দৃশ্যটি
বদলায়নি।
সেখানে তুমি
এখনও সেই বয়সে।

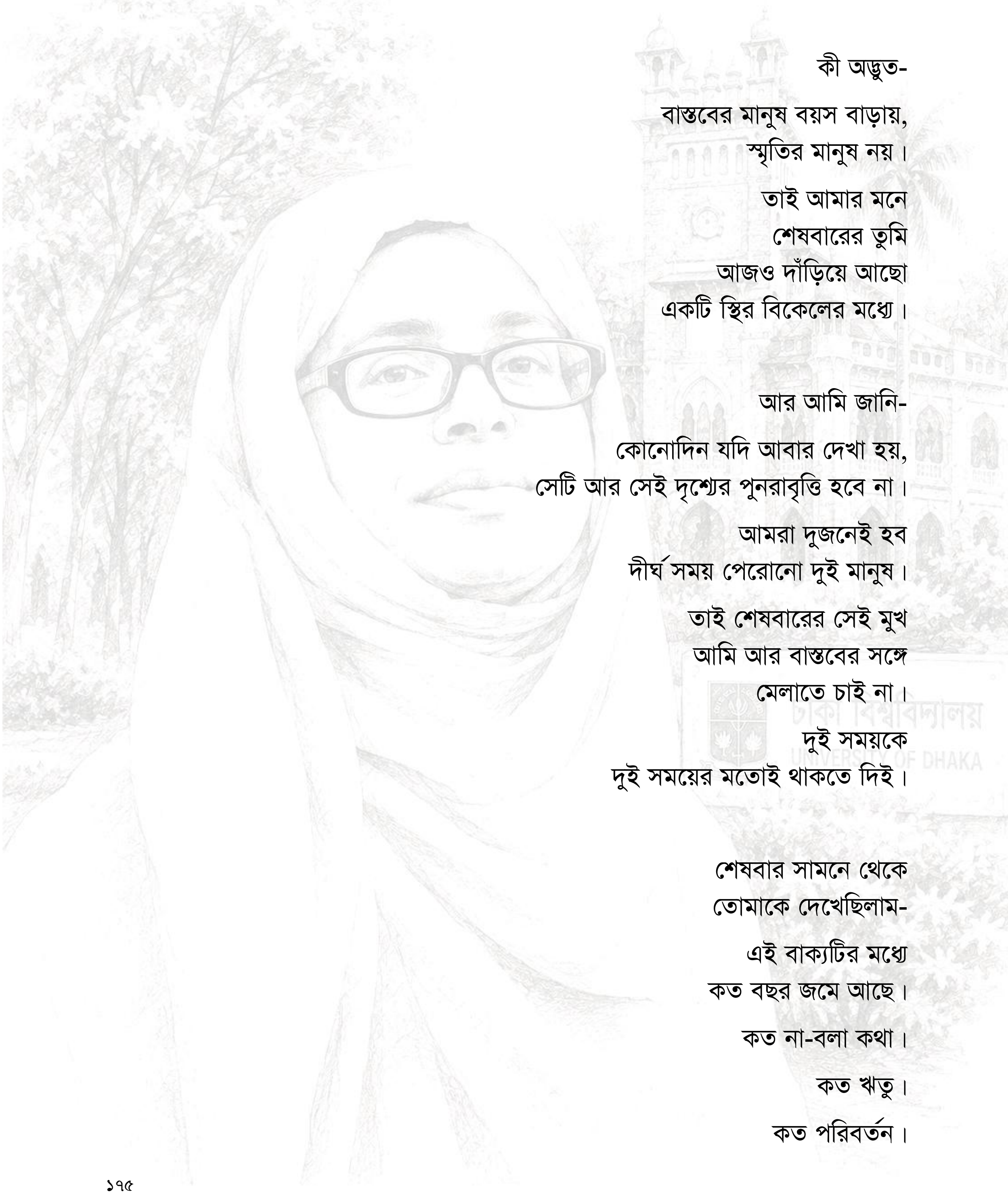

আমি এখনও সেই মানুষ।

কী অদ্ভুত-
বাস্তবের মানুষ বয়স বাড়ায়,
স্মৃতির মানুষ নয়।
তাই আমার মনে
শেষবারের তুমি
আজও দাঁড়িয়ে আছো
একটি স্থির বিকেলের মধ্যে।

আর আমি জানি-
কোনোদিন যদি আবার দেখা হয়,
সেটি আর সেই দৃশ্যের পুনরাবৃত্তি হবে না।
আমরা দুজনেই হব
দীর্ঘ সময় পেরোনো দুই মানুষ।
তাই শেষবারের সেই মুখ
আমি আর বাস্তবের সঙ্গে
মেলাতে চাই না।
দুই সময়কে
দুই সময়ের মতোই থাকতে দিই।

শেষবার সামনে থেকে
তোমাকে দেখেছিলাম-
এই বাক্যটির মধ্যে
কত বছর জমে আছে।
কত না-বলা কথা।
কত ঋতু।
কত পরিবর্তন।

কত জীবন।

আজ শুধু মনে মনে বলি-

সেদিন বুঝিনি
তুমি আমার চোখের সামনে থেকে
এত দীর্ঘ সময়ের জন্য সরে যাচ্ছ।
কিন্তু ভালোই হয়েছে-
যদি জানতাম, হয়তো বিদায়টাকে ভারী করতাম।
তুমি সাধারণভাবেই চলে গিয়েছিলে,
তাই স্মৃতিটিও আজও
একটি সাধারণ বিকেলের মতোই সুন্দর।

তারপর ত্রিশ বছর

তারপর ত্রিশ বছর।

চারটি শব্দ।

কিন্তু চারটি শব্দের মধ্যে
কত জীবন ধরে?

ত্রিশটি বর্ষা।

ত্রিশটি শীত।

ত্রিশটি বসন্ত।

কত জন্মদিন।

কত সকাল।

কত রাত।

প্রথম বছর
হয়তো মনে হয়েছে-

এই তো কিছুদিন।

তারপর সময় যাবে।

সব স্বাভাবিক হবে।

দ্বিতীয় বছর
স্মৃতি একটু নরম হলো।

তৃতীয় বছর
জীবন আরও ব্যস্ত।

তারপর?

গোনা বন্ধ।

সময় মানুষকে শেখায়-

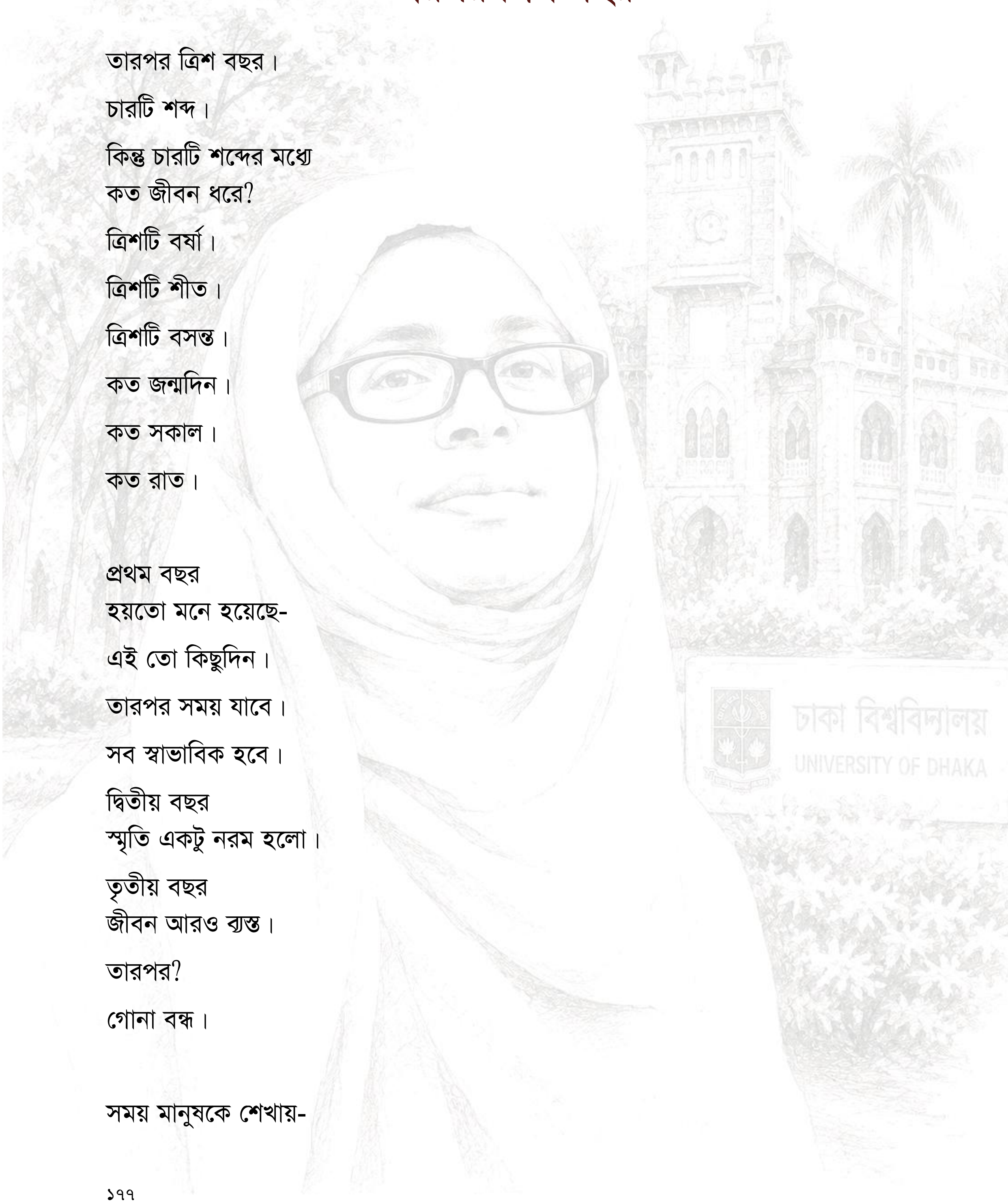

প্রতিদিন মনে না পড়লেও
কিছু স্মৃতি থাকে।

তারা দৈনিক উপস্থিত নয়,
কিন্তু স্থায়ী।

যেমন পুরোনো বই
আলমারির ওপরে রাখা।

প্রতিদিন খোলা হয় না।

তবু জানি-

আছে।

তোমার স্মৃতিও
তেমন হয়ে গেল।

ত্রিশ বছরে
পৃথিবী কত বদলেছে।

আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের পথ বদলেছে হয়তো।

ভবন বেড়েছে।

মানুষ বদলেছে।

প্রজন্ম বদলেছে।

প্রযুক্তি বদলেছে।

ছবি কাগজ থেকে
স্ক্রিনে চলে এসেছে।

চিঠি বদলে গেছে
তাৎক্ষণিক বার্তায়।

কিন্তু আমাদের গল্প
সেই পুরোনো যুগেই
কী অদ্ভুতভাবে থেমে আছে।

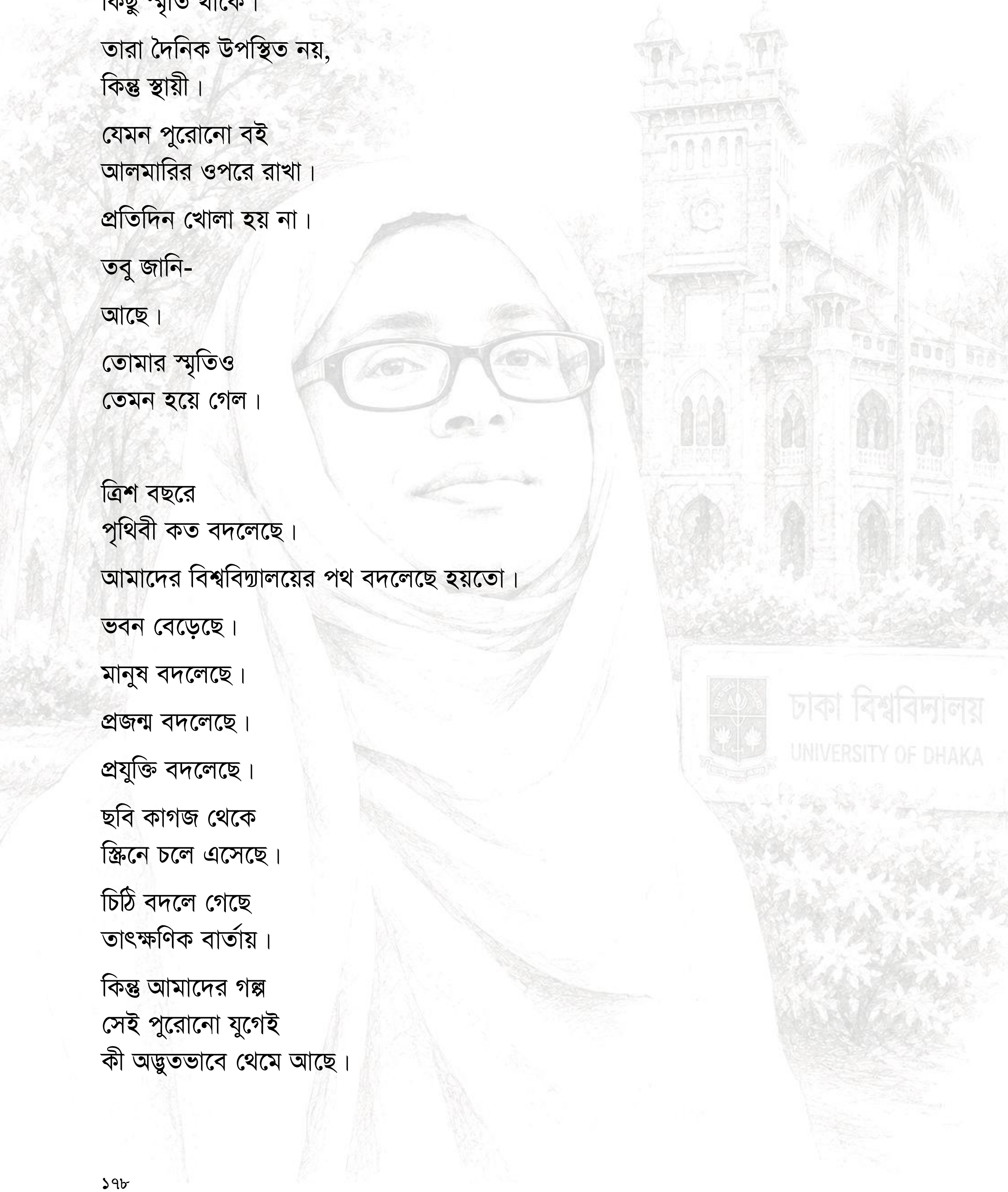

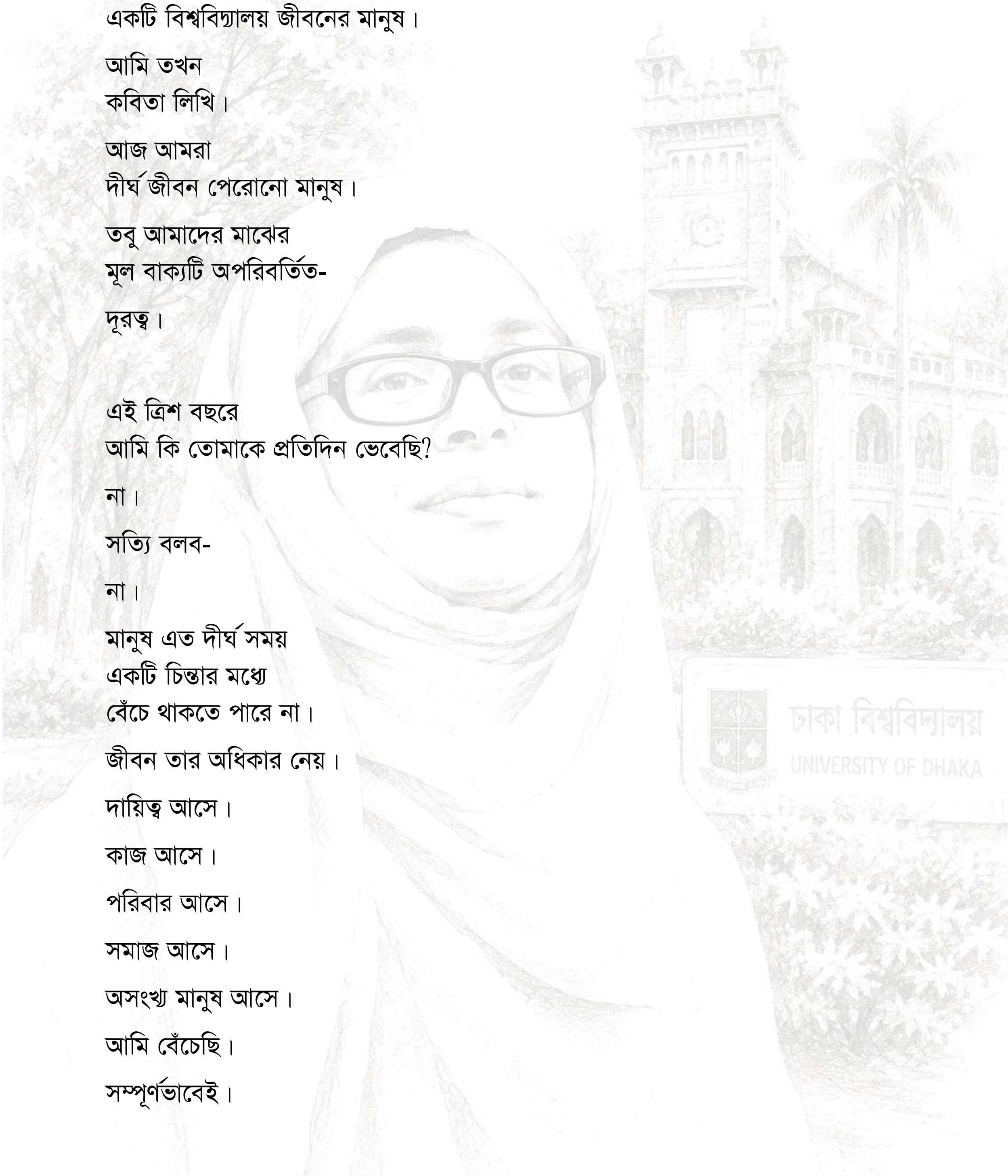

তুমি তখন
একটি বিশ্ববিদ্যালয় জীবনের মানুষ।

আমি তখন
কবিতা লিখি।

আজ আমরা
দীর্ঘ জীবন পেরোনো মানুষ।

তবু আমাদের মাঝের
মূল বাক্যটি অপরিবর্তিত-

দূরত্ব।

এই ত্রিশ বছরে
আমি কি তোমাকে প্রতিদিন ভেবেছি?

না।

সত্যি বলব-

না।

মানুষ এত দীর্ঘ সময়
একটি চিন্তার মধ্যে
বেঁচে থাকতে পারে না।

জীবন তার অধিকার নেয়।

দায়িত্ব আসে।

কাজ আসে।

পরিবার আসে।

সমাজ আসে।

অসংখ্য মানুষ আসে।

আমি বেঁচেছি।

সম্পূর্ণভাবেই।

তবু কিছু রাতে
তুমি ফিরে এসেছ।

কোনো কারণ ছাড়াই।

কখনো একটি গান নয়-
শুধু বাতাসের গন্ধ।

কখনো কোনো পথ।

কখনো এক টুকরো বিকেল।

কখনো কোনো মেয়ের
চশমার আড়ালের দৃষ্টি।

কখনো গোলাপি রং।

হঠাৎ মনে হয়েছে-

কোথাও যেন
একটি পুরোনো দরজা খুলেছে।

আমি সেখানে ঢুকেছি।

দেখেছি-

ক্যাম্পাস।

করিডোর।

বেঞ্চ।

পথ।

আর তুমি।

তারপর দরজা বন্ধ করেছি।

বর্তমানে ফিরে এসেছি।

এভাবেই স্মৃতি
বেঁচে ছিল।

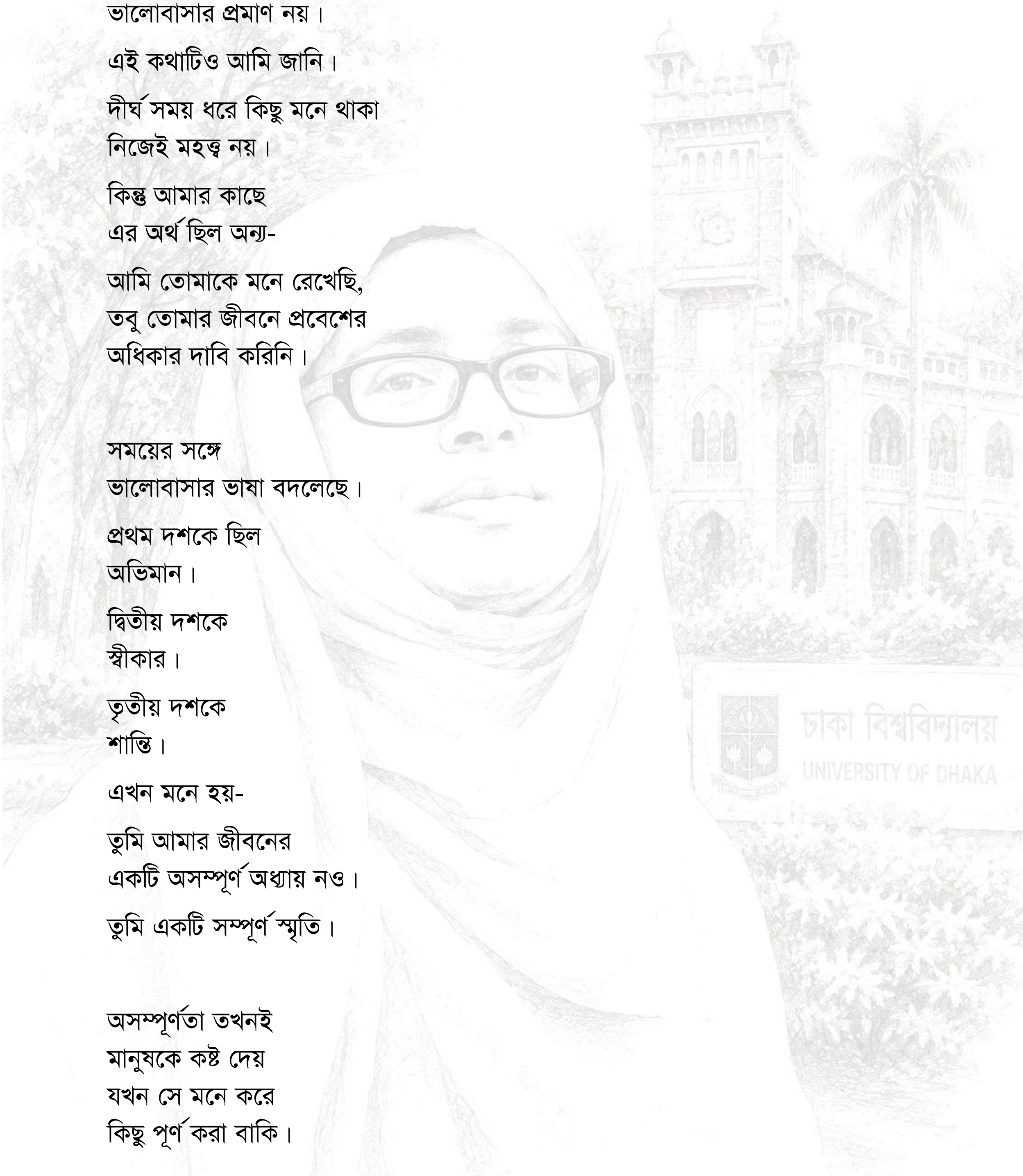

ত্রিশ বছর
ভালোবাসার প্রমাণ নয়।

এই কথাটিও আমি জানি।

দীর্ঘ সময় ধরে কিছু মনে থাকা
নিজেই মহত্ত্ব নয়।

কিন্তু আমার কাছে
এর অর্থ ছিল অন্য-

আমি তোমাকে মনে রেখেছি,
তবু তোমার জীবনে প্রবেশের
অধিকার দাবি করিনি।

সময়ের সঙ্গে
ভালোবাসার ভাষা বদলেছে।

প্রথম দশকে ছিল
অভিমান।

দ্বিতীয় দশকে
স্বীকার।

তৃতীয় দশকে
শান্তি।

এখন মনে হয়-

তুমি আমার জীবনের
একটি অসম্পূর্ণ অধ্যায় নও।

তুমি একটি সম্পূর্ণ স্মৃতি।

অসম্পূর্ণতা তখনই
মানুষকে কষ্ট দেয়
যখন সে মনে করে
কিছু পূর্ণ করা বাকি।

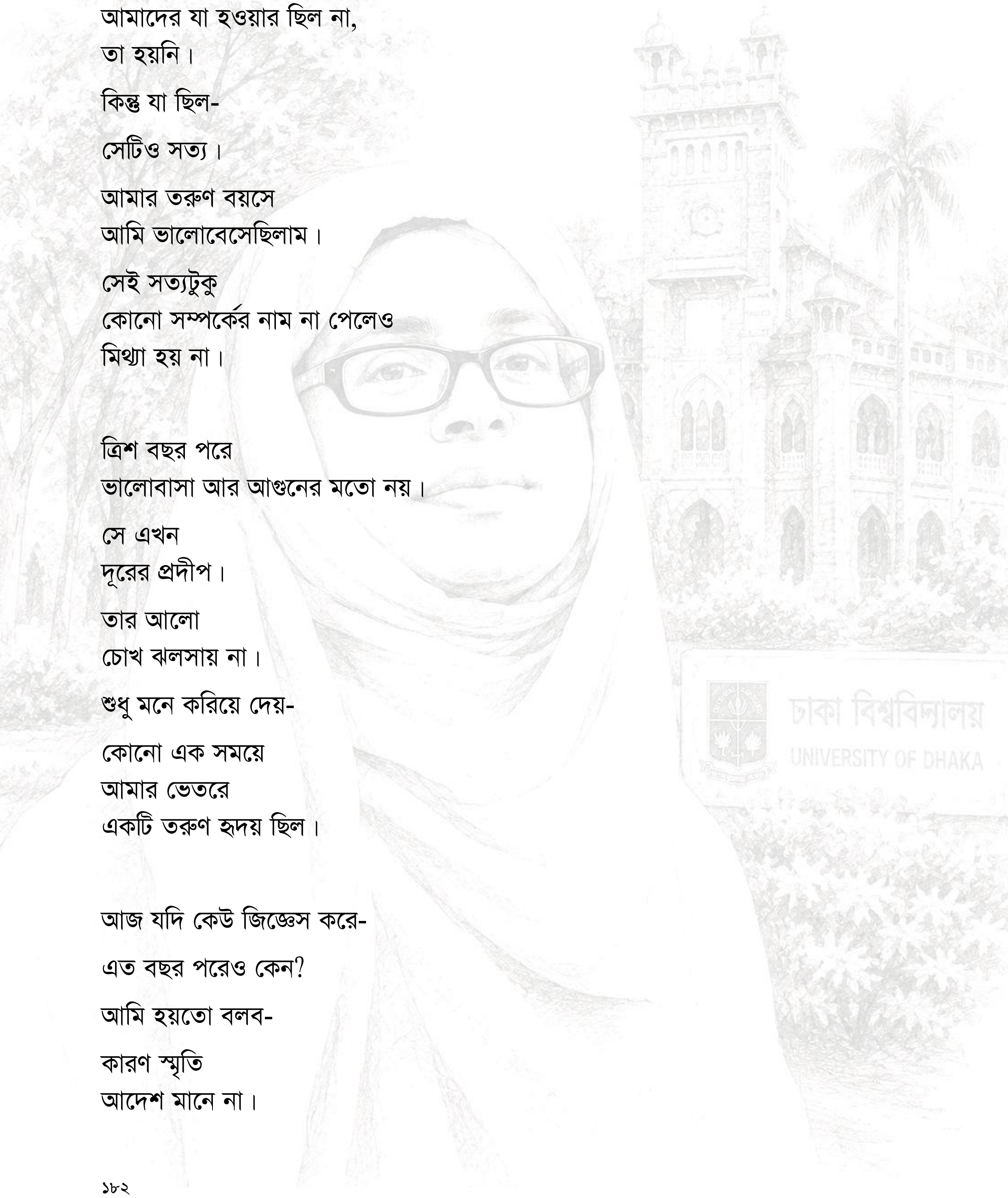

আজ আর তেমন মনে হয় না।

আমাদের যা হওয়ার ছিল না,
তা হয়নি।

কিন্তু যা ছিল-

সেটিও সত্য।

আমার তরুণ বয়সে
আমি ভালোবেসেছিলাম।

সেই সত্যটুকু
কোনো সম্পর্কের নাম না পেলেও
মিথ্যা হয় না।

ত্রিশ বছর পরে
ভালোবাসা আর আগুনের মতো নয়।

সে এখন
দূরের প্রদীপ।

তার আলো
চোখ ঝলসায় না।

শুধু মনে করিয়ে দেয়-

কোনো এক সময়ে
আমার ভেতরে
একটি তরুণ হৃদয় ছিল।

আজ যদি কেউ জিজ্ঞেস করে-

এত বছর পরেও কেন?

আমি হয়তো বলব-

কারণ স্মৃতি
আদেশ মানে না।

আর কিছু ভালোবাসা
শেষ হয় না বলে নয়-

তারা রূপ বদলায় বলে।

তুমি আজ
আমার আকাঙ্ক্ষা নও।

তুমি আমার স্মৃতি।

তুমি আমার কোনো দাবি নও।

তুমি আমার একটি ইতিহাস।

এই পার্থক্য
ত্রিশ বছর আমাকে শিখিয়েছে।

আর এই দীর্ঘ সময়ে
আমার সবচেয়ে বড় শিক্ষা-

কাউকে মনে রাখা
এবং কাউকে বিরক্ত করা
এক বিষয় নয়।

আমি প্রথমটি রেখেছি।

দ্বিতীয়টি এড়িয়ে চলেছি।

তারপর ত্রিশ বছর।

কত দীর্ঘ!

তবু আজ লিখতে বসে
মনে হয়-

উনিশশো নব্বইয়ের সেই দিন
একেবারে দূরে নয়।

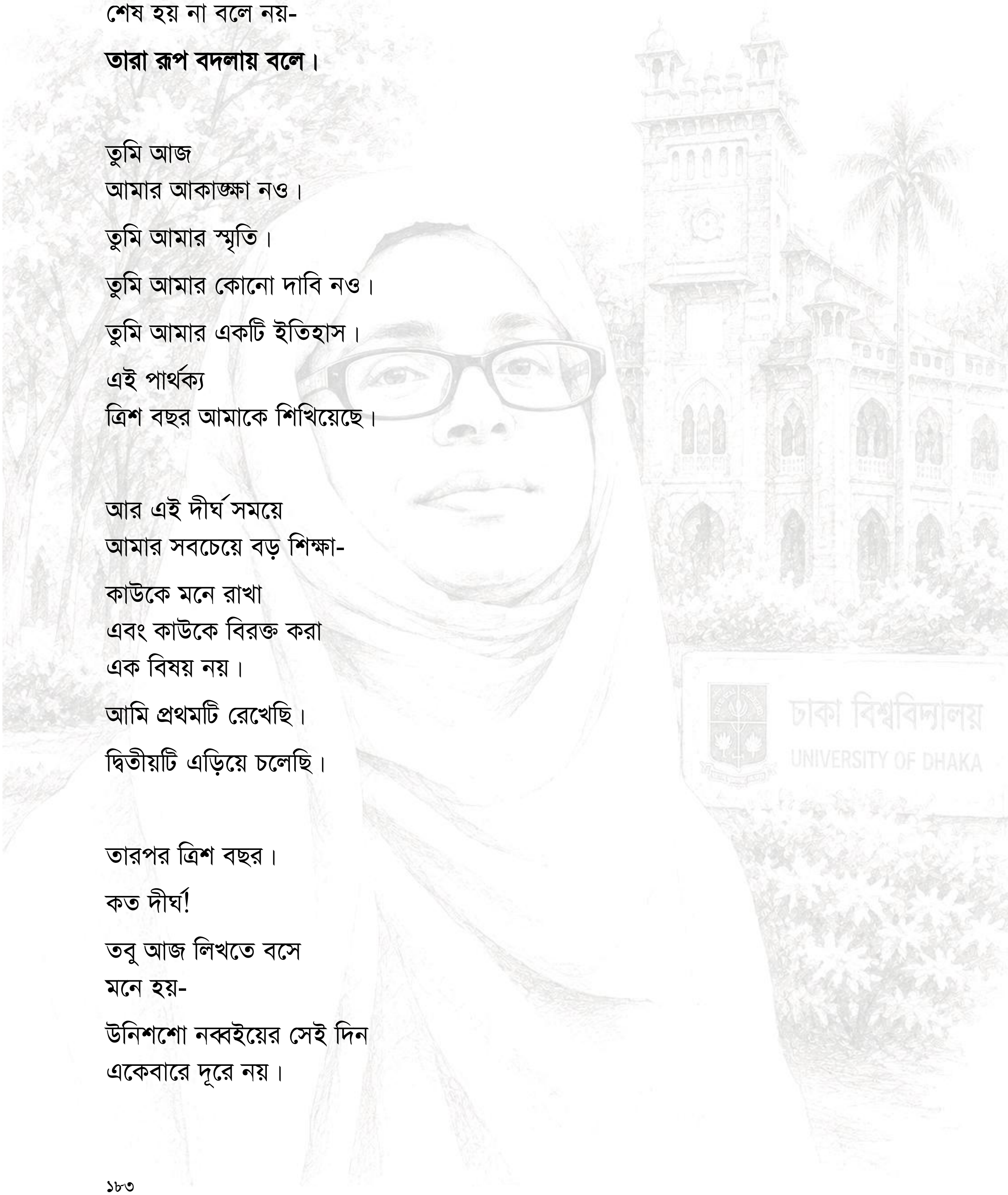

মনের কোনো এক কোণে
সময় বোধহয় সরলরেখা নয়।

সেখানে
১৯৯০ এবং আজ
কখনো পাশাপাশি দাঁড়ায়।

আমি দেখি-

তরুণ আমি
তোমাকে প্রথম দেখছে।

আজকের আমি
তার পাশে দাঁড়িয়ে।

দুজনেই তোমার দিকে তাকাই।

সে বলে-

"আমি কি তাকে হারাব?"

আমি বলি-

"তুমি তাকে কখনো পাওনি,
তাই হারানোর ভাষাটিও ঠিক নয়।"

সে চুপ।

তারপর জিজ্ঞেস করে-

"তবে কী থাকবে?"

আমি উত্তর দিই-

"একদিন বুঝবে-
মানুষ নয়,
কখনো একটি অনুভূতি থেকে যায়।
আর ত্রিশ বছর পর
সেই অনুভূতিই তোমাকে আবার
কলম ধরাবে।"

দূরত্বেরও একটি ভাষা আছে

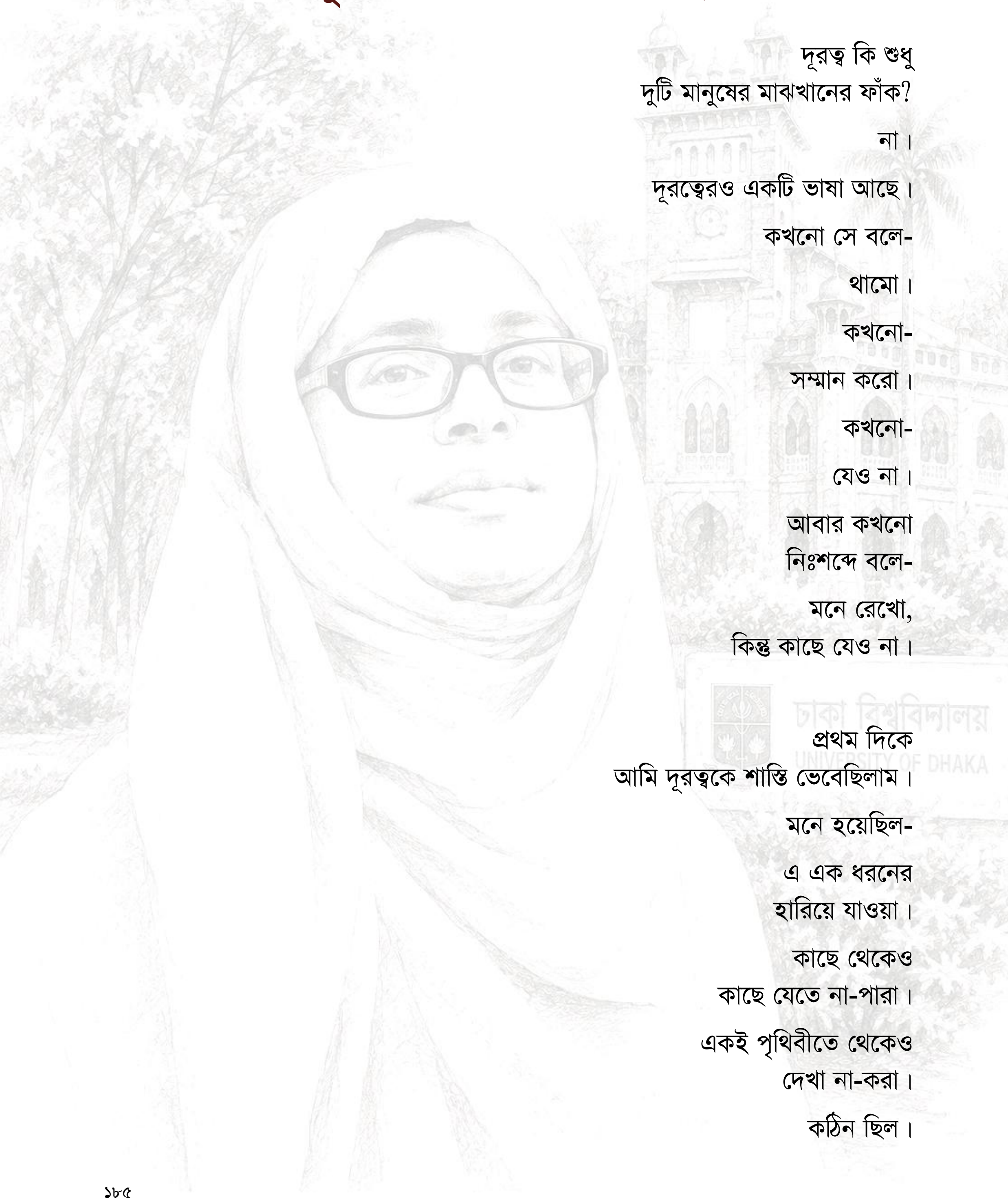

দূরত্ব কি শুধু
দুটি মানুষের মাঝখানের ফাঁক?

না।

দূরত্বেরও একটি ভাষা আছে।

কখনো সে বলে-

থামো।

কখনো-

সম্মান করো।

কখনো-

যেও না।

আবার কখনো
নিঃশব্দে বলে-

মনে রেখো,
কিন্তু কাছে যেও না।

প্রথম দিকে
আমি দূরত্বকে শাস্তি ভেবেছিলাম।

মনে হয়েছিল-

এ এক ধরনের
হারিয়ে যাওয়া।

কাছে থেকেও
কাছে যেতে না-পারা।

একই পৃথিবীতে থেকেও
দেখা না-করা।

কঠিন ছিল।

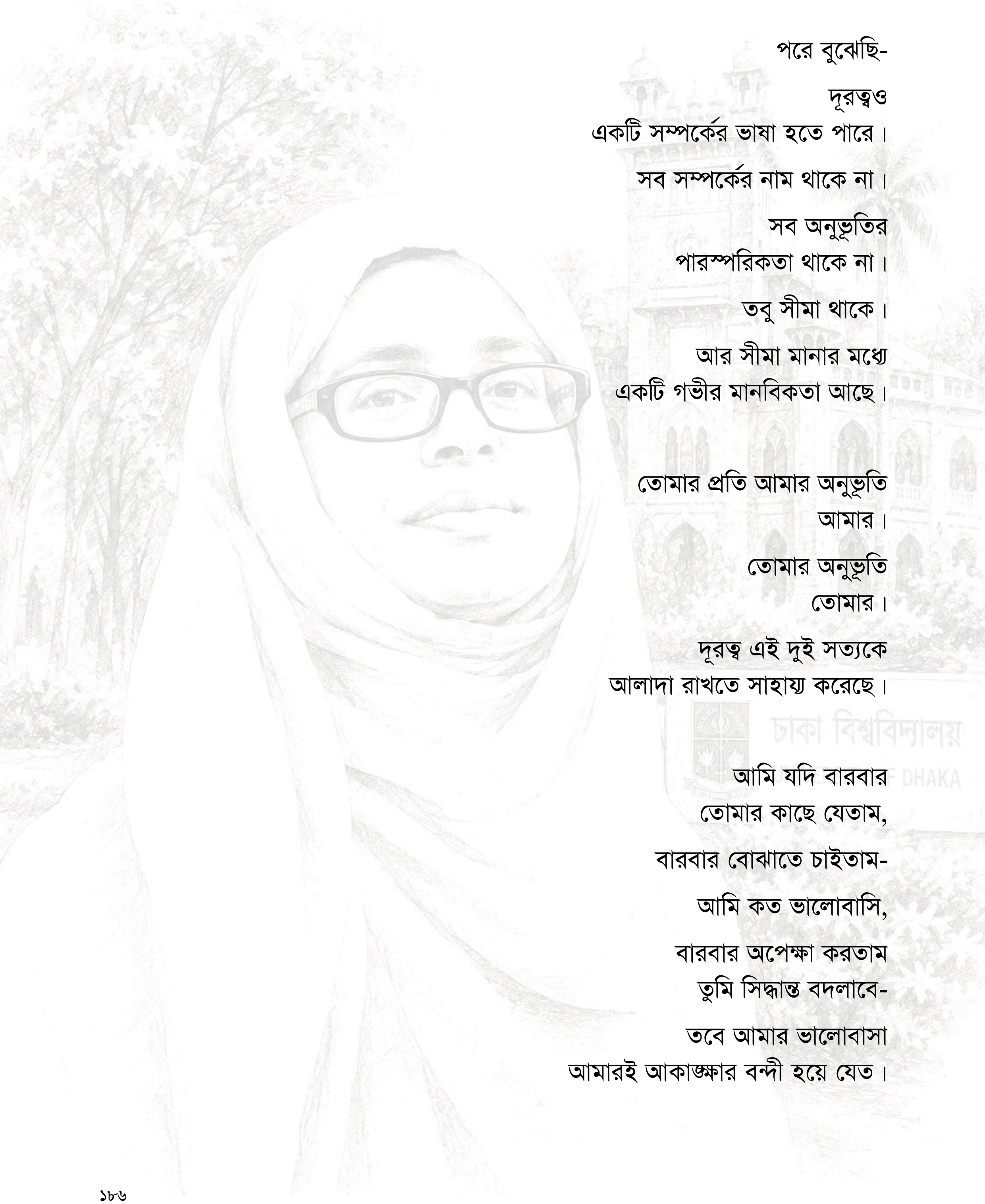

পরে বুঝেছি-

দূরত্বও
একটি সম্পর্কের ভাষা হতে পারে।

সব সম্পর্কের নাম থাকে না।

সব অনুভূতির
পারস্পরিকতা থাকে না।

তবু সীমা থাকে।

আর সীমা মানার মধ্যে
একটি গভীর মানবিকতা আছে।

তোমার প্রতি আমার অনুভূতি
আমার।

তোমার অনুভূতি
তোমার।

দূরত্ব এই দুই সত্যকে
আলাদা রাখতে সাহায্য করেছে।

আমি যদি বারবার
তোমার কাছে যেতাম,

বারবার বোঝাতে চাইতাম-

আমি কত ভালোবাসি,

বারবার অপেক্ষা করতাম
তুমি সিদ্ধান্ত বদলাবে-

তবে আমার ভালোবাসা
আমারই আকাঙ্ক্ষার বন্দী হয়ে যেত।

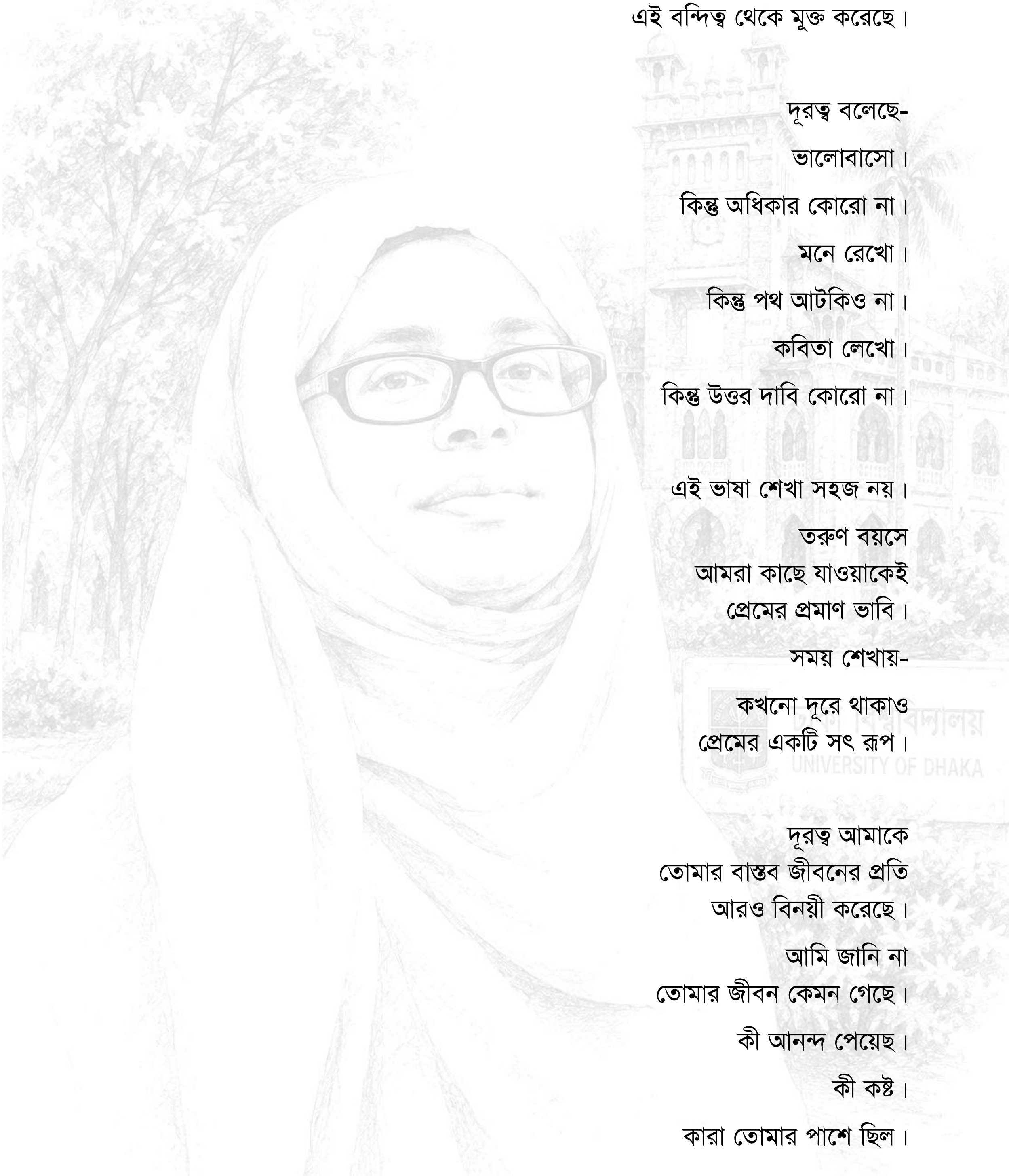

দূরত্ব আমাকে
এই বন্দিত্ব থেকে মুক্ত করেছে।

দূরত্ব বলেছে-
ভালোবাসো।
কিন্তু অধিকার কোরো না।
মনে রেখো।
কিন্তু পথ আটকিও না।
কবিতা লেখো।
কিন্তু উত্তর দাবি কোরো না।

এই ভাষা শেখা সহজ নয়।
তরুণ বয়সে
আমরা কাছে যাওয়াকেই
প্রেমের প্রমাণ ভাবি।
সময় শেখায়-
কখনো দূরে থাকাও
প্রেমের একটি সৎ রূপ।

দূরত্ব আমাকে
তোমার বাস্তব জীবনের প্রতি
আরও বিনয়ী করেছে।
আমি জানি না
তোমার জীবন কেমন গেছে।
কী আনন্দ পেয়েছ।
কী কষ্ট।
কারা তোমার পাশে ছিল।

কী স্বপ্ন পূর্ণ হয়েছে।
কী অপূর্ণ।
এই না-জানাটিও
দূরত্বের অংশ।

আগে হলে হয়তো
সব জানতে চাইতাম।
এখন মনে হয়-
যে তথ্য তুমি আমাকে দাওনি,
তা জানতেই হবে কেন?
তোমার জীবন
আমার কৌতূহলের সম্পত্তি নয়।
এই উপলব্ধি
দূরত্বেরই শিক্ষা।

কখনো মনে হয়
দূরত্ব একটি নদী।
আমি এক পারে।
তুমি অন্য পারে।
নদীর ওপারে আলো দেখা যায়।
কিন্তু সাঁতরে যেতে হয় না।
সব নদী
পার হওয়ার জন্য নয়।
কিছু নদী
মানুষকে শুধু শেখায়-
অন্য পারও আছে।

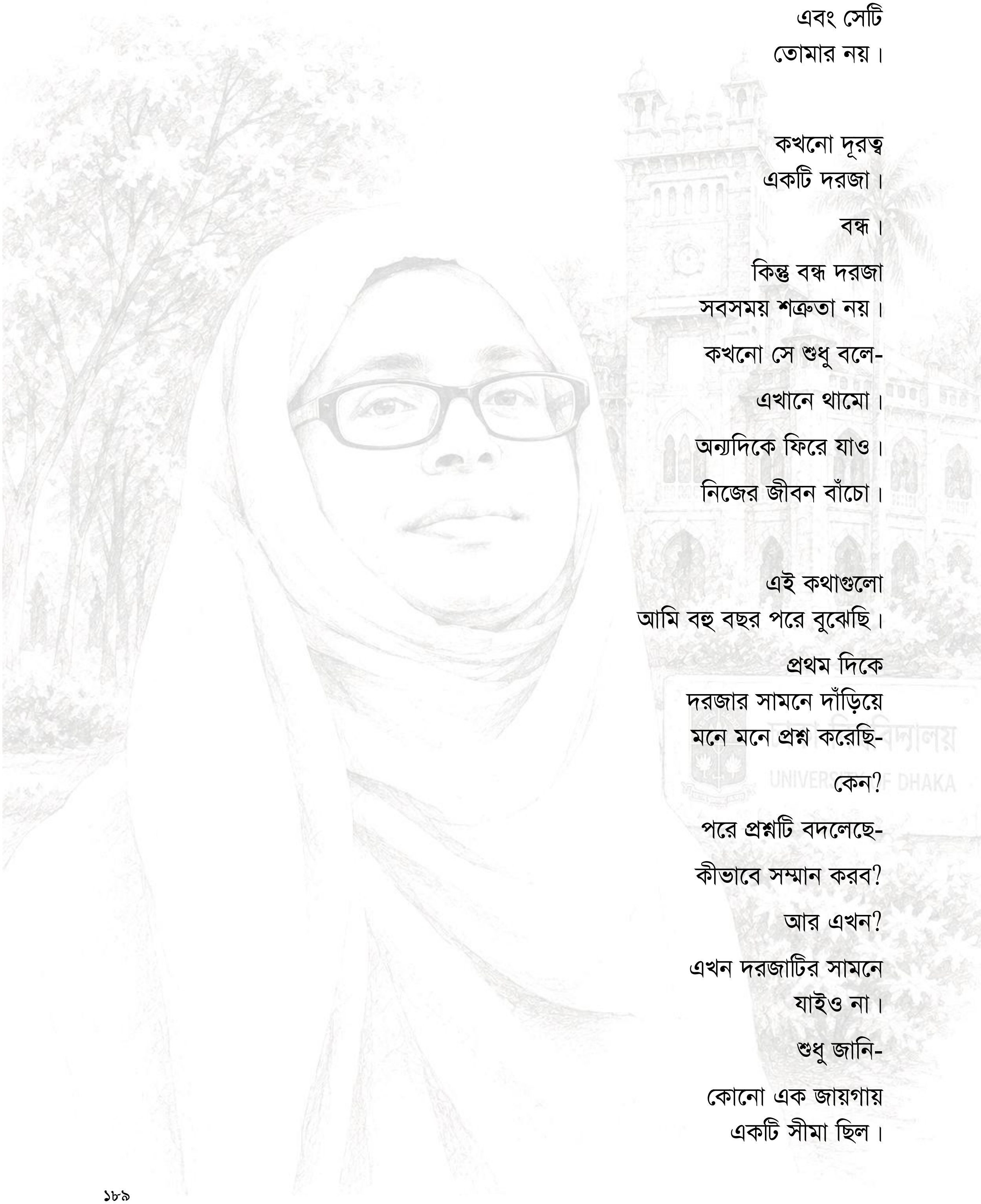

এবং সেটি
তোমার নয়।

কখনো দূরত্ব
একটি দরজা।
বন্ধ।
কিন্তু বন্ধ দরজা
সবসময় শত্রুতা নয়।
কখনো সে শুধু বলে-
এখানে থামো।
অন্যদিকে ফিরে যাও।
নিজের জীবন বাঁচো।

এই কথাগুলো
আমি বহু বছর পরে বুঝেছি।
প্রথম দিকে
দরজার সামনে দাঁড়িয়ে
মনে মনে প্রশ্ন করেছি-
কেন?
পরে প্রশ্নটি বদলেছে-
কীভাবে সম্মান করব?
আর এখন?
এখন দরজাটির সামনে
যাইও না।
শুধু জানি-
কোনো এক জায়গায়
একটি সীমা ছিল।

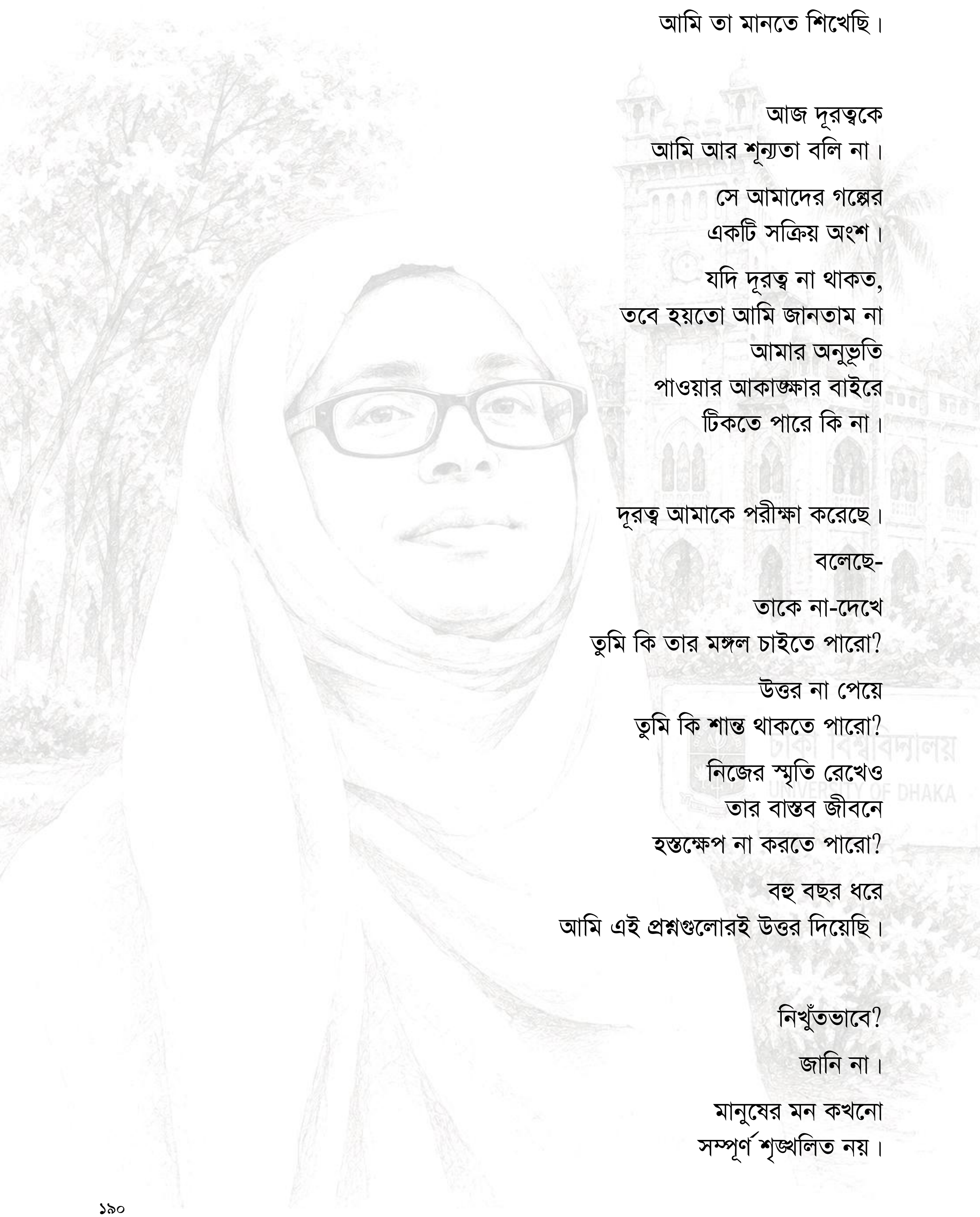

আমি তা মানতে শিখেছি।

আজ দূরত্বকে
আমি আর শূন্যতা বলি না।

সে আমাদের গল্পের
একটি সক্রিয় অংশ।

যদি দূরত্ব না থাকত,
তবে হয়তো আমি জানতাম না
আমার অনুভূতি
পাওয়ার আকাঙ্ক্ষার বাইরে
টিকতে পারে কি না।

দূরত্ব আমাকে পরীক্ষা করেছে।

বলেছে-

তাকে না-দেখে
তুমি কি তার মঙ্গল চাইতে পারো?

উত্তর না পেয়ে
তুমি কি শান্ত থাকতে পারো?

নিজের স্মৃতি রেখেও
তার বাস্তব জীবনে
হস্তক্ষেপ না করতে পারো?

বহু বছর ধরে
আমি এই প্রশ্নগুলোরই উত্তর দিয়েছি।

নিখুঁতভাবে?

জানি না।

মানুষের মন কখনো
সম্পূর্ণ শৃঙ্খলিত নয়।

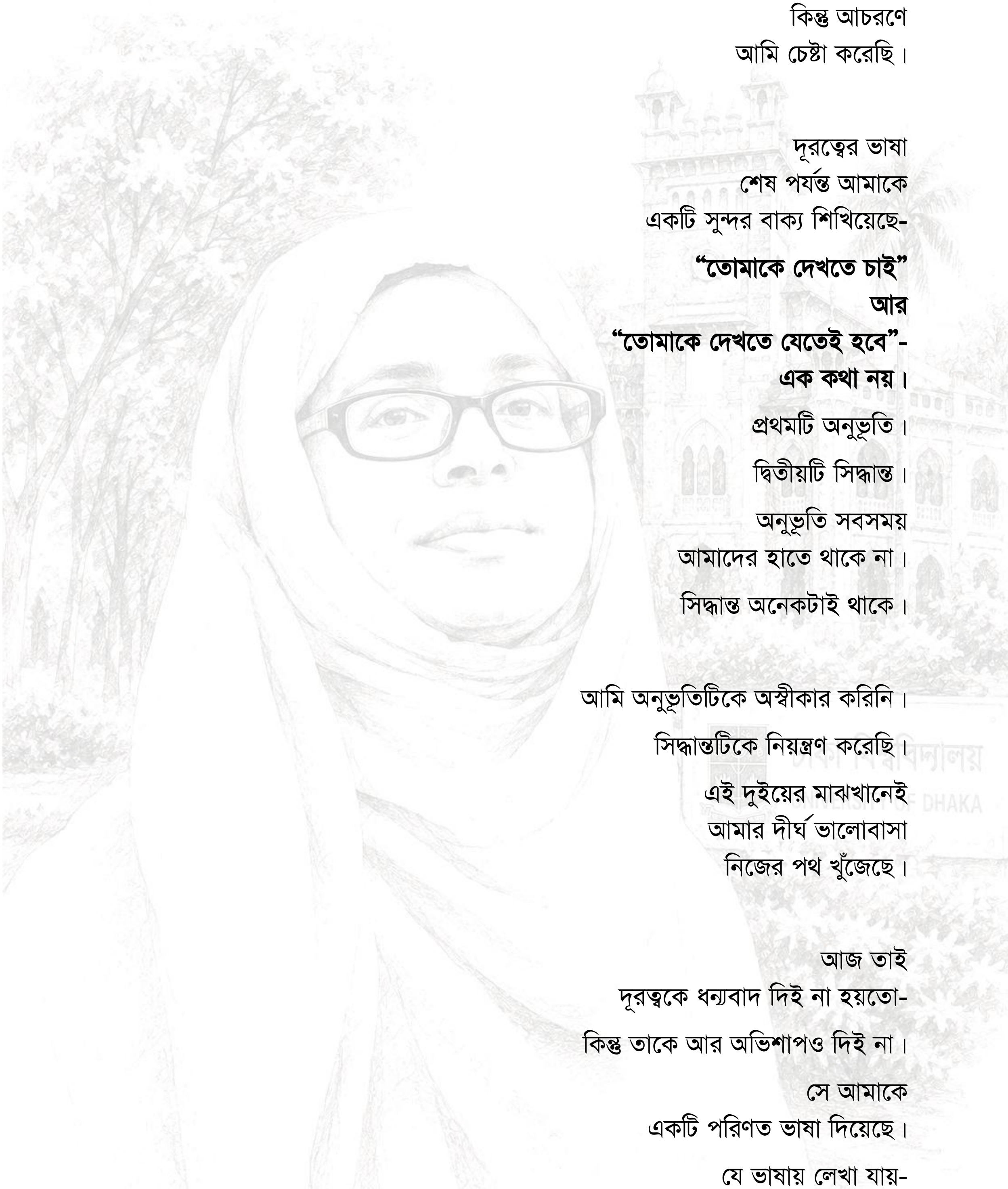

কিন্তু আচরণে
আমি চেষ্টা করেছি।

দূরত্বের ভাষা
শেষ পর্যন্ত আমাকে
একটি সুন্দর বাক্য শিখিয়েছে-
“তোমাকে দেখতে চাই”
আর
“তোমাকে দেখতে যেতেই হবে”-
এক কথা নয়।
প্রথমটি অনুভূতি।
দ্বিতীয়টি সিদ্ধান্ত।
অনুভূতি সবসময়
আমাদের হাতে থাকে না।
সিদ্ধান্ত অনেকটাই থাকে।

আমি অনুভূতিটিকে অস্বীকার করিনি।
সিদ্ধান্তটিকে নিয়ন্ত্রণ করেছি।
এই দুইয়ের মাঝখানেই
আমার দীর্ঘ ভালোবাসা
নিজের পথ খুঁজেছে।

আজ তাই
দূরত্বকে ধন্যবাদ দিই না হয়তো-
কিন্তু তাকে আর অভিশাপও দিই না।
সে আমাকে
একটি পরিণত ভাষা দিয়েছে।
যে ভাষায় লেখা যায়-

"আমি তোমাকে মনে করি,
তবু তোমার কাছে যাই না।
আমি তোমার মঙ্গল চাই,
তবু তার সাক্ষী হতে চাই না।
আমি তোমাকে ভালোবেসেছিলাম,
তবু তোমার জীবনের ওপর
কোনো অধিকার দাবি করি না।"

এই ভাষাটির নাম-

দূরত্ব।

খোঁজ নিইনি, ভুলিওনি

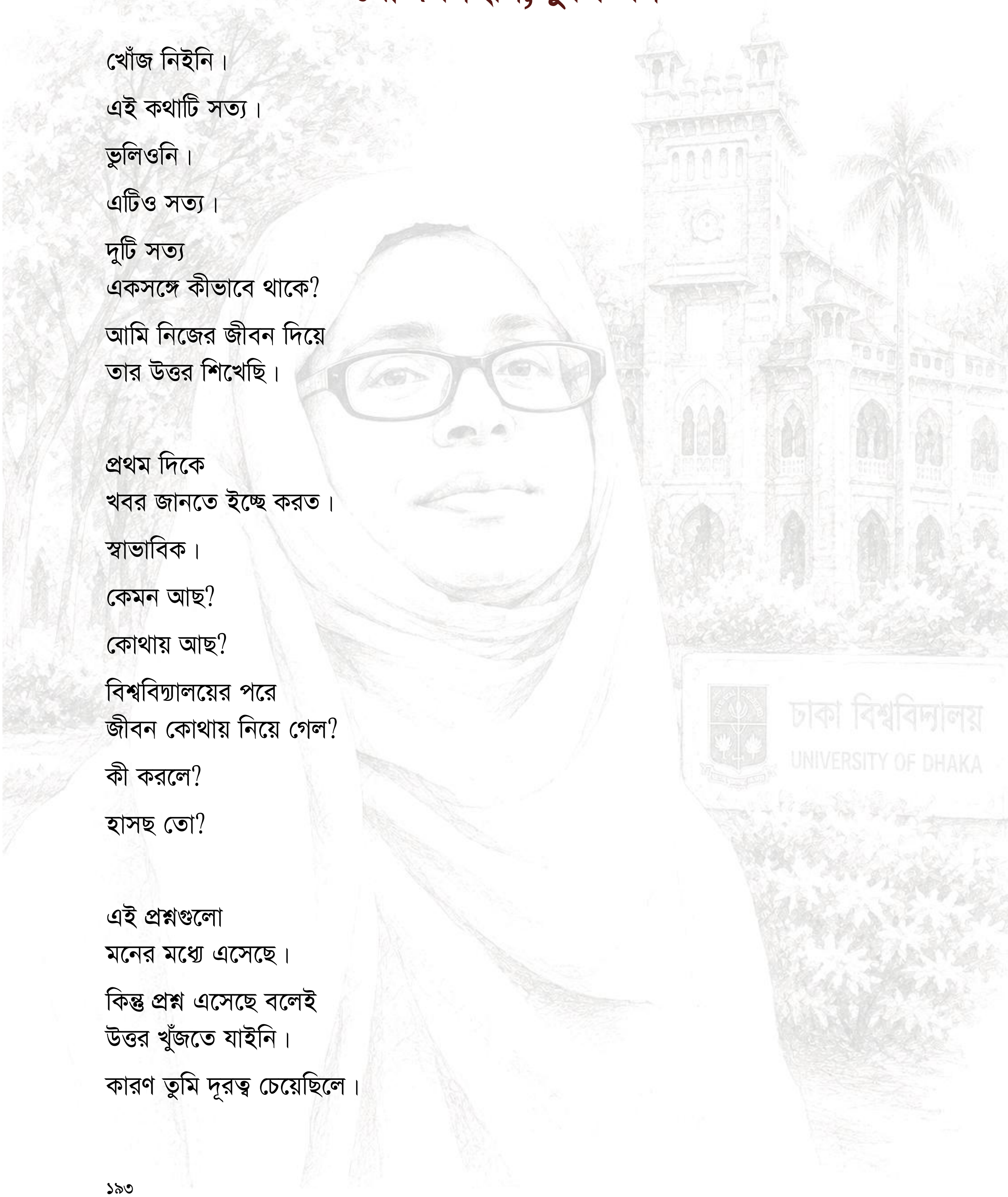

খোঁজ নিইনি।

এই কথাটি সত্য।

ভুলিওনি।

এটিও সত্য।

দুটি সত্য
একসঙ্গে কীভাবে থাকে?

আমি নিজের জীবন দিয়ে
তার উত্তর শিখেছি।

প্রথম দিকে
খবর জানতে ইচ্ছে করত।

স্বাভাবিক।

কেমন আছ?

কোথায় আছ?

বিশ্ববিদ্যালয়ের পরে
জীবন কোথায় নিয়ে গেল?

কী করলে?

হাসছ তো?

এই প্রশ্নগুলো
মনের মধ্যে এসেছে।

কিন্তু প্রশ্ন এসেছে বলেই
উত্তর খুঁজতে যাইনি।

কারণ তুমি দূরত্ব চেয়েছিলে।

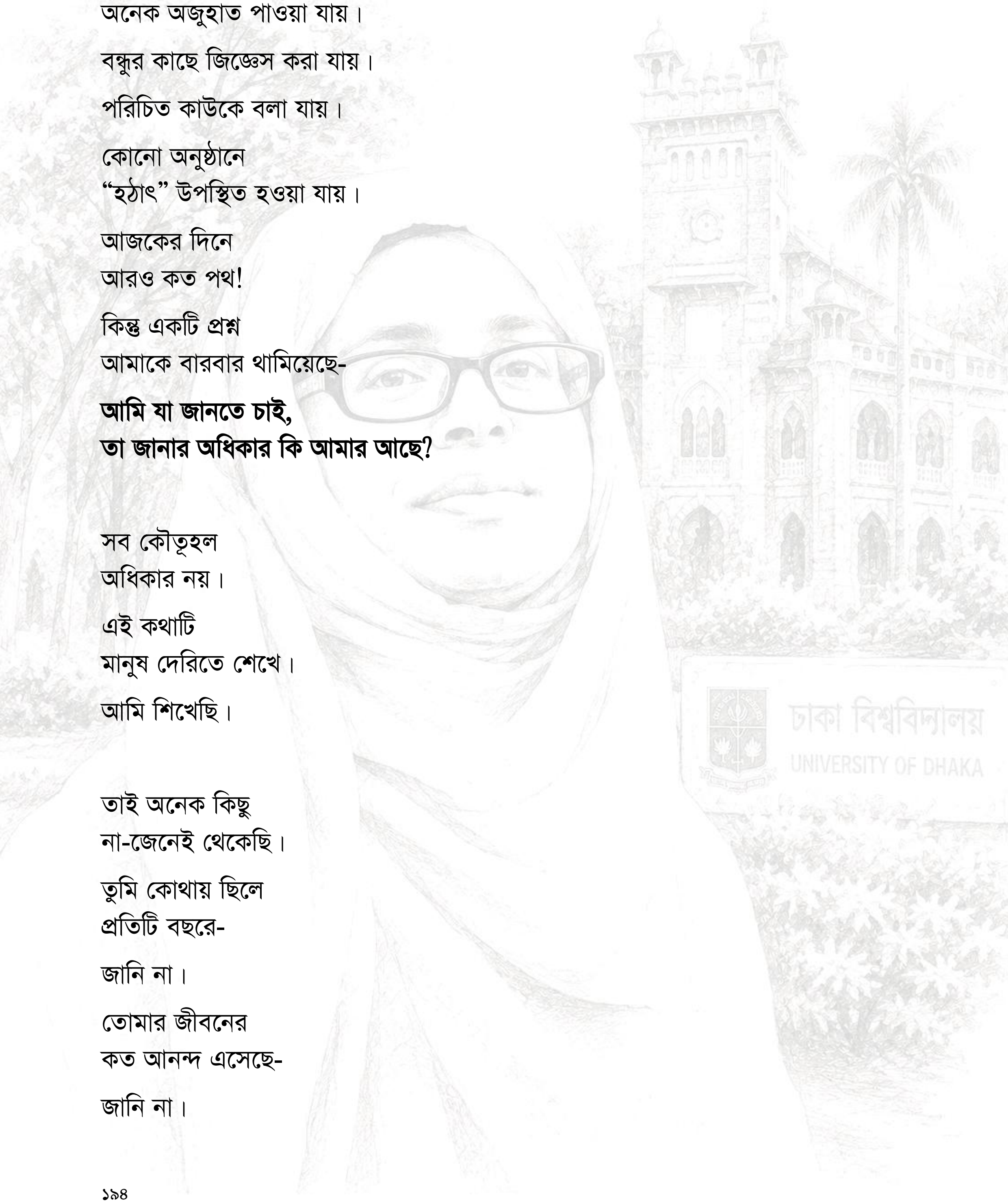

খবর নেওয়ারও
অনেক অজুহাত পাওয়া যায়।

বন্ধুর কাছে জিজ্ঞেস করা যায়।

পরিচিত কাউকে বলা যায়।

কোনো অনুষ্ঠানে
“হঠাৎ” উপস্থিত হওয়া যায়।

আজকের দিনে
আরও কত পথ!

কিন্তু একটি প্রশ্ন
আমাকে বারবার থামিয়েছে-

আমি যা জানতে চাই,
তা জানার অধিকার কি আমার আছে?

সব কৌতূহল
অধিকার নয়।

এই কথাটি
মানুষ দেরিতে শেখে।

আমি শিখেছি।

তাই অনেক কিছু
না-জেনেই থেকেছি।

তুমি কোথায় ছিলে
প্রতিটি বছরে-

জানি না।

তোমার জীবনের
কত আনন্দ এসেছে-

জানি না।

কত দুঃখ-

জানি না।

হয়তো এই না-জানার মধ্যে
একটি বড় শূন্যতা আছে।

কিন্তু একই সঙ্গে
একটি সম্মানও আছে।

খোঁজ নিইনি মানে
উদাসীন ছিলাম না।

বরং কখনো কখনো
খোঁজ না-নেওয়াটাই
সবচেয়ে কঠিন যত্ন ছিল।

কারণ মন চাইত জানতে।

আমি নিজেকে বলেছি-

না।

সে যদি চায় না
তুমি তার জীবনের অংশ হও,
তবে তার খবরও
তোমার প্রয়োজনীয় সম্পদ নয়।

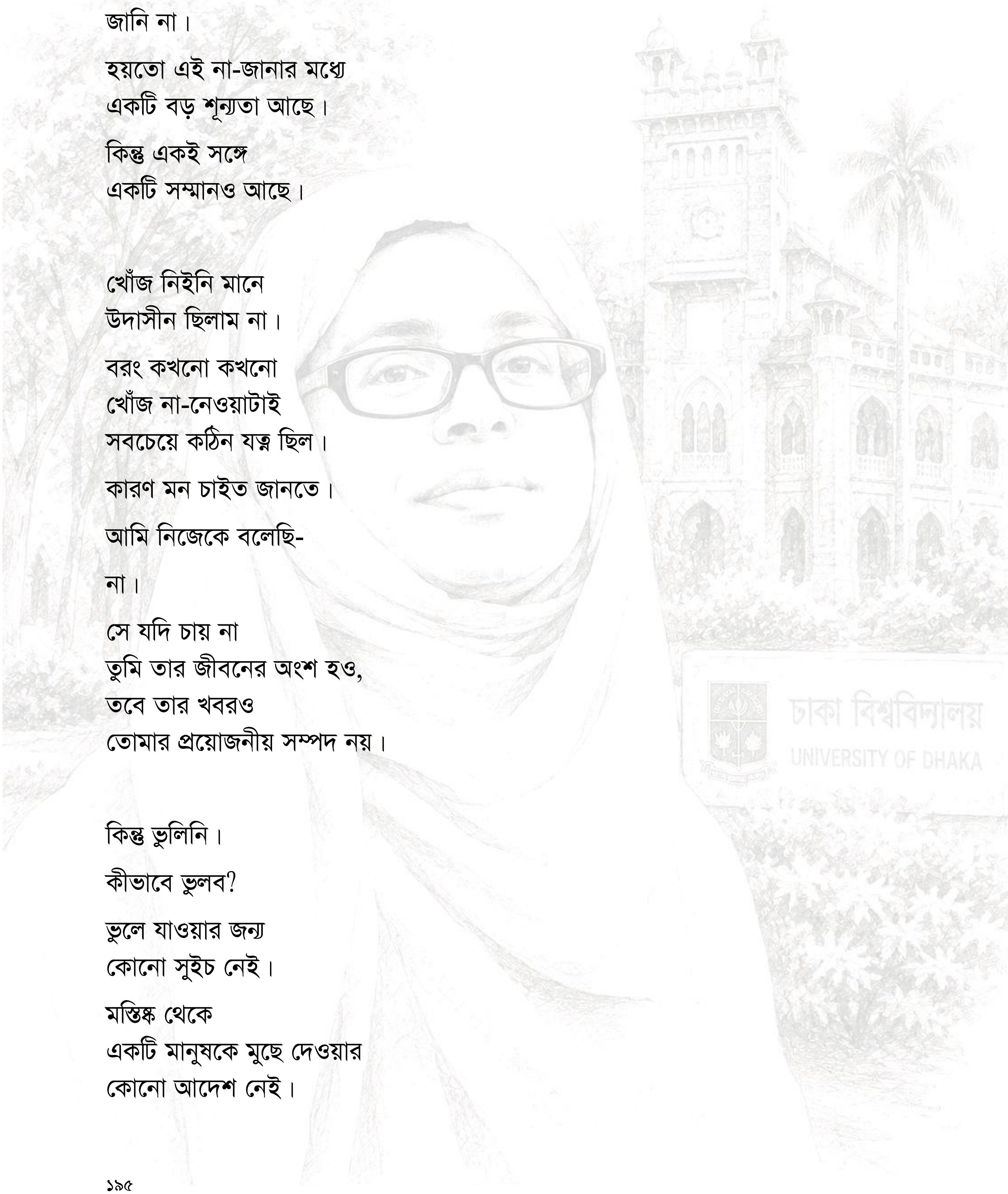

কিন্তু ভুলিনি।

কীভাবে ভুলব?

ভুলে যাওয়ার জন্য
কোনো সুইচ নেই।

মস্তিষ্ক থেকে
একটি মানুষকে মুছে দেওয়ার
কোনো আদেশ নেই।

স্মৃতি নিজে নিজেই
তার কাজ করেছে।

কখনো বছর কেটে গেছে
তোমার কথা বিশেষ মনে পড়েনি।

তারপর হঠাৎ-

কোনো বিকেল।

কোনো গন্ধ।

কোনো ক্যাম্পাস।

একটি পুরোনো খাতা।

আর তুমি।

আমি অবাক হয়ে ভাবি-

এত বছর পরেও?

তারপর নিজেকে বলি-

হ্যাঁ।

মনে পড়া
অপরাধ নয়।

প্রশ্ন হলো-

স্মৃতির পরে তুমি কী করছ?

আমি স্মৃতির পরে
তোমার কাছে যাইনি।

স্মৃতিকে কবিতা করেছি।

এই পার্থক্যটিই
আমার কাছে গুরুত্বপূর্ণ।

একসময় পাণ্ডুলিপি হারিয়েছে।

মনে হয়েছিল-

এবার হয়তো
তোমাকে নিয়ে আমার লিখিত ইতিহাসও শেষ।

কিন্তু পাণ্ডুলিপি হারালেও
স্মৃতি গেল না।

অদ্ভুত!

যাকে ধরে রাখার জন্য
কাগজে এত শব্দ লিখেছিলাম,

শেষ পর্যন্ত
কাগজই হারাল।

আর যে অনুভূতি
কাগজের আগে ছিল-

সে থেকে গেল।

আজ নতুন করে লিখছি।

তার মানে এই নয়
আমি পুরোনো দূরত্ব ভাঙছি।

বরং সেই দূরত্বকে
লেখার মধ্যে স্বীকার করছি।

এই কবিতা
খোঁজ নেওয়া নয়।

এই কবিতা
দরজায় কড়া নাড়া নয়।

এটি নিজের হৃদয়ের
পুরোনো একটি ঘর খুলে দেখা।

ঘরটির মধ্যে
কিছু ধুলো।

কিছু আলো।

একটি বেঞ্চ।

কিছু পথ।

একজন তরুণ।

আর একটি তরুণী
যার নাম আমি এখনও লিখি না।

আমি তাদের দেখি।

তারপর দরজা আবার বন্ধ করি।

বর্তমানে ফিরে আসি।

কখনো মনে হয়-

তুমি কি আমায় ভুলে গেছ?

প্রশ্নটি আসে।

কিন্তু তাকে বেশি দূর যেতে দিই না।

তুমি ভুলে গেলে
তার অধিকার তোমার।

তোমাকে আমার মতো
স্মৃতি বহন করতেই হবে কেন?

আমাদের অভিজ্ঞতা
এক ছিল না।

হয়তো তোমার জীবনে
আমি ছিলাম খুব ছোট একটি ঘটনা।

হয়তো কোনো স্মৃতিই নই।

এই সম্ভাবনা
এখন আমাকে কষ্ট দেয় না।

কারণ ভালোবাসার মূল্য
অন্যজন কতটা মনে রাখল
তার ওপর নির্ভর করলে
সে আবার বিনিময়ের হিসাব হয়ে যায়।

আমি মনে রেখেছি-

এটি আমার সত্য।

তুমি মনে রেখেছ কি না-

সেটি তোমার।

খোঁজ নিইনি।

তবু কখনো মনে মনে
তোমার জন্য শুভকামনা করেছি।

বিশেষ কোনো তথ্য না জেনেই।

যেমন মানুষ
দূরের কোনো নৌকার জন্য
শান্ত নদী কামনা করে-

নৌকাটি কোথায় যাচ্ছে
তা না জেনেও।

আমি চেয়েছি-

তুমি ভালো থাকো।

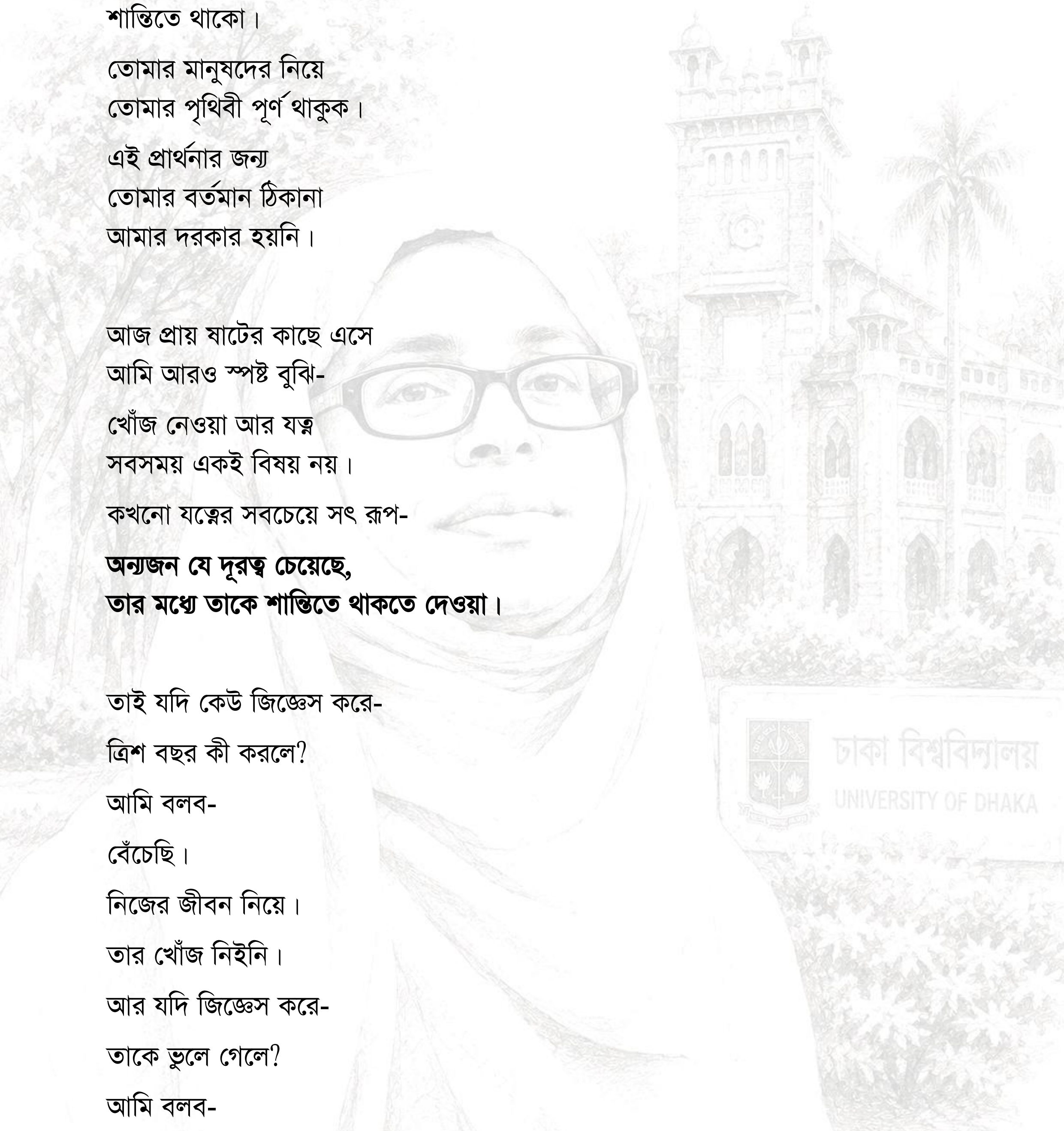

সুস্থ থাকো।

শান্তিতে থাকো।

তোমার মানুষদের নিয়ে
তোমার পৃথিবী পূর্ণ থাকুক।

এই প্রার্থনার জন্য
তোমার বর্তমান ঠিকানা
আমার দরকার হয়নি।

আজ প্রায় ষাটের কাছে এসে
আমি আরও স্পষ্ট বুঝি-

খোঁজ নেওয়া আর যত্ন
সবসময় একই বিষয় নয়।

কখনো যত্নের সবচেয়ে সৎ রূপ-

অন্যজন যে দূরত্ব চেয়েছে,
তার মধ্যে তাকে শান্তিতে থাকতে দেওয়া।

তাই যদি কেউ জিজ্ঞেস করে-

ত্রিশ বছর কী করলে?

আমি বলব-

বেঁচেছি।

নিজের জীবন নিয়ে।

তার খোঁজ নিইনি।

আর যদি জিজ্ঞেস করে-

তাকে ভুলে গেলে?

আমি বলব-

না।

কিন্তু মনে রাখাকে
কোনো অধিকারপত্র বানাইনি।

আজ আমার কাছে
এই দুটি বাক্য পাশাপাশি
একটি সম্পূর্ণ কবিতা-

খোঁজ নিইনি-
কারণ তোমার সীমাকে সম্মান করেছি।

ভুলিওনি-
কারণ হৃদয়ের কিছু স্মৃতি
আদেশে মুছে যায় না।

আর এই দুইয়ের মাঝখানে
যে দীর্ঘ নীরবতা-

সেখানেই হয়তো
আমার ত্রিশ বছরের ভালোবাসা
সবচেয়ে শান্তভাবে বেঁচে ছিল।

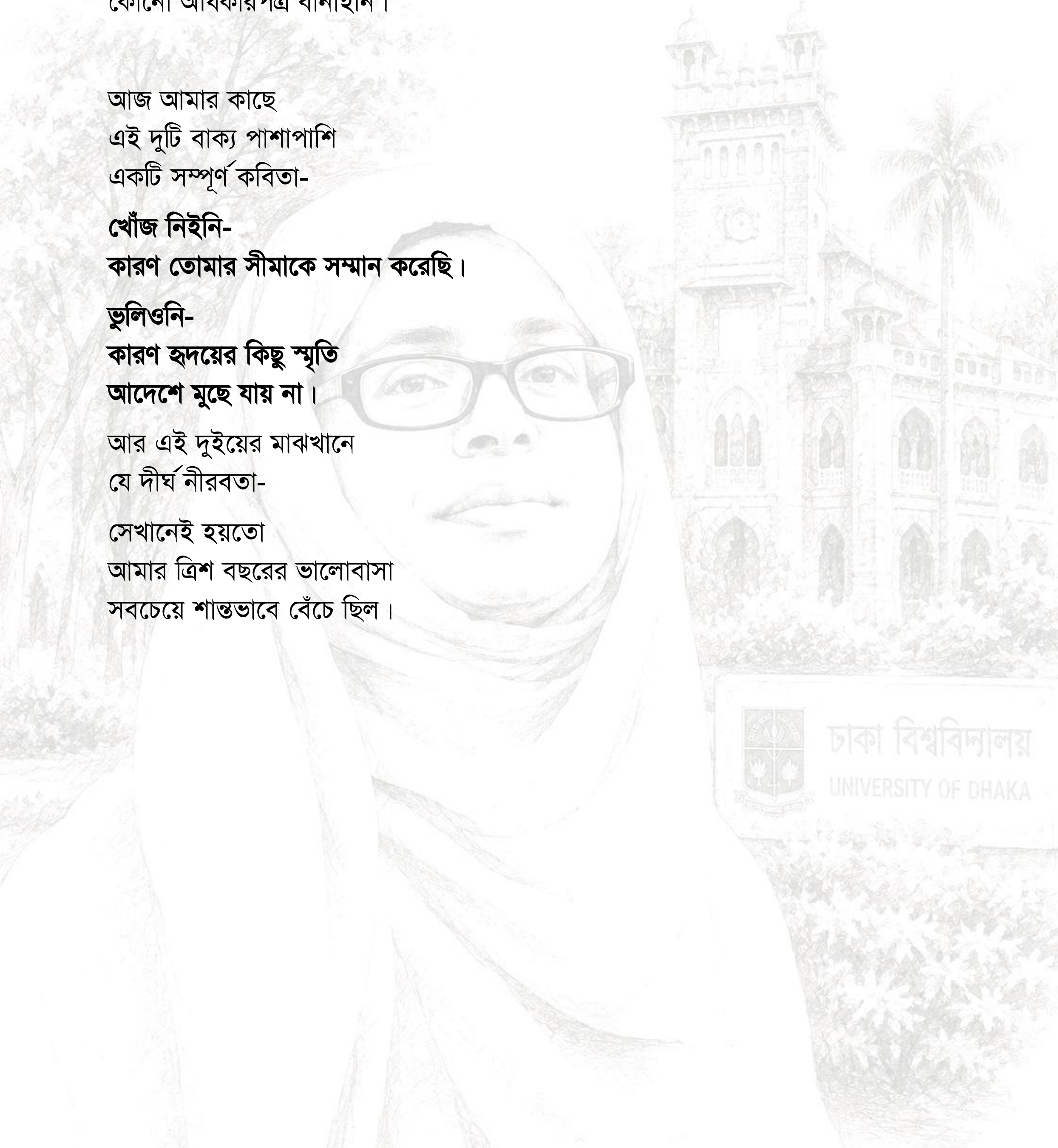

তোমাকে না দেখার অভ্যাস

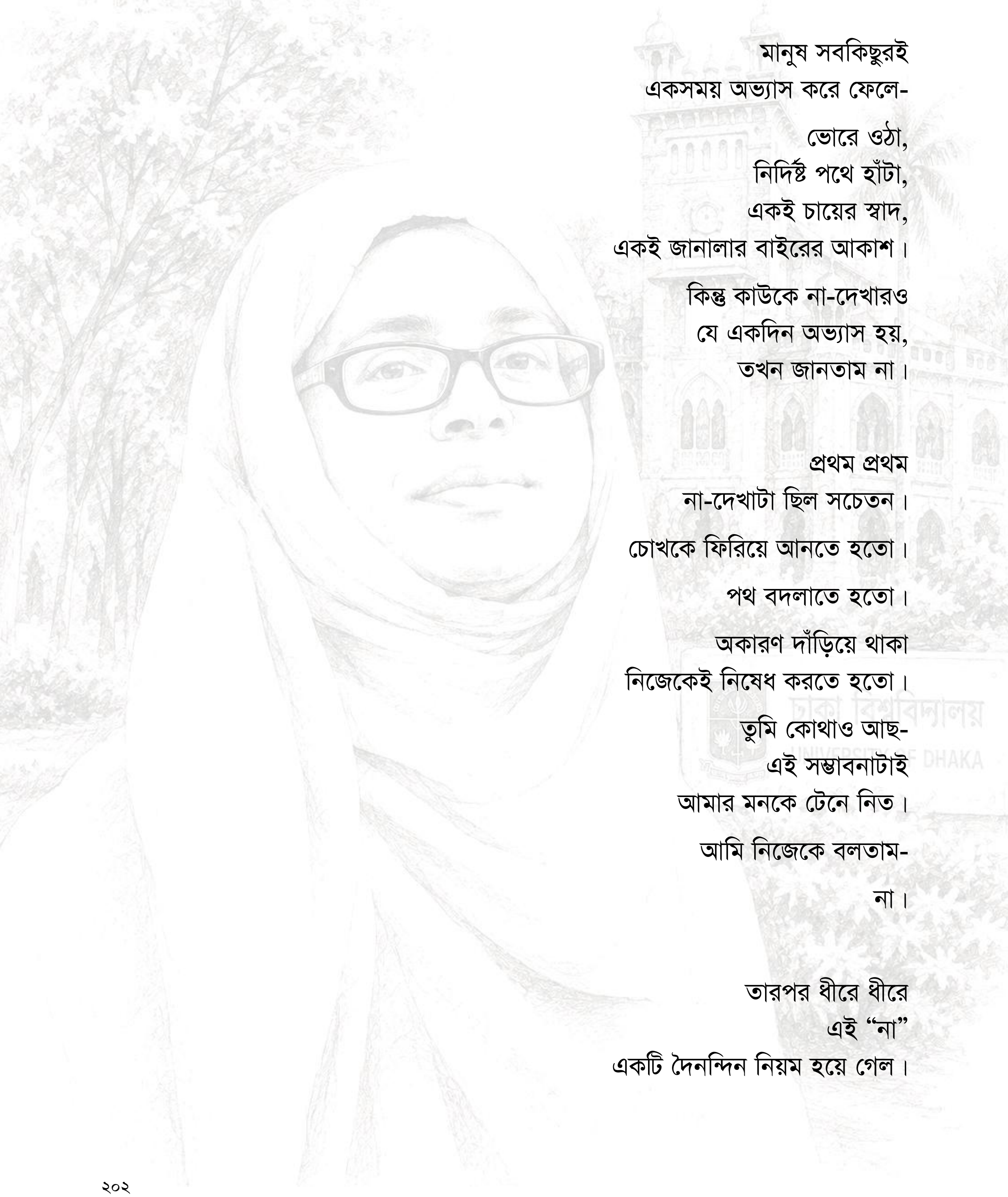

মানুষ সবকিছুরই
একসময় অভ্যাস করে ফেলে-

ভোরে ওঠা,
নির্দিষ্ট পথে হাঁটা,
একই চায়ের স্বাদ,
একই জানালার বাইরের আকাশ।

কিন্তু কাউকে না-দেখারও
যে একদিন অভ্যাস হয়,
তখন জানতাম না।

প্রথম প্রথম
না-দেখাটা ছিল সচেতন।

চোখকে ফিরিয়ে আনতে হতো।

পথ বদলাতে হতো।

অকারণ দাঁড়িয়ে থাকা
নিজেকেই নিষেধ করতে হতো।

তুমি কোথাও আছ-
এই সম্ভাবনাটাই
আমার মনকে টেনে নিত।

আমি নিজেকে বলতাম-
না।

তারপর ধীরে ধীরে
এই “না”
একটি দৈনন্দিন নিয়ম হয়ে গেল।

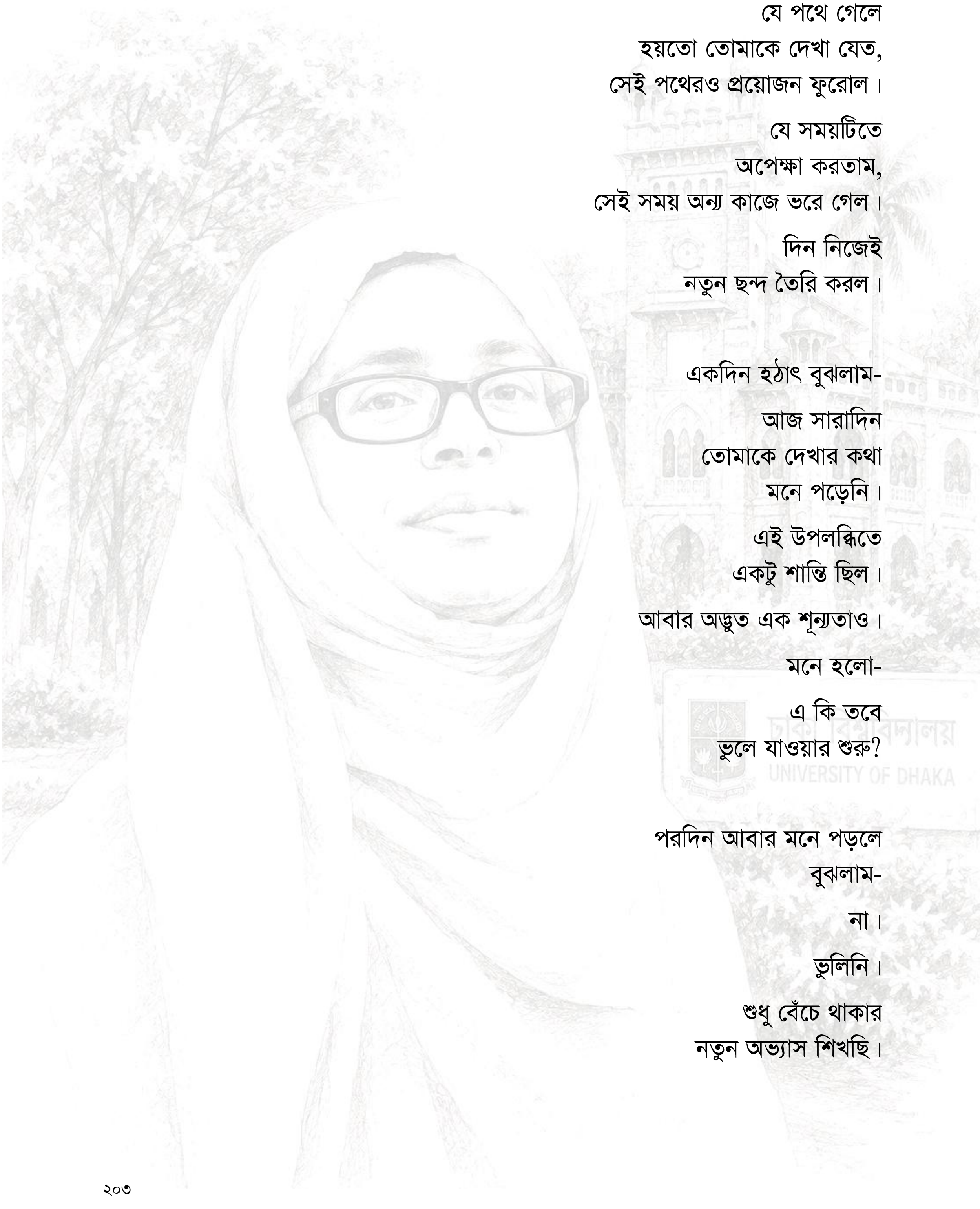

যে পথে গেলে
হয়তো তোমাকে দেখা যেত,
সেই পথেরও প্রয়োজন ফুরোল।

যে সময়টিতে
অপেক্ষা করতাম,
সেই সময় অন্য কাজে ভরে গেল।

দিন নিজেই
নতুন ছন্দ তৈরি করল।

একদিন হঠাৎ বুঝলাম-

আজ সারাদিন
তোমাকে দেখার কথা
মনে পড়েনি।

এই উপলব্ধিতে
একটু শান্তি ছিল।

আবার অদ্ভুত এক শূন্যতাও।

মনে হলো-

এ কি তবে
ভুলে যাওয়ার শুরু?

পরদিন আবার মনে পড়লে
বুঝলাম-

না।

ভুলিনি।

শুধু বেঁচে থাকার
নতুন অভ্যাস শিখছি।

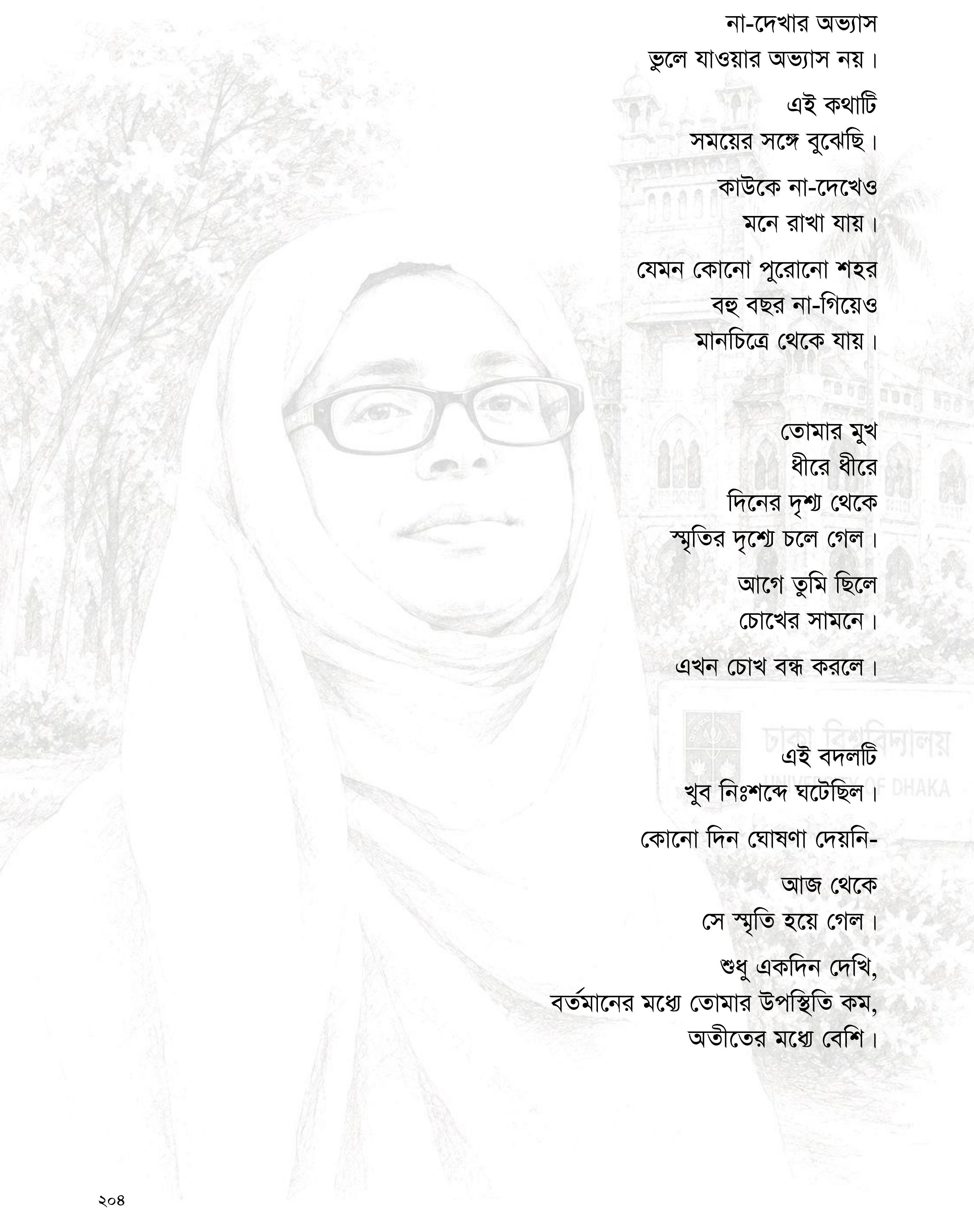

না-দেখার অভ্যাস
ভুলে যাওয়ার অভ্যাস নয়।

এই কথাটি
সময়ের সঙ্গে বুঝেছি।

কাউকে না-দেখেও
মনে রাখা যায়।

যেমন কোনো পুরোনো শহর
বহু বছর না-গিয়েও
মানচিত্রে থেকে যায়।

তোমার মুখ
ধীরে ধীরে
দিনের দৃশ্য থেকে
স্মৃতির দৃশ্যে চলে গেল।

আগে তুমি ছিলে
চোখের সামনে।

এখন চোখ বন্ধ করলে।

এই বদলটি
খুব নিঃশব্দে ঘটেছিল।

কোনো দিন ঘোষণা দেয়নি-

আজ থেকে
সে স্মৃতি হয়ে গেল।

শুধু একদিন দেখি,
বর্তমানের মধ্যে তোমার উপস্থিতি কম,
অতীতের মধ্যে বেশি।

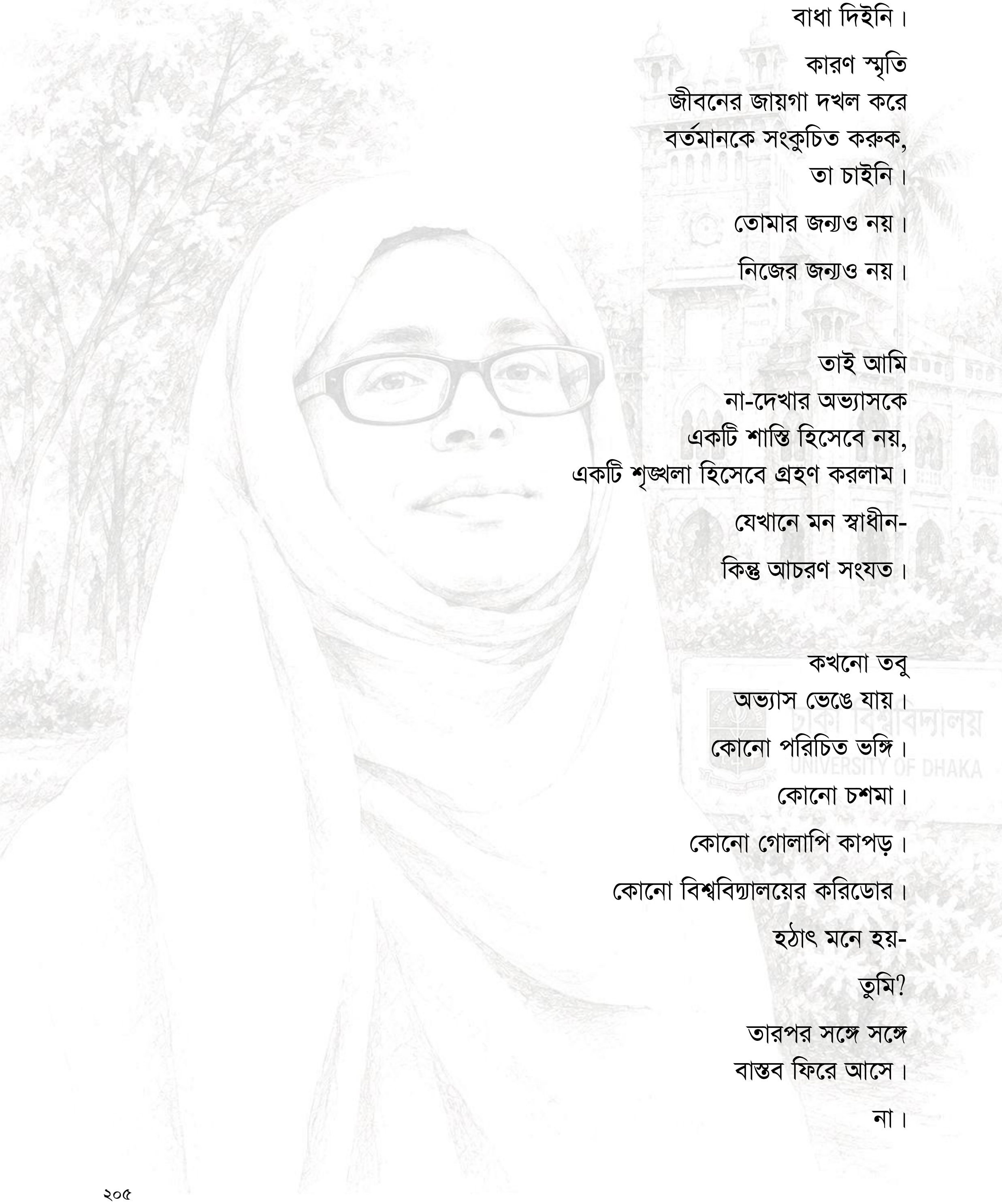

আমি এতে
বাধা দিইনি।

কারণ স্মৃতি
জীবনের জায়গা দখল করে
বর্তমানকে সংকুচিত করুক,
তা চাইনি।

তোমার জন্যও নয়।

নিজের জন্যও নয়।

তাই আমি
না-দেখার অভ্যাসকে
একটি শাস্তি হিসেবে নয়,
একটি শৃঙ্খলা হিসেবে গ্রহণ করলাম।

যেখানে মন স্বাধীন-

কিন্তু আচরণ সংযত।

কখনো তবু
অভ্যাস ভেঙে যায়।
কোনো পরিচিত ভঙ্গি।
কোনো চশমা।
কোনো গোলাপি কাপড়।
কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের করিডোর।
হঠাৎ মনে হয়-
তুমি?
তারপর সঙ্গে সঙ্গে
বাস্তব ফিরে আসে।
না।

তুমি নও।

এই ভুল চিনে নেওয়ার মধ্যেও
একটি বয়স আছে।

প্রথম দিকে
হৃদয় আগে চিনত,
মস্তিষ্ক পরে সংশোধন করত।

এখন উল্টো-

মস্তিষ্ক দ্রুত বলে দেয়
এ শুধু মিল।

স্মৃতি একটু দূর থেকে
নিঃশব্দে তাকিয়ে থাকে।

কিন্তু সবচেয়ে আশ্চর্য-

তোমাকে না-দেখার অভ্যাস হয়ে গেলেও
তোমাকে দেখার স্মৃতি
অভ্যাসে নিস্তেজ হয়নি।

বরং কিছু দৃশ্য
আরও পরিষ্কার হয়েছে।

প্রথম দেখা।

ক্যাম্পাসের পথ।

বেঞ্চ।

ক্লাস শেষে তোমার হেঁটে যাওয়া।

হয়তো কারণ
বাস্তবের নতুন ছবি না-থাকলে
পুরোনো ছবিই
মনের মধ্যে স্থায়ী হয়ে যায়।

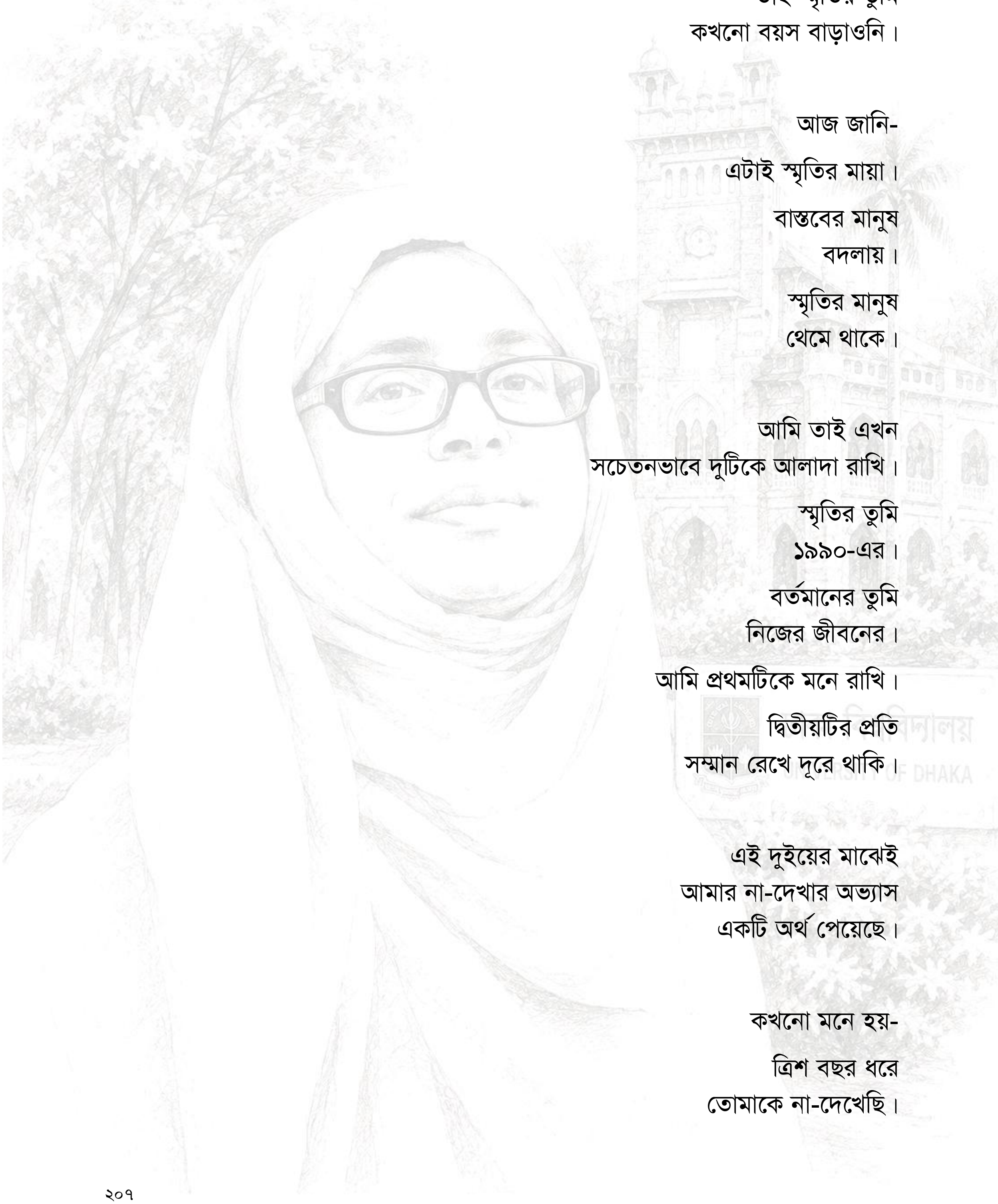

তাই স্মৃতির তুমি
কখনো বয়স বাড়াওনি।

আজ জানি-
এটাই স্মৃতির মায়া।
বাস্তবের মানুষ
বদলায়।
স্মৃতির মানুষ
থেমে থাকে।

আমি তাই এখন
সচেতনভাবে দুটিকে আলাদা রাখি।
স্মৃতির তুমি
১৯৯০-এর।
বর্তমানের তুমি
নিজের জীবনের।
আমি প্রথমটিকে মনে রাখি।
দ্বিতীয়টির প্রতি
সম্মান রেখে দূরে থাকি।

এই দুইয়ের মাঝেই
আমার না-দেখার অভ্যাস
একটি অর্থ পেয়েছে।

কখনো মনে হয়-
ত্রিশ বছর ধরে
তোমাকে না-দেখেছি।

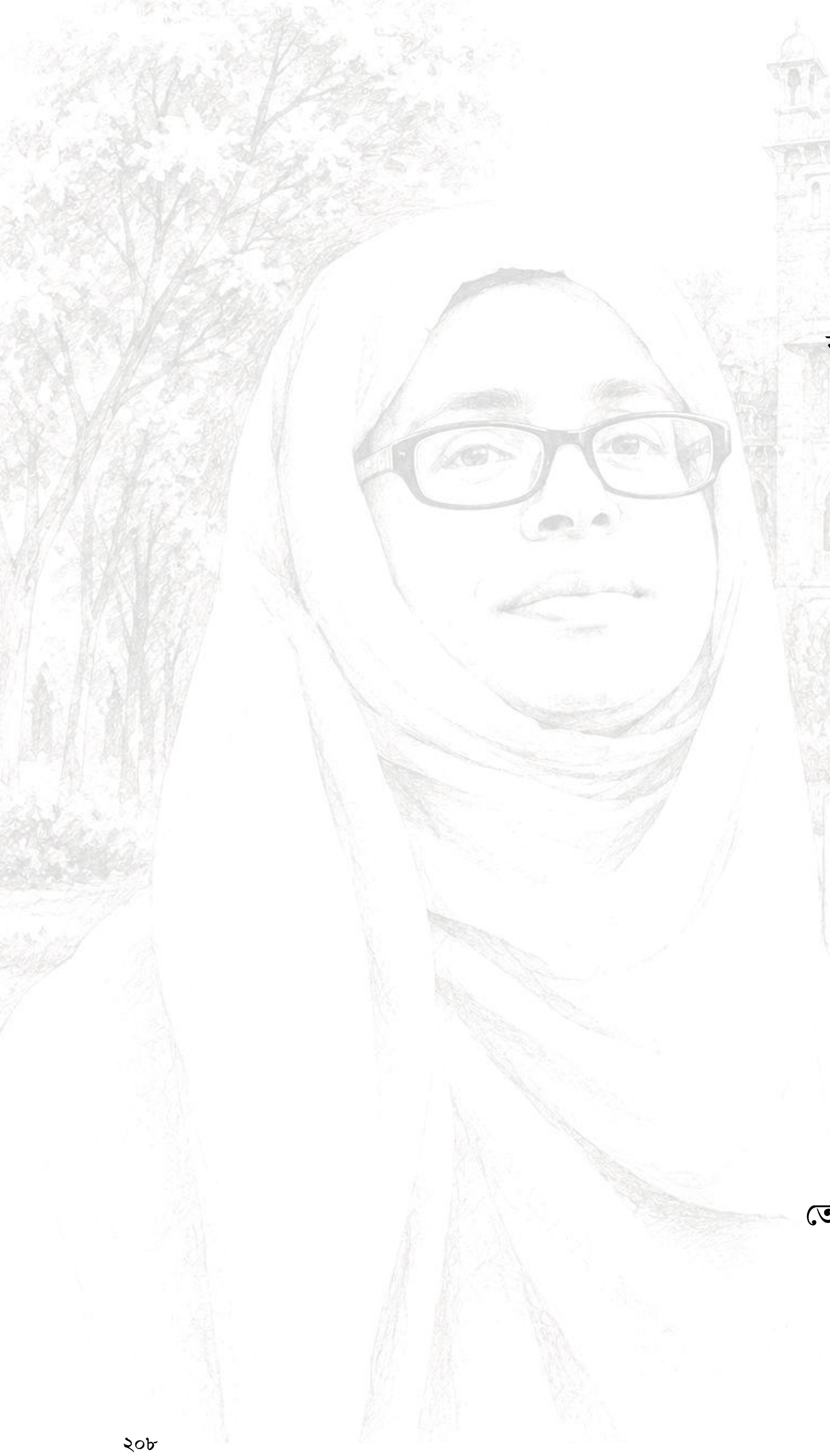

আবার কখনো মনে হয়-

না।

স্মৃতিতে তো
কতবার দেখেছি।

তাহলে "না-দেখা"
কোনটি?

বাস্তবের চোখে না-দেখা।

হৃদয়ের স্মৃতিতে
দেখে যাওয়া।

দুটি একসঙ্গে সম্ভব।

আমি তারই সাক্ষী।

আজ যদি কেউ বলে-

তুমি কীভাবে পারলে?

আমি বলব-

মানুষ পারে।
যখন সে বোঝে
নিজের আকাঙ্ক্ষার চেয়ে
অন্যজনের সীমা বড়।

তারপর একসময়
কঠিনটিও অভ্যাস হয়।

তোমাকে না-দেখার অভ্যাস
আমাকে ভুলিয়ে দেয়নি।

বরং শিখিয়েছে-

কিছু ভালোবাসা
দর্শনের ওপর টিকে থাকে না।
দেখা বন্ধ হলেও
স্মৃতি তার নিজস্ব আলোয়
নিঃশব্দে বেঁচে থাকতে পারে।

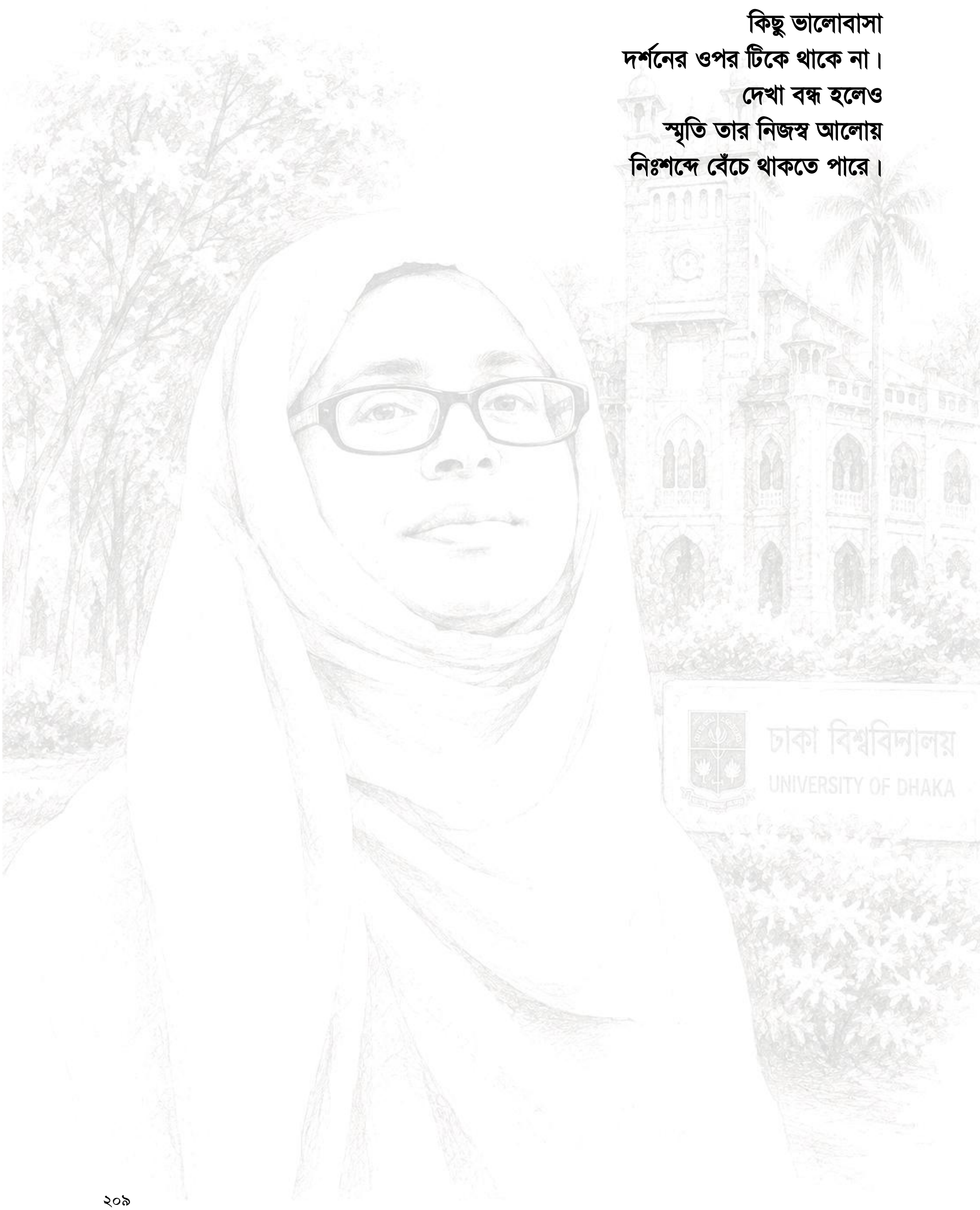

শহরে তুমি আছো

একদিন এই ভাবনাটি
অদ্ভুতভাবে আমাকে থামিয়ে দিয়েছিল-

শহরে তুমি আছো।

এই একই আকাশের নিচে।

এই একই সন্ধ্যার মধ্যে।

হয়তো খুব দূরে নও।

তবু আমাদের মাঝখানে
বছরের পর বছর।

একই শহর
কত অদ্ভুত জায়গা!

দুজন মানুষ
একই রাস্তায় কখনো চলতে পারে,
একই বৃষ্টিতে ভিজতে পারে,
একই বিকেলের আলো দেখতে পারে-

তবু দেখা না-ও হতে পারে।

আমি কখনো ভেবেছি-

এইমাত্র যে রাস্তাটি পার হলাম,
তুমি কি কিছুক্ষণ আগে
এখান দিয়ে গেছ?

এই যে বৃষ্টি নামল,
তোমার জানালাতেও কি
একই শব্দ পড়ছে?

এই যে শীতের কুয়াশা,
তুমিও কি দেখছ?

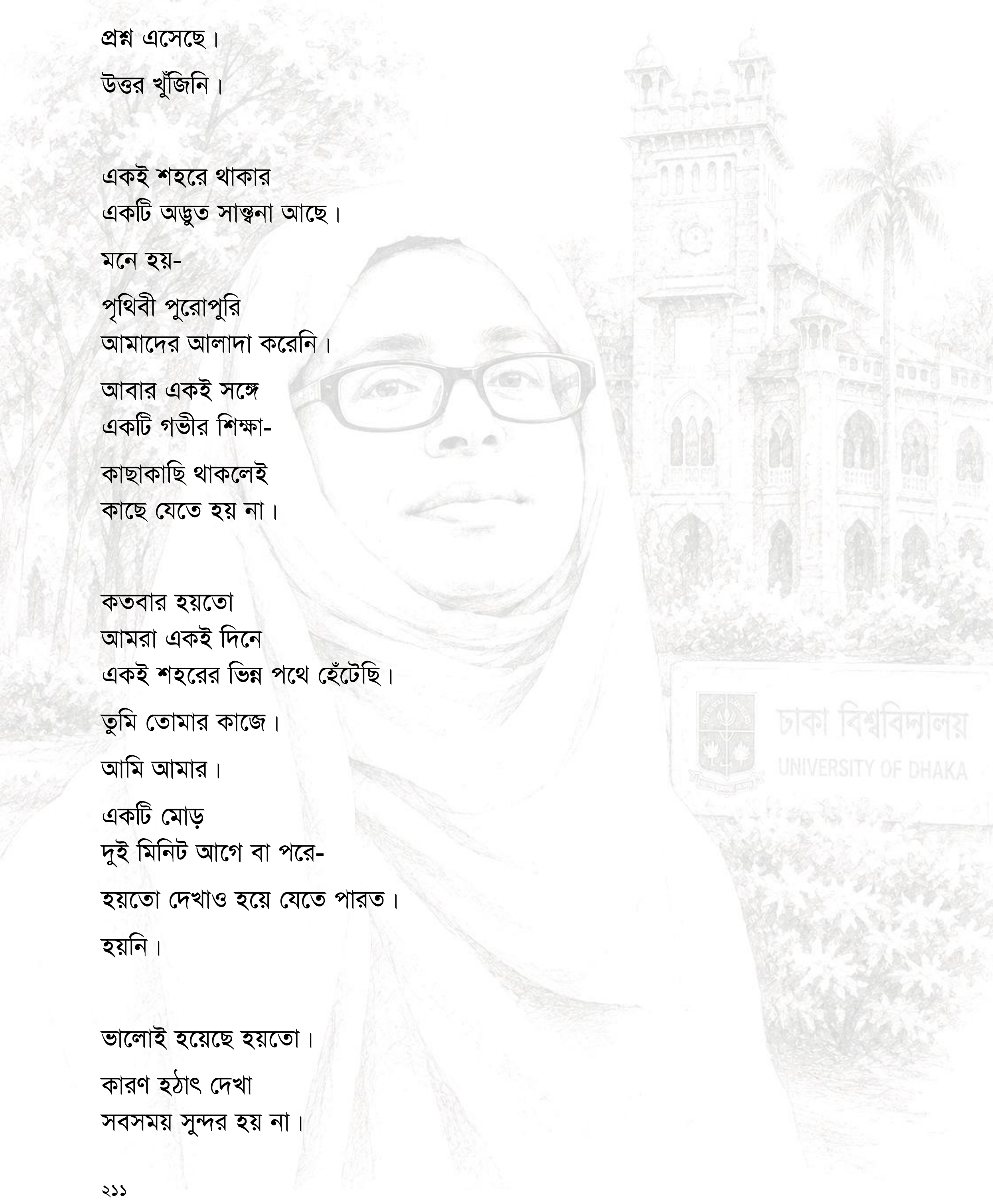

প্রশ্ন এসেছে।

উত্তর খুঁজিনি।

একই শহরে থাকার
একটি অদ্ভুত সান্ত্বনা আছে।

মনে হয়-

পৃথিবী পুরোপুরি
আমাদের আলাদা করেনি।

আবার একই সঙ্গে
একটি গভীর শিক্ষা-

কাছাকাছি থাকলেই
কাছে যেতে হয় না।

কতবার হয়তো
আমরা একই দিনে
একই শহরের ভিন্ন পথে হেঁটেছি।

তুমি তোমার কাজে।

আমি আমার।

একটি মোড়
দুই মিনিট আগে বা পরে-

হয়তো দেখাও হয়ে যেতে পারত।

হয়নি।

ভালোই হয়েছে হয়তো।

কারণ হঠাৎ দেখা
সবসময় সুন্দর হয় না।

যে দূরত্ব
এত যত্নে রাখা হয়েছে,
একটি আকস্মিক মুহূর্ত
তাকে অস্বস্তিকর করে তুলতে পারে।

তবু মানবমন
কল্পনা করে।

আমি কখনো কল্পনা করেছি-

রাস্তার ওপারে
হঠাৎ তোমাকে দেখলাম।

প্রথমে চিনতে পারলাম না।

তারপর কোনো ভঙ্গি,
চোখের চশমা,
মুখের সেই পরিচিত রেখা-

হঠাৎ সময় সরে গেল।

আমি কি ডাকতাম?

না।

এই প্রশ্নের উত্তর
এখন সহজ।

আমি দাঁড়াতাম কি?

হয়তো না।

শুধু একটু ধীরে হাঁটতাম।

একবার নিশ্চিত হয়ে নিতাম-

তুমি ভালো আছো।

তারপর নিজের পথে।

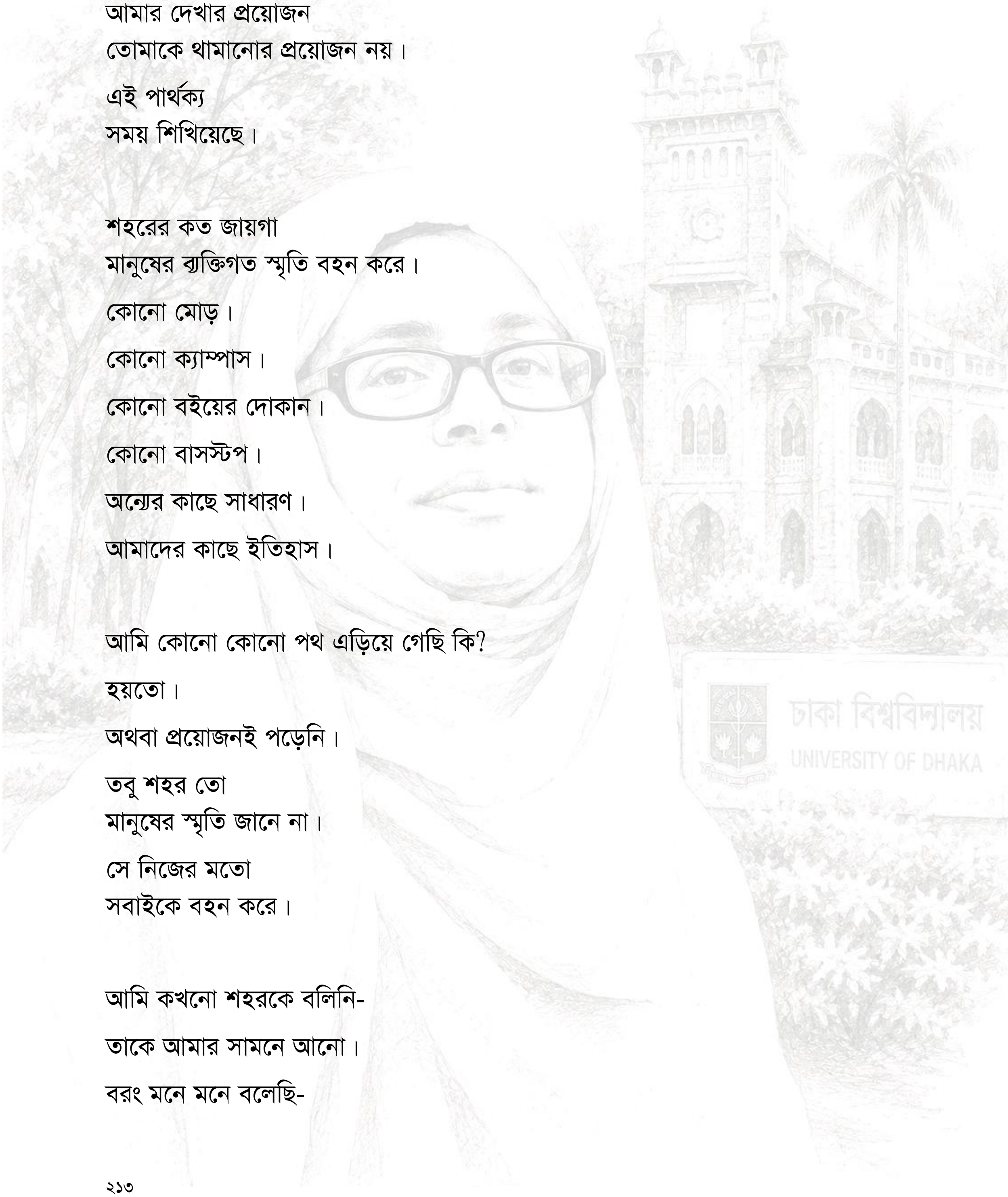

কেননা এত বছর পরে
আমার দেখার প্রয়োজন
তোমাকে থামানোর প্রয়োজন নয়।

এই পার্থক্য
সময় শিখিয়েছে।

শহরের কত জায়গা
মানুষের ব্যক্তিগত স্মৃতি বহন করে।

কোনো মোড়।

কোনো ক্যাম্পাস।

কোনো বইয়ের দোকান।

কোনো বাসস্টপ।

অন্যের কাছে সাধারণ।

আমাদের কাছে ইতিহাস।

আমি কোনো কোনো পথ এড়িয়ে গেছি কি?

হয়তো।

অথবা প্রয়োজনই পড়েনি।

তবু শহর তো
মানুষের স্মৃতি জানে না।

সে নিজের মতো
সবাইকে বহন করে।

আমি কখনো শহরকে বলিনি-

তাকে আমার সামনে আনো।

বরং মনে মনে বলেছি-

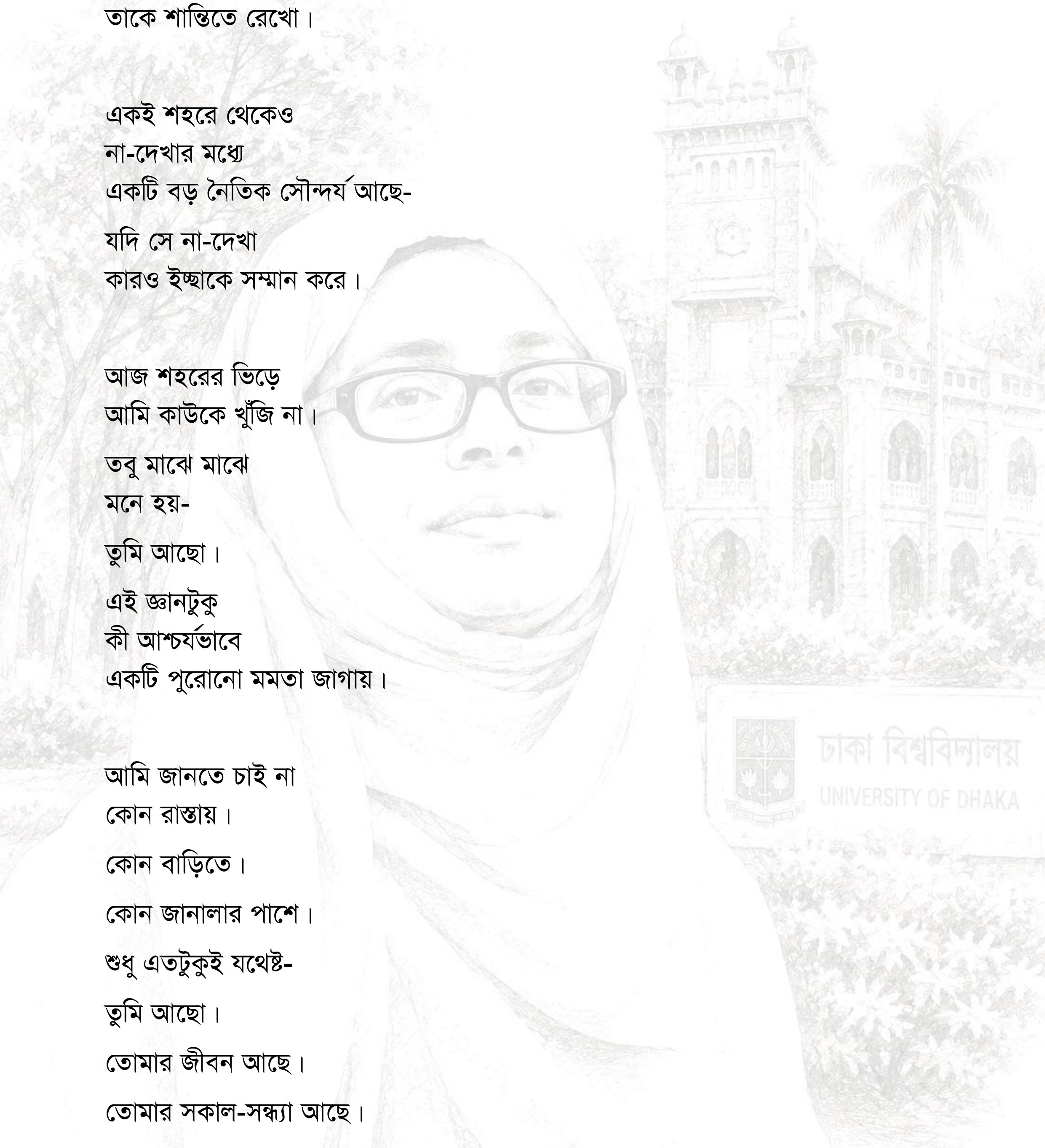

যদি সে তোমার মধ্যে থাকে,
তাকে শান্তিতে রেখো।

একই শহরে থেকেও
না-দেখার মধ্যে
একটি বড় নৈতিক সৌন্দর্য আছে-
যদি সে না-দেখা
কারও ইচ্ছাকে সম্মান করে।

আজ শহরের ভিড়ে
আমি কাউকে খুঁজি না।
তবু মাঝে মাঝে
মনে হয়-
তুমি আছো।
এই জ্ঞানটুকু
কী আশ্চর্যভাবে
একটি পুরোনো মমতা জাগায়।

আমি জানতে চাই না
কোন রাস্তায়।
কোন বাড়িতে।
কোন জানালার পাশে।
শুধু এতটুকুই যথেষ্ট-
তুমি আছো।
তোমার জীবন আছে।
তোমার সকাল-সন্ধ্যা আছে।

আমার ভালোবাসা
এখন আর ঠিকানা চায় না।
শুধু অস্তিত্বে শান্তি পায়।

শহরে তুমি আছো-
এই বাক্যের পরে
আরেকটি বাক্য যোগ করি-
আর আমি তোমার কাছে যাই না।
এই দ্বিতীয় বাক্যটিই
প্রথমটির প্রতি আমার সম্মান।

তোমার উপস্থিতি
জানার মতো কাছের।
তোমার সীমানা
মানার মতো দূরের।

হয়তো একদিন
আমাদের কেউই
এই শহরে থাকব না।
সময় মানুষকে সরিয়ে দেয়।
শহর থেকে।
জীবন থেকে।
স্মৃতি থেকেও কখনো।

তার আগে পর্যন্ত
আমি শহরটিকে একটি নীরব অনুরোধ রেখে দিই-

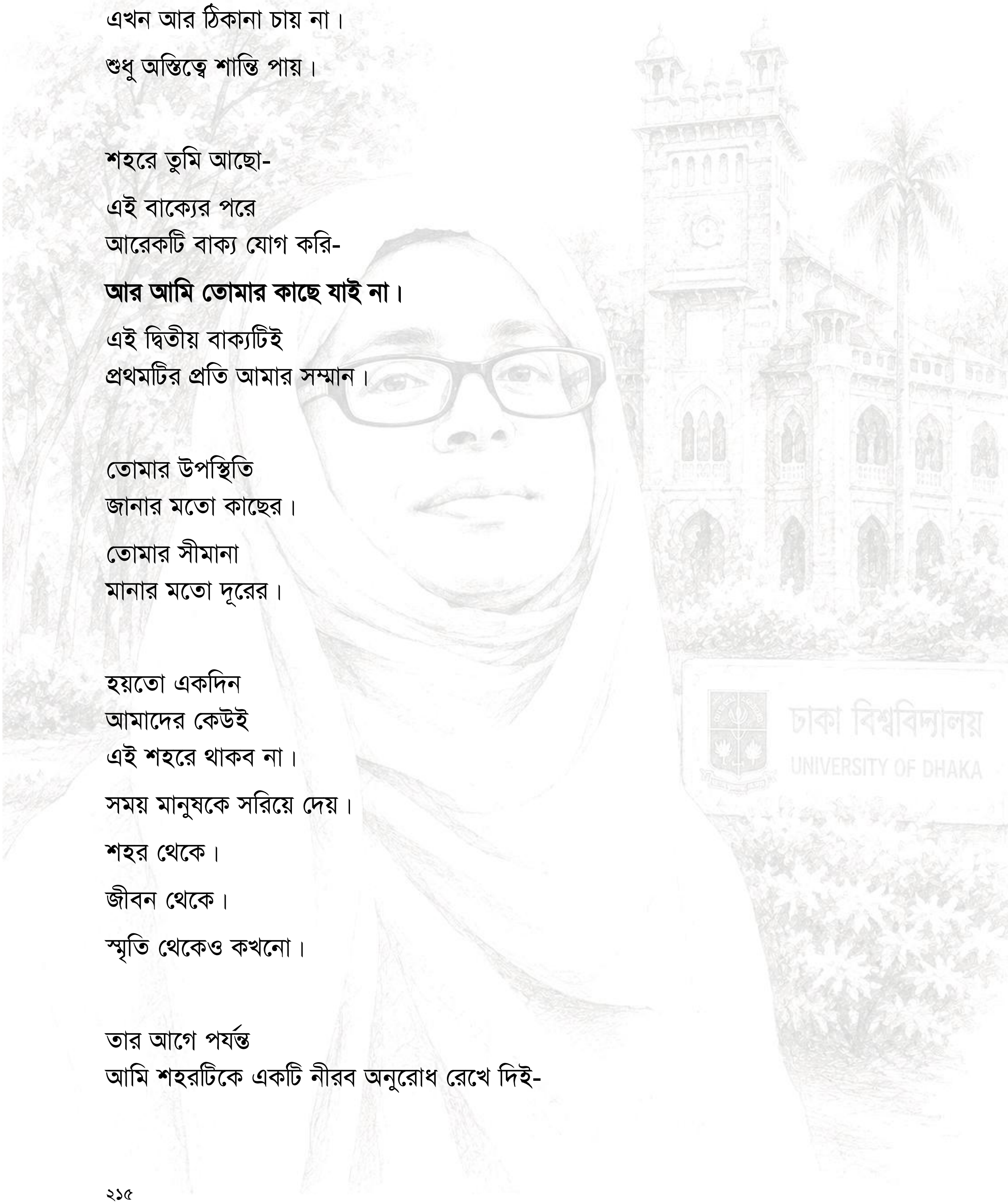

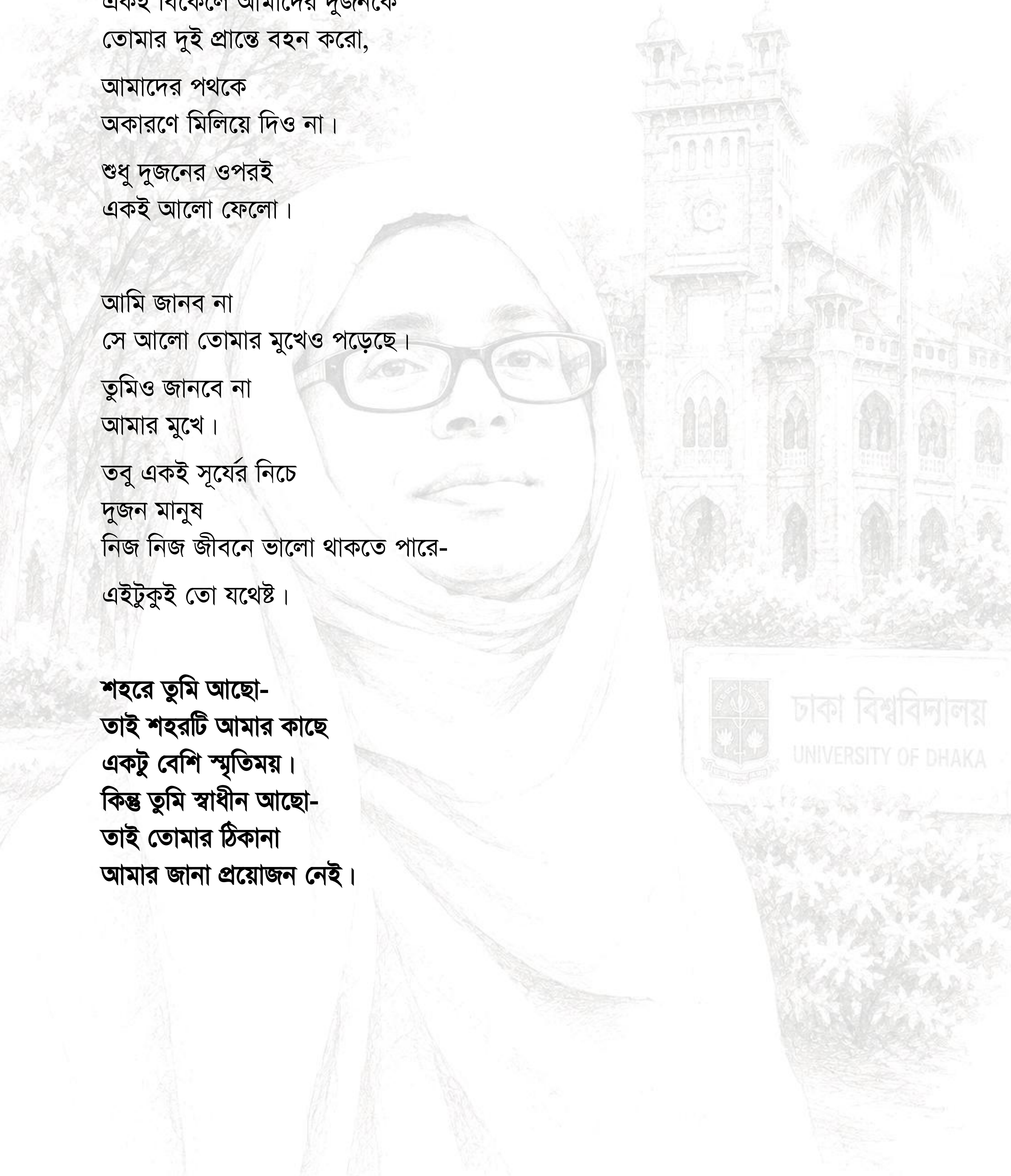

যদি কোনোদিন
একই বিকেলে আমাদের দুজনকে
তোমার দুই প্রান্তে বহন করো,

আমাদের পথকে
অকারণে মিলিয়ে দিও না।

শুধু দুজনের ওপরই
একই আলো ফেলো।

আমি জানব না
সে আলো তোমার মুখেও পড়েছে।

তুমিও জানবে না
আমার মুখে।

তবু একই সূর্যের নিচে
দুজন মানুষ
নিজ নিজ জীবনে ভালো থাকতে পারে-

এইটুকুই তো যথেষ্ট।

শহরে তুমি আছো-
তাই শহরটি আমার কাছে
একটু বেশি স্মৃতিময়।
কিন্তু তুমি স্বাধীন আছো-
তাই তোমার ঠিকানা
আমার জানা প্রয়োজন নেই।

হঠাৎ যদি দেখা হয়ে যেত

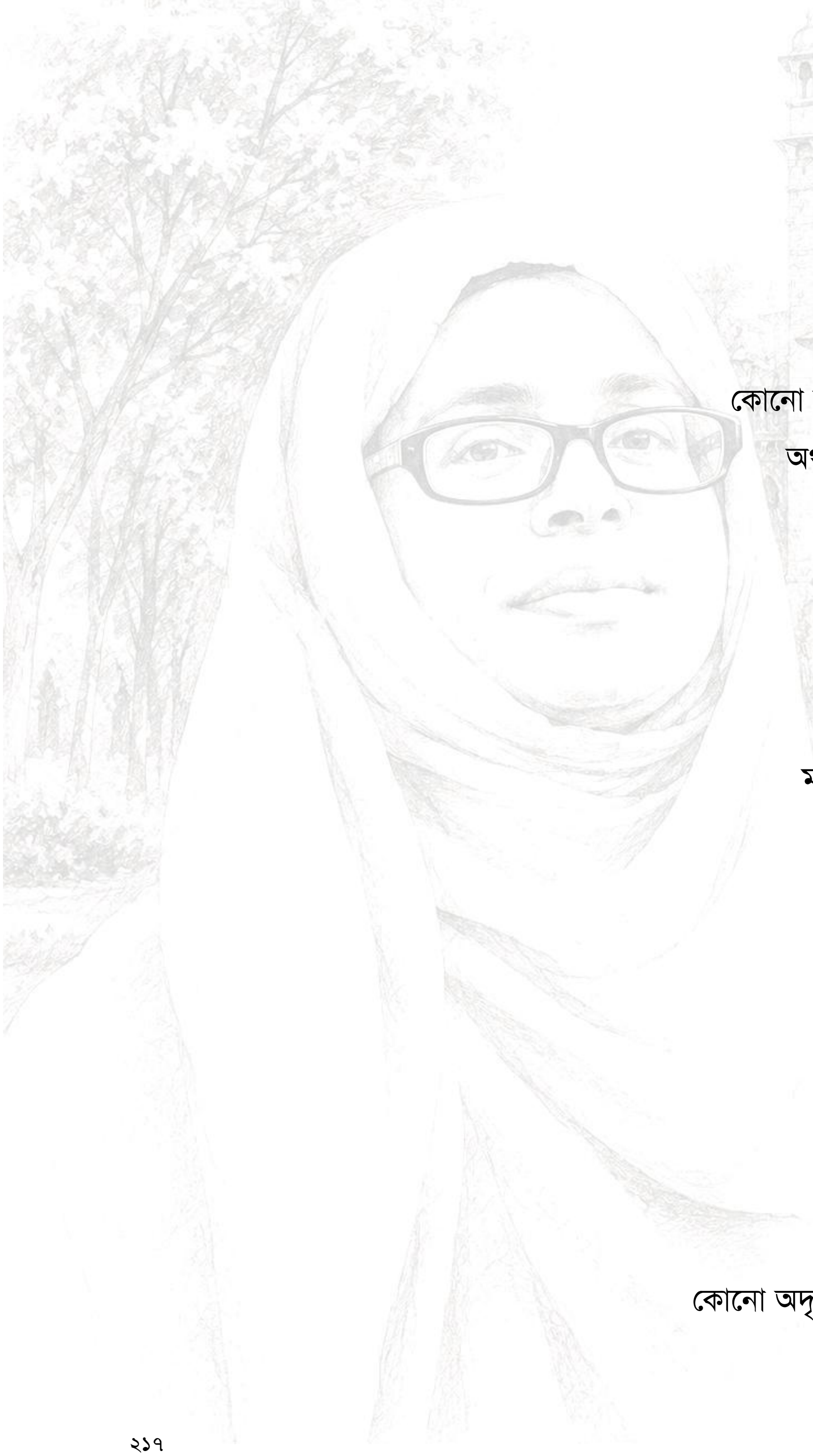

হঠাৎ যদি দেখা হয়ে যেত-

এই কল্পনাটি
কতবার যে এসেছে!

রাস্তার মোড়ে।

কোনো অনুষ্ঠানে।

কোনো বইয়ের দোকানে।

কোনো হাসপাতালের অপেক্ষাঘরে।

অথবা পুরোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের
কোনো পথের কাছে।

প্রথম প্রশ্ন-

আমি কি চিনতে পারতাম?

ত্রিশ বছর
মানুষের মুখে কম সময় নয়।

চুল বদলায়।
চোখের পাশে রেখা আসে।
হাঁটার গতি বদলায়।
চেহারা বদলায়।

তবু মনে হয়-

চিনতাম।

মুখ দিয়ে নয় শুধু।

কোনো অদৃশ্য পরিচিতির ভেতর দিয়ে।

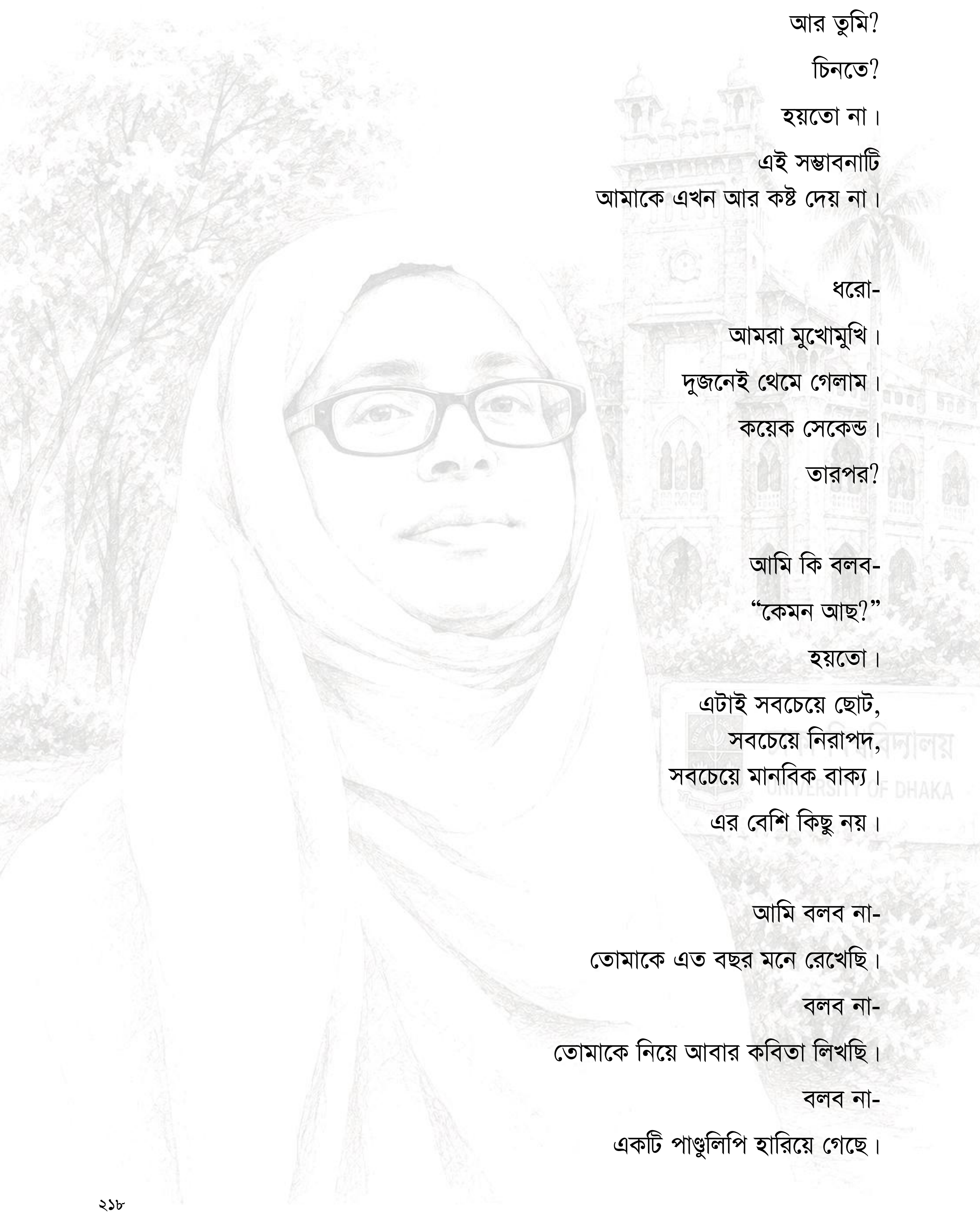

আর তুমি?

চিনতে?

হয়তো না।

এই সম্ভাবনাটি
আমাকে এখন আর কষ্ট দেয় না।

ধরো-

আমরা মুখোমুখি।

দুজনেই থেমে গেলাম।

কয়েক সেকেন্ড।

তারপর?

আমি কি বলব-

"কেমন আছ?"

হয়তো।

এটাই সবচেয়ে ছোট,
সবচেয়ে নিরাপদ,
সবচেয়ে মানবিক বাক্য।

এর বেশি কিছু নয়।

আমি বলব না-

তোমাকে এত বছর মনে রেখেছি।

বলব না-

তোমাকে নিয়ে আবার কবিতা লিখছি।

বলব না-

একটি পাণ্ডুলিপি হারিয়ে গেছে।

বলব না-

আমার প্রথম প্রেম শেষ হয়নি।

কেন?

কারণ রাস্তার এক আকস্মিক দেখা
কোনো মানুষের ওপর
ত্রিশ বছরের অনুভূতি
এক মুহূর্তে তুলে দেওয়ার জায়গা নয়।

হয়তো তুমি বলবে-

“ভালো।”

তারপর সৌজন্যে জিজ্ঞেস করবে-

“আপনি?”

আমি বলব-

“ভালো।”

এই দুই “ভালো”-এর মধ্যে
কত ইতিহাস থাকবে!

তুমি জানবে না।

আমি হয়তো জানব।

তবু সেটাই যথেষ্ট।

হয়তো কয়েকটি সাধারণ কথা।

তারপর বিদায়।

আমি বলব-

“ভালো থেকো।”

এই বাক্যটি
আমার জন্য নতুন নয়।
ত্রিশ বছর ধরে
মনে মনে তো এটিই বলেছি।

তারপর আমরা
দুই দিকে হাঁটব।
আমি কি পেছনে তাকাব?
যৌবনের আমি তাকাতে চাইত।
আজকের আমি
সম্ভবত না।

কারণ দেখা হয়ে গেলে
তাকে আবার স্মৃতি বানাতে হবে।
আমি চাইব
সেই মুহূর্তটি
তার নিজের মতো থাকুক।

তবু কল্পনার আরেকটি রূপ আছে।
ধরো তুমি
আমাকে দেখেই
চিনলে।
চোখে বিস্ময়।
বললে-
“এত বছর!”
আমি হয়তো হেসে বলব-
“হ্যাঁ।”

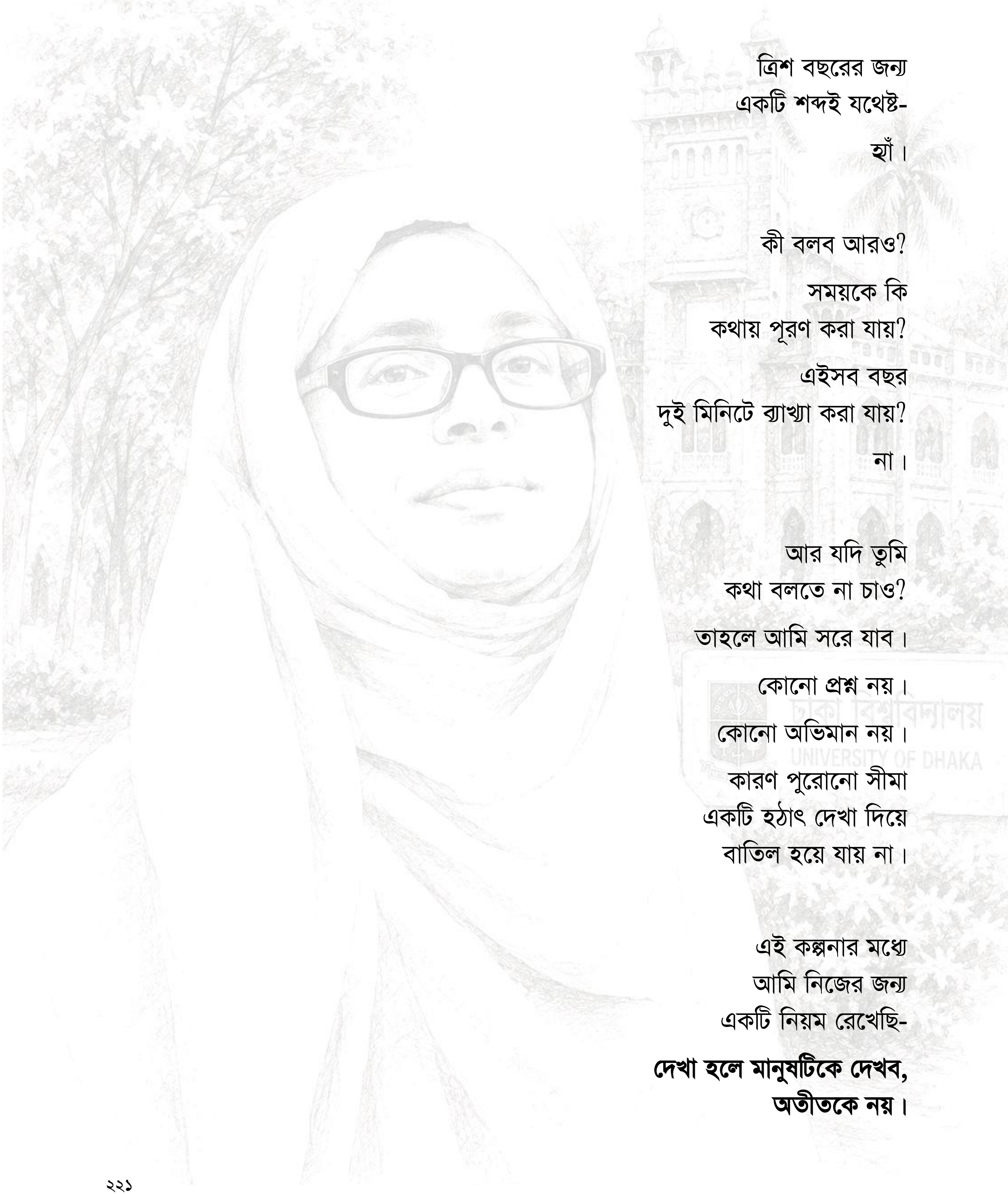

শুধু এইটুকু।

ত্রিশ বছরের জন্য
একটি শব্দই যথেষ্ট-
হ্যাঁ।

কী বলব আরও?
সময়কে কি
কথায় পূরণ করা যায়?
এইসব বছর
দুই মিনিটে ব্যাখ্যা করা যায়?
না।

আর যদি তুমি
কথা বলতে না চাও?
তাহলে আমি সরে যাব।
কোনো প্রশ্ন নয়।
কোনো অভিমান নয়।
কারণ পুরোনো সীমা
একটি হঠাৎ দেখা দিয়ে
বাতিল হয়ে যায় না।

এই কল্পনার মধ্যে
আমি নিজের জন্য
একটি নিয়ম রেখেছি-
দেখা হলে মানুষটিকে দেখব,
অতীতকে নয়।

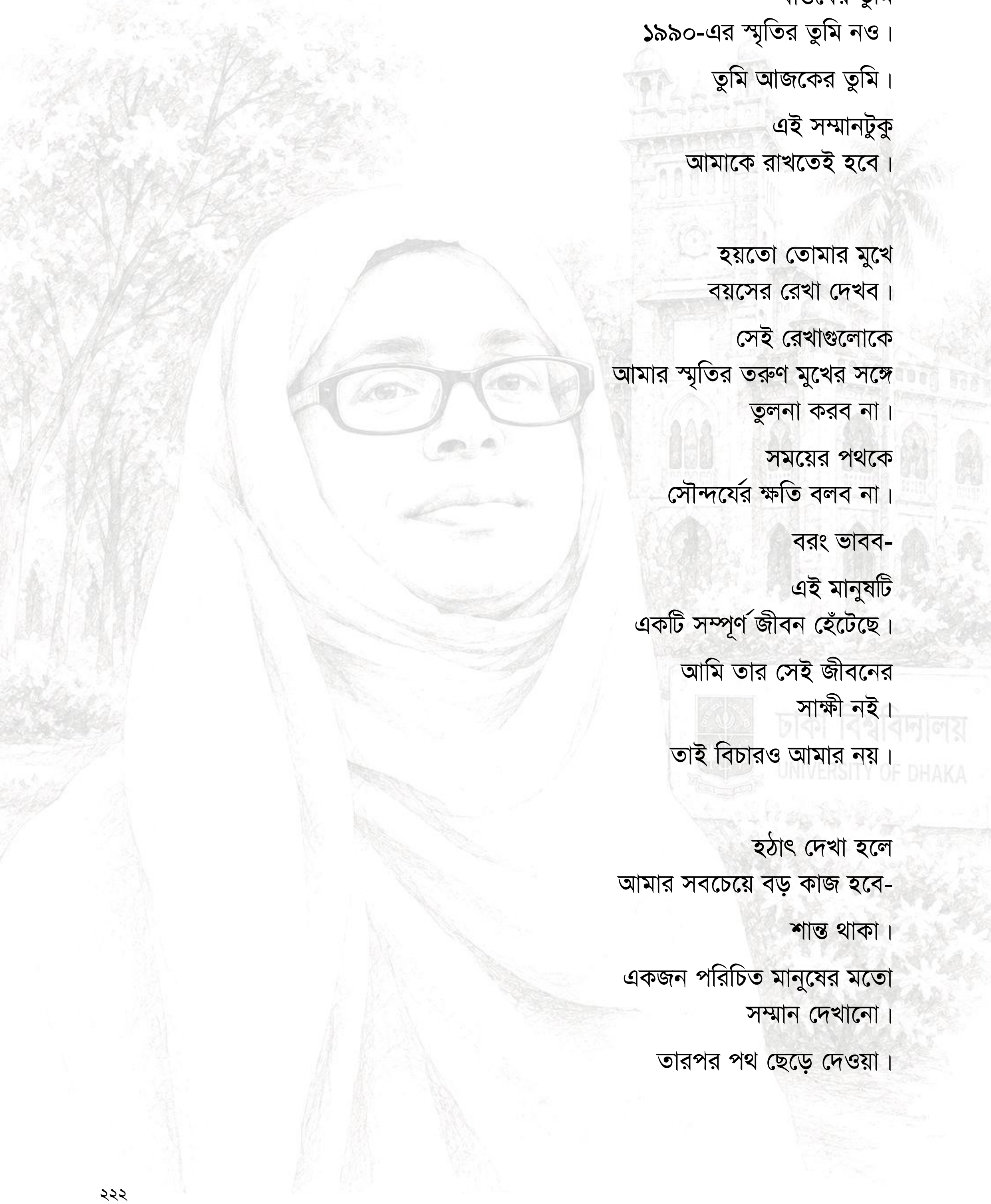

বাস্তবের তুমি
১৯৯০-এর স্মৃতির তুমি নও।

তুমি আজকের তুমি।

এই সম্মানটুকু
আমাকে রাখতেই হবে।

হয়তো তোমার মুখে
বয়সের রেখা দেখব।

সেই রেখাগুলোকে
আমার স্মৃতির তরুণ মুখের সঙ্গে
তুলনা করব না।

সময়ের পথকে
সৌন্দর্যের ক্ষতি বলব না।

বরং ভাবব-

এই মানুষটি
একটি সম্পূর্ণ জীবন হেঁটেছে।

আমি তার সেই জীবনের
সাক্ষী নই।

তাই বিচারও আমার নয়।

হঠাৎ দেখা হলে
আমার সবচেয়ে বড় কাজ হবে-

শান্ত থাকা।

একজন পরিচিত মানুষের মতো
সম্মান দেখানো।

তারপর পথ ছেড়ে দেওয়া।

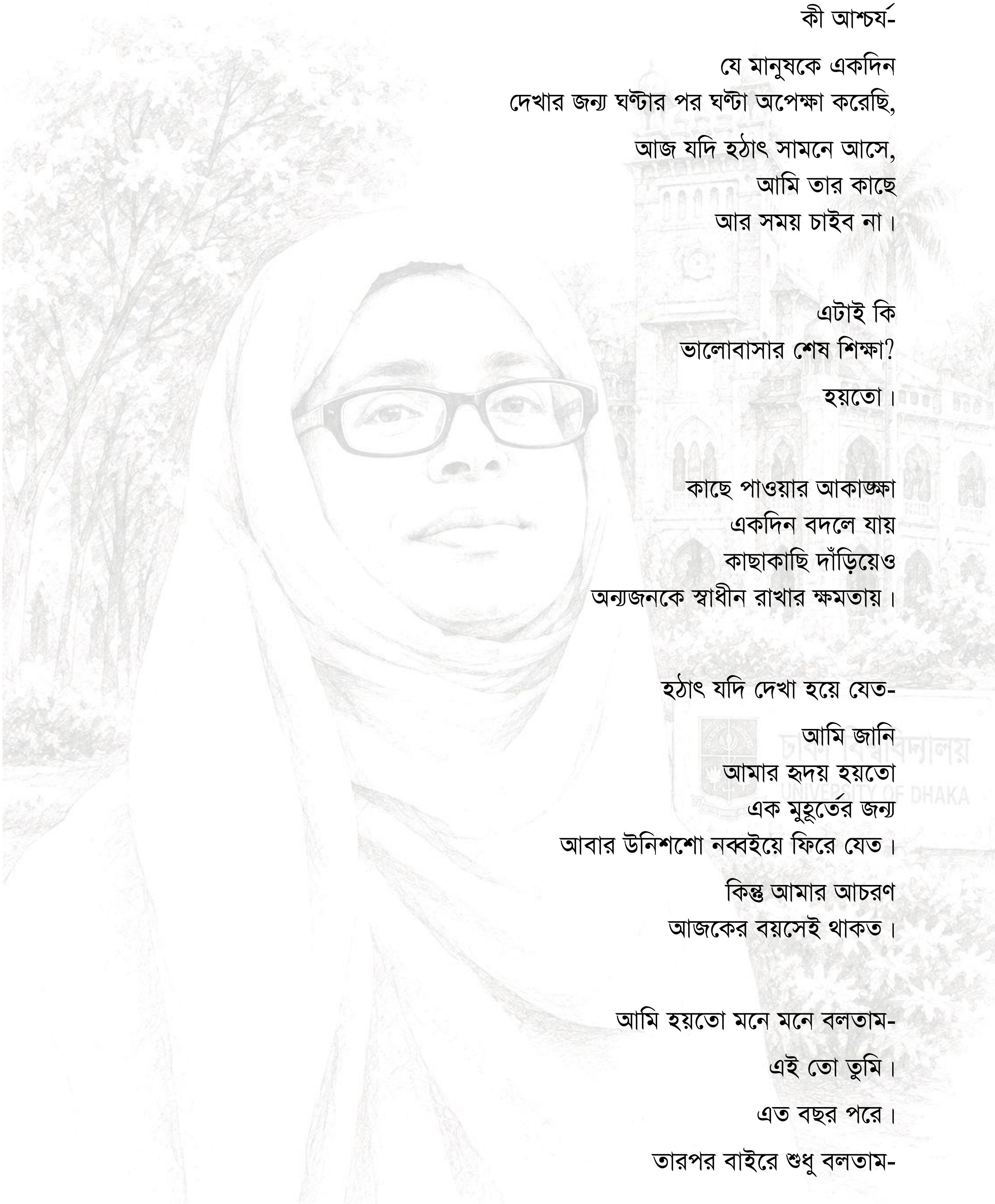

কী আশ্চর্য-

যে মানুষকে একদিন
দেখার জন্য ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপেক্ষা করেছি,

আজ যদি হঠাৎ সামনে আসে,
আমি তার কাছে
আর সময় চাইব না।

এটাই কি
ভালোবাসার শেষ শিক্ষা?

হয়তো।

কাছে পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা
একদিন বদলে যায়
কাছাকাছি দাঁড়িয়েও
অন্যজনকে স্বাধীন রাখার ক্ষমতায়।

হঠাৎ যদি দেখা হয়ে যেত-

আমি জানি
আমার হৃদয় হয়তো
এক মুহূর্তের জন্য
আবার উনিশশো নব্বইয়ে ফিরে যেত।

কিন্তু আমার আচরণ
আজকের বয়সেই থাকত।

আমি হয়তো মনে মনে বলতাম-

এই তো তুমি।

এত বছর পরে।

তারপর বাইরে শুধু বলতাম-

"ভালো থেকো।"

আর যদি কোনো কথা না-ও হয়-

চোখে চোখ পড়ে
দুজন দুদিকে চলে যাই-

তবু সেটিও
অসম্পূর্ণ থাকবে না।

কারণ সব দেখার
কথা প্রয়োজন হয় না।

কখনো একটি মুহূর্তই যথেষ্ট
বুঝতে-

সময় গেছে।

মানুষ বদলেছে।

আর স্মৃতি
তার জায়গায় রয়ে গেছে।

হঠাৎ যদি দেখা হয়ে যেত,
আমি পুরোনো প্রেম ফেরত চাইতাম না।
শুধু বর্তমানের তোমাকে
বর্তমানের মতোই সম্মান করে
চুপচাপ চলে আসতাম।

পুরোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে

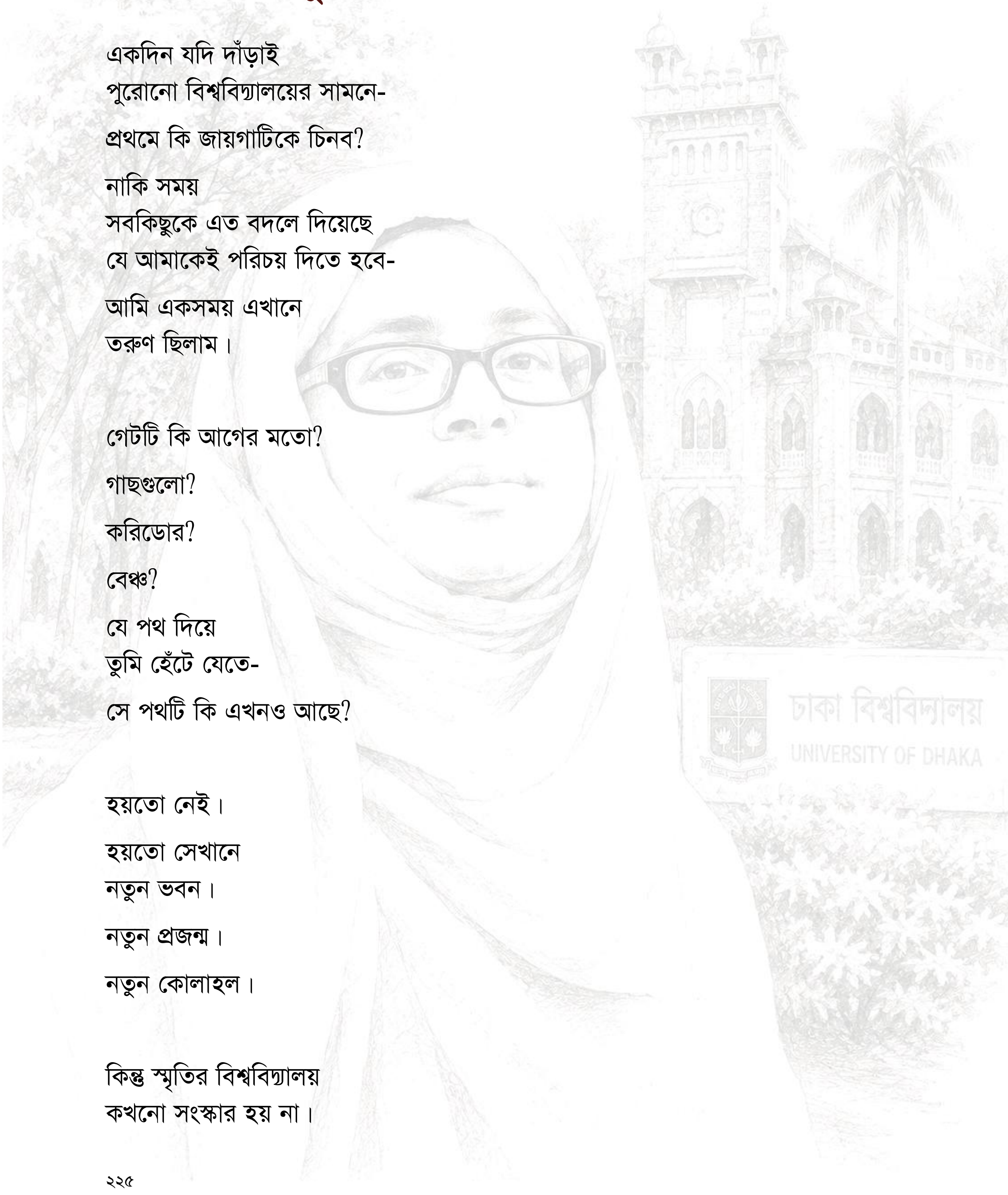

একদিন যদি দাঁড়াই
পুরোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে-

প্রথমে কি জায়গাটিকে চিনব?

নাকি সময়
সবকিছুকে এত বদলে দিয়েছে
যে আমাকেই পরিচয় দিতে হবে-

আমি একসময় এখানে
তরুণ ছিলাম।

গেটটি কি আগের মতো?

গাছগুলো?

করিডোর?

বেঞ্চ?

যে পথ দিয়ে
তুমি হেঁটে যেতে-

সে পথটি কি এখনও আছে?

হয়তো নেই।

হয়তো সেখানে
নতুন ভবন।

নতুন প্রজন্ম।

নতুন কোলাহল।

কিন্তু স্মৃতির বিশ্ববিদ্যালয়
কখনো সংস্কার হয় না।

সেখানে সবকিছু
আগের মতো।

আমি গেট পেরোতেই
দেখব-

তরুণেরা হাঁটছে।

কেউ বই হাতে।

কেউ হাসছে।

কেউ বন্ধুর জন্য অপেক্ষা করছে।

হয়তো কোনো এক ছেলে
দূর থেকে
একটি মেয়ের দিকে তাকিয়ে আছে।

আমি কি তাকে চিনব?

হয়তো।

কারণ তার চোখে
নিজের অতীত দেখতে পাব।

সে হয়তো
কথা বলতে পারছে না।

হয়তো ক্লাস শেষে
অকারণে দাঁড়িয়ে।

হয়তো খাতার কোণে
একটি নাম লিখে
আবার কেটে দিচ্ছে।

আমি মনে মনে হাসব।

বলব-

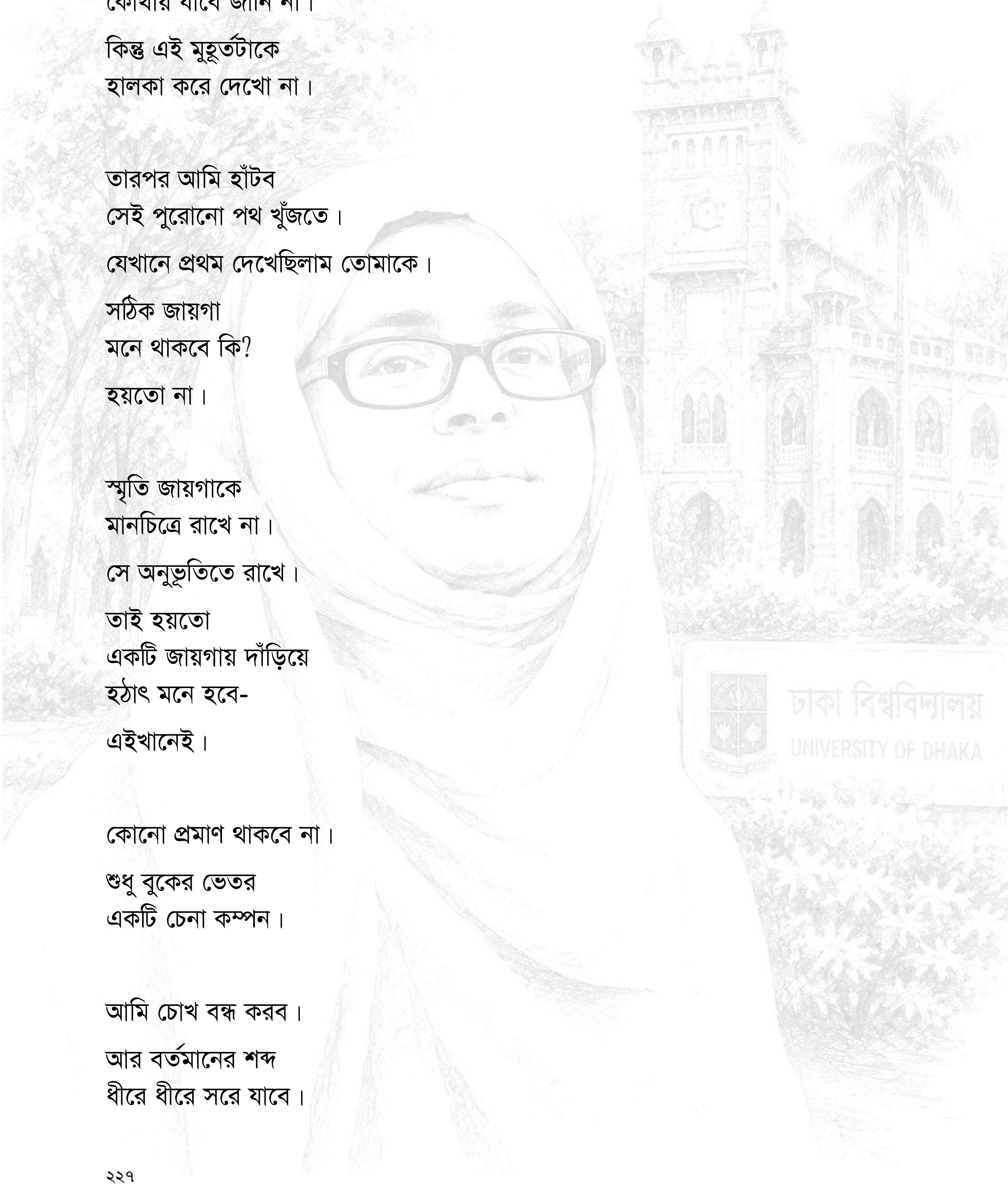

তোমার গল্পটা
কোথায় যাবে জানি না।

কিন্তু এই মুহূর্তটাকে
হালকা করে দেখো না।

তারপর আমি হাঁটব
সেই পুরোনো পথ খুঁজতে।

যেখানে প্রথম দেখেছিলাম তোমাকে।

সঠিক জায়গা
মনে থাকবে কি?

হয়তো না।

স্মৃতি জায়গাকে
মানচিত্রে রাখে না।

সে অনুভূতিতে রাখে।

তাই হয়তো
একটি জায়গায় দাঁড়িয়ে
হঠাৎ মনে হবে-

এইখানেই।

কোনো প্রমাণ থাকবে না।

শুধু বুকের ভেতর
একটি চেনা কম্পন।

আমি চোখ বন্ধ করব।

আর বর্তমানের শব্দ
ধীরে ধীরে সরে যাবে।

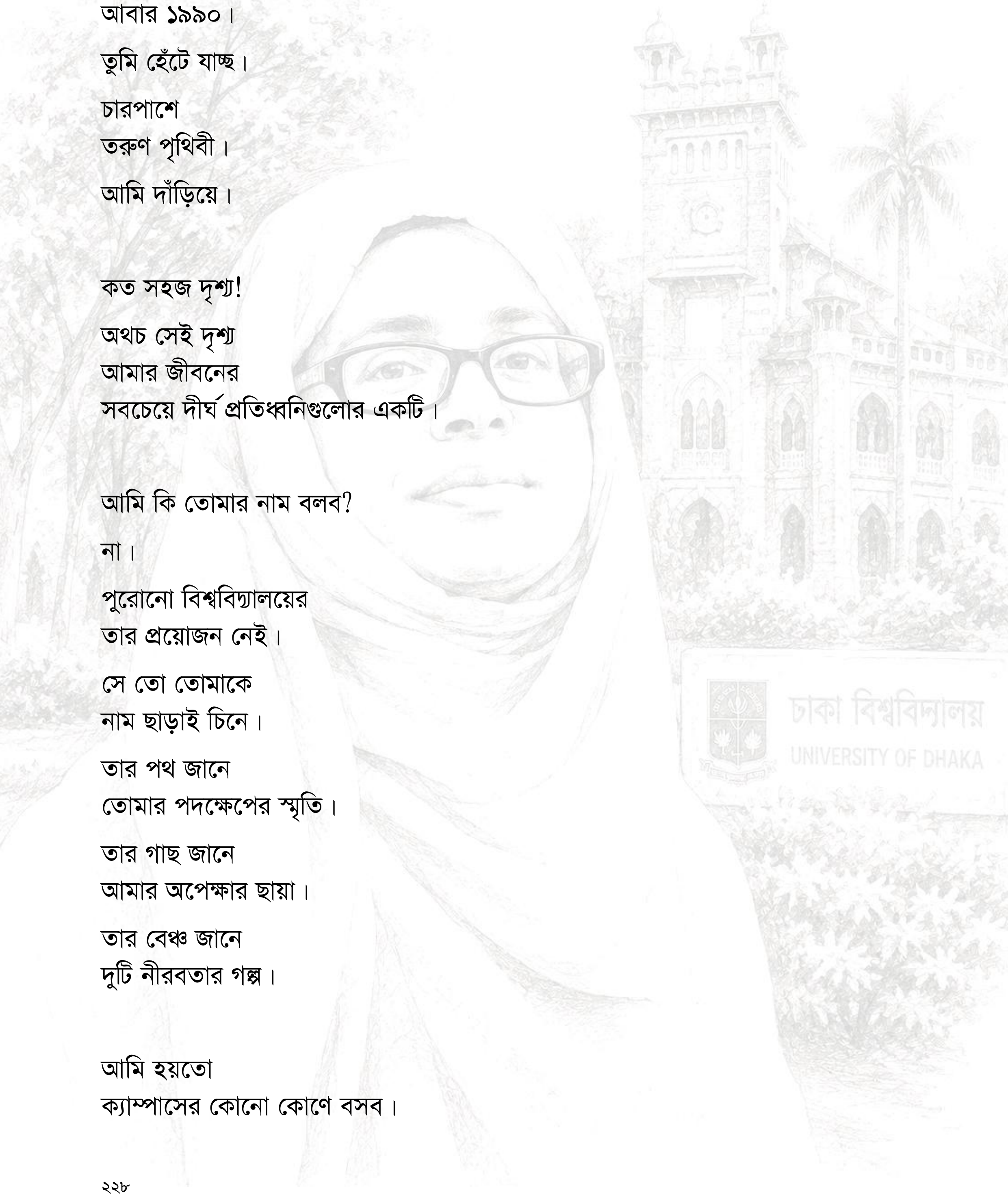

আবার ১৯৯০।

তুমি হেঁটে যাচ্ছ।

চারপাশে
তরুণ পৃথিবী।

আমি দাঁড়িয়ে।

কত সহজ দৃশ্য!

অথচ সেই দৃশ্য
আমার জীবনের
সবচেয়ে দীর্ঘ প্রতিধ্বনিগুলোর একটি।

আমি কি তোমার নাম বলব?

না।

পুরোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের
তার প্রয়োজন নেই।

সে তো তোমাকে
নাম ছাড়াই চিনে।

তার পথ জানে
তোমার পদক্ষেপের স্মৃতি।

তার গাছ জানে
আমার অপেক্ষার ছায়া।

তার বেঞ্চ জানে
দুটি নীরবতার গল্প।

আমি হয়তো
ক্যাম্পাসের কোনো কোণে বসব।

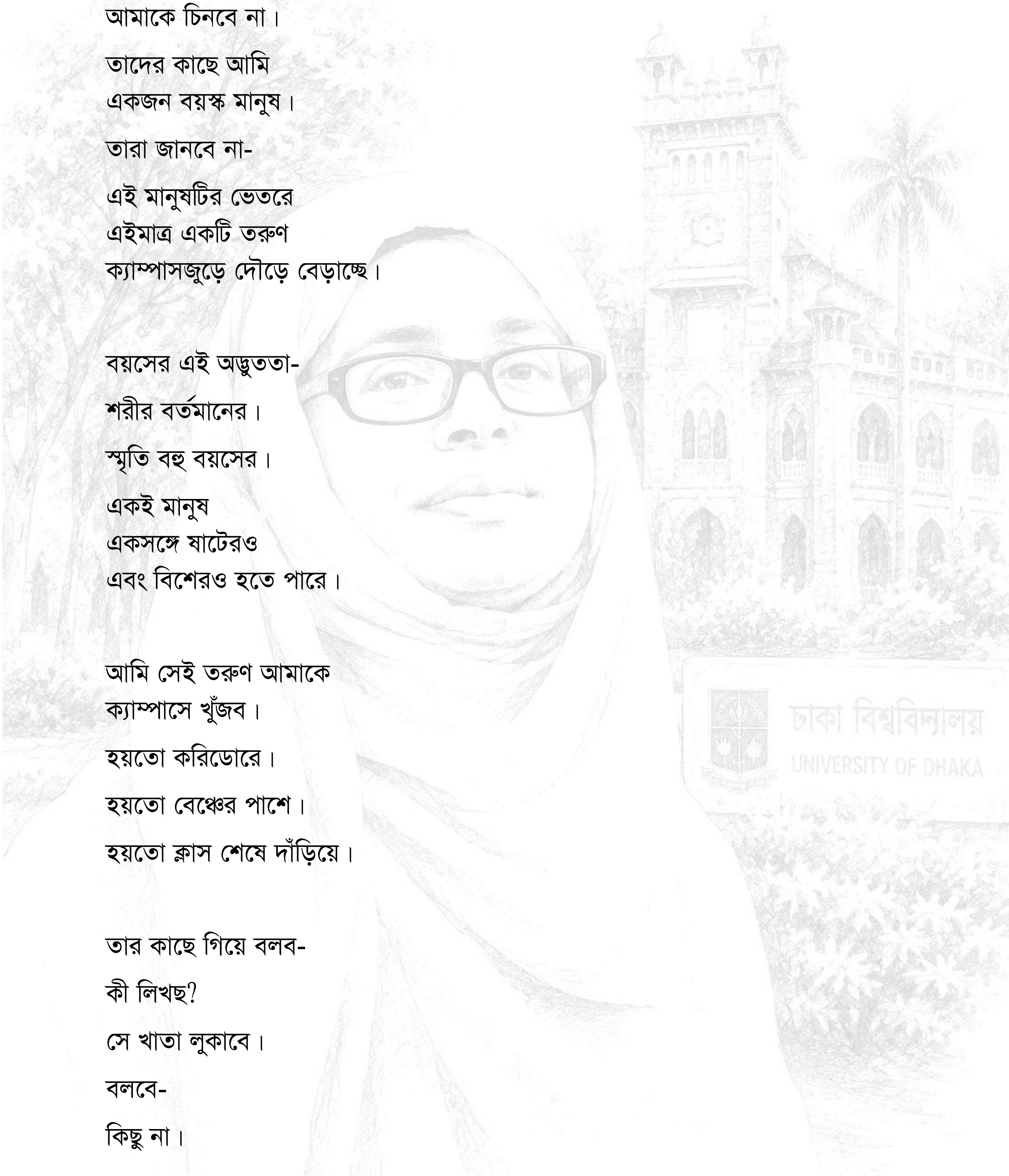

বর্তমানের ছাত্রছাত্রীরা
আমাকে চিনবে না।

তাদের কাছে আমি
একজন বয়স্ক মানুষ।

তারা জানবে না-

এই মানুষটির ভেতরে
এইমাত্র একটি তরুণ
ক্যাম্পাসজুড়ে দৌড়ে বেড়াচ্ছে।

বয়সের এই অদ্ভুততা-

শরীর বর্তমানের।

স্মৃতি বহু বয়সের।

একই মানুষ
একসঙ্গে ষাটেরও
এবং বিশেরও হতে পারে।

আমি সেই তরুণ আমাকে
ক্যাম্পাসে খুঁজব।

হয়তো করিডোরে।

হয়তো বেঞ্চের পাশে।

হয়তো ক্লাস শেষে দাঁড়িয়ে।

তার কাছে গিয়ে বলব-

কী লিখছ?

সে খাতা লুকাবে।

বলবে-

কিছু না।

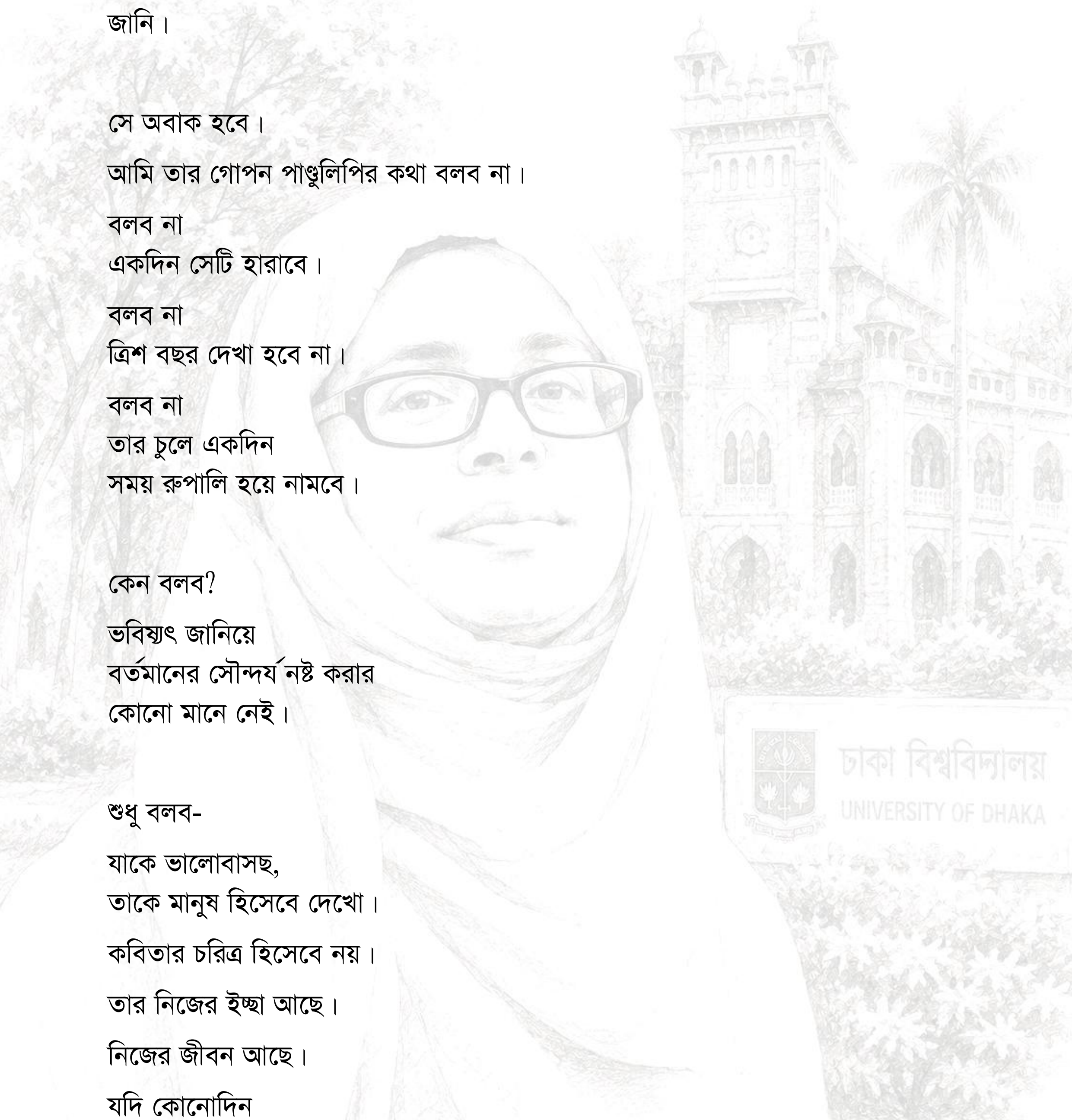

আমি বলব-

জানি।

সে অবাক হবে।

আমি তার গোপন পাণ্ডুলিপির কথা বলব না।

বলব না
একদিন সেটি হারাবে।

বলব না
ত্রিশ বছর দেখা হবে না।

বলব না
তার চুলে একদিন
সময় রুপালি হয়ে নামবে।

কেন বলব?

ভবিষ্যৎ জানিয়ে
বর্তমানের সৌন্দর্য নষ্ট করার
কোনো মানে নেই।

শুধু বলব-

যাকে ভালোবাসছ,
তাকে মানুষ হিসেবে দেখো।

কবিতার চরিত্র হিসেবে নয়।

তার নিজের ইচ্ছা আছে।

নিজের জীবন আছে।

যদি কোনোদিন
সে তোমাকে দূরে থাকতে বলে-

থেমে যেও।

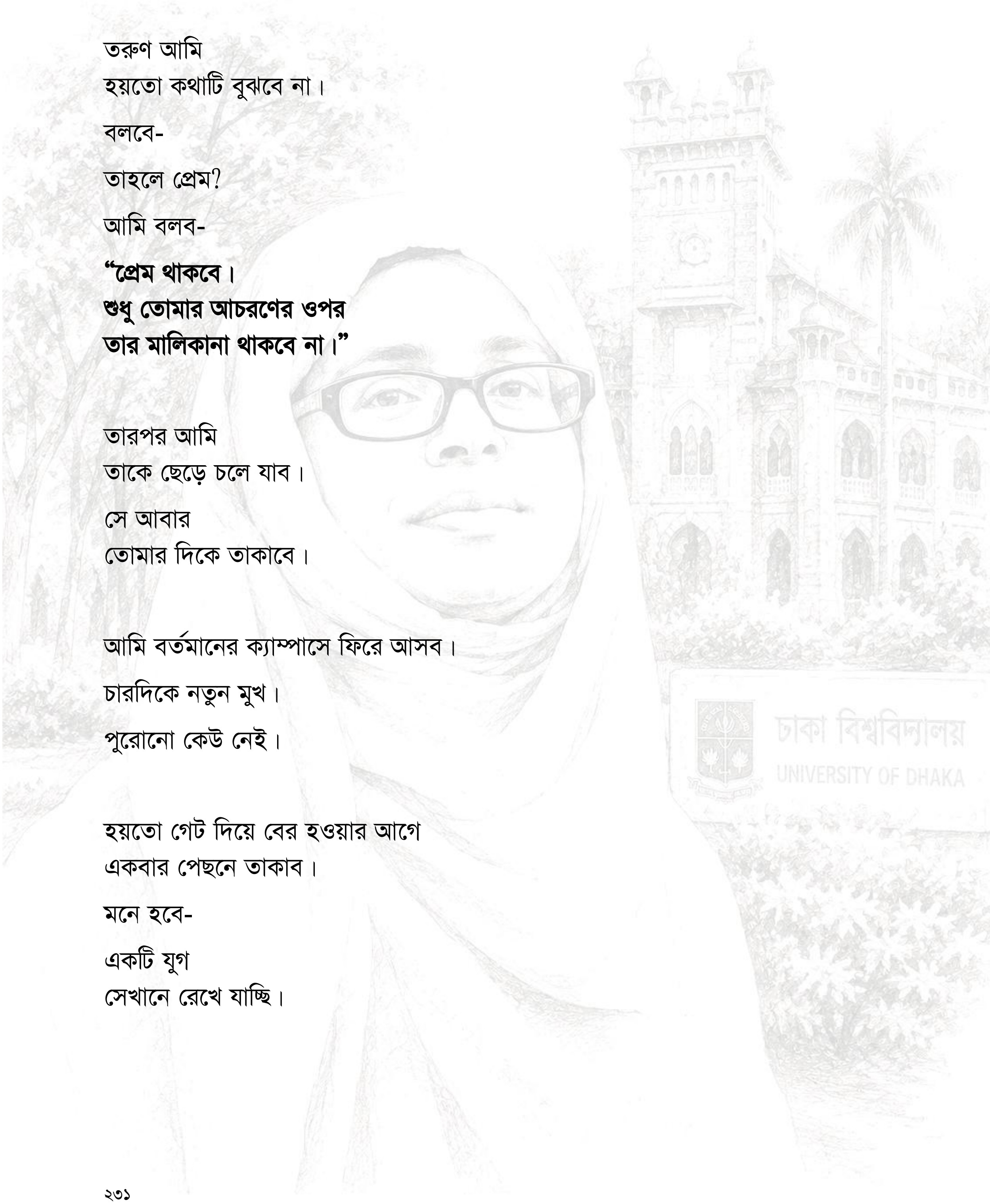

তরুণ আমি
হয়তো কথাটি বুঝবে না।

বলবে-

তাহলে প্রেম?

আমি বলব-

“প্রেম থাকবে।
শুধু তোমার আচরণের ওপর
তার মালিকানা থাকবে না।”

তারপর আমি
তাকে ছেড়ে চলে যাব।

সে আবার
তোমার দিকে তাকাবে।

আমি বর্তমানের ক্যাম্পাসে ফিরে আসব।

চারদিকে নতুন মুখ।

পুরোনো কেউ নেই।

হয়তো গেট দিয়ে বের হওয়ার আগে
একবার পেছনে তাকাব।

মনে হবে-

একটি যুগ
সেখানে রেখে যাচ্ছি।

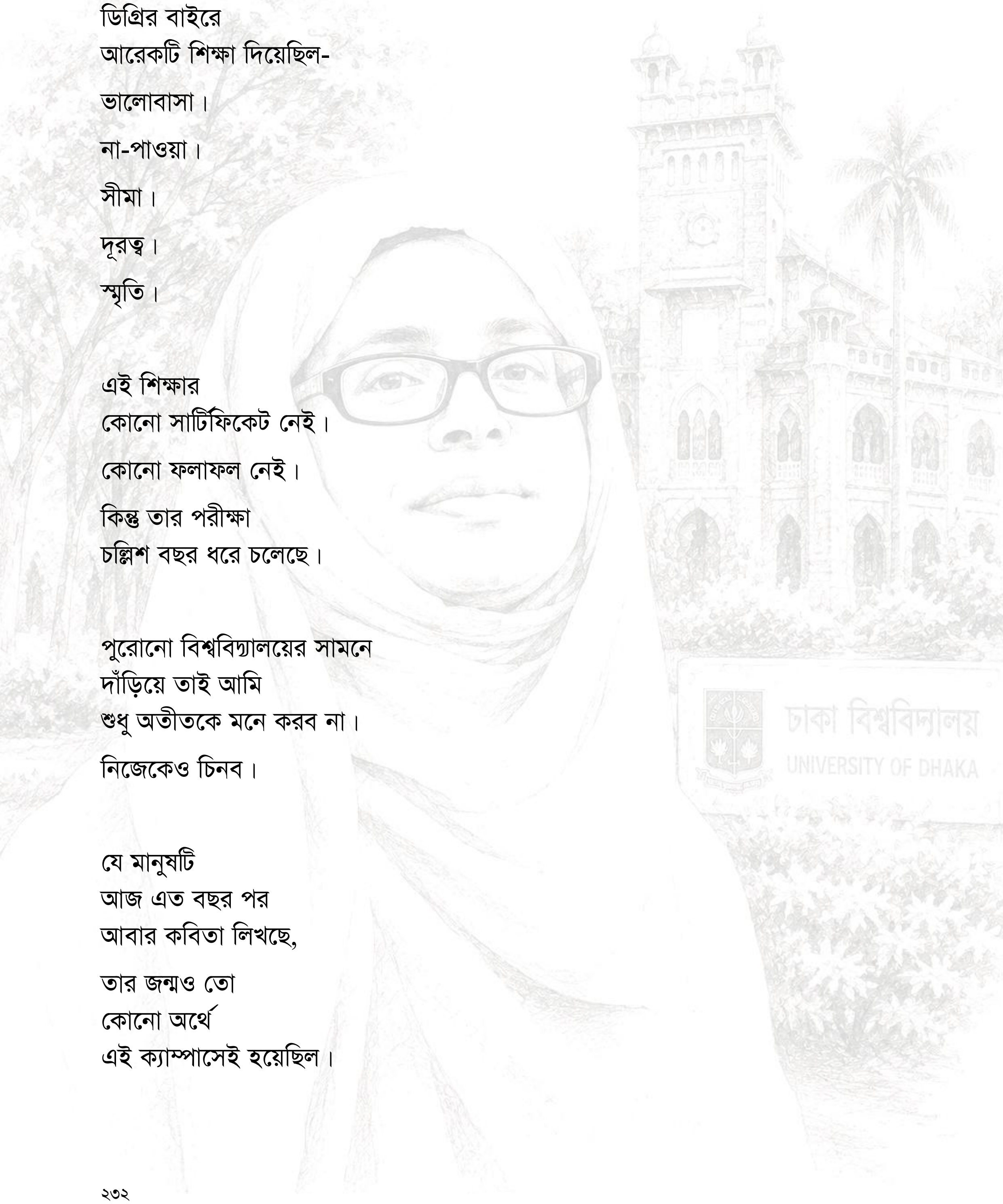

বিশ্ববিদ্যালয় আমাকে
ডিগ্রির বাইরে
আরেকটি শিক্ষা দিয়েছিল-

ভালোবাসা।

না-পাওয়া।

সীমা।

দূরত্ব।

স্মৃতি।

এই শিক্ষার
কোনো সার্টিফিকেট নেই।

কোনো ফলাফল নেই।

কিন্তু তার পরীক্ষা
চল্লিশ বছর ধরে চলেছে।

পুরোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে
দাঁড়িয়ে তাই আমি
শুধু অতীতকে মনে করব না।

নিজেকেও চিনব।

যে মানুষটি
আজ এত বছর পর
আবার কবিতা লিখছে,

তার জন্মও তো
কোনো অর্থে
এই ক্যাম্পাসেই হয়েছিল।

তুমি হয়তো
সেটি কোনোদিন জানোনি।
জানার প্রয়োজনও ছিল না।

আমি বেরিয়ে আসব।
পেছনে থাকবে
গেট।
ভবন।
পথ।

আর মনে মনে বলব-

“তোমরা তাকে মনে রেখো না-
তোমাদের তার নাম জানার দরকার নেই।
শুধু সেই তরুণটিকে মনে রেখো
যে এখানে প্রথম শিখেছিল,
একটি মানুষকে ভালোবাসা যায়
তাকে নিজের করে না পেয়েও।”

তারপর খুব আস্তে
আরেকটি কথা বলব-

“১৯৯০,
আমি ফিরে এসেছিলাম।
কিন্তু তোমাকে ফেরত নিতে নয়-
তোমাকে ধন্যবাদ জানাতে।”

আমাদের সেই করিডোর

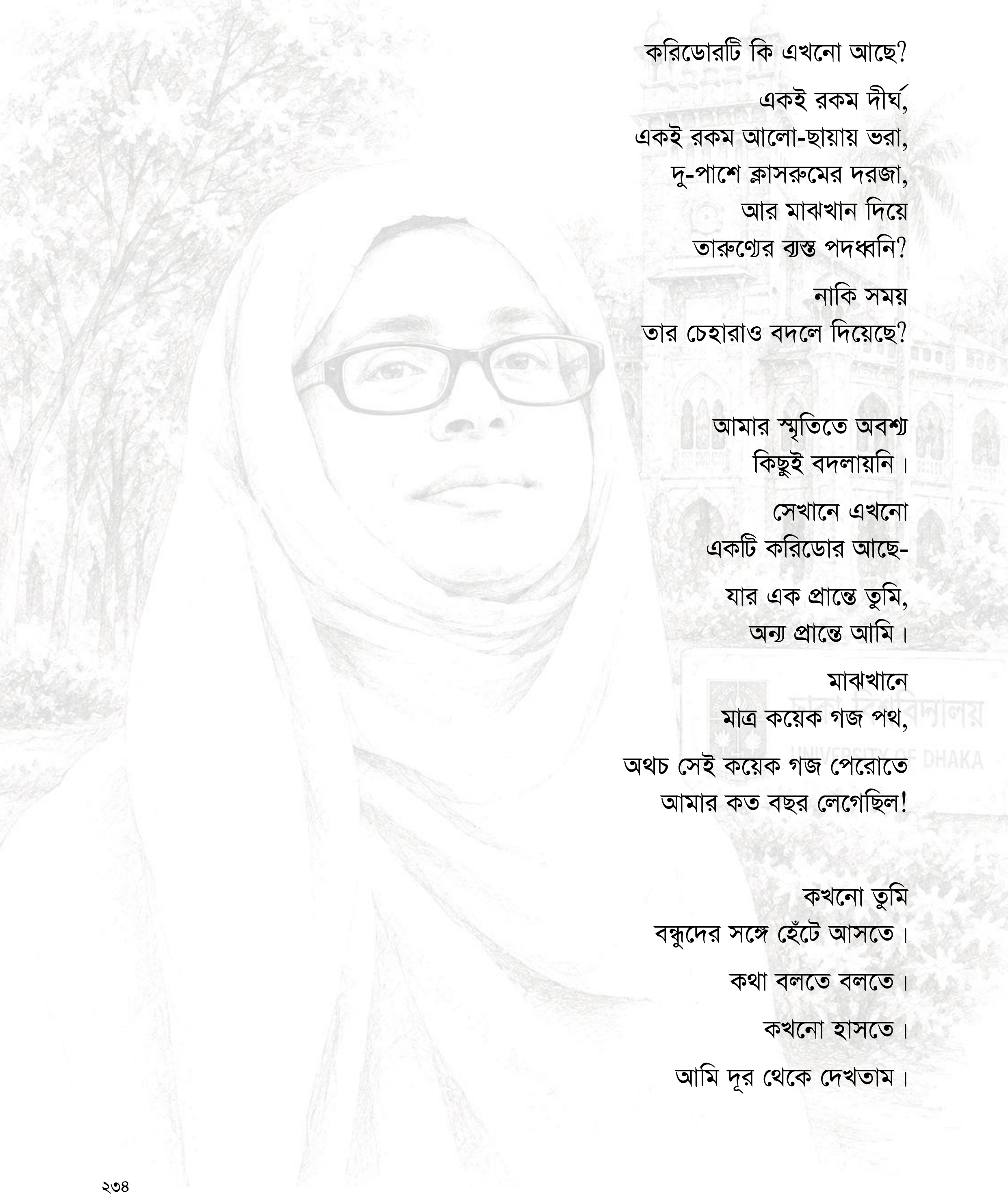

করিডোরটি কি এখনো আছে?

একই রকম দীর্ঘ,
একই রকম আলো-ছায়ায় ভরা,
দু-পাশে ক্লাসরুমের দরজা,
আর মাঝখান দিয়ে
তারুণ্যের ব্যস্ত পদধ্বনি?

নাকি সময়
তার চেহারাও বদলে দিয়েছে?

আমার স্মৃতিতে অবশ্য
কিছুই বদলায়নি।

সেখানে এখনো
একটি করিডোর আছে-

যার এক প্রান্তে তুমি,
অন্য প্রান্তে আমি।

মাঝখানে
মাত্র কয়েক গজ পথ,

অথচ সেই কয়েক গজ পেরোতে
আমার কত বছর লেগেছিল!

কখনো তুমি
বন্ধুদের সঙ্গে হেঁটে আসতে।

কথা বলতে বলতে।

কখনো হাসতে।

আমি দূর থেকে দেখতাম।

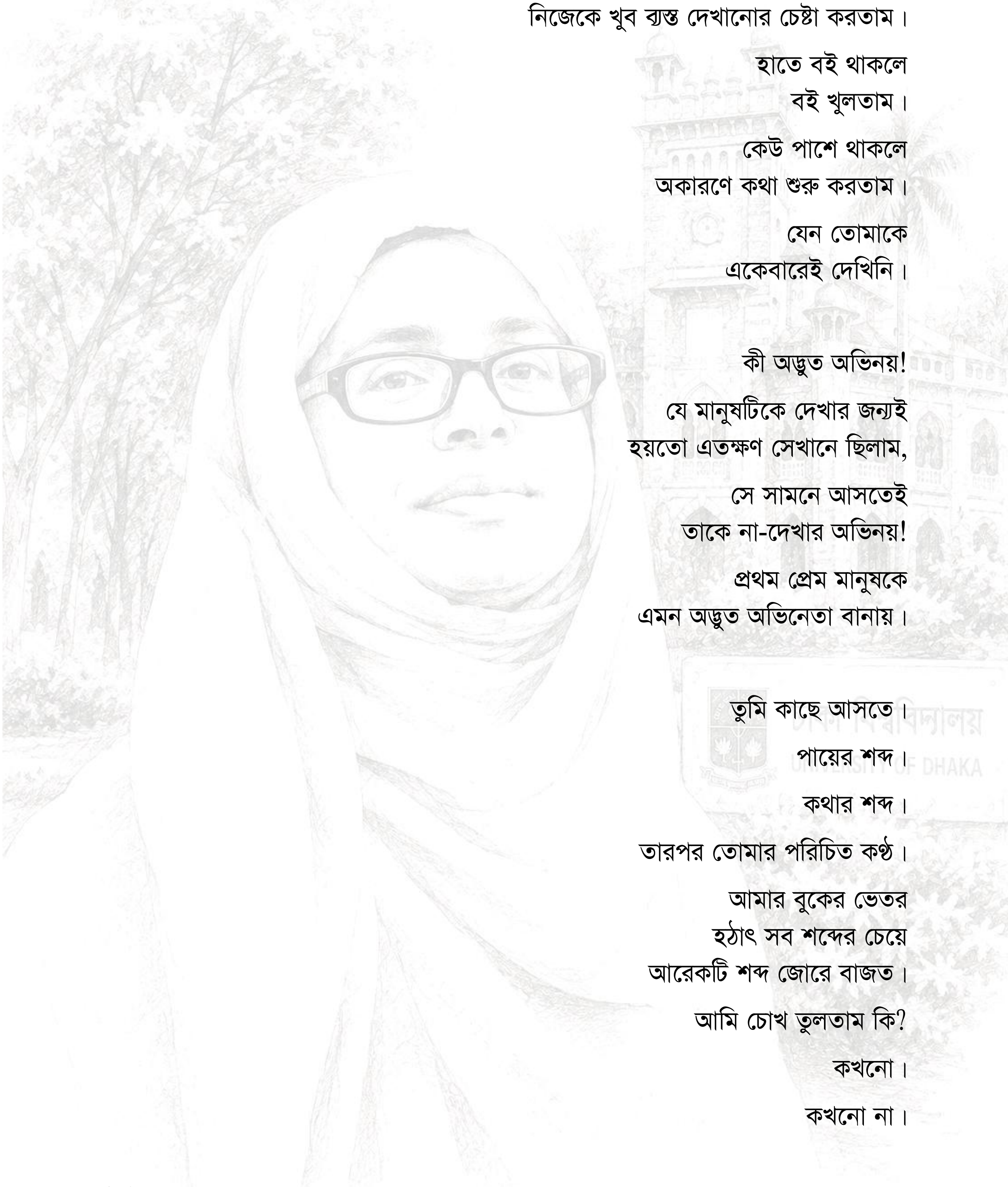

তারপর হঠাৎ
নিজেকে খুব ব্যস্ত দেখানোর চেষ্টা করতাম।

হাতে বই থাকলে
বই খুলতাম।

কেউ পাশে থাকলে
অকারণে কথা শুরু করতাম।

যেন তোমাকে
একেবারেই দেখিনি।

কী অদ্ভুত অভিনয়!

যে মানুষটিকে দেখার জন্যই
হয়তো এতক্ষণ সেখানে ছিলাম,

সে সামনে আসতেই
তাকে না-দেখার অভিনয়!

প্রথম প্রেম মানুষকে
এমন অদ্ভুত অভিনেতা বানায়।

তুমি কাছে আসতে।

পায়ের শব্দ।

কথার শব্দ।

তারপর তোমার পরিচিত কণ্ঠ।

আমার বুকের ভেতর
হঠাৎ সব শব্দের চেয়ে
আরেকটি শব্দ জোরে বাজত।

আমি চোখ তুলতাম কি?

কখনো।

কখনো না।

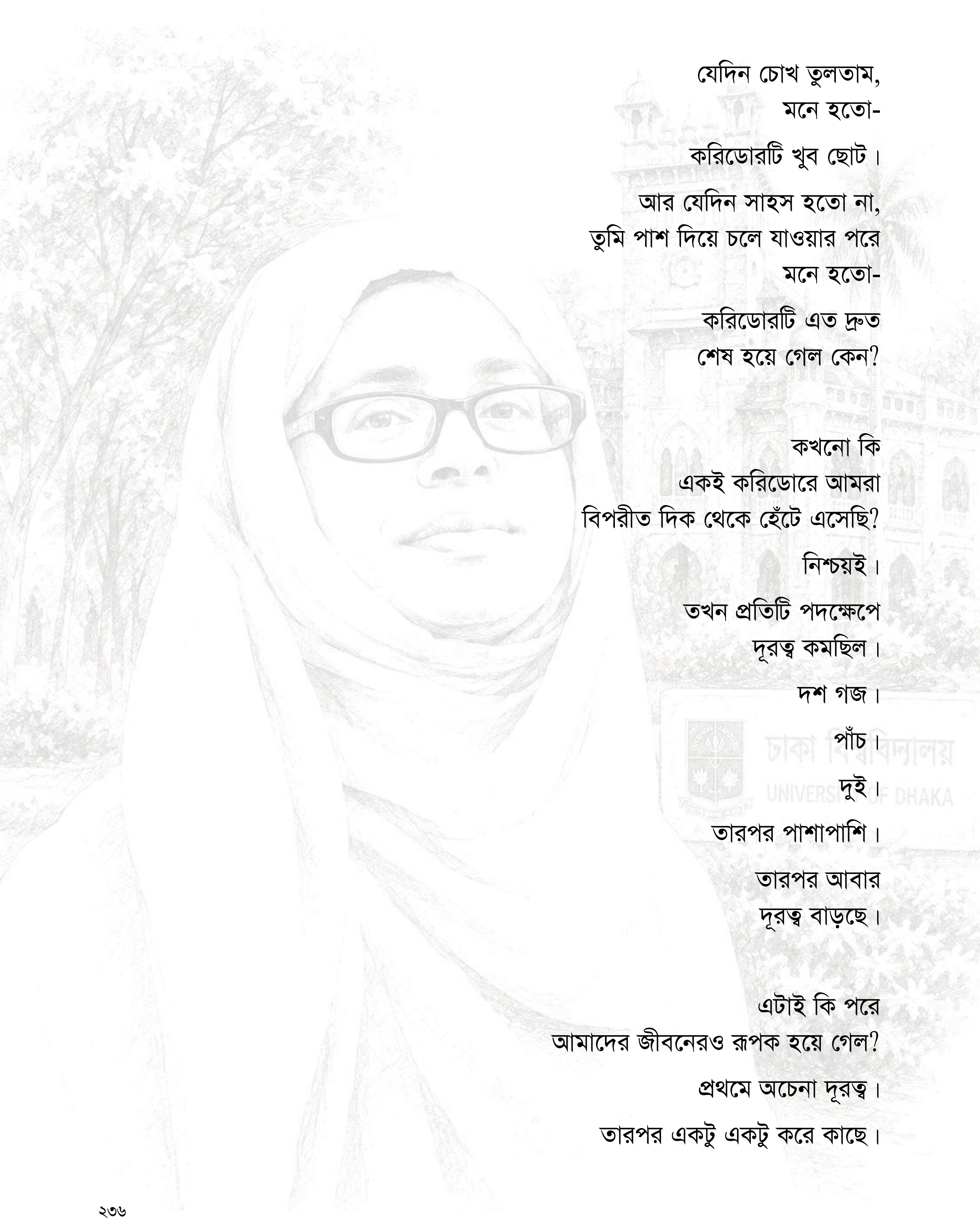

যেদিন চোখ তুলতাম,
মনে হতো-

করিডোরটি খুব ছোট।

আর যেদিন সাহস হতো না,
তুমি পাশ দিয়ে চলে যাওয়ার পরে
মনে হতো-

করিডোরটি এত দ্রুত
শেষ হয়ে গেল কেন?

কখনো কি
একই করিডোরে আমরা
বিপরীত দিক থেকে হেঁটে এসেছি?

নিশ্চয়ই।

তখন প্রতিটি পদক্ষেপে
দূরত্ব কমছিল।

দশ গজ।

পাঁচ।

দুই।

তারপর পাশাপাশি।

তারপর আবার
দূরত্ব বাড়ছে।

এটাই কি পরে
আমাদের জীবনেরও রূপক হয়ে গেল?

প্রথমে অচেনা দূরত্ব।

তারপর একটু একটু করে কাছে।

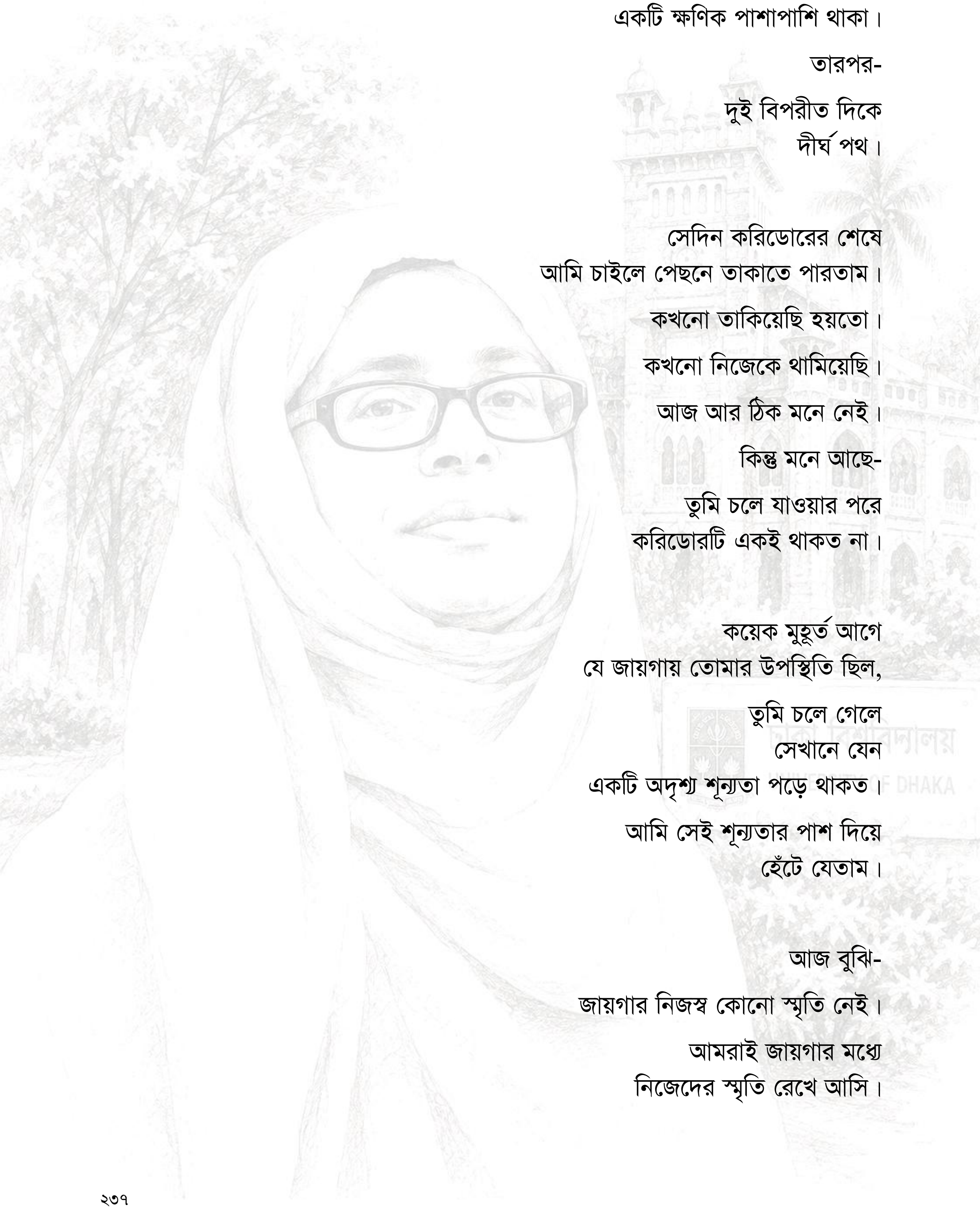

একটি ক্ষণিক পাশাপাশি থাকা।

তারপর-

দুই বিপরীত দিকে
দীর্ঘ পথ।

সেদিন করিডোরের শেষে
আমি চাইলে পেছনে তাকাতে পারতাম।

কখনো তাকিয়েছি হয়তো।

কখনো নিজেকে থামিয়েছি।

আজ আর ঠিক মনে নেই।

কিন্তু মনে আছে-

তুমি চলে যাওয়ার পরে
করিডোরটি একই থাকত না।

কয়েক মুহূর্ত আগে
যে জায়গায় তোমার উপস্থিতি ছিল,

তুমি চলে গেলে
সেখানে যেন
একটি অদৃশ্য শূন্যতা পড়ে থাকত।

আমি সেই শূন্যতার পাশ দিয়ে
হেঁটে যেতাম।

আজ বুঝি-

জায়গার নিজস্ব কোনো স্মৃতি নেই।

আমরাই জায়গার মধ্যে
নিজেদের স্মৃতি রেখে আসি।

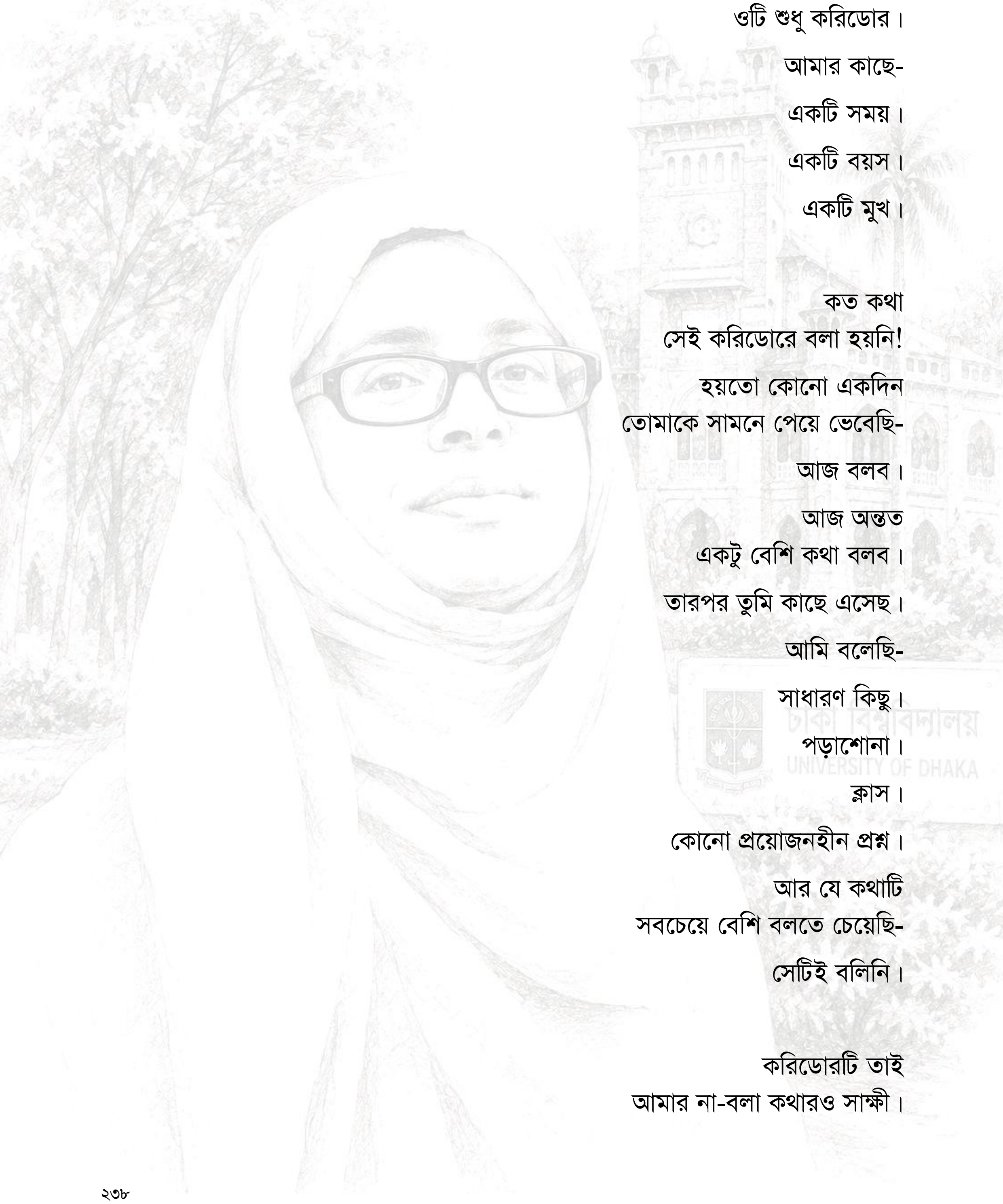

তাই অন্য কারও কাছে
ওটি শুধু করিডোর।

আমার কাছে-

একটি সময়।

একটি বয়স।

একটি মুখ।

কত কথা
সেই করিডোরে বলা হয়নি!

হয়তো কোনো একদিন
তোমাকে সামনে পেয়ে ভেবেছি-

আজ বলব।

আজ অন্তত
একটু বেশি কথা বলব।

তারপর তুমি কাছে এসেছ।

আমি বলেছি-

সাধারণ কিছু।

পড়াশোনা।

ক্লাস।

কোনো প্রয়োজনহীন প্রশ্ন।

আর যে কথাটি
সবচেয়ে বেশি বলতে চেয়েছি-

সেটিই বলিনি।

করিডোরটি তাই
আমার না-বলা কথারও সাক্ষী।

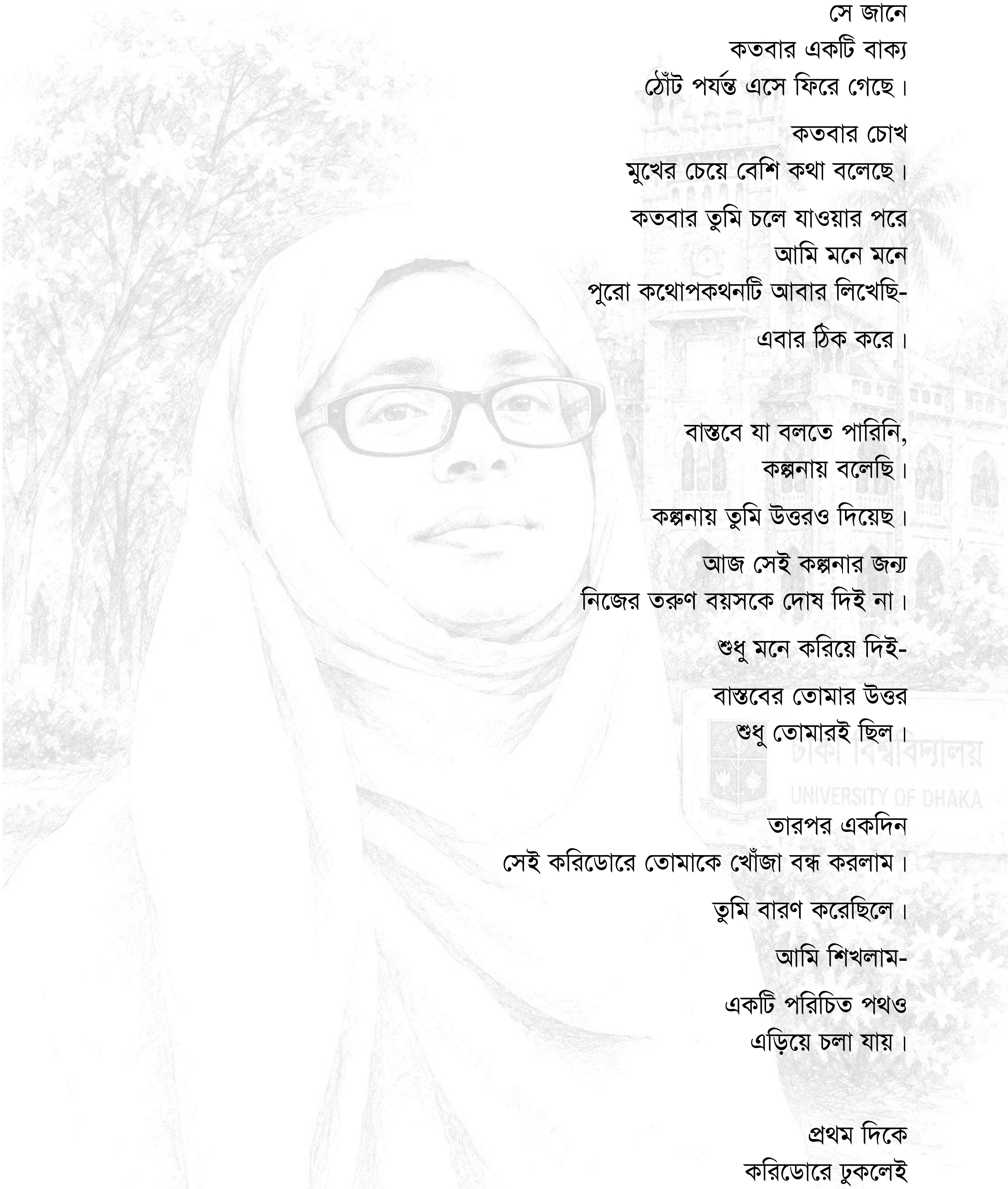

সে জানে
কতবার একটি বাক্য
ঠোঁট পর্যন্ত এসে ফিরে গেছে।
কতবার চোখ
মুখের চেয়ে বেশি কথা বলেছে।
কতবার তুমি চলে যাওয়ার পরে
আমি মনে মনে
পুরো কথোপকথনটি আবার লিখেছি-
এবার ঠিক করে।

বাস্তবে যা বলতে পারিনি,
কল্পনায় বলেছি।
কল্পনায় তুমি উত্তরও দিয়েছ।
আজ সেই কল্পনার জন্য
নিজের তরুণ বয়সকে দোষ দিই না।
শুধু মনে করিয়ে দিই-
বাস্তবের তোমার উত্তর
শুধু তোমারই ছিল।

তারপর একদিন
সেই করিডোরে তোমাকে খোঁজা বন্ধ করলাম।
তুমি বারণ করেছিলে।
আমি শিখলাম-
একটি পরিচিত পথও
এড়িয়ে চলা যায়।

প্রথম দিকে
করিডোরে ঢুকলেই

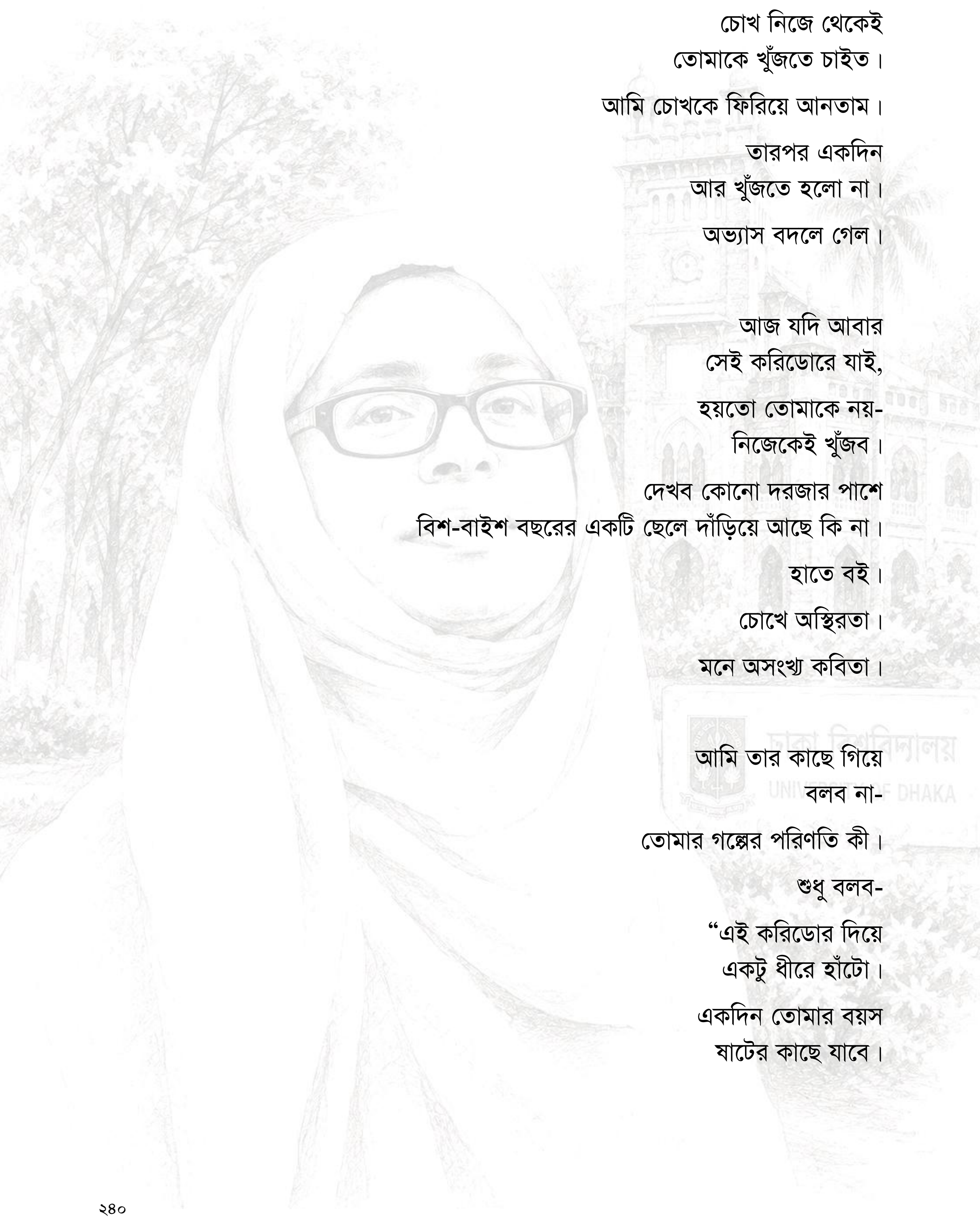

চোখ নিজে থেকেই
তোমাকে খুঁজতে চাইত।
আমি চোখকে ফিরিয়ে আনতাম।
তারপর একদিন
আর খুঁজতে হলো না।
অভ্যাস বদলে গেল।

আজ যদি আবার
সেই করিডোরে যাই,
হয়তো তোমাকে নয়-
নিজেকেই খুঁজব।
দেখব কোনো দরজার পাশে
বিশ-বাইশ বছরের একটি ছেলে দাঁড়িয়ে আছে কি না।
হাতে বই।
চোখে অস্থিরতা।
মনে অসংখ্য কবিতা।

আমি তার কাছে গিয়ে
বলব না-
তোমার গল্পের পরিণতি কী।
শুধু বলব-
“এই করিডোর দিয়ে
একটু ধীরে হাঁটো।
একদিন তোমার বয়স
ষাটের কাছে যাবে।

তখন এই দেয়াল,
এই আলো,
এই পদধ্বনি-
সবই অমূল্য হয়ে উঠবে।”

তারপর হয়তো
দূর থেকে তুমি আসবে।

তরুণ আমি
হঠাৎ চুপ হয়ে যাবে।

আমি মৃদু হেসে
সরে দাঁড়াব।

কারণ সেই মুহূর্তটি
আমার নয় আর-

তার।

আজ এত বছর পরে
“আমাদের সেই করিডোর” বলি,

যদিও জানি
সেটি কখনো সত্যিকার অর্থে
আমাদের ছিল না।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ছিল।

সবার ছিল।

তবু আমার স্মৃতিতে
তার একটি ছোট্ট অংশে
দুটি ছায়া রয়ে গেছে।

একটি তোমার।

একটি আমার।

দুটি ছায়া
কিছুক্ষণের জন্য কাছাকাছি আসে।

তারপর বিপরীত দিকে চলে যায়।

আর করিডোরটি
নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে থাকে।

যেন সে আগেই জানত-

মানুষ চলে যাবে,
তারুণ্য চলে যাবে,
দেখা শেষ হয়ে যাবে-
শুধু কোনো কোনো পদধ্বনি
একজন মানুষের হৃদয়ের করিডোরে
সারাজীবন প্রতিধ্বনি হয়ে থাকবে।

বেঞ্চটি কি এখনো আছে?

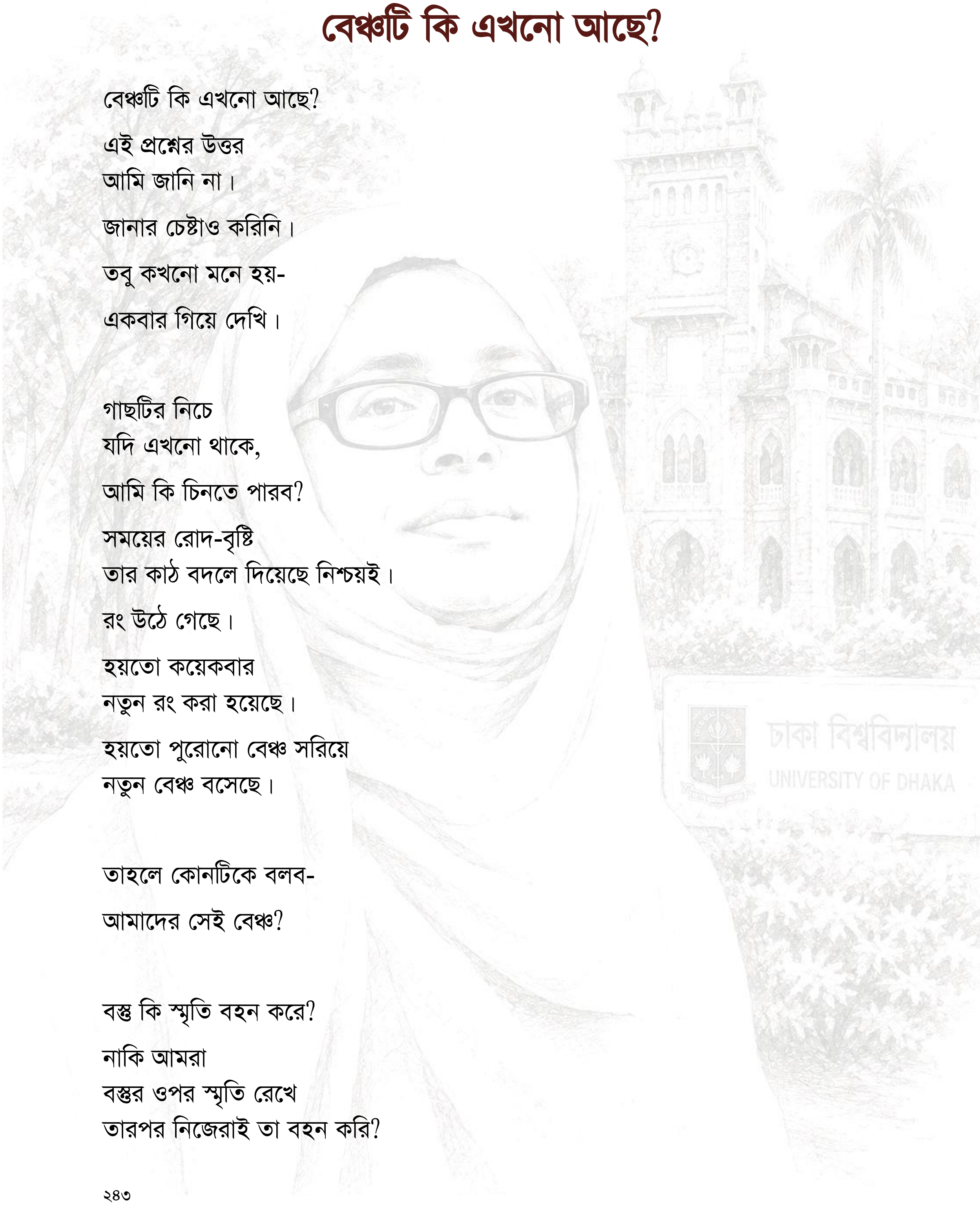

বেঞ্চটি কি এখনো আছে?

এই প্রশ্নের উত্তর
আমি জানি না।

জানার চেষ্টাও করিনি।

তবু কখনো মনে হয়-

একবার গিয়ে দেখি।

গাছটির নিচে
যদি এখনো থাকে,

আমি কি চিনতে পারব?

সময়ের রোদ-বৃষ্টি
তার কাঠ বদলে দিয়েছে নিশ্চয়ই।

রং উঠে গেছে।

হয়তো কয়েকবার
নতুন রং করা হয়েছে।

হয়তো পুরোনো বেঞ্চ সরিয়ে
নতুন বেঞ্চ বসেছে।

তাহলে কোনটিকে বলব-

আমাদের সেই বেঞ্চ?

বস্তু কি স্মৃতি বহন করে?

নাকি আমরা
বস্তুর ওপর স্মৃতি রেখে
তারপর নিজেরাই তা বহন করি?

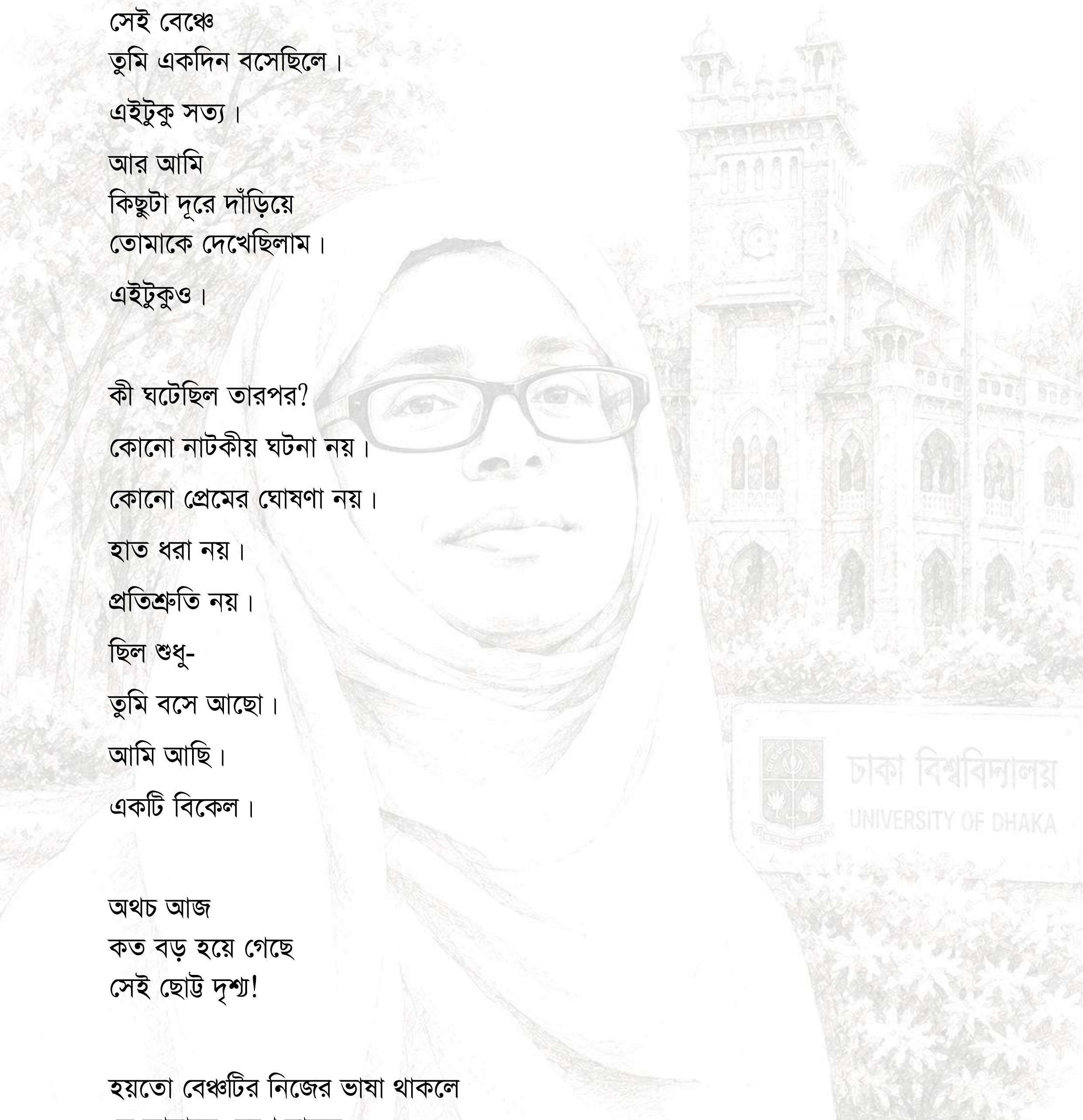

সেই বেঞ্চে
তুমি একদিন বসেছিলে।

এইটুকু সত্য।

আর আমি
কিছুটা দূরে দাঁড়িয়ে
তোমাকে দেখেছিলাম।

এইটুকুও।

কী ঘটেছিল তারপর?

কোনো নাটকীয় ঘটনা নয়।

কোনো প্রেমের ঘোষণা নয়।

হাত ধরা নয়।

প্রতিশ্রুতি নয়।

ছিল শুধু-

তুমি বসে আছো।

আমি আছি।

একটি বিকেল।

অথচ আজ
কত বড় হয়ে গেছে
সেই ছোট্ট দৃশ্য!

হয়তো বেঞ্চটির নিজের ভাষা থাকলে
সে আমাকে দেখে হাসত-

“এইটুকু ঘটনা
এত বছর ধরে মনে রেখেছ?”

আমি বলতাম-

হ্যাঁ।

কারণ মানুষের জীবনে
ঘটনার আকার নয়,

অনুভূতির গভীরতা
স্মৃতির আয়ু ঠিক করে।

তুমি হয়তো
সেই বেঞ্চের কথা
একেবারেই ভুলে গেছ।

স্বাভাবিক।

তোমার কাছে
সেটি হয়তো ছিল
একটি সাধারণ বসার জায়গা।

আমার কাছে
একটি সম্পূর্ণ বিকেল।

একই বস্তু
দুজন মানুষের জীবনে
দুটি সম্পূর্ণ আলাদা অর্থ বহন করতে পারে।

এই সত্যটিই
আমাদের গল্পের মতো।

যদি বেঞ্চটি এখনো থাকে,
সেখানে এখন কারা বসে?

হয়তো নতুন কোনো শিক্ষার্থী
পরীক্ষার আগে পড়ছে।

কেউ ফোনে কথা বলছে।

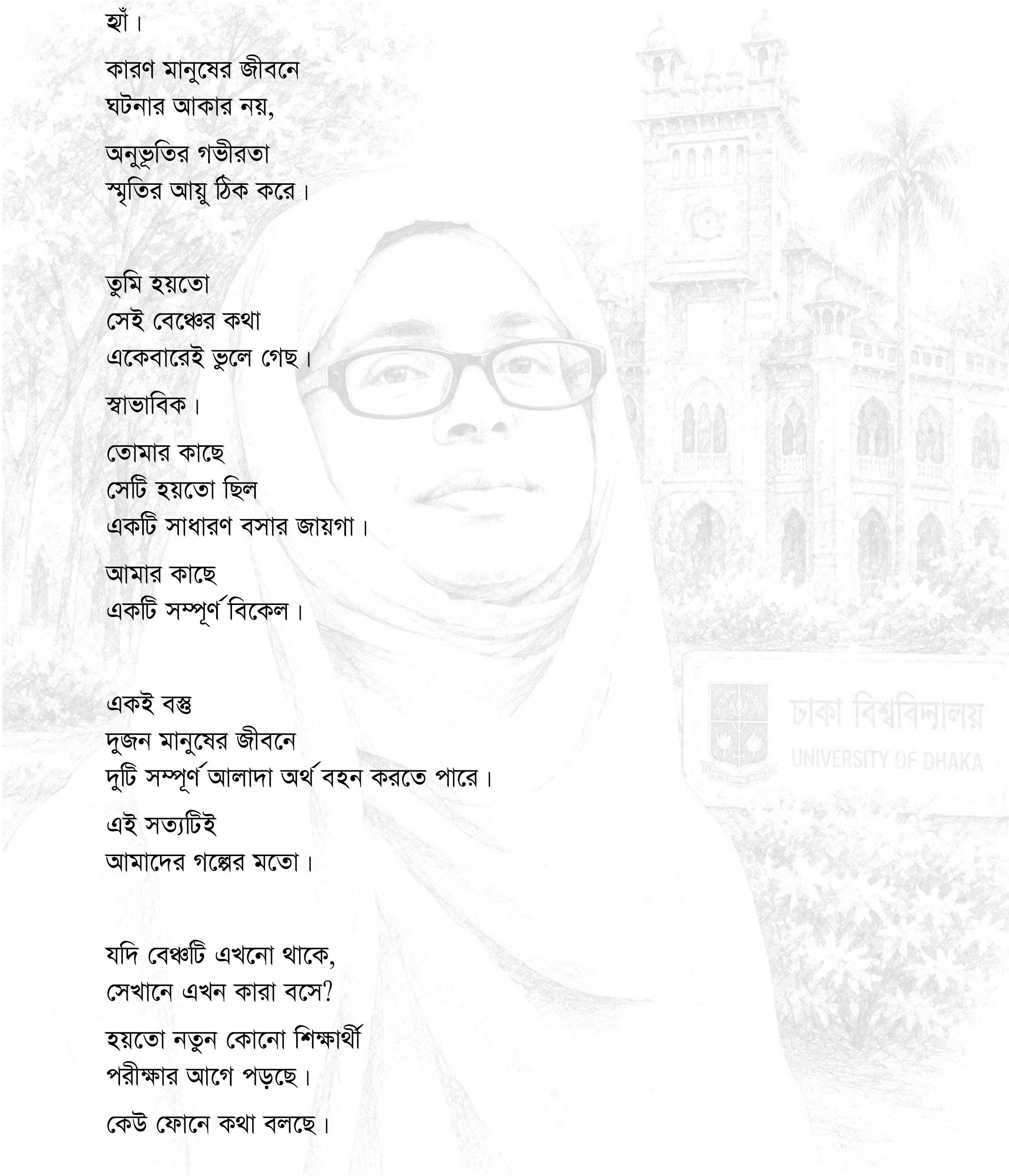

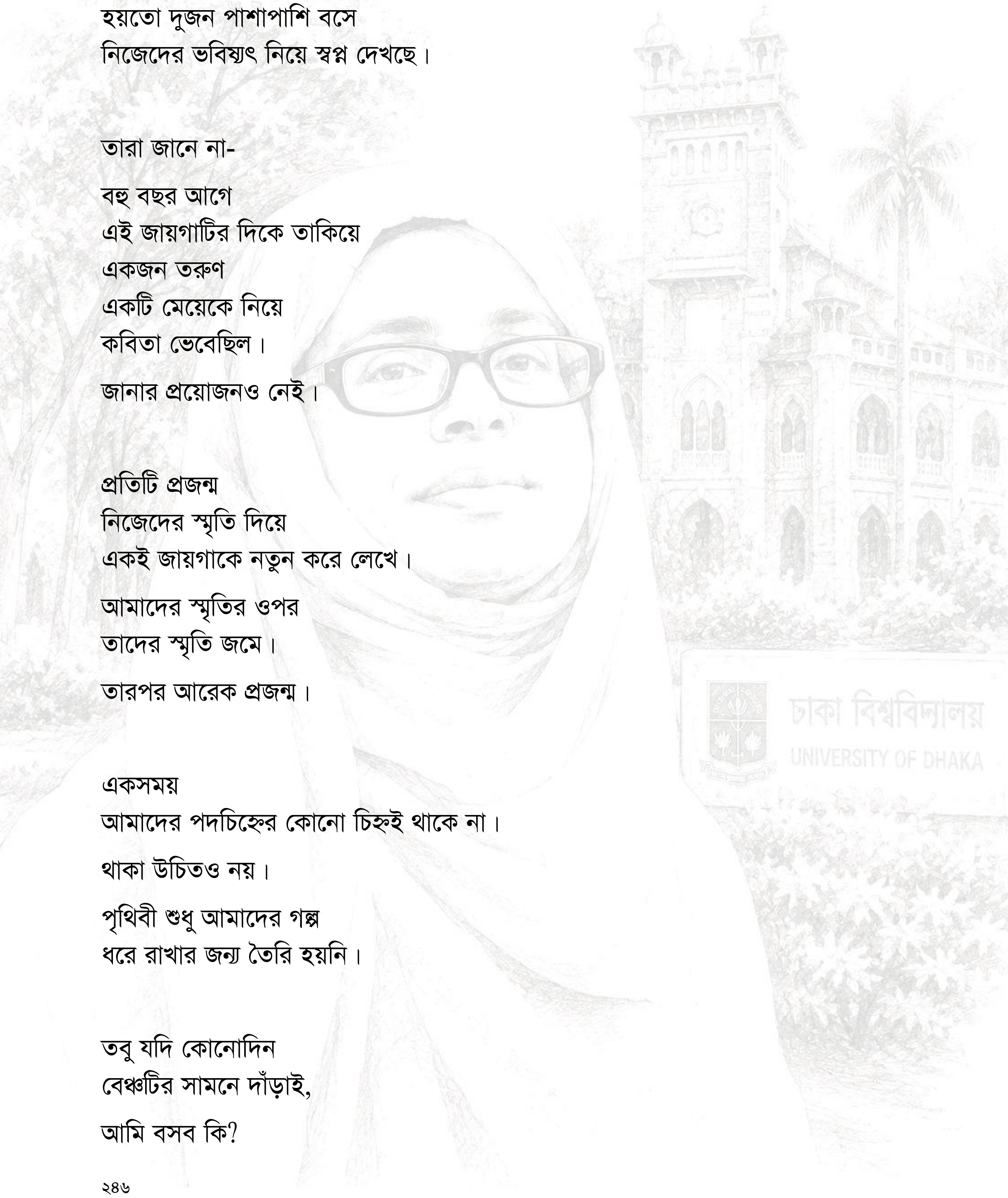

কেউ বন্ধুর অপেক্ষায়।

হয়তো দুজন পাশাপাশি বসে
নিজেদের ভবিষ্যৎ নিয়ে স্বপ্ন দেখছে।

তারা জানে না-

বহু বছর আগে
এই জায়গাটির দিকে তাকিয়ে
একজন তরুণ
একটি মেয়েকে নিয়ে
কবিতা ভেবেছিল।

জানার প্রয়োজনও নেই।

প্রতিটি প্রজন্ম
নিজেদের স্মৃতি দিয়ে
একই জায়গাকে নতুন করে লেখে।

আমাদের স্মৃতির ওপর
তাদের স্মৃতি জমে।

তারপর আরেক প্রজন্ম।

একসময়
আমাদের পদচিহ্নের কোনো চিহ্নই থাকে না।

থাকা উচিতও নয়।

পৃথিবী শুধু আমাদের গল্প
ধরে রাখার জন্য তৈরি হয়নি।

তবু যদি কোনোদিন
বেঞ্চটির সামনে দাঁড়াই,

আমি বসব কি?

হয়তো।

কোন পাশে?

যে পাশে তুমি বসেছিলে?

না।

এত বছর পরেও
হয়তো আমি অন্য পাশেই বসব।

পুরোনো সংকোচে নয়।

শুধু স্মৃতিটিকে
তার জায়গায় রেখে দেওয়ার জন্য।

আমি হাত বুলাব না।

নাম খোদাই করব না।

কোনো চিহ্ন রেখে আসব না।

কারণ স্মৃতিকে প্রমাণ করার জন্য
বস্তুকে আঘাত করার প্রয়োজন নেই।

শুধু কিছুক্ষণ বসে থাকব।

চোখ বন্ধ করব।

শুনব-

বর্তমানের কোলাহলের নিচে
পুরোনো কোনো বিকেল
এখনো শোনা যায় কি না।

হয়তো শুনব না।

শুধু ছাত্রছাত্রীদের কথা।

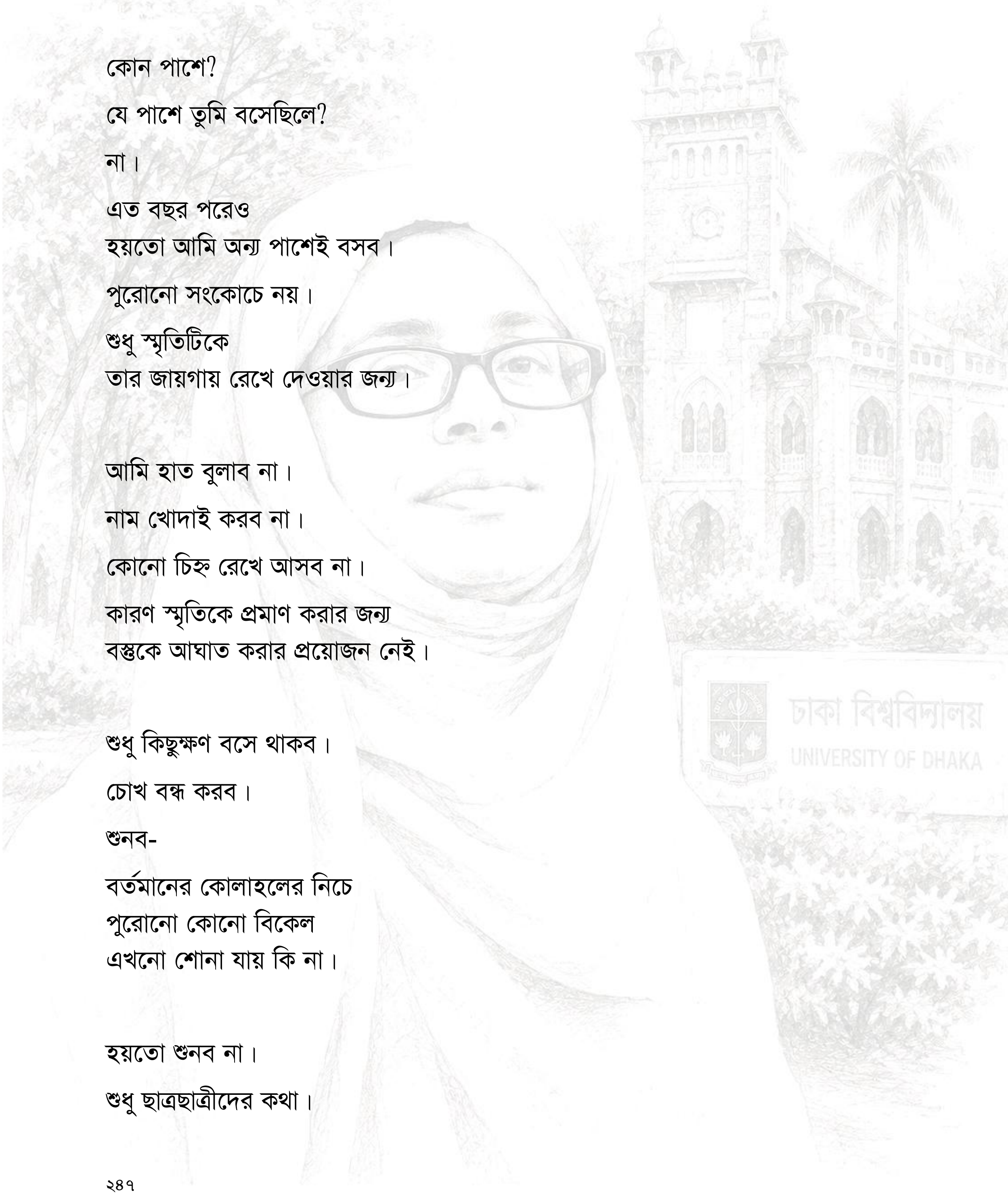

পাখির ডাক।

গাড়ির শব্দ।

বর্তমান।

তখন বুঝব-

সেটিই ঠিক।

অতীতের কাজ
বর্তমানকে দখল করা নয়।

সে শুধু মাঝে মাঝে
মনে এসে বসবে।

আমি উঠে দাঁড়াব।

বেঞ্চটিকে বলব না-

আমার জন্য অপেক্ষা করো।

কারণ কোনো বস্তুই
আমাদের অপেক্ষায় থাকে না।

তবু চলে আসার আগে
একবার ফিরে তাকিয়ে ভাবব-

তুমি থাকো বা না থাকো,

তুমি পুরোনো হও বা নতুন,

তোমার কাঠ বদলে যাক,
রং বদলে যাক-

আমার স্মৃতির বেঞ্চটির
কিছুই বদলাবে না।

সেখানে এখনও
একটি তরুণী বসে আছে।

কিছুটা দূরে
একটি তরুণ দাঁড়িয়ে।

তাদের মধ্যে
কোনো কথা নেই।

শুধু একটি বিকেল
ধীরে ধীরে নেমে আসছে।

আজ বুঝি-

সেই বেঞ্চটির সবচেয়ে বড় স্মৃতি
তুমি সেখানে বসেছিলে-
এটিও নয়।

সবচেয়ে বড় স্মৃতি-

আমি তোমার পাশে
বসতে পারতাম,

তবু বসিনি।

সেই না-বসার মধ্যে
ছিল সংকোচ।

ভয়।

সম্মান।

আর এক অদ্ভুত
অপরিণত ভালোবাসা।

তাই আজও প্রশ্ন করি-

বেঞ্চটি কি এখনো আছে?

তারপর নিজেই উত্তর দিই-

বাস্তবে জানি না।
কিন্তু আমার ভেতরে আছে।

আর যতদিন স্মৃতি আছে,
সেখানে একটি জায়গা
চিরকাল খালি থাকবে-

তোমার পাশে নয়,

আমার সেই তরুণ বয়সের পাশে।

হারিয়ে যাওয়া পাণ্ডুলিপি

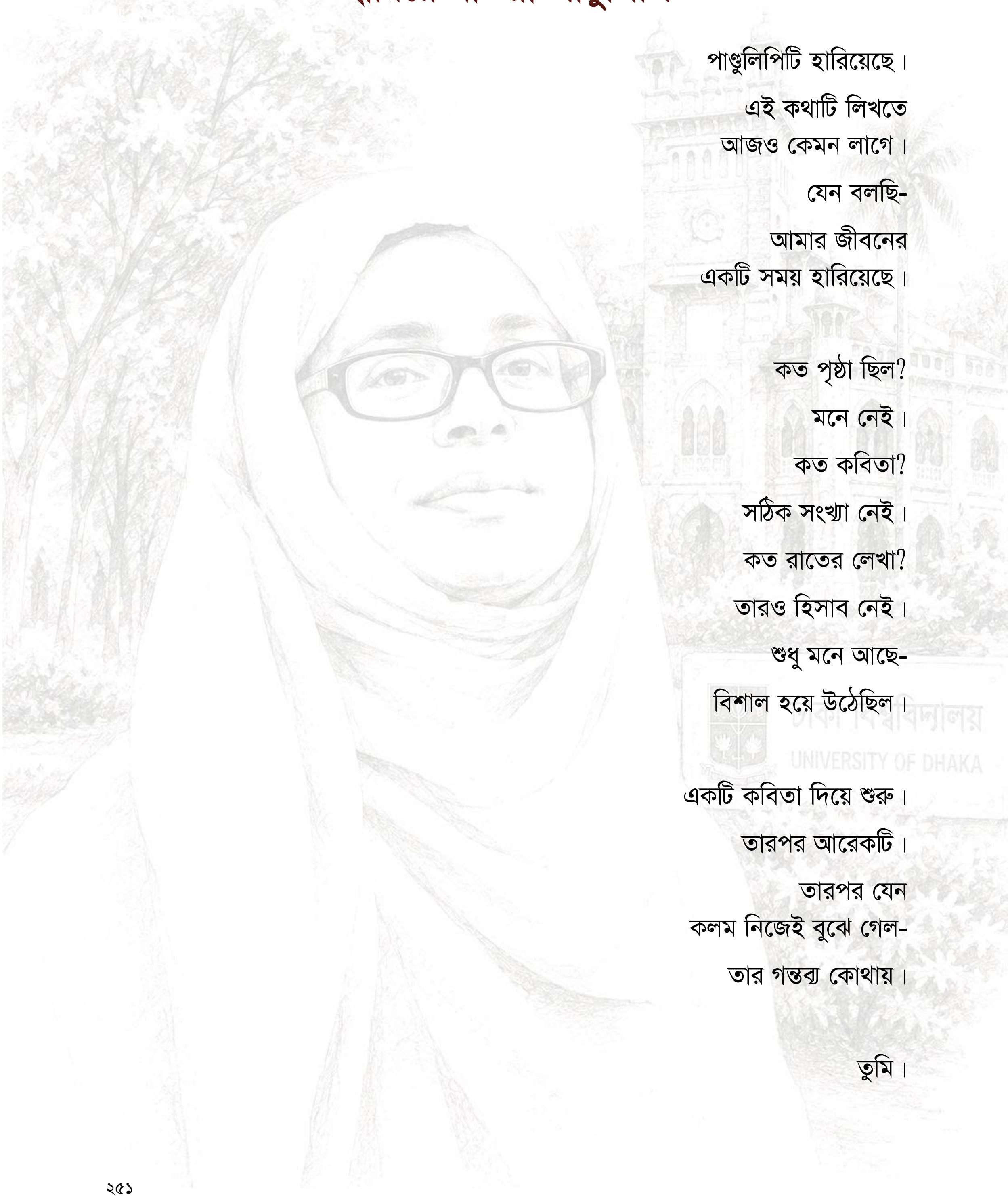

পাণ্ডুলিপিটি হারিয়েছে।
এই কথাটি লিখতে
আজও কেমন লাগে।
যেন বলছি-
আমার জীবনের
একটি সময় হারিয়েছে।

কত পৃষ্ঠা ছিল?
মনে নেই।
কত কবিতা?
সঠিক সংখ্যা নেই।
কত রাতের লেখা?
তারও হিসাব নেই।
শুধু মনে আছে-
বিশাল হয়ে উঠেছিল।

একটি কবিতা দিয়ে শুরু।
তারপর আরেকটি।
তারপর যেন
কলম নিজেই বুঝে গেল-
তার গন্তব্য কোথায়।

তুমি।

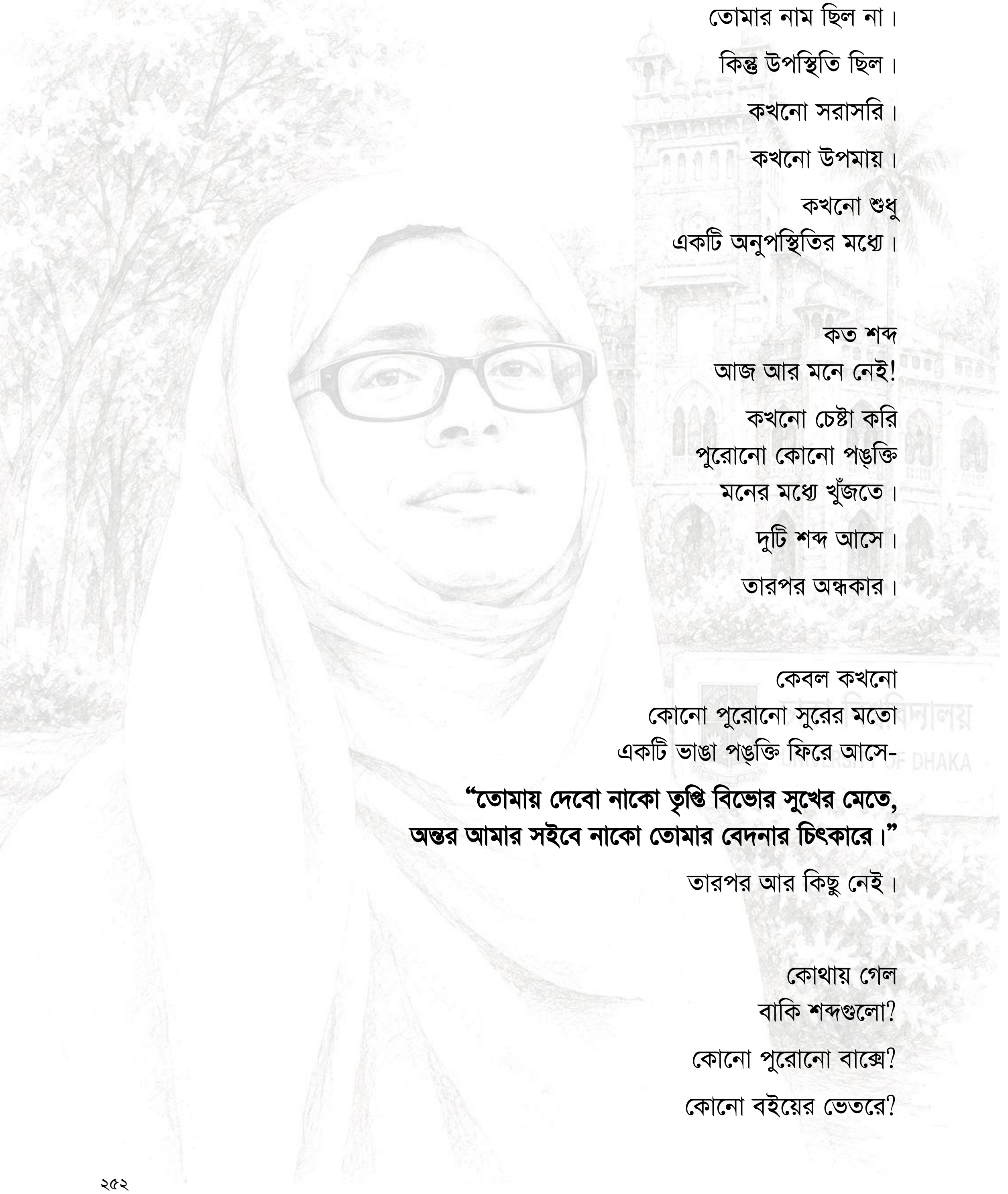

প্রতিটি পৃষ্ঠায়
তোমার নাম ছিল না।
কিন্তু উপস্থিতি ছিল।
কখনো সরাসরি।
কখনো উপমায়।
কখনো শুধু
একটি অনুপস্থিতির মধ্যে।

কত শব্দ
আজ আর মনে নেই!
কখনো চেষ্টা করি
পুরোনো কোনো পঙ্‌ক্তি
মনের মধ্যে খুঁজতে।
দুটি শব্দ আসে।
তারপর অন্ধকার।

কেবল কখনো
কোনো পুরোনো সুরের মতো
একটি ভাঙা পঙ্‌ক্তি ফিরে আসে-

"তোমায় দেবো নাকো তৃপ্তি বিভোর সুখের মেতে,
অন্তর আমার সইবে নাকো তোমার বেদনার চিৎকারে।"

তারপর আর কিছু নেই।

কোথায় গেল
বাকি শব্দগুলো?
কোনো পুরোনো বাক্সে?
কোনো বইয়ের ভেতরে?

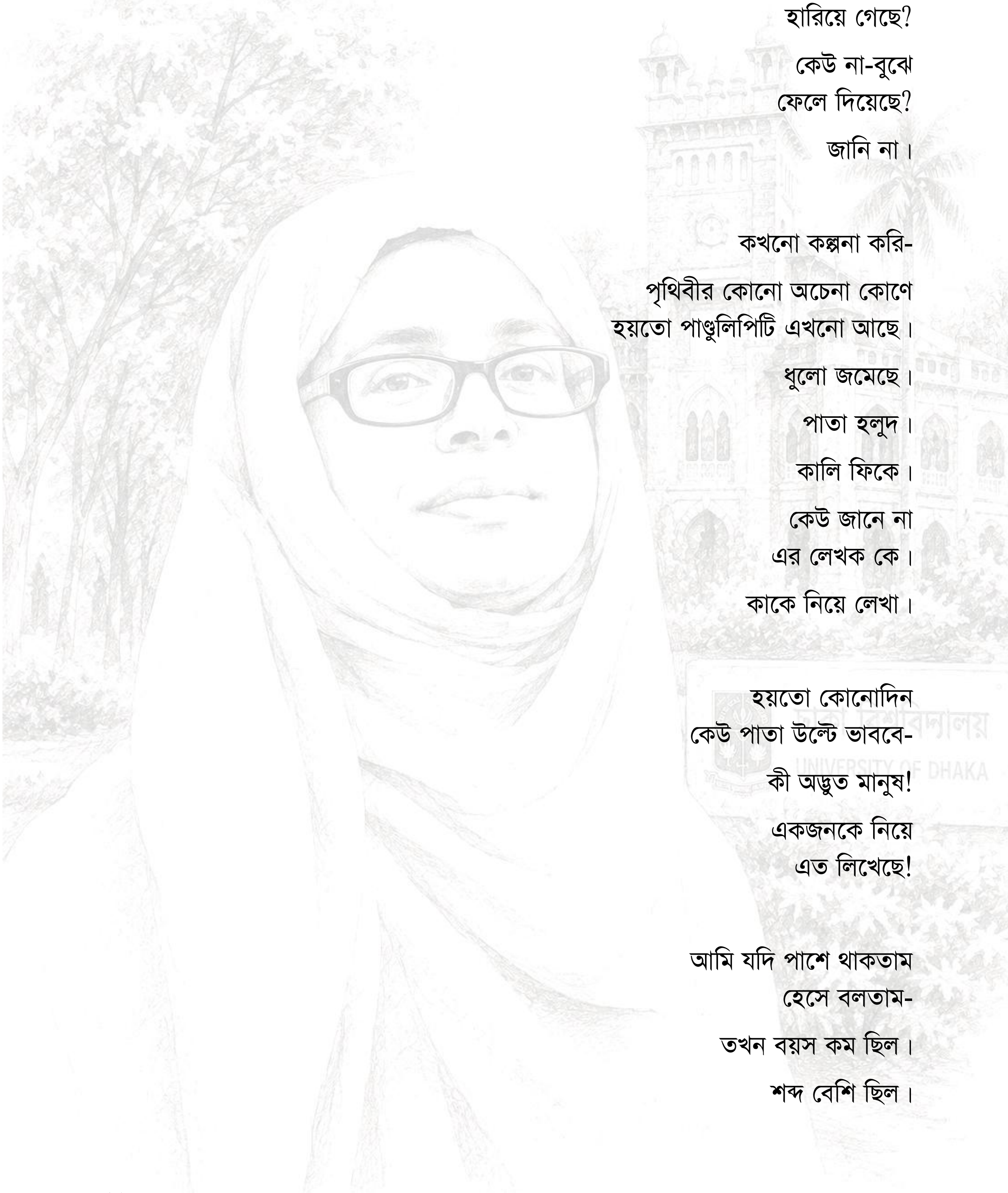

কোনো স্থানান্তরের সময়
হারিয়ে গেছে?

কেউ না-বুঝে
ফেলে দিয়েছে?

জানি না।

কখনো কল্পনা করি-

পৃথিবীর কোনো অচেনা কোণে
হয়তো পাণ্ডুলিপিটি এখনো আছে।

ধুলো জমেছে।

পাতা হলুদ।

কালি ফিকে।

কেউ জানে না
এর লেখক কে।

কাকে নিয়ে লেখা।

হয়তো কোনোদিন
কেউ পাতা উল্টে ভাববে-

কী অদ্ভুত মানুষ!

একজনকে নিয়ে
এত লিখেছে!

আমি যদি পাশে থাকতাম
হেসে বলতাম-

তখন বয়স কম ছিল।

শব্দ বেশি ছিল।

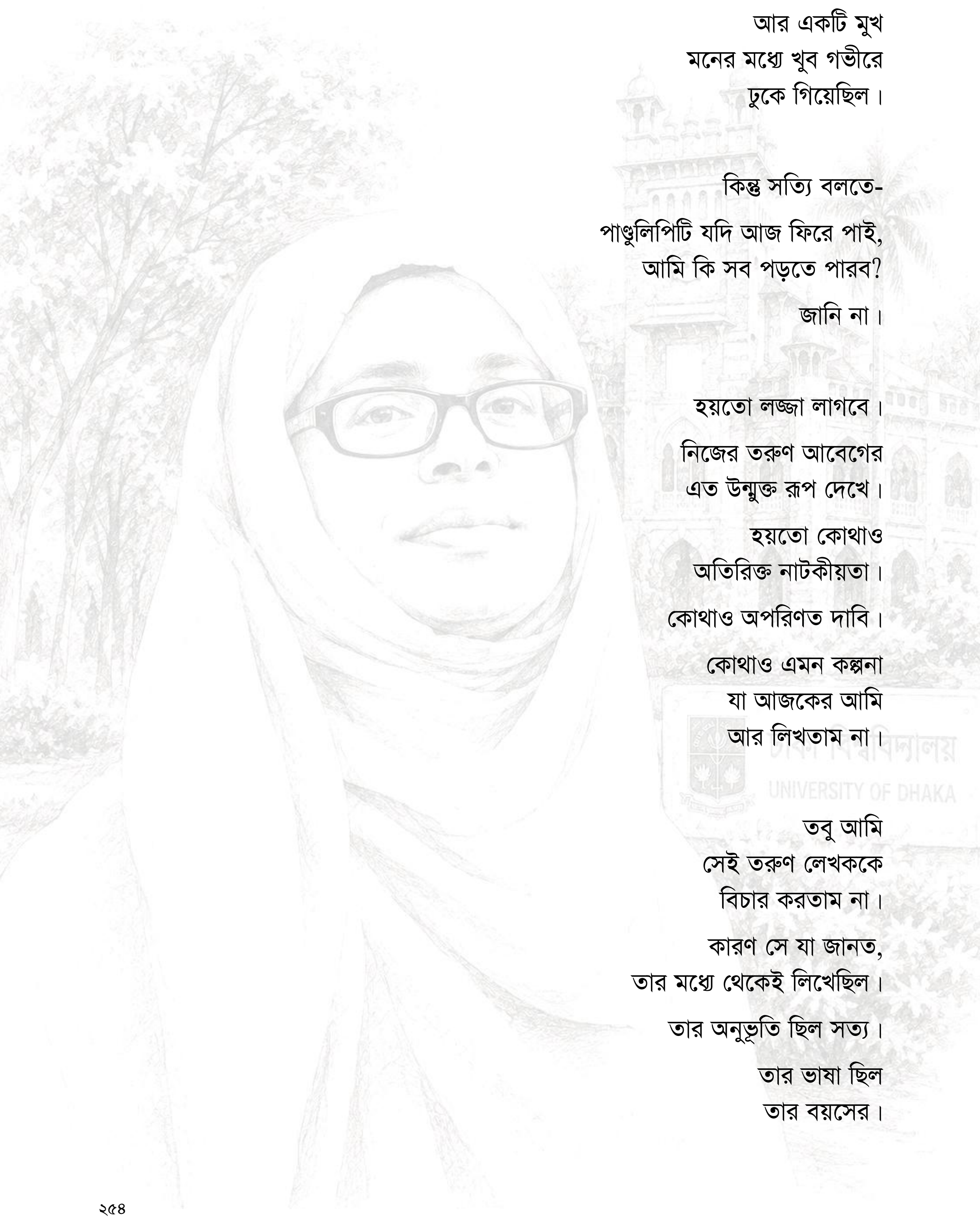

আর একটি মুখ
মনের মধ্যে খুব গভীরে
ঢুকে গিয়েছিল।

কিন্তু সত্যি বলতে-
পাণ্ডুলিপিটি যদি আজ ফিরে পাই,
আমি কি সব পড়তে পারব?
জানি না।

হয়তো লজ্জা লাগবে।
নিজের তরুণ আবেগের
এত উন্মুক্ত রূপ দেখে।
হয়তো কোথাও
অতিরিক্ত নাটকীয়তা।
কোথাও অপরিণত দাবি।
কোথাও এমন কল্পনা
যা আজকের আমি
আর লিখতাম না।

তবু আমি
সেই তরুণ লেখককে
বিচার করতাম না।
কারণ সে যা জানত,
তার মধ্যে থেকেই লিখেছিল।
তার অনুভূতি ছিল সত্য।
তার ভাষা ছিল
তার বয়সের।

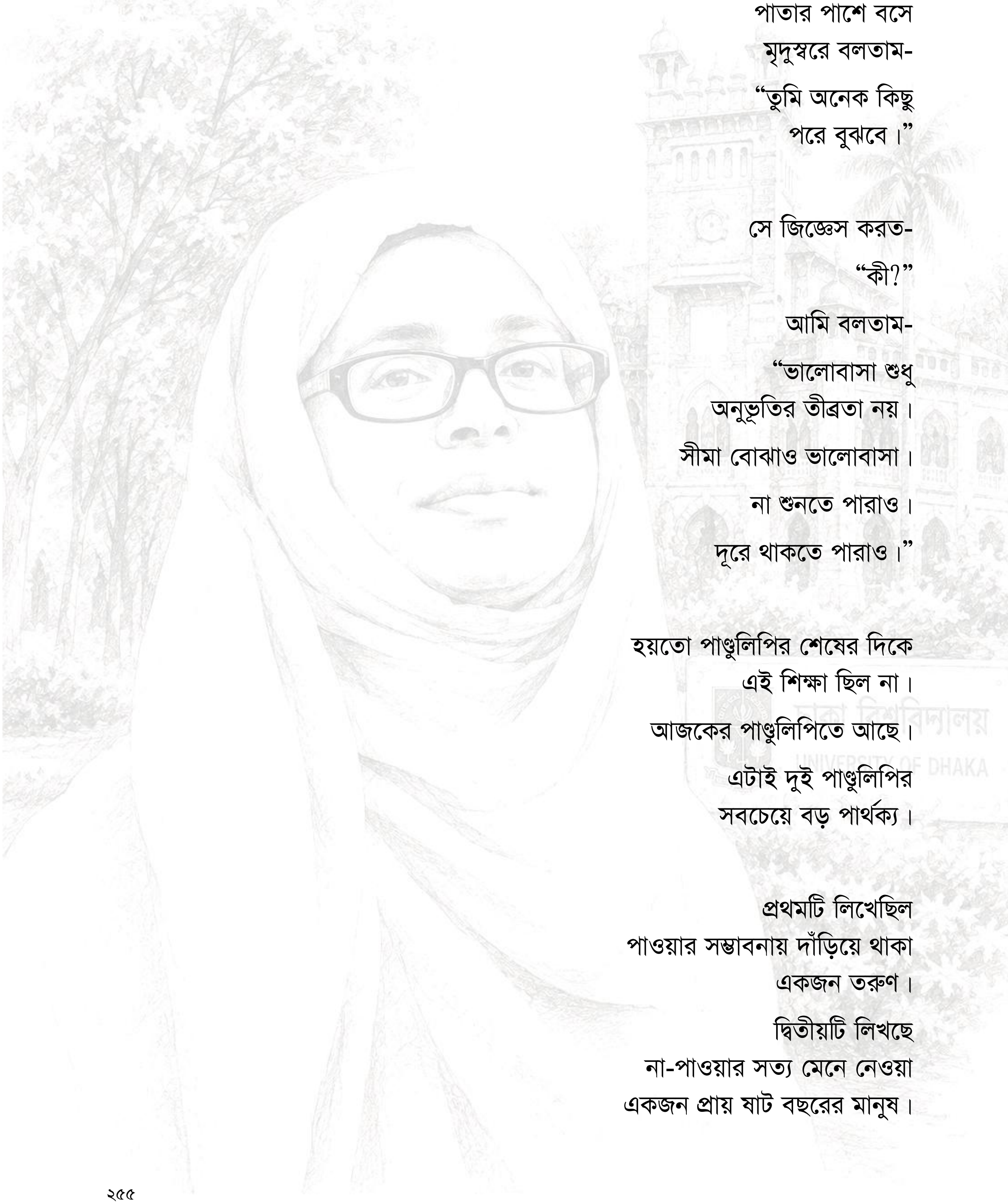

আমি শুধু হয়তো
পাতার পাশে বসে
মৃদুস্বরে বলতাম-
"তুমি অনেক কিছু
পরে বুঝবে।"

সে জিজ্ঞেস করত-
"কী?"
আমি বলতাম-
"ভালোবাসা শুধু
অনুভূতির তীব্রতা নয়।
সীমা বোঝাও ভালোবাসা।
না শুনতে পারাও।
দূরে থাকতে পারাও।"

হয়তো পাণ্ডুলিপির শেষের দিকে
এই শিক্ষা ছিল না।
আজকের পাণ্ডুলিপিতে আছে।
এটাই দুই পাণ্ডুলিপির
সবচেয়ে বড় পার্থক্য।

প্রথমটি লিখেছিল
পাওয়ার সম্ভাবনায় দাঁড়িয়ে থাকা
একজন তরুণ।
দ্বিতীয়টি লিখছে
না-পাওয়ার সত্য মেনে নেওয়া
একজন প্রায় ষাট বছরের মানুষ।

প্রথমটিতে ছিল প্রশ্ন-

তুমি কি আমাকে বুঝবে?

আজকেরটিতে-

তোমাকে বুঝতেই হবে না।

প্রথমটিতে-

তুমি কি আমার হবে?

আজ-

তুমি তোমারই থেকো।

প্রথমটিতে-

আমার দিকে তাকাও।

আজ-

তোমার পথেই তাকিয়ে থেকো।

কী দীর্ঘ পথ
দুটি পাণ্ডুলিপির মাঝখানে!

প্রায় একটি জীবন।

তাই কখনো মনে হয়-

হারিয়ে যাওয়া পাণ্ডুলিপিটি
ফিরে না পাওয়াই হয়তো ভালো।

সে তার সময়ের মধ্যে
অক্ষত থাকুক।

আমার স্মৃতিতে।

যদি ফিরে আসে,
আমি হয়তো তাকে সম্পাদনা করতে চাইব।

শব্দ বদলাব।

অতিরিক্ত আবেগ কমাব।

কিছু পঙ্‌ক্তি মুছব।

তাহলে তো
তরুণ আমাকেই বদলে দেব।

তার চেয়ে সে
হারানো থাক।

অসম্পাদিত।

অপরিণত।

সত্য।

কারণ আমাদের জীবনের
সব পুরোনো লেখা
আজকের বুদ্ধি দিয়ে
সংশোধন করার জন্য নয়।

কিছু লেখা
শুধু প্রমাণ করে-

আমরা একসময়
অন্যরকম ছিলাম।

আজ তাই
হারানো পাণ্ডুলিপির জন্য
শোকের সঙ্গে কৃতজ্ঞতাও আছে।

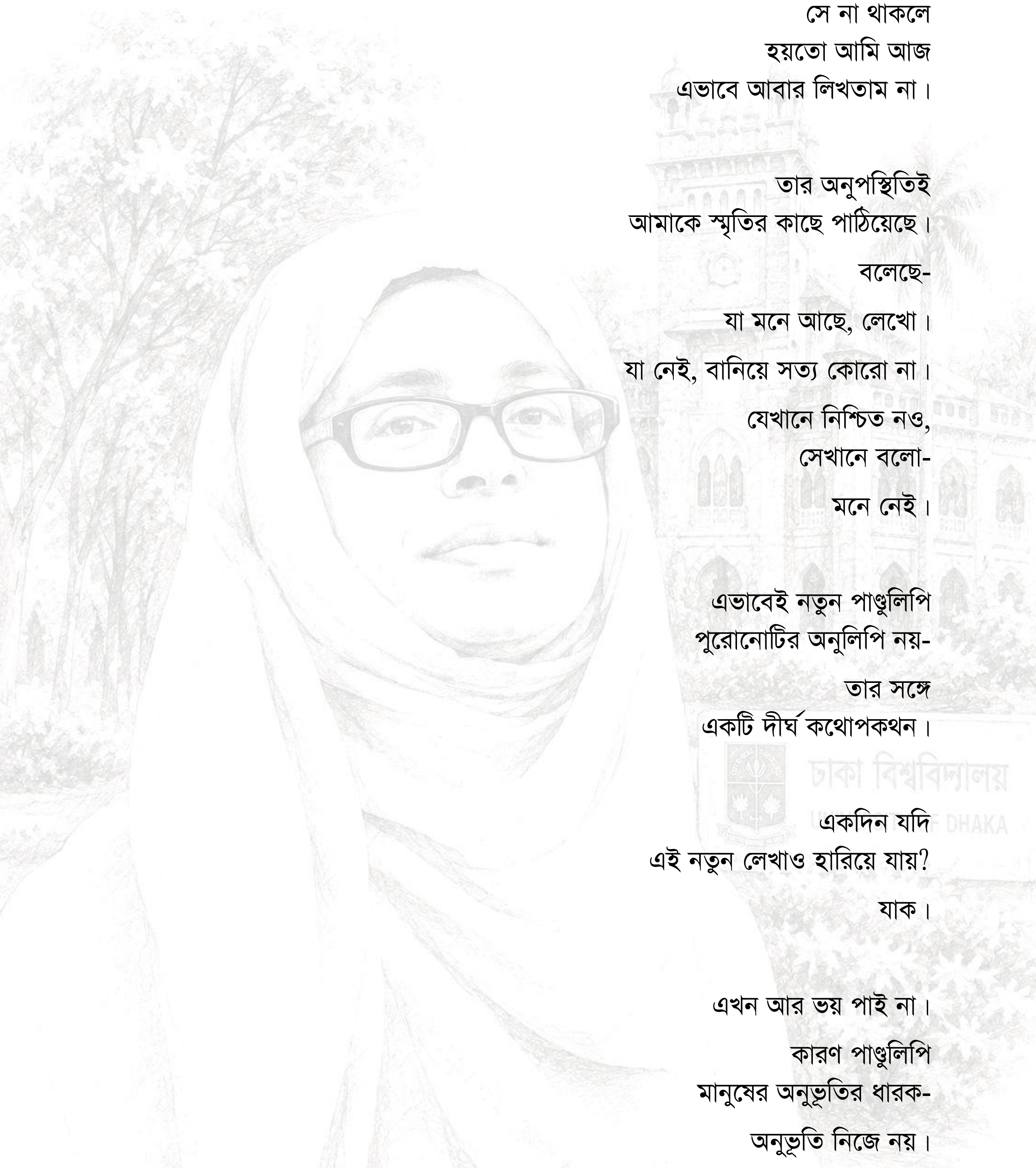

সে না থাকলে
হয়তো আমি আজ
এভাবে আবার লিখতাম না।

তার অনুপস্থিতিই
আমাকে স্মৃতির কাছে পাঠিয়েছে।
বলেছে-
যা মনে আছে, লেখো।
যা নেই, বানিয়ে সত্য কোরো না।
যেখানে নিশ্চিত নও,
সেখানে বলো-
মনে নেই।

এভাবেই নতুন পাণ্ডুলিপি
পুরোনোটির অনুলিপি নয়-
তার সঙ্গে
একটি দীর্ঘ কথোপকথন।

একদিন যদি
এই নতুন লেখাও হারিয়ে যায়?
যাক।

এখন আর ভয় পাই না।
কারণ পাণ্ডুলিপি
মানুষের অনুভূতির ধারক-
অনুভূতি নিজে নয়।

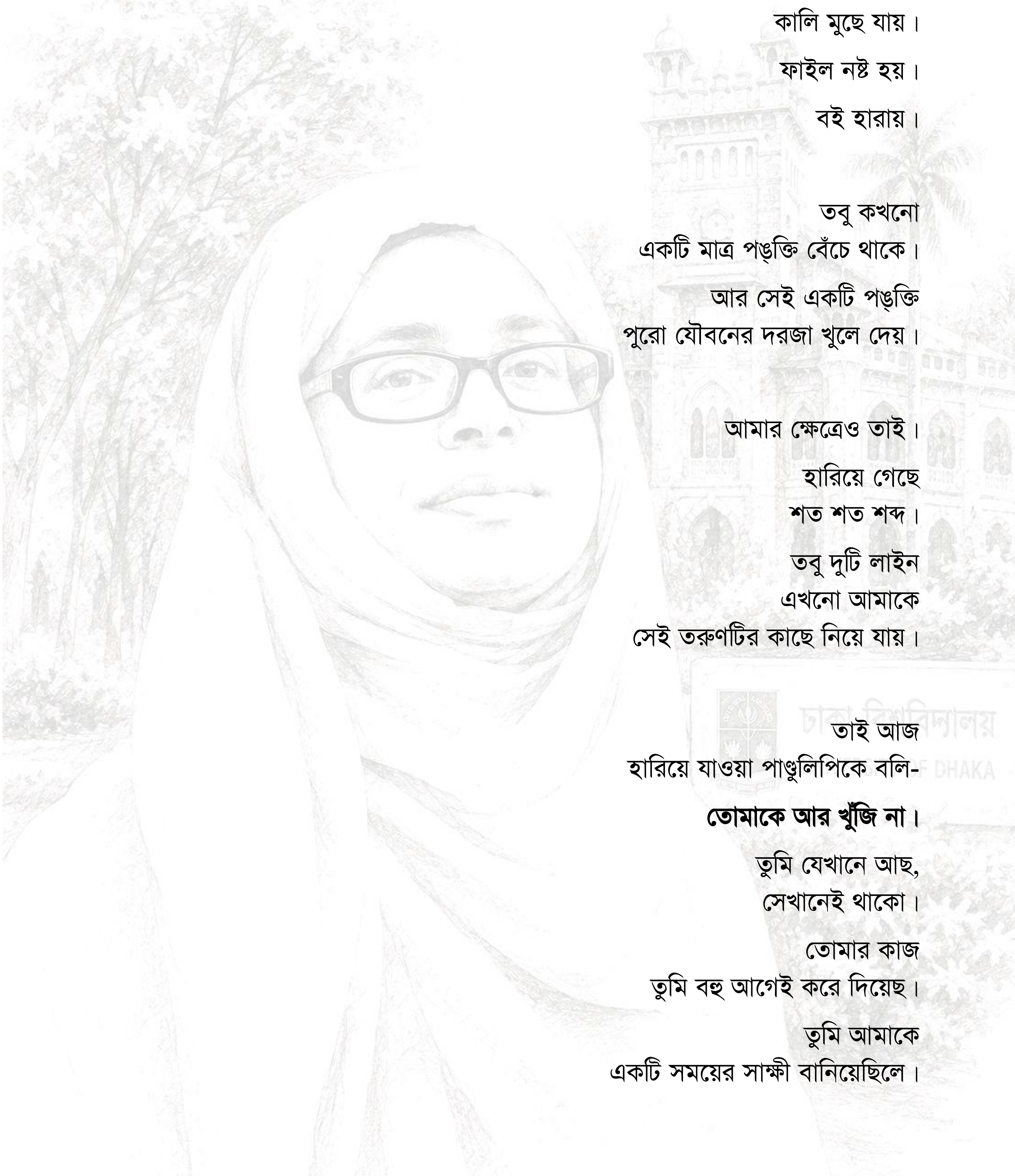

কাগজ হারায়।

কালি মুছে যায়।

ফাইল নষ্ট হয়।

বই হারায়।

তবু কখনো
একটি মাত্র পঙ্ক্তি বেঁচে থাকে।

আর সেই একটি পঙ্ক্তি
পুরো যৌবনের দরজা খুলে দেয়।

আমার ক্ষেত্রেও তাই।

হারিয়ে গেছে
শত শত শব্দ।

তবু দুটি লাইন
এখনো আমাকে
সেই তরুণটির কাছে নিয়ে যায়।

তাই আজ
হারিয়ে যাওয়া পাণ্ডুলিপিকে বলি-

তোমাকে আর খুঁজি না।

তুমি যেখানে আছ,
সেখানেই থাকো।

তোমার কাজ
তুমি বহু আগেই করে দিয়েছ।

তুমি আমাকে
একটি সময়ের সাক্ষী বানিয়েছিলে।

আর আজ
তোমার অনুপস্থিতিই
আমাকে আবার লিখতে শিখিয়েছে।

তুমি হারিয়েছ-
তাই গল্পটি হারায়নি;
বরং এত বছর পরে
নতুন ভাষায় ফিরে এসেছে।

কাগজ হারিয়েছে, তুমি নও

কাগজ হারিয়েছে।

তুমি নও।

প্রথম শুনলে
বাক্যটি হয়তো ভুল মনে হয়।

কারণ তুমিও তো
আমার বর্তমান থেকে বহু দূরে।

দেখা নেই।

কথা নেই।

খোঁজ নেই।

তবু বলছি-

কাগজ হারিয়েছে,
তুমি নও।

কারণ কাগজে ছিল
তোমাকে নিয়ে লেখা শব্দ।

আর স্মৃতিতে ছিলে
তুমি।

কাগজটি হারালে
শব্দ গেল।

স্মৃতি পুরোটা গেল না।

একসময় ভাবতাম
পাণ্ডুলিপিই আমার
সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ।

কত রাত!

কত কবিতা!

কত আবেগ!

যদি হারায়?

হারাল।

তারপর?

আমি কি তোমাকে ভুলে গেলাম?

না।

তখন বুঝলাম-

আমি ভুল জায়গায়
স্থায়িত্ব খুঁজছিলাম।

কাগজ একটি বাহন।

স্মৃতি অন্য কিছু।

সে কখনো নিষ্ঠুর।

কখনো অবিশ্বাস্য কোমল।

কখনো প্রয়োজনীয় জিনিস মুছে দেয়।

আবার একেবারে তুচ্ছ একটি দৃশ্য
অর্ধশতাব্দীর কাছাকাছি সময়
ধরে রাখে।

আমি আজও জানি না
কেন কিছু দৃশ্য রয়ে গেছে।

প্রথম দেখা।

পথ।

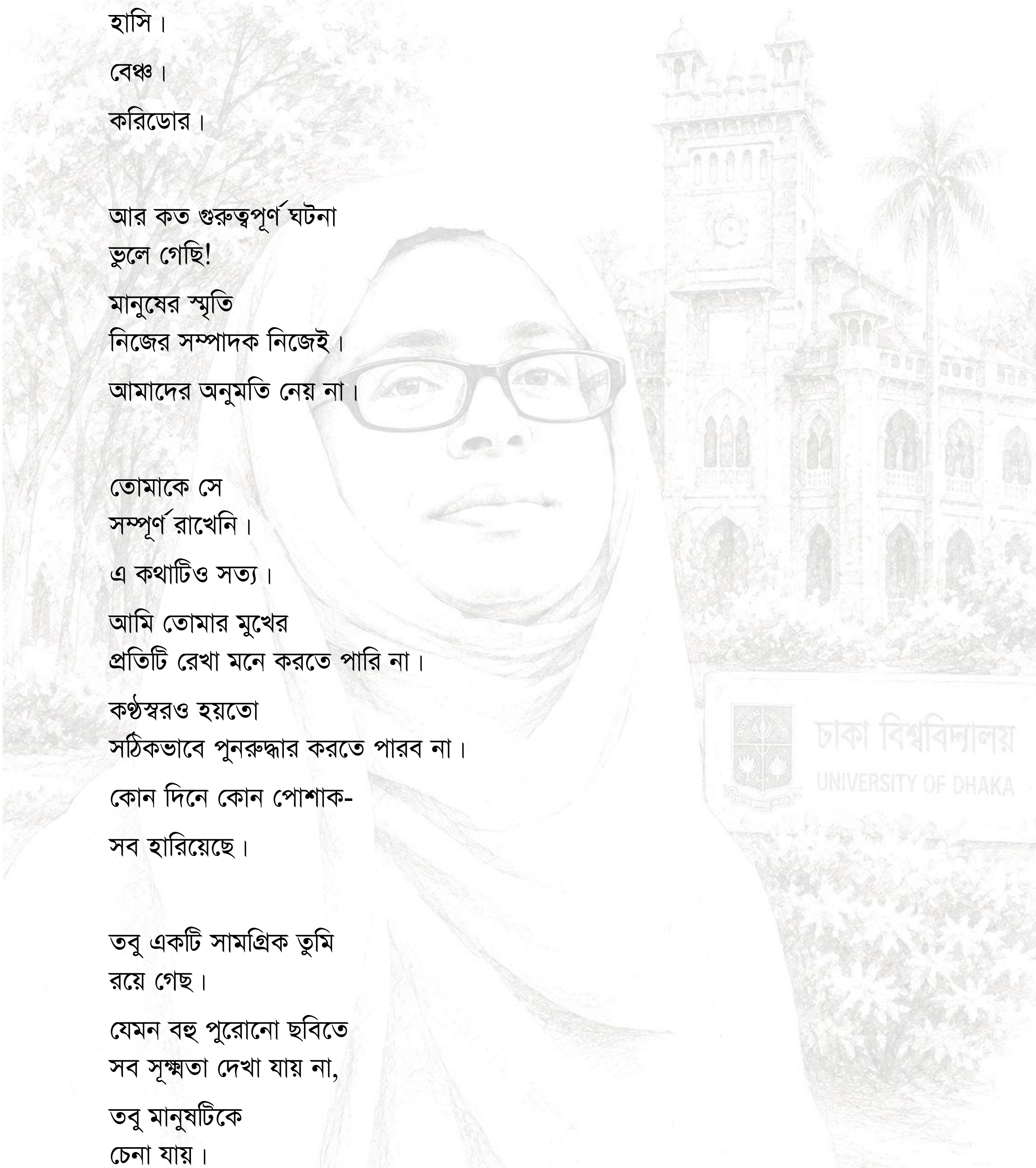

চোখ।

হাসি।

বেঞ্চ।

করিডোর।

আর কত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা
ভুলে গেছি!

মানুষের স্মৃতি
নিজের সম্পাদক নিজেই।

আমাদের অনুমতি নেয় না।

তোমাকে সে
সম্পূর্ণ রাখেনি।

এ কথাটিও সত্য।

আমি তোমার মুখের
প্রতিটি রেখা মনে করতে পারি না।

কণ্ঠস্বরও হয়তো
সঠিকভাবে পুনরুদ্ধার করতে পারব না।

কোন দিনে কোন পোশাক-

সব হারিয়েছে।

তবু একটি সামগ্রিক তুমি
রয়ে গেছ।

যেমন বহু পুরোনো ছবিতে
সব সূক্ষ্মতা দেখা যায় না,

তবু মানুষটিকে
চেনা যায়।

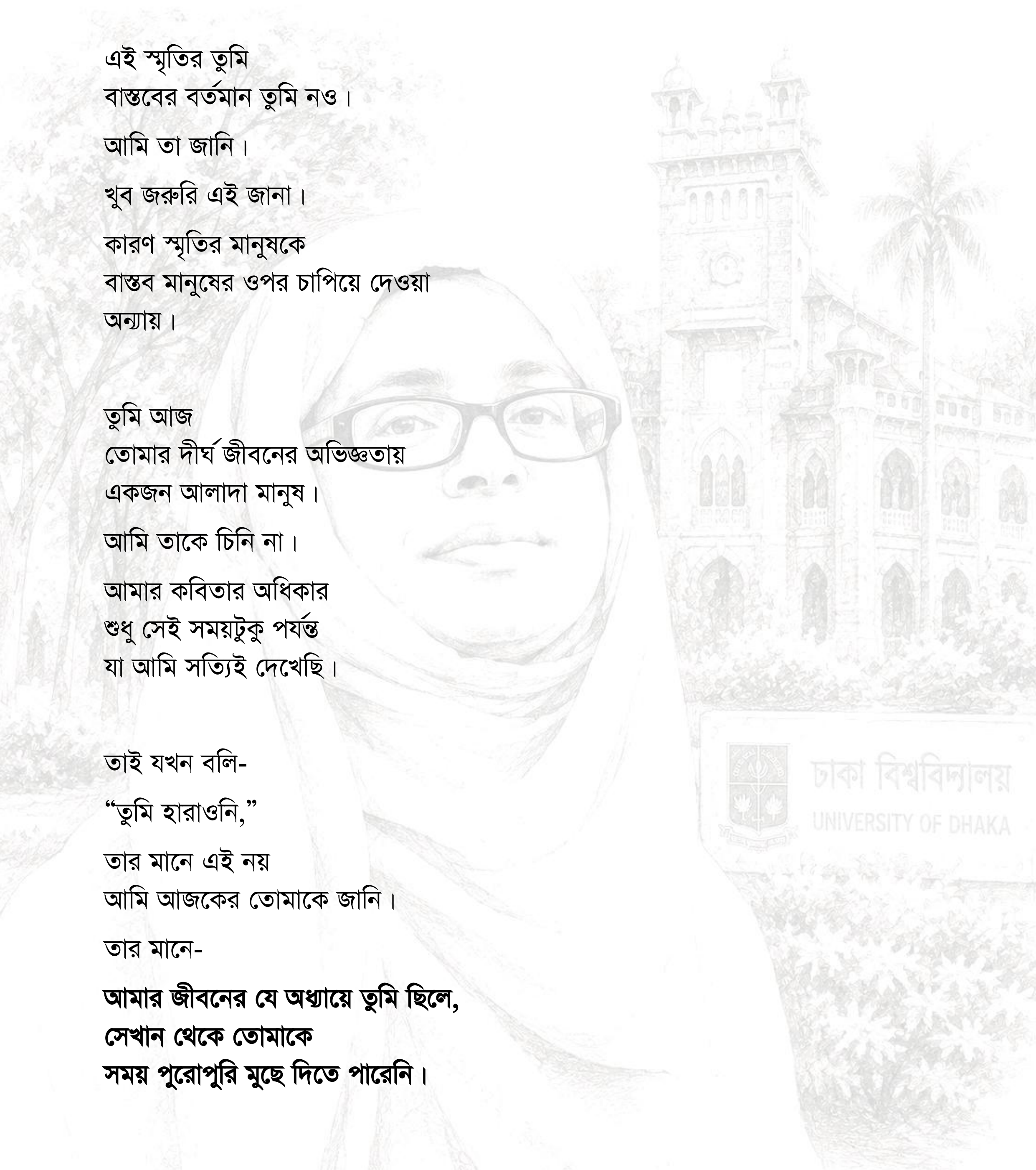

এই স্মৃতির তুমি
বাস্তবের বর্তমান তুমি নও।

আমি তা জানি।

খুব জরুরি এই জানা।

কারণ স্মৃতির মানুষকে
বাস্তব মানুষের ওপর চাপিয়ে দেওয়া
অন্যায়।

তুমি আজ
তোমার দীর্ঘ জীবনের অভিজ্ঞতায়
একজন আলাদা মানুষ।

আমি তাকে চিনি না।

আমার কবিতার অধিকার
শুধু সেই সময়টুকু পর্যন্ত
যা আমি সত্যিই দেখেছি।

তাই যখন বলি-

"তুমি হারাওনি,"

তার মানে এই নয়
আমি আজকের তোমাকে জানি।

তার মানে-

আমার জীবনের যে অধ্যায়ে তুমি ছিলে,
সেখান থেকে তোমাকে
সময় পুরোপুরি মুছে দিতে পারেনি।

এই পার্থক্যটুকু
আমার নতুন কবিতার
সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সততা।

কাগজ হারিয়েছে।

তাতে হয়তো লেখা ছিল
আমার অনেক ভুলও।

অতিরঞ্জন।

তরুণ বয়সের দাবি।

অপরিণত স্বপ্ন।

সব গেছে।

স্মৃতি আশ্চর্যভাবে
তার মধ্য থেকে
কিছু মৌলিক সত্য রেখে দিয়েছে-

আমি তোমাকে দেখেছিলাম।

আমার ভালো লেগেছিল।

আমি লিখেছিলাম।

আমি বলতে পারিনি।

তুমি দূরত্ব চেয়েছিলে।

আমি দূরে গিয়েছিলাম।

আর বহু বছর পরেও
কিছু অনুভূতি রয়ে গেছে।

এই কয়েকটি সত্যের জন্য
হাজার পৃষ্ঠার পাণ্ডুলিপি
আসলে প্রয়োজন নেই।

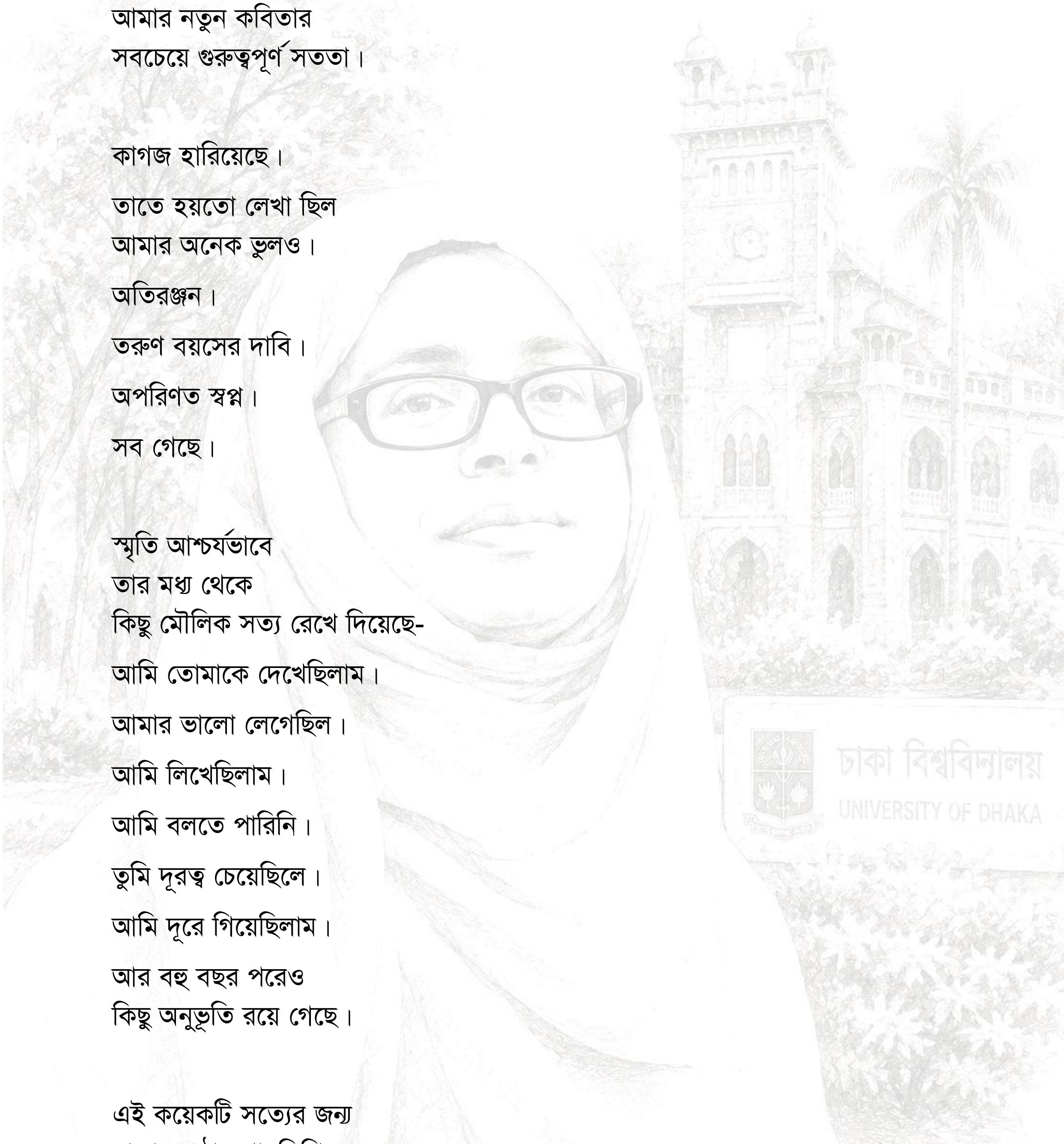

কখনো মনে হয়-

আমার হারানো পাণ্ডুলিপি
যদি সত্যিই একদিন ফিরে আসে,

তবে আজকের এই কবিতাগুলোর পাশে
রাখব।

এক পাশে
তরুণ আমি।

অন্য পাশে
আজকের আমি।

দুই মানুষ
একই নারীকে নিয়ে লিখছে।

কিন্তু তাদের ভালোবাসার ভাষা
এক নয়।

তরুণটি লিখছে-

কাছে এসো।

আজকেরটি লিখছে-

যেখানে আছো ভালো থেকো।

তরুণটি লিখছে-

আমাকে বোঝো।

আজকেরটি-

আমাকে বোঝার প্রয়োজন নেই।

তরুণটি লিখছে-

আমার কবিতা পড়ো।

আজকেরটি-

না পড়লেও
কবিতার জন্ম বৃথা নয়।

তরুণটি জানতে চায়-

তুমি কি আমাকে মনে রাখবে?

আজকেরটি জানে-

সেটি তোমার স্বাধীনতা।

এই দুই লেখকের মাঝখানে
ত্রিশ বছরেরও বেশি সময়।

কিন্তু একটি জায়গায়
তারা একই।

দুজনেই
তোমার কষ্ট চায় না।

সেই কারণেই
আমার পুরোনো দুটি পঙ্‌ক্তি
আজও ফিরে আসে।

তাদের ভাষা তরুণ,
কিন্তু ভেতরের আকাঙ্ক্ষাটি
আজও চিনতে পারি-

প্রিয় মানুষের বেদনা
নিজের সুখের মূল্য হতে পারে না।

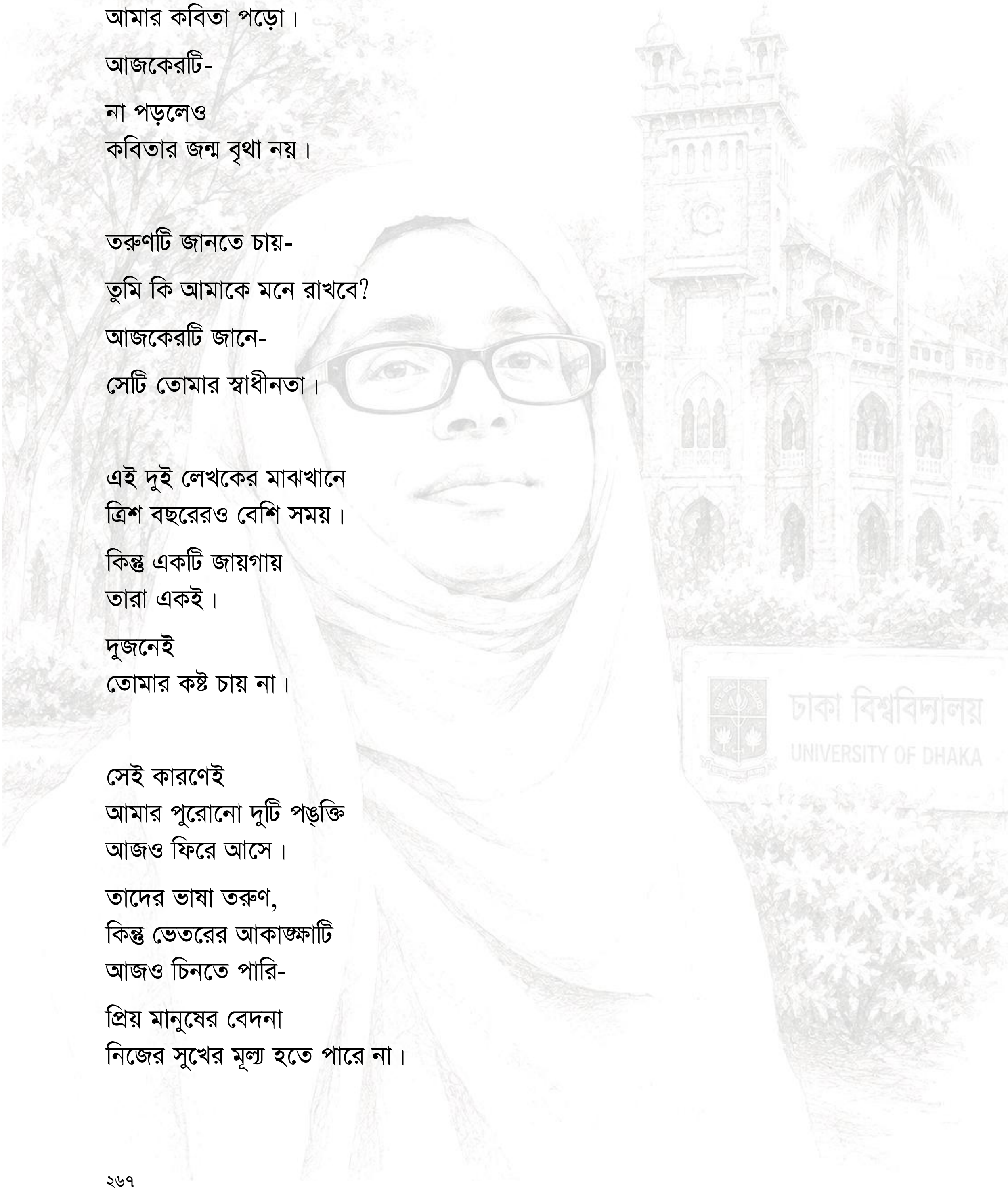

হয়তো এই একটি বোধই
হারানো পাণ্ডুলিপি থেকে
আমার কাছে বেঁচে থাকা
সবচেয়ে মূল্যবান পৃষ্ঠা।

কাগজ হারিয়েছে।

শব্দ হারিয়েছে।

তারিখ হারিয়েছে।

অনেক দৃশ্যও।

কিন্তু একটি অনুভূতির ইতিহাস
পুরোপুরি হারায়নি।

আর আজ আমি
সেই ইতিহাসকে নতুন করে লিখছি-

তোমাকে ফিরে পাওয়ার জন্য নয়।

হারানো সময়কে
ফিরিয়ে আনার জন্যও নয়।

শুধু নিজের জীবনের
একটি সত্যকে তার যথাযথ জায়গা দেওয়ার জন্য।

কখনো মানুষ ভাবে
সে একটি বই লিখছে।

পরে বুঝতে পারে-

বইটিই আসলে
তাকে লিখছিল।

আমার সেই প্রথম পাণ্ডুলিপিও
হয়তো তাই করেছিল।

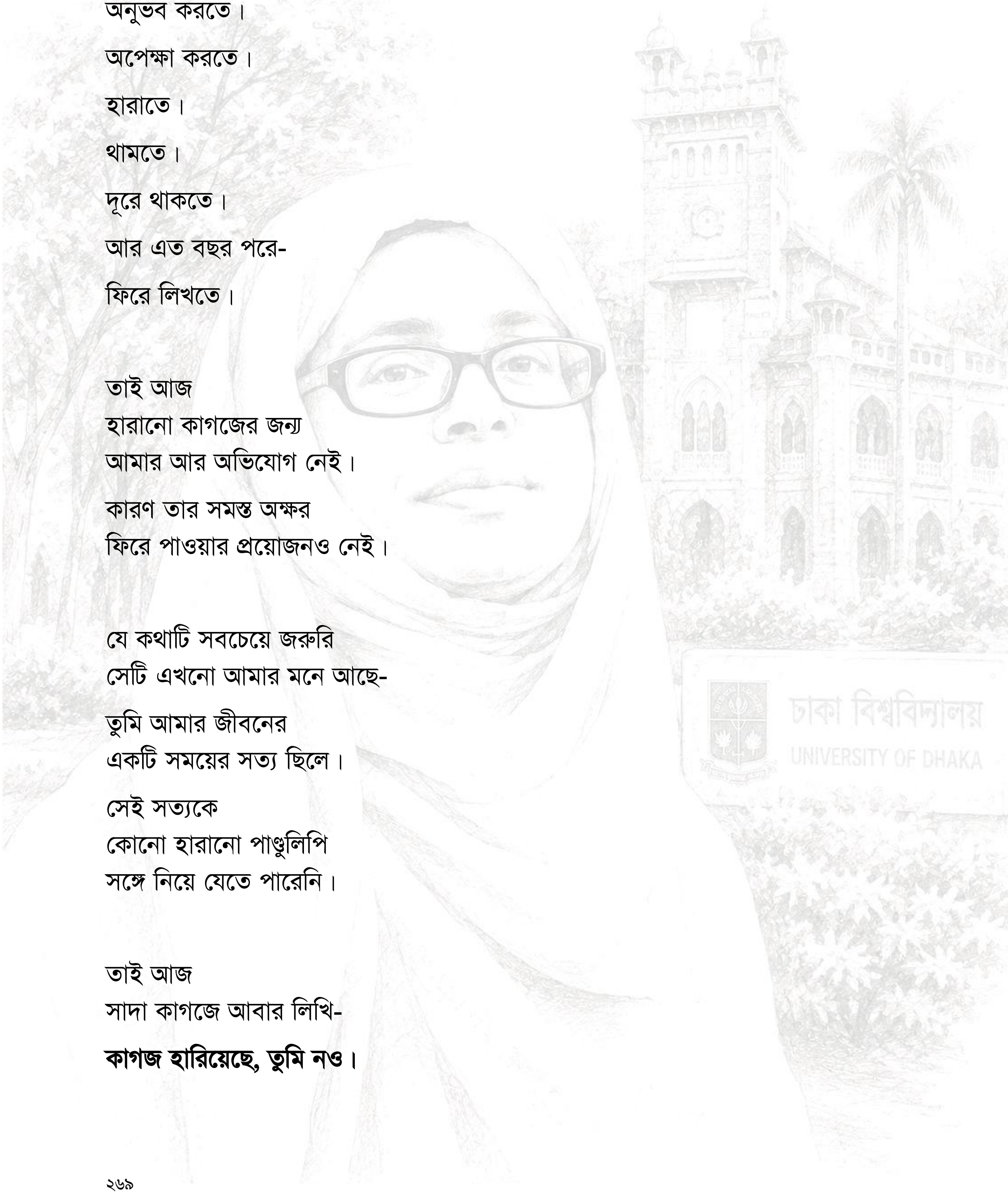

সে আমাকে শিখিয়েছিল
অনুভব করতে।

অপেক্ষা করতে।

হারাতে।

থামতে।

দূরে থাকতে।

আর এত বছর পরে-

ফিরে লিখতে।

তাই আজ
হারানো কাগজের জন্য
আমার আর অভিযোগ নেই।

কারণ তার সমস্ত অক্ষর
ফিরে পাওয়ার প্রয়োজনও নেই।

যে কথাটি সবচেয়ে জরুরি
সেটি এখনো আমার মনে আছে-

তুমি আমার জীবনের
একটি সময়ের সত্য ছিলে।

সেই সত্যকে
কোনো হারানো পাণ্ডুলিপি
সঙ্গে নিয়ে যেতে পারেনি।

তাই আজ
সাদা কাগজে আবার লিখি-

কাগজ হারিয়েছে, তুমি নও।

তারপর একটু থেমে
বাক্যটি সংশোধন করি-

না, আজকের তুমি নও-
তোমাকে আজ আমি চিনি না।
হারায়নি সেই তুমি,
যাকে একদিন বিশ্ববিদ্যালয়ের পথে
আমার তরুণ চোখ প্রথম দেখেছিল।

সে আজও আছে-

কোনো ছবিতে নয়,
কোনো পুরোনো খাতায় নয়,

আমার জীবনের
একটি দূরবর্তী, শান্ত অধ্যায়ে।

আর হয়তো এটাই
স্মৃতির সবচেয়ে সুন্দর ন্যায়বিচার-

সে মানুষকে আমাদের করে রাখে না,
শুধু একদিন মানুষটি
আমাদের জীবনে ছিল-
এই সত্যটুকু হারাতে দেয় না।

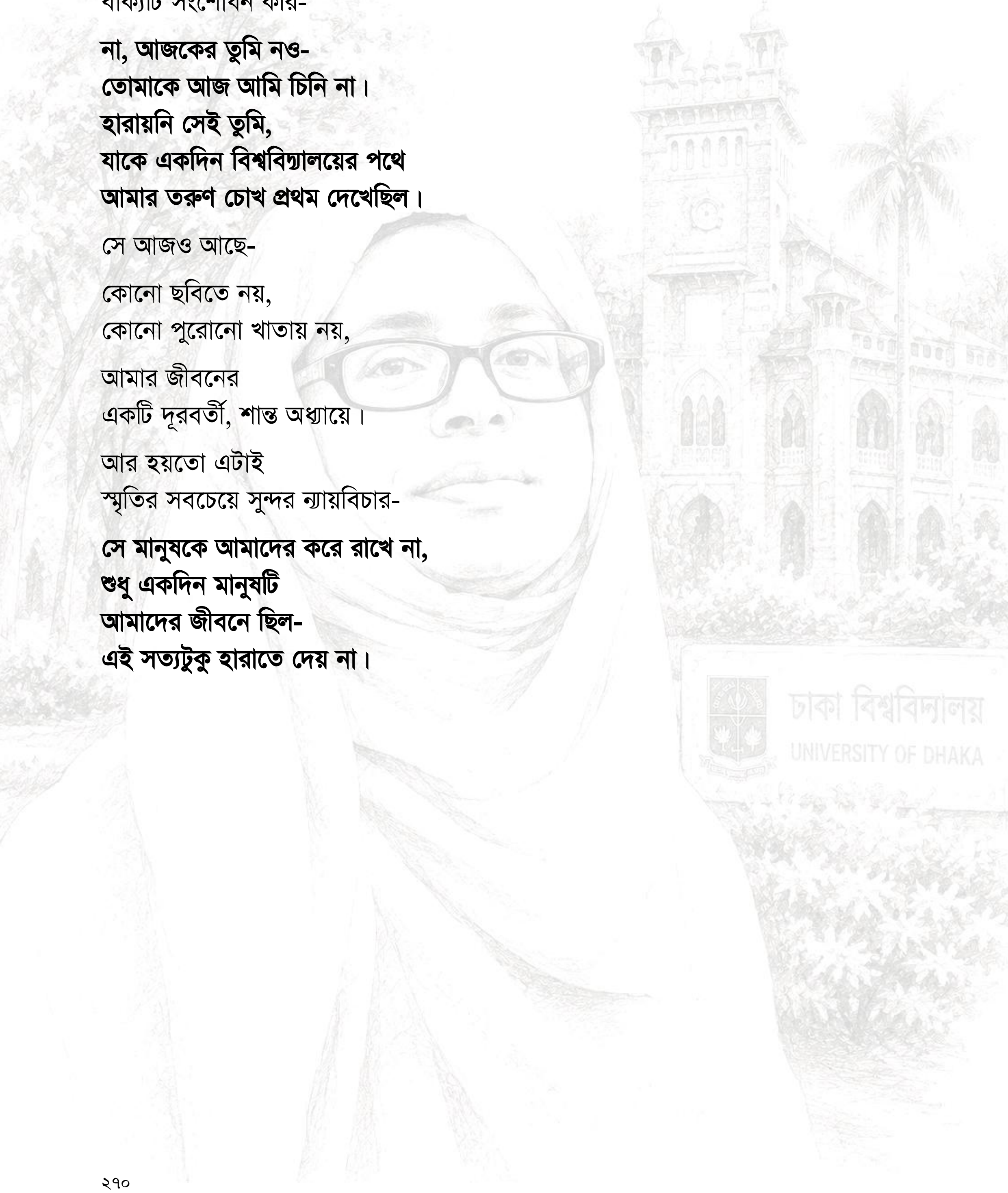

আবার কলম ধরলাম

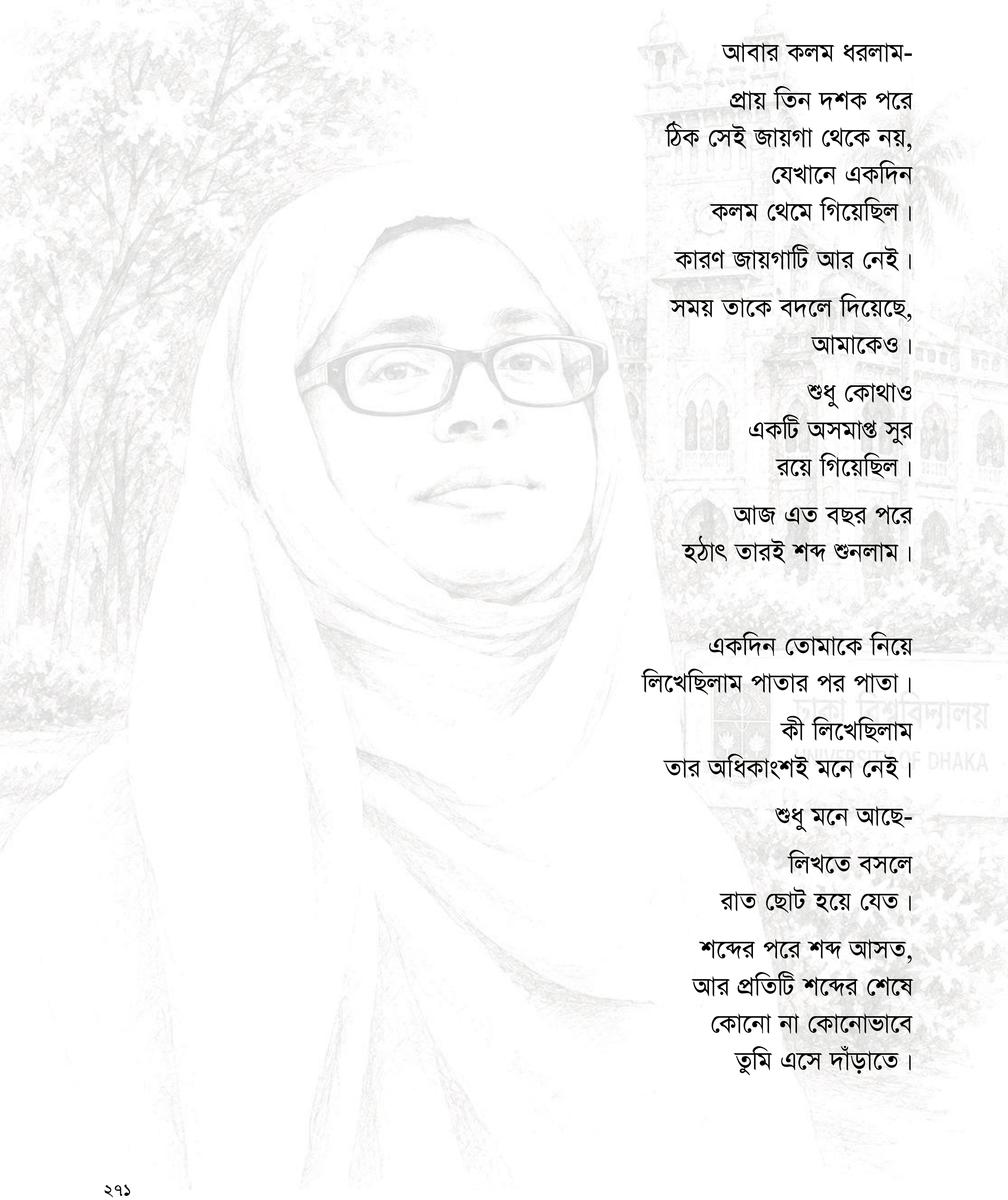

আবার কলম ধরলাম-

প্রায় তিন দশক পরে
ঠিক সেই জায়গা থেকে নয়,
যেখানে একদিন
কলম থেমে গিয়েছিল।

কারণ জায়গাটি আর নেই।

সময় তাকে বদলে দিয়েছে,
আমাকেও।

শুধু কোথাও
একটি অসমাপ্ত সুর
রয়ে গিয়েছিল।

আজ এত বছর পরে
হঠাৎ তারই শব্দ শুনলাম।

একদিন তোমাকে নিয়ে
লিখেছিলাম পাতার পর পাতা।

কী লিখেছিলাম
তার অধিকাংশই মনে নেই।

শুধু মনে আছে-

লিখতে বসলে
রাত ছোট হয়ে যেত।

শব্দের পরে শব্দ আসত,
আর প্রতিটি শব্দের শেষে
কোনো না কোনোভাবে
তুমি এসে দাঁড়াতে।

সেই পাণ্ডুলিপি নেই।

কাগজ নেই।

কালি নেই।

তরুণ বয়সের
সেই হাতের লেখাও নেই।

তবু আজ
নতুন সাদা পাতার সামনে বসে
হঠাৎ মনে হলো-

আমি কি সত্যিই
কখনো লেখা থামিয়েছিলাম?

নাকি শুধু
দীর্ঘ একটি বিরতি নিয়েছিলাম?

ত্রিশ বছরের বিরতি!

কোনো কবিতার মাঝখানে
এত দীর্ঘ নীরবতা
কে রাখে?

হয়তো জীবন।

জীবন বলেছিল-

এখন কবিতা রেখে ওঠো।

তোমার আরও কাজ আছে।

দায়িত্ব আছে।

পথ আছে।

মানুষ আছে।

সুখ আছে।

দুঃখ আছে।

বেঁচে থাকার
অসংখ্য প্রয়োজন আছে।
আমি উঠে গিয়েছিলাম।

তারপর বছর গেছে।
কলম ধরেছি
অসংখ্য কারণে।
কাজের জন্য।
জীবিকার জন্য।
শিক্ষার জন্য।
গবেষণার জন্য।
প্রয়োজনের জন্য।
কিন্তু সেই পুরোনো অর্থে-
তোমাকে নিয়ে-
কলম আর ধরা হয়নি।

আজ ধরলাম।
আর প্রথমেই বুঝলাম-
কলমটি একই নয়।
হাতটিও নয়।

তখন কলম ধরত
একজন তরুণ।
যে ভালোবাসাকে
প্রধানত আকাঙ্ক্ষা হিসেবে জানত।

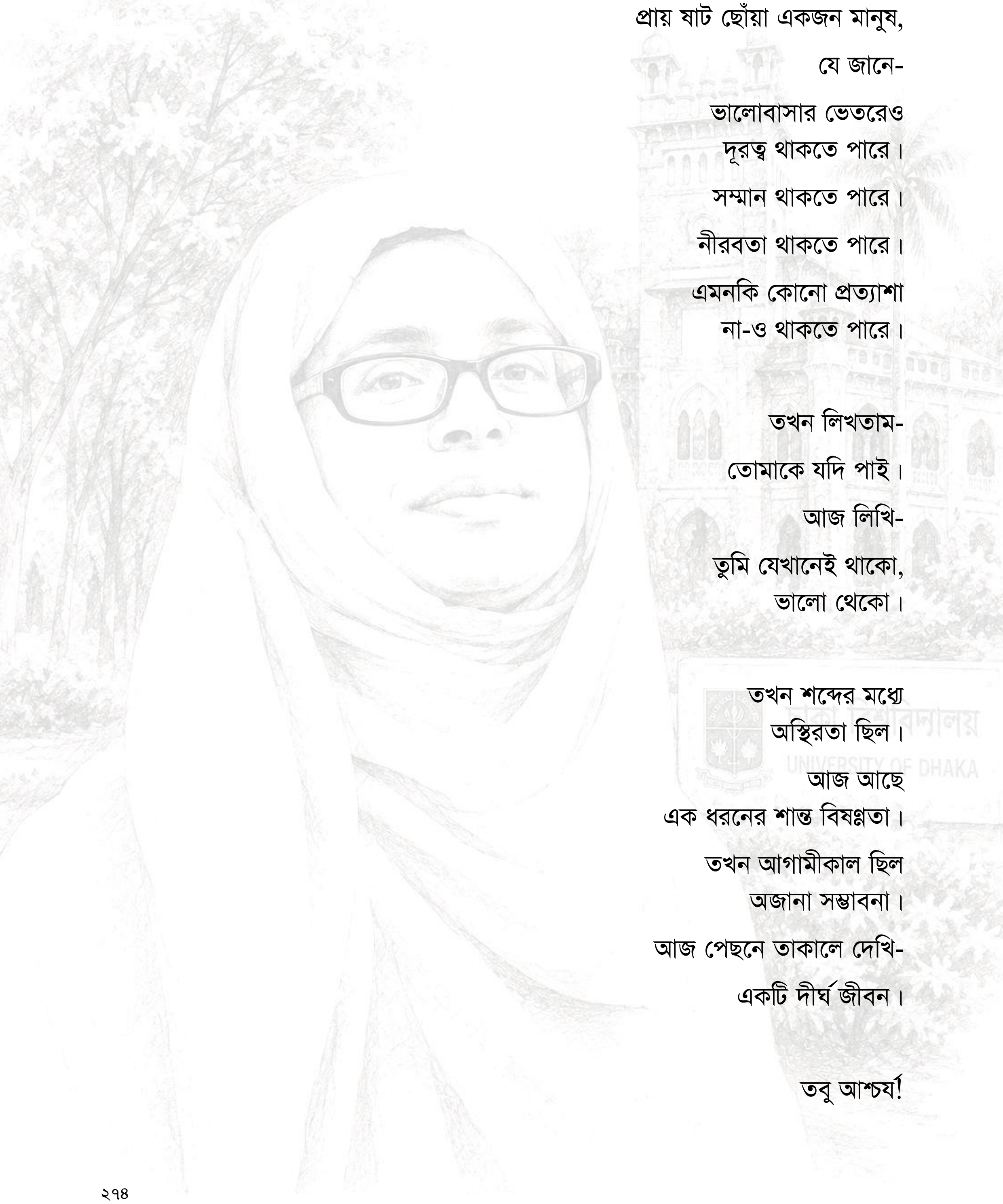

আজ কলম ধরেছে
প্রায় ষাট ছোঁয়া একজন মানুষ,

যে জানে-

ভালোবাসার ভেতরেও
দূরত্ব থাকতে পারে।

সম্মান থাকতে পারে।

নীরবতা থাকতে পারে।

এমনকি কোনো প্রত্যাশা
না-ও থাকতে পারে।

তখন লিখতাম-

তোমাকে যদি পাই।

আজ লিখি-

তুমি যেখানেই থাকো,
ভালো থেকো।

তখন শব্দের মধ্যে
অস্থিরতা ছিল।

আজ আছে
এক ধরনের শান্ত বিষণ্নতা।

তখন আগামীকাল ছিল
অজানা সম্ভাবনা।

আজ পেছনে তাকালে দেখি-

একটি দীর্ঘ জীবন।

তবু আশ্চর্য!

কলম কাগজ ছোঁয়ার পরে
কোথা থেকে যেন
সেই তরুণটি ফিরে আসে।

সে আমার হাত ধরে বলে-

চেনো আমাকে?

আমি হাসি।

বলি-

কী করে ভুলব?

সে জিজ্ঞেস করে-

তুমি কি এখনও
তাকে নিয়ে লিখতে পারো?

আমি বলি-

পারি।

তবে তোমার মতো নয়।

সে অবাক হয়।
কেন?

আমি বলি-

কারণ তুমি তাকে
পেতে চেয়েছিলে।

আমি এখন শুধু
স্মরণ করতে চাই।

তুমি উত্তর চেয়েছিলে।

আমি এখন
কোনো উত্তর চাই না।

তুমি ভাবতে-
একদিন হয়তো।
আমি জানি-
‘হয়তো’ দিয়ে
কারও সীমানা বদলানো যায় না।

তরুণটি চুপ করে।
তারপর আমার লেখা পড়ে।
হয়তো তার ভালো লাগে না।
সে বলবে-
এত সংযম কেন?
এত দূরত্ব কেন?
প্রেম কি এত হিসাব বোঝে?
আমি বলব-
প্রেম হয়তো বোঝে না।
কিন্তু মানুষকে বুঝতে হয়।

সে আবার জিজ্ঞেস করবে-
তাহলে এত বছর পরে
লিখছ কেন?
এই প্রশ্নে
আমি থেমে যাব।

সত্যিই তো-
কেন?
তোমাকে পাঠানোর জন্য?

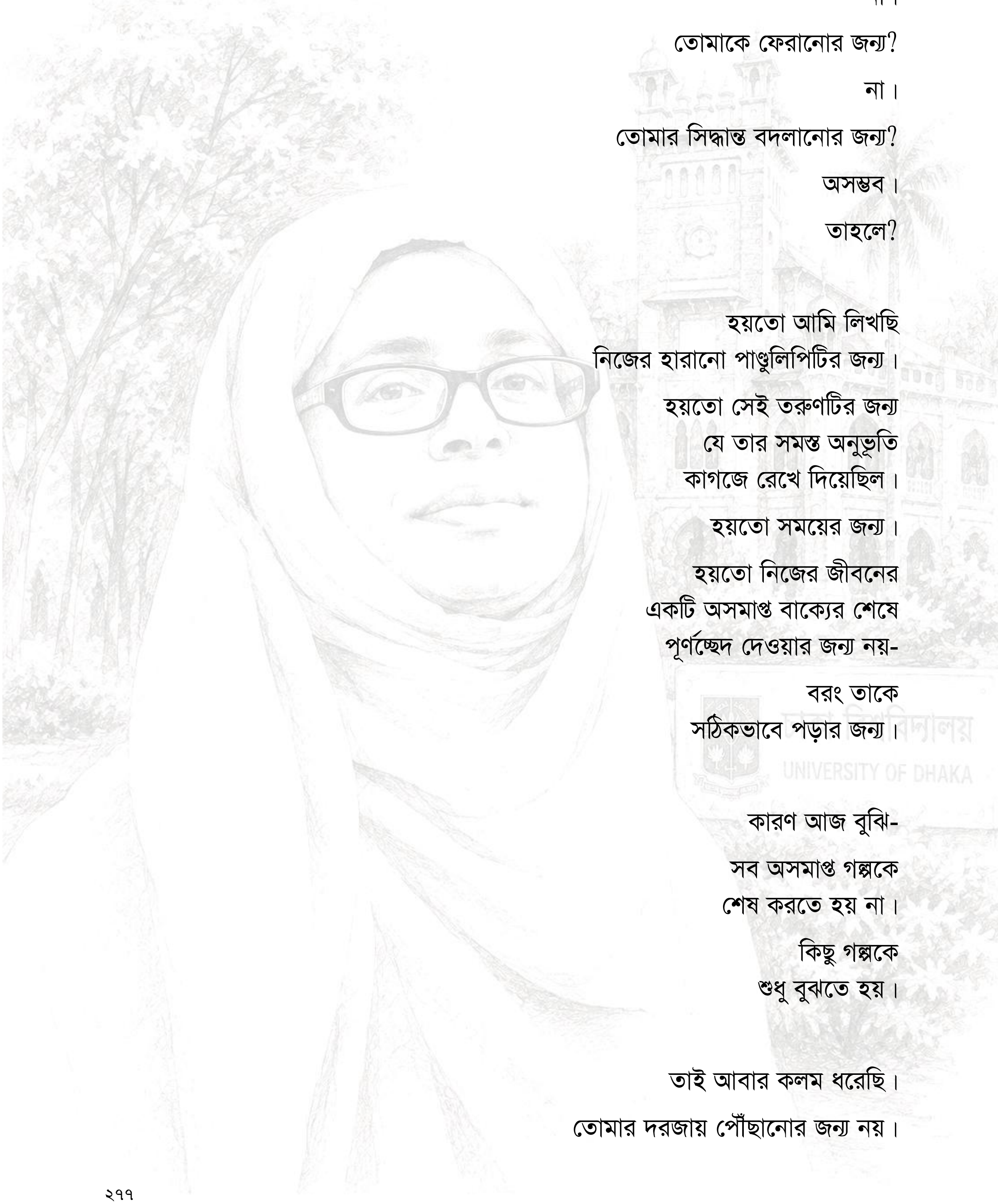

না।

তোমাকে ফেরানোর জন্য?

না।

তোমার সিদ্ধান্ত বদলানোর জন্য?

অসম্ভব।

তাহলে?

হয়তো আমি লিখছি
নিজের হারানো পাণ্ডুলিপিটির জন্য।

হয়তো সেই তরুণটির জন্য
যে তার সমস্ত অনুভূতি
কাগজে রেখে দিয়েছিল।

হয়তো সময়ের জন্য।

হয়তো নিজের জীবনের
একটি অসমাপ্ত বাক্যের শেষে
পূর্ণচ্ছেদ দেওয়ার জন্য নয়-

বরং তাকে
সঠিকভাবে পড়ার জন্য।

কারণ আজ বুঝি-

সব অসমাপ্ত গল্পকে
শেষ করতে হয় না।

কিছু গল্পকে
শুধু বুঝতে হয়।

তাই আবার কলম ধরেছি।

তোমার দরজায় পৌঁছানোর জন্য নয়।

নিজের স্মৃতির দরজা
একবার খুলে দেখার জন্য।

সেখানে দেখি-
ধুলো জমেছে।
কিছু ছবি অস্পষ্ট।
অনেক শব্দ হারানো।
তবু এক কোণে
একটি তরুণ বসে লিখছে।
আমি তার পাশে বসি।

আমরা দুজন
একই পাণ্ডুলিপি লিখি-
সে অতীত থেকে।
আমি বর্তমান থেকে।

আমাদের ভাষা আলাদা।
বয়স আলাদা।
বোঝাপড়া আলাদা।
শুধু কবিতার কেন্দ্রের
সেই পুরোনো মুখটি একই-
স্মৃতিতে।

আবার কলম ধরলাম।
এবার কোনো দাবি নিয়ে নয়।
কোনো প্রত্যাশা নিয়ে নয়।

শুধু একটি দীর্ঘ জীবনের
একটি সত্যকে লিখতে-

একদিন তোমাকে ভালোবেসেছিলাম।
তারপর তোমার কথায় দূরে গিয়েছিলাম।
জীবন থামাইনি।
তোমাকেও বিরক্ত করিনি।
কিন্তু কোথাও কিছু শব্দ
অসমাপ্ত থেকে গিয়েছিল।

আজ তাদেরই
ঘরে ফিরিয়ে আনছি।

ষাটের কাছে দাঁড়িয়ে

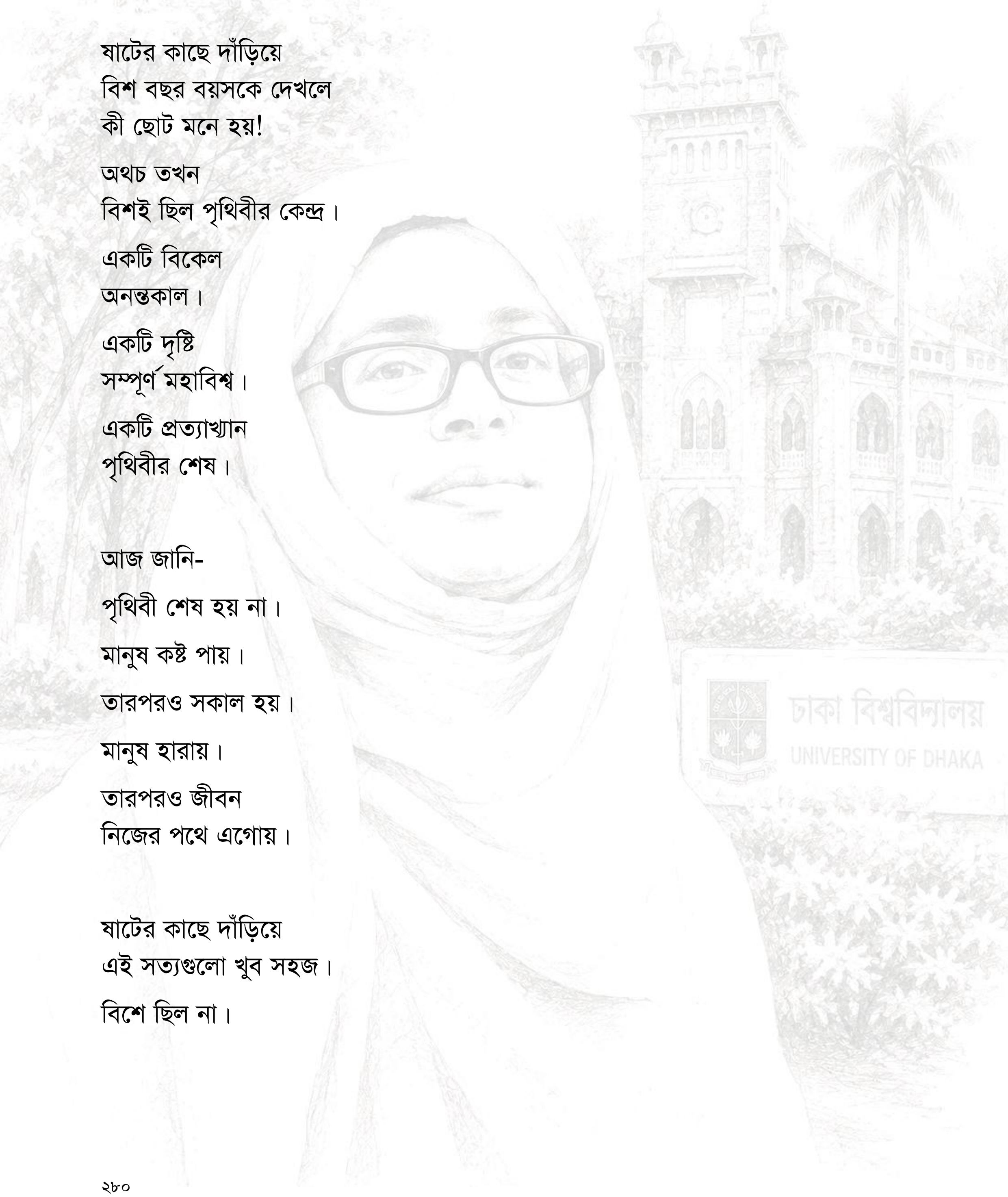

ষাটের কাছে দাঁড়িয়ে
বিশ বছর বয়সকে দেখলে
কী ছোট মনে হয়!

অথচ তখন
বিশই ছিল পৃথিবীর কেন্দ্র।

একটি বিকেল
অনন্তকাল।

একটি দৃষ্টি
সম্পূর্ণ মহাবিশ্ব।

একটি প্রত্যাখ্যান
পৃথিবীর শেষ।

আজ জানি-

পৃথিবী শেষ হয় না।

মানুষ কষ্ট পায়।

তারপরও সকাল হয়।

মানুষ হারায়।

তারপরও জীবন
নিজের পথে এগোয়।

ষাটের কাছে দাঁড়িয়ে
এই সত্যগুলো খুব সহজ।

বিশে ছিল না।

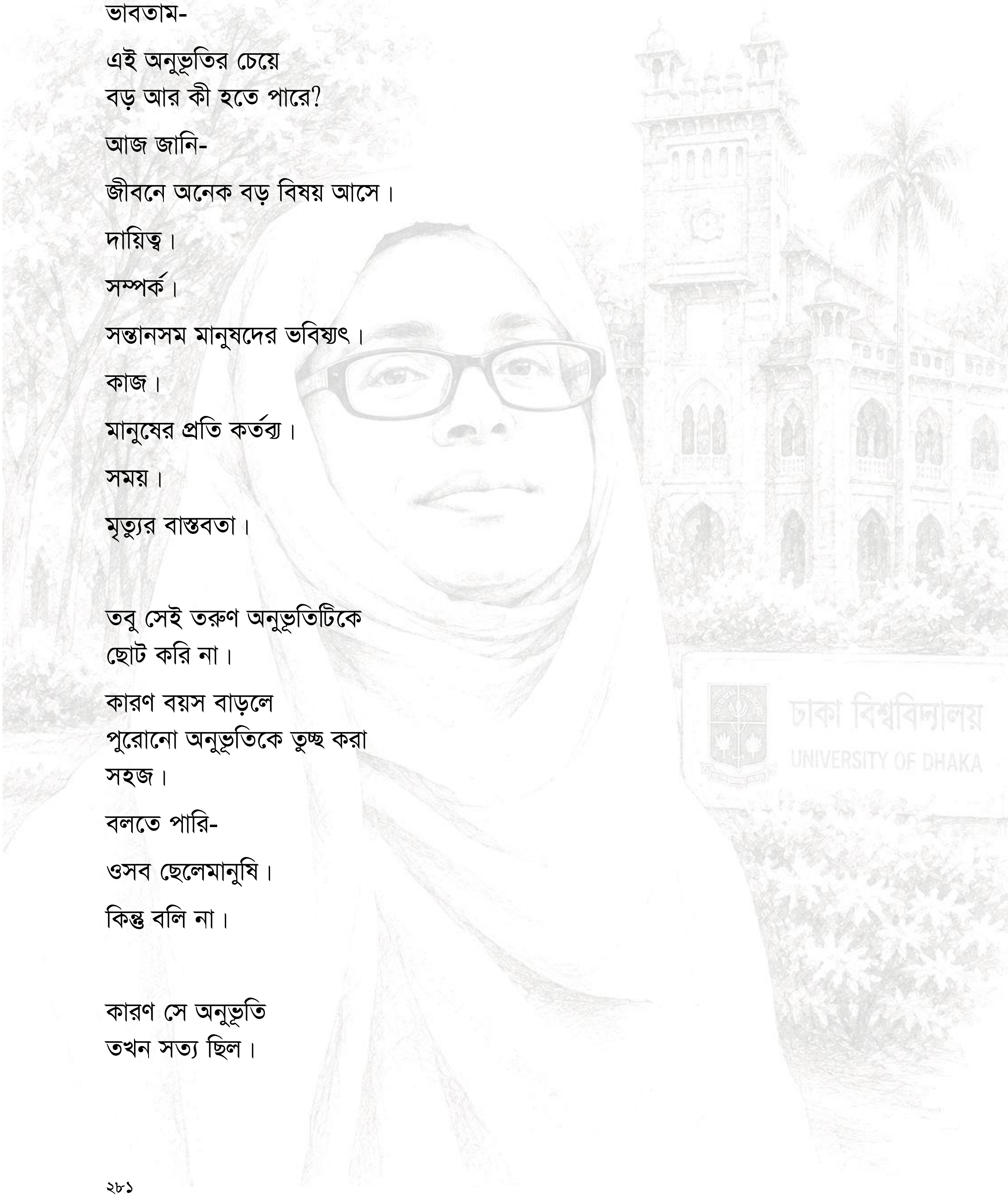

তখন তোমাকে দেখে
ভাবতাম-

এই অনুভূতির চেয়ে
বড় আর কী হতে পারে?

আজ জানি-

জীবনে অনেক বড় বিষয় আসে।

দায়িত্ব।

সম্পর্ক।

সন্তানসম মানুষদের ভবিষ্যৎ।

কাজ।

মানুষের প্রতি কর্তব্য।

সময়।

মৃত্যুর বাস্তবতা।

তবু সেই তরুণ অনুভূতিটিকে
ছোট করি না।

কারণ বয়স বাড়লে
পুরোনো অনুভূতিকে তুচ্ছ করা
সহজ।

বলতে পারি-

ওসব ছেলেমানুষি।

কিন্তু বলি না।

কারণ সে অনুভূতি
তখন সত্য ছিল।

একজন বিশ বছরের মানুষের সত্যকে
ষাট বছরের জ্ঞান দিয়ে
উপহাস করা অন্যায়।

আমি বরং
সেই তরুণটির পাশে দাঁড়াই।

তার কাঁধে হাত রাখি।

বলি-

তুমি যা অনুভব করছ,
তা সত্য।

কিন্তু মনে রেখো-

তোমার সত্যই
একমাত্র সত্য নয়।

যাকে ভালোবাসছ,
তারও একটি সত্য আছে।

এই বাক্যটি
যদি তখন বুঝতাম!

হয়তো কষ্ট কমত।

হয়তো না।

কিছু শিক্ষা
কষ্টের ভেতর দিয়েই আসে।

ষাটের কাছে দাঁড়িয়ে
শরীর সময়ের খবর দেয়।

আয়নায় মুখ বদলেছে।

চোখের পাশে রেখা।

চুলে সময়ের ছাপ।

আগের মতো দ্রুত
বছরগুলো যায় না মনে হলেও-

পেছনে তাকালে দেখি
কী দ্রুত চলে গেছে!

ত্রিশ বছর!

শব্দটি উচ্চারণ করলে
এখন আর শুধু দূরত্ব মনে হয় না।

মনে হয়-

আমাদের জীবনের
বিশাল একটি অংশ।

এই সময়ে
আমরা দুজনেই নিশ্চয়ই
অসংখ্য মানুষের জীবন ছুঁয়েছি।

অসংখ্য দায়িত্ব পালন করেছি।

অসংখ্য সুখ-দুঃখের ভেতর দিয়ে গেছি।

যদিও একে অন্যের
কিছুই জানি না।

এই না-জানার মধ্যেই
আমাদের বর্তমান সত্য।

আমি কখনো
তোমার জীবনকে কল্পনায় পূর্ণ করতে চাই না।

বলতে চাই না-

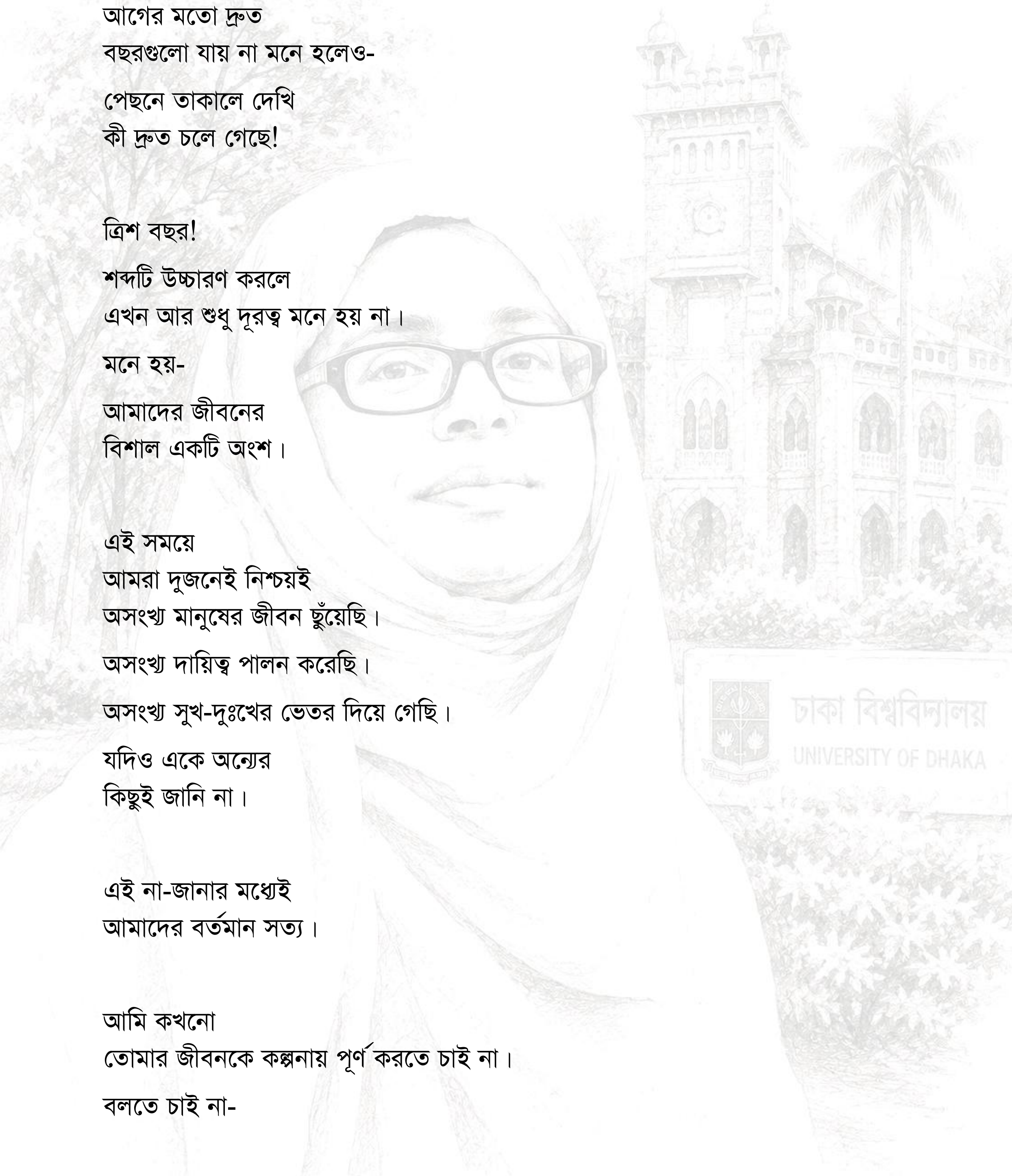

তুমি নিশ্চয়ই এমন।

তুমি নিশ্চয়ই আমাকে মনে করো।

তুমি নিশ্চয়ই ভুলে গেছ।

কিছুই জানি না।

আর না-জানাকে
না-জানা হিসেবেই রাখা
এই বয়সের শিক্ষা।

ঘাটের কাছে এসে
মানুষের দাবিগুলোও
কেমন ছোট হয়ে আসে।

এখন আর মনে হয় না-

কে আমাকে মনে রাখল?

কে ভুলল?

কে বুঝল?

কে বুঝল না?

বরং প্রশ্ন আসে-

আমি কি কাউকে
অকারণে কষ্ট দিয়েছি?

আমি কি কারও স্বাধীনতাকে
সম্মান করেছি?

আমার উপস্থিতি
কারও জীবনে আলো ছিল,
নাকি ভার?

এই প্রশ্নগুলোর সামনে
পুরোনো প্রেমও
নতুন অর্থ পায়।

আজ তোমাকে
আমার জীবনে চাই-
এই ভাষায় ভাবি না।

কারণ জীবন
আমাদের দুজনকেই
অনেক দূর নিয়ে গেছে।

আজ বরং মনে হয়-

তুমি তোমার জীবনে
শান্তিতে থেকো।

আমি আমার জীবনে।

আর কোথাও
দুটি জীবনের মাঝখানে
একটি পুরোনো বিশ্ববিদ্যালয়
থাকুক।

একটি করিডোর।

একটি বেঞ্চ।

একটি তরুণ বয়স।

কিছু হারানো কবিতা।

এইটুকুই।

ঘাটের কাছে দাঁড়িয়ে
আরেকটি বিষয় বুঝি-

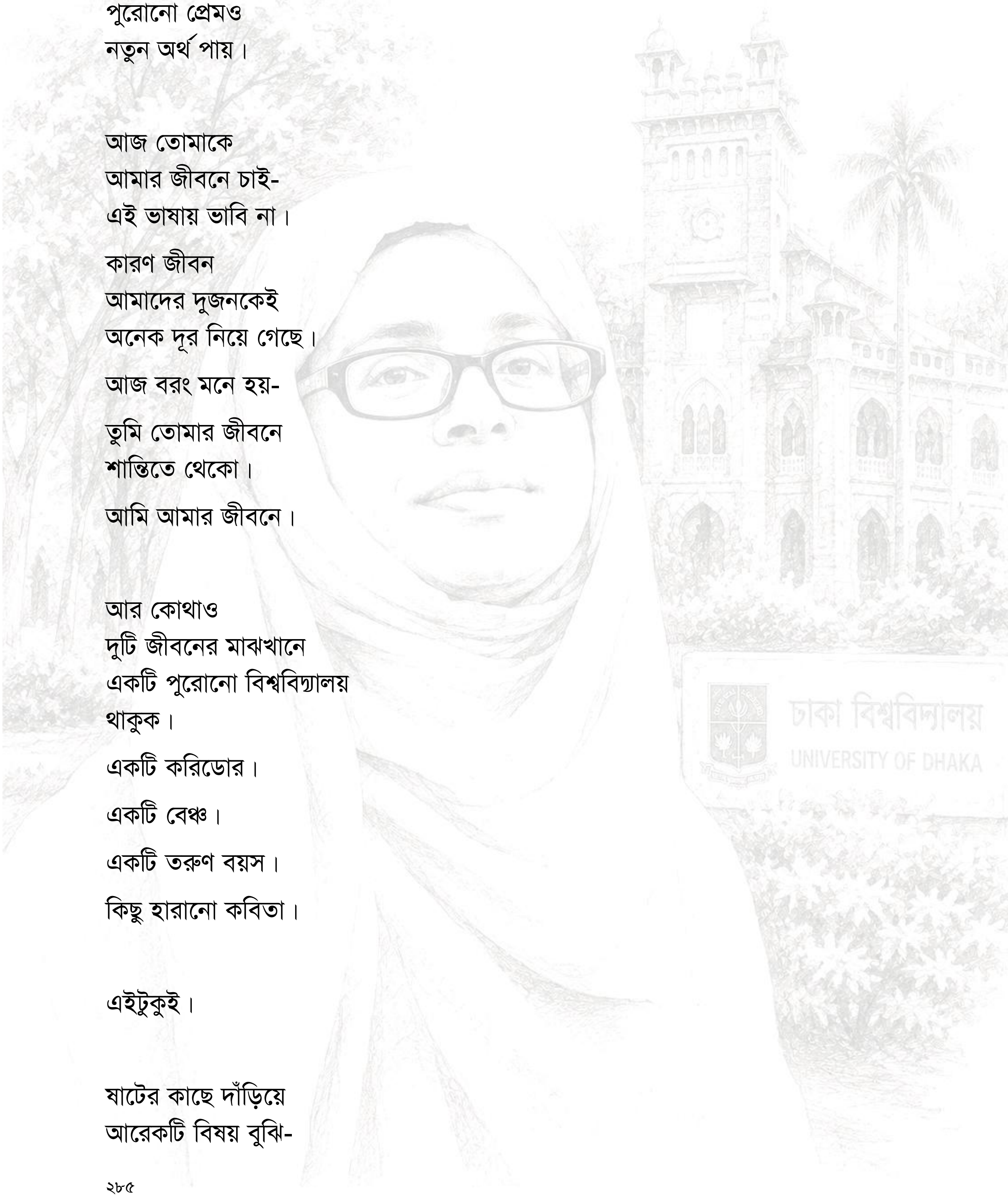

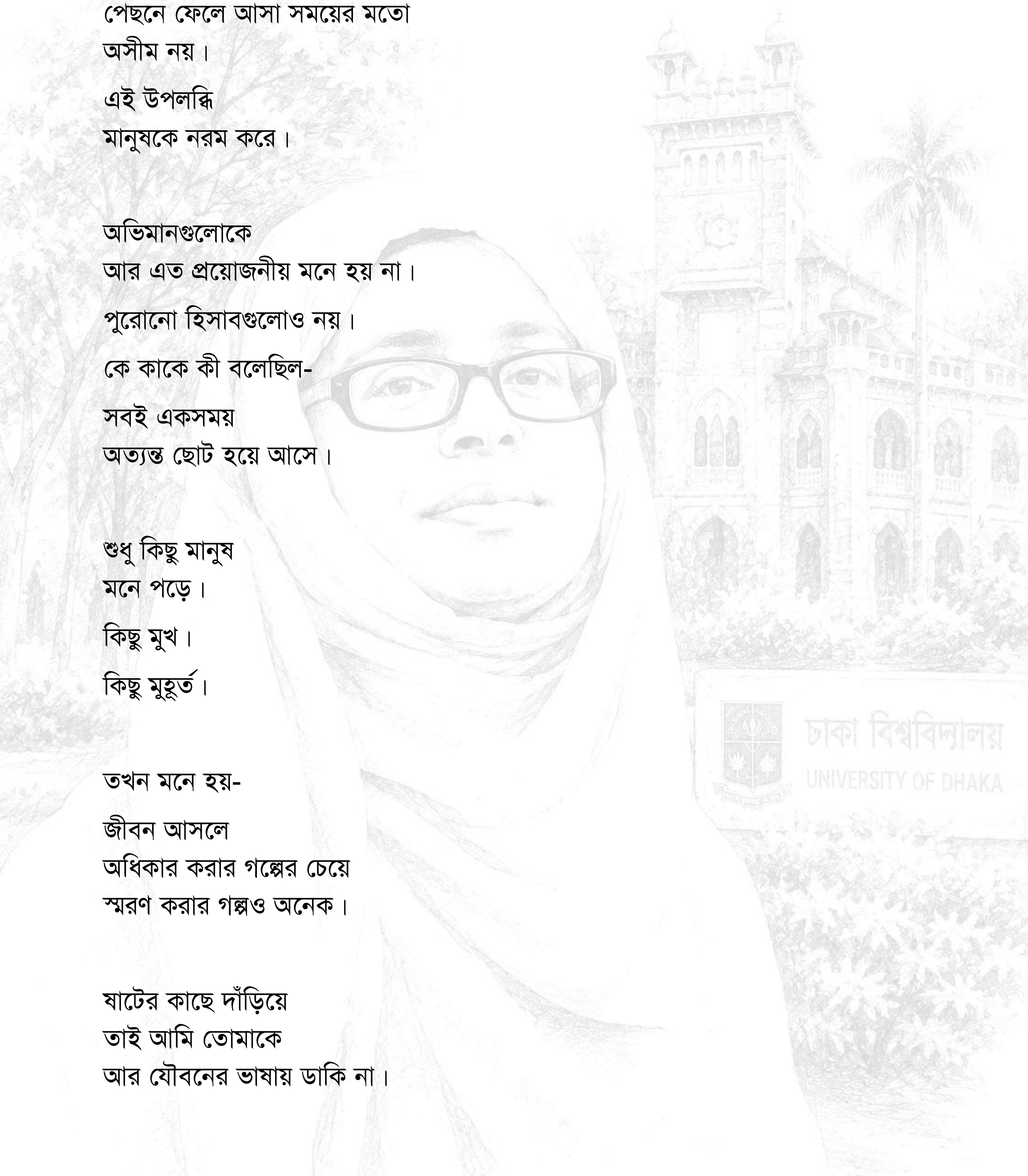

আমাদের সামনে থাকা সময়
পেছনে ফেলে আসা সময়ের মতো
অসীম নয়।

এই উপলব্ধি
মানুষকে নরম করে।

অভিমানগুলোকে
আর এত প্রয়োজনীয় মনে হয় না।

পুরোনো হিসাবগুলোও নয়।

কে কাকে কী বলেছিল-

সবই একসময়
অত্যন্ত ছোট হয়ে আসে।

শুধু কিছু মানুষ
মনে পড়ে।

কিছু মুখ।

কিছু মুহূর্ত।

তখন মনে হয়-

জীবন আসলে
অধিকার করার গল্পের চেয়ে
স্মরণ করার গল্পও অনেক।

ঘাটের কাছে দাঁড়িয়ে
তাই আমি তোমাকে
আর যৌবনের ভাষায় ডাকি না।

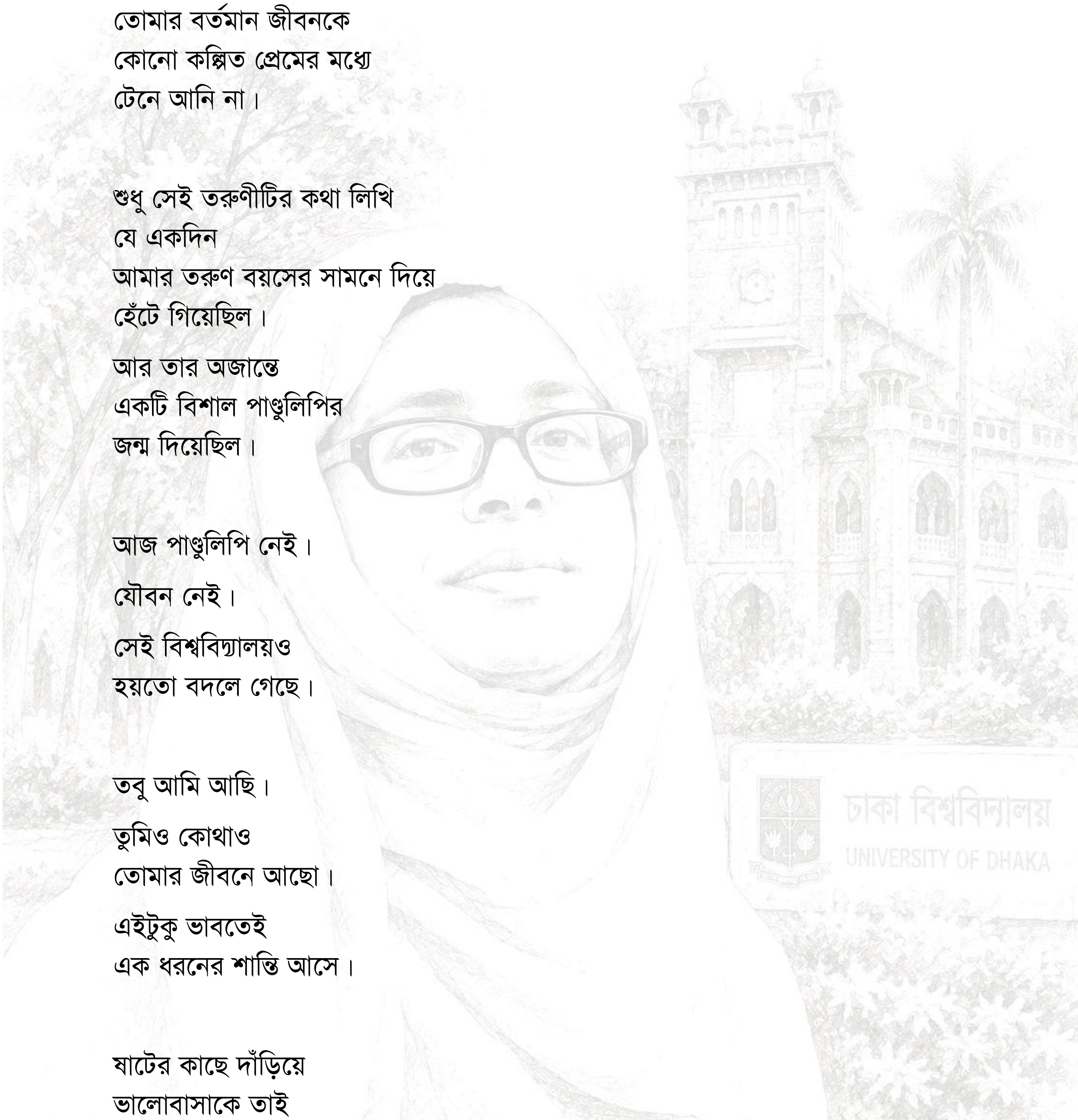

তোমার বর্তমান জীবনকে
কোনো কল্পিত প্রেমের মধ্যে
টেনে আনি না।

শুধু সেই তরুণীটির কথা লিখি
যে একদিন
আমার তরুণ বয়সের সামনে দিয়ে
হেঁটে গিয়েছিল।

আর তার অজান্তে
একটি বিশাল পাণ্ডুলিপির
জন্ম দিয়েছিল।

আজ পাণ্ডুলিপি নেই।

যৌবন নেই।

সেই বিশ্ববিদ্যালয়ও
হয়তো বদলে গেছে।

তবু আমি আছি।

তুমিও কোথাও
তোমার জীবনে আছো।

এইটুকু ভাবতেই
এক ধরনের শান্তি আসে।

ষাটের কাছে দাঁড়িয়ে
ভালোবাসাকে তাই
আর পাওয়ার ভাষায় লিখি না।

লিখি-

সময় আমাদের দুজনকেই
দূরে নিয়ে গেছে।
তবু আমার জীবনের যে বয়সে
তুমি একদিন আলো হয়ে এসেছিলে,
সেই বয়সটির কাছে
আজও তোমার একটি ঋণ আছে-

তুমি তাকে প্রথম শিখিয়েছিলে,
হৃদয়ও কখনো
নিজের অজান্তে কবি হয়ে যায়।

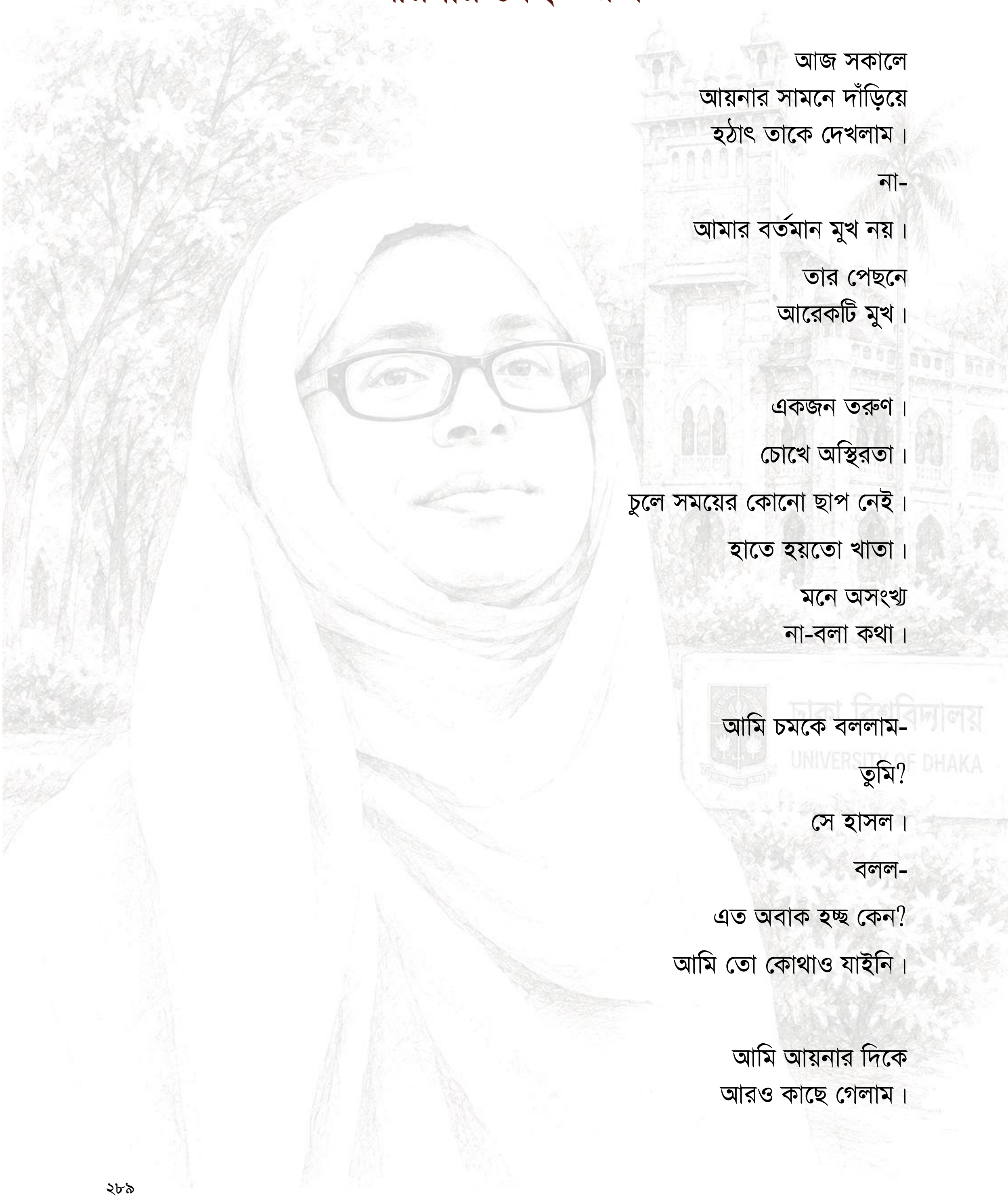

আয়নায় সেই তরুণ

আজ সকালে
আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে
হঠাৎ তাকে দেখলাম।

না-

আমার বর্তমান মুখ নয়।

তার পেছনে
আরেকটি মুখ।

একজন তরুণ।

চোখে অস্থিরতা।

চুলে সময়ের কোনো ছাপ নেই।

হাতে হয়তো খাতা।

মনে অসংখ্য
না-বলা কথা।

আমি চমকে বললাম-

তুমি?

সে হাসল।

বলল-

এত অবাক হচ্ছ কেন?

আমি তো কোথাও যাইনি।

আমি আয়নার দিকে
আরও কাছে গেলাম।

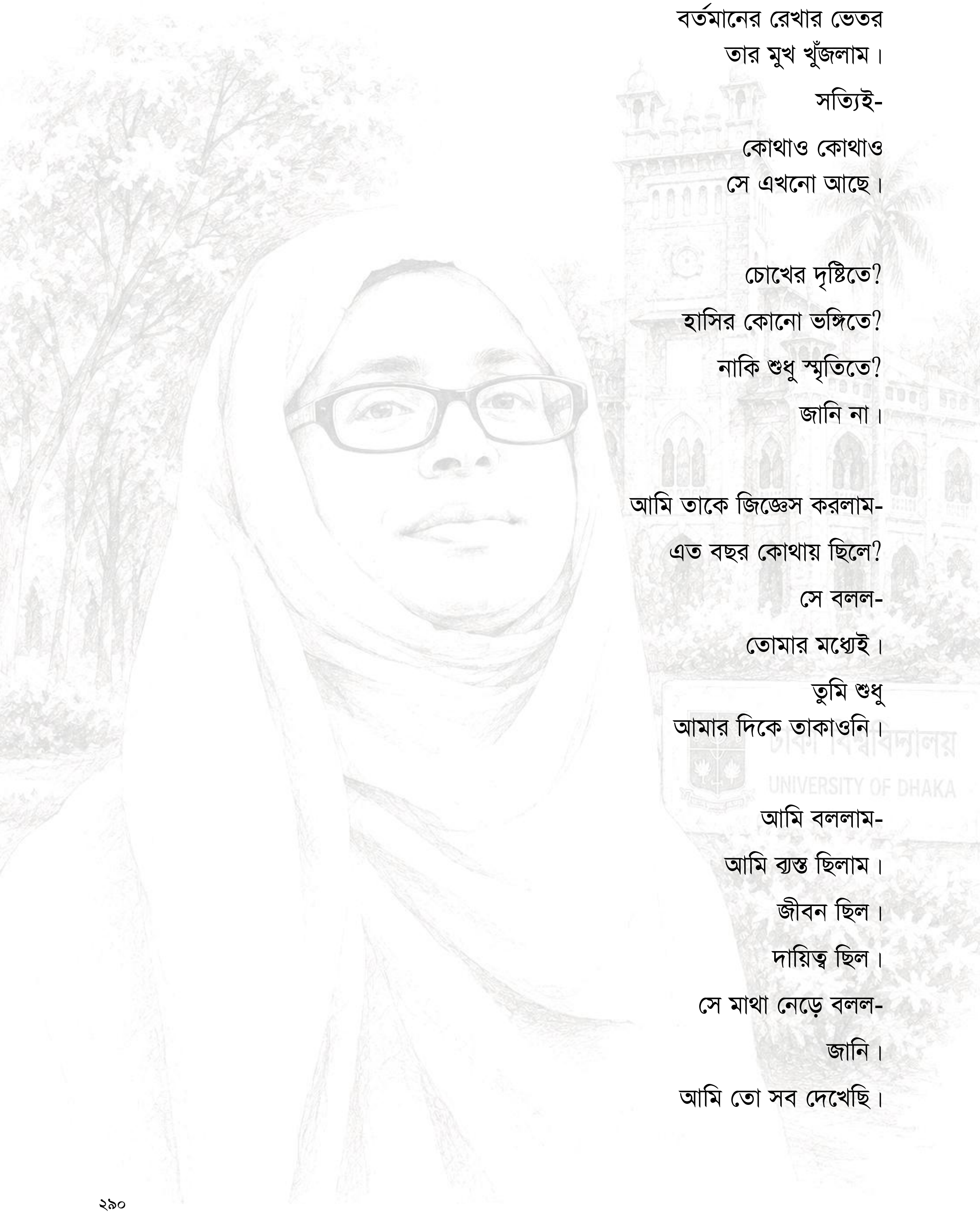

বর্তমানের রেখার ভেতর
তার মুখ খুঁজলাম।

সত্যিই-

কোথাও কোথাও
সে এখনো আছে।

চোখের দৃষ্টিতে?

হাসির কোনো ভঙ্গিতে?

নাকি শুধু স্মৃতিতে?

জানি না।

আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম-

এত বছর কোথায় ছিলে?

সে বলল-

তোমার মধ্যেই।

তুমি শুধু
আমার দিকে তাকাওনি।

আমি বললাম-

আমি ব্যস্ত ছিলাম।

জীবন ছিল।

দায়িত্ব ছিল।

সে মাথা নেড়ে বলল-

জানি।

আমি তো সব দেখেছি।

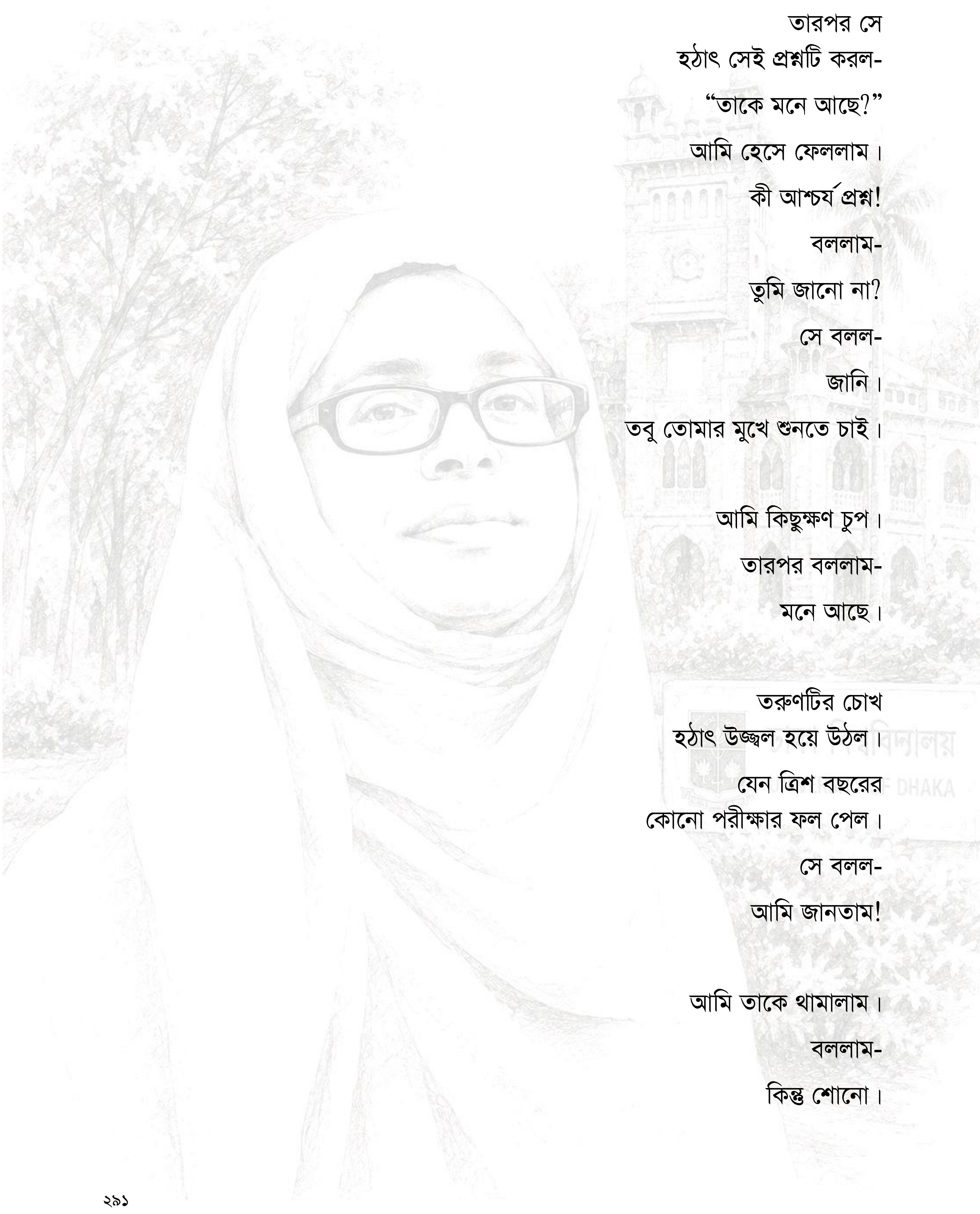

তারপর সে
হঠাৎ সেই প্রশ্নটি করল-
"তাকে মনে আছে?"
আমি হেসে ফেললাম।
কী আশ্চর্য প্রশ্ন!
বললাম-
তুমি জানো না?
সে বলল-
জানি।
তবু তোমার মুখে শুনতে চাই।

আমি কিছুক্ষণ চুপ।
তারপর বললাম-
মনে আছে।

তরুণটির চোখ
হঠাৎ উজ্জ্বল হয়ে উঠল।
যেন ত্রিশ বছরের
কোনো পরীক্ষার ফল পেল।
সে বলল-
আমি জানতাম!

আমি তাকে থামালাম।
বললাম-
কিন্তু শোনো।

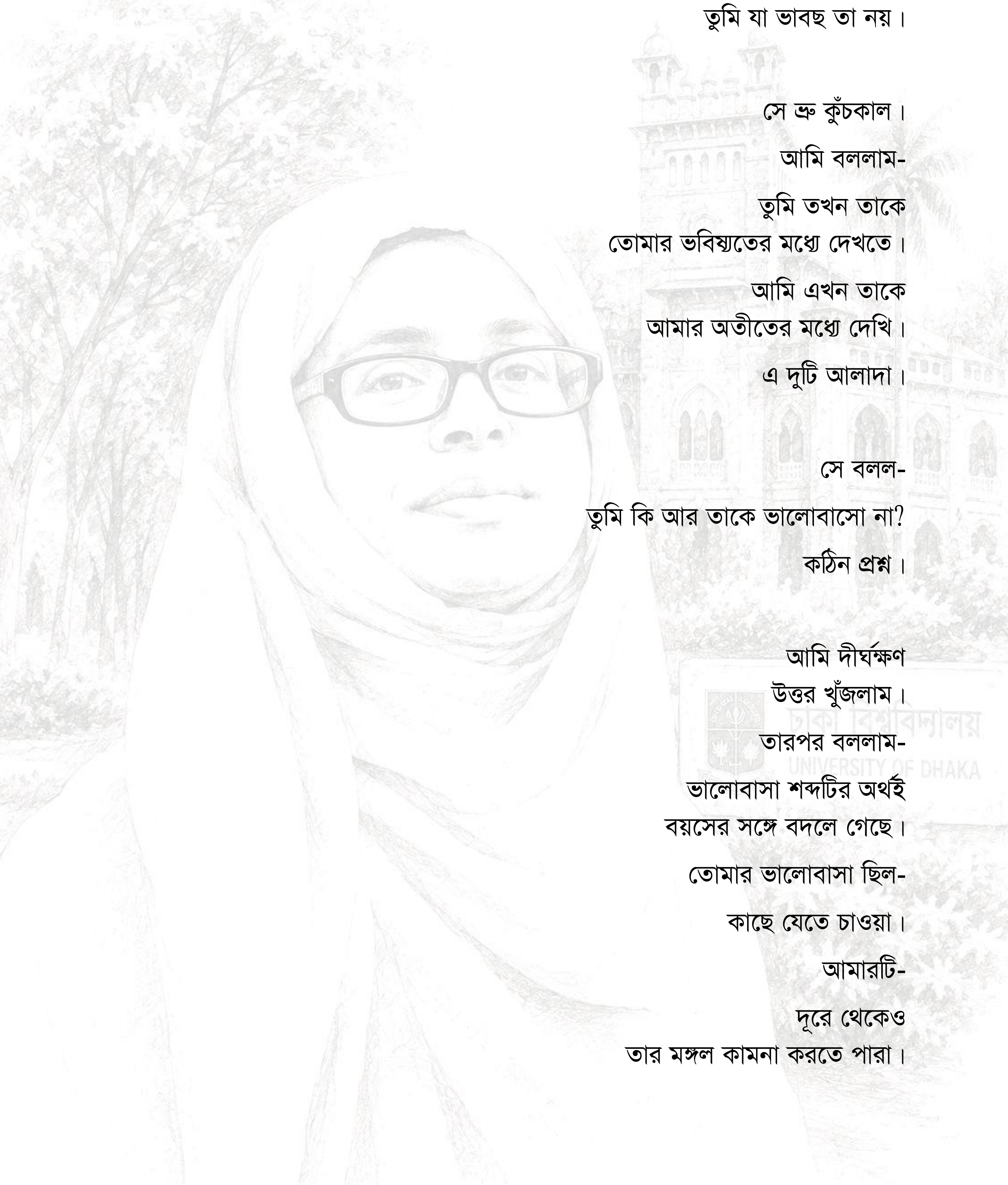

মনে থাকার অর্থ
তুমি যা ভাবছ তা নয়।

সে ভ্রু কুঁচকাল।
আমি বললাম-
তুমি তখন তাকে
তোমার ভবিষ্যতের মধ্যে দেখতে।
আমি এখন তাকে
আমার অতীতের মধ্যে দেখি।
এ দুটি আলাদা।

সে বলল-
তুমি কি আর তাকে ভালোবাসো না?
কঠিন প্রশ্ন।

আমি দীর্ঘক্ষণ
উত্তর খুঁজলাম।
তারপর বললাম-
ভালোবাসা শব্দটির অর্থই
বয়সের সঙ্গে বদলে গেছে।
তোমার ভালোবাসা ছিল-
কাছে যেতে চাওয়া।
আমারটি-
দূরে থেকেও
তার মঙ্গল কামনা করতে পারা।

তুমি বলতে-

আমাকে দেখো।

আমি বলি-

নিজের জীবনে ভালো থেকো।

তুমি বলতে-

আমাকে বুঝো।

আমি বলি-

আমাকে না বুঝলেও চলে।

তরুণটি
কেমন হতাশ হলো।

বলল-

তাহলে কবিতা কোথায়?

আমি হাসলাম।

বললাম-

এই তো কবিতা।

সব কবিতায়
আগুন থাকতে হয় না।
কোনো কোনো কবিতা
শেষ বিকেলের আলোর মতো-

শান্ত।

নরম।

দূরের।

সে আমার মুখের দিকে তাকাল।

বলল-

তুমি খুব বদলে গেছ।

আমি বললাম-

ত্রিশ বছর
মানুষকে বদলানোর জন্য
যথেষ্ট সময়।

আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম-

আর তুমি?

তুমি কেন বদলাওনি?

সে হেসে বলল-

কারণ আমি স্মৃতি।

আমার বয়স বাড়ে না।

কথাটি শুনে
আমার বুকের ভেতর
কেমন করে উঠল।

সত্যিই তো।

সে এখনও
সেই বয়সে আটকে আছে।
যে বয়সে প্রথম তোমাকে দেখেছিল।

আমি বৃদ্ধ হব।

আরও রেখা আসবে।

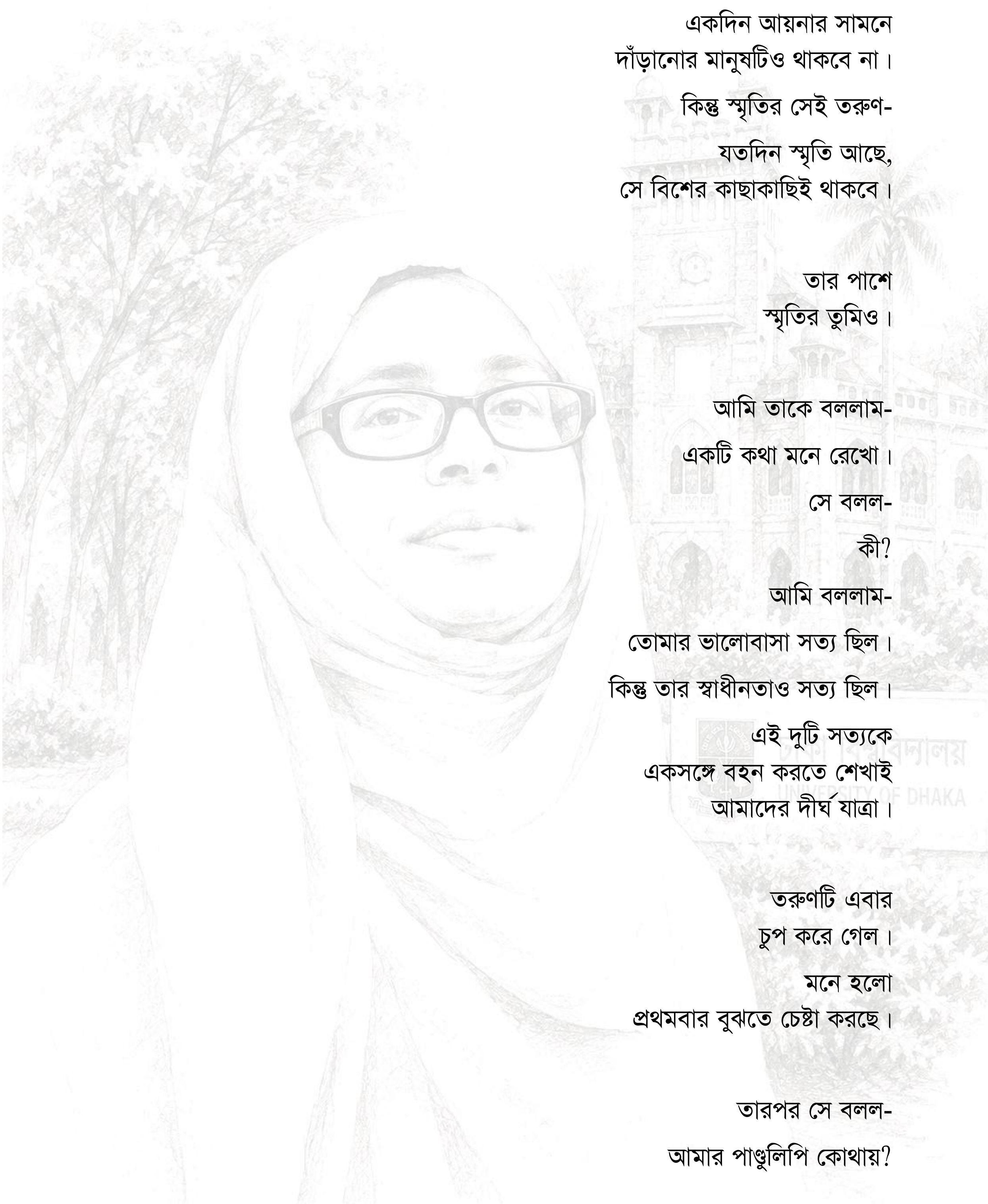

একদিন আয়নার সামনে
দাঁড়ানোর মানুষটিও থাকবে না।

কিন্তু স্মৃতির সেই তরুণ-

যতদিন স্মৃতি আছে,
সে বিশের কাছাকাছিই থাকবে।

তার পাশে
স্মৃতির তুমিও।

আমি তাকে বললাম-

একটি কথা মনে রেখো।

সে বলল-

কী?

আমি বললাম-

তোমার ভালোবাসা সত্য ছিল।

কিন্তু তার স্বাধীনতাও সত্য ছিল।

এই দুটি সত্যকে
একসঙ্গে বহন করতে শেখাই
আমাদের দীর্ঘ যাত্রা।

তরুণটি এবার
চুপ করে গেল।

মনে হলো
প্রথমবার বুঝতে চেষ্টা করছে।

তারপর সে বলল-

আমার পাণ্ডুলিপি কোথায়?

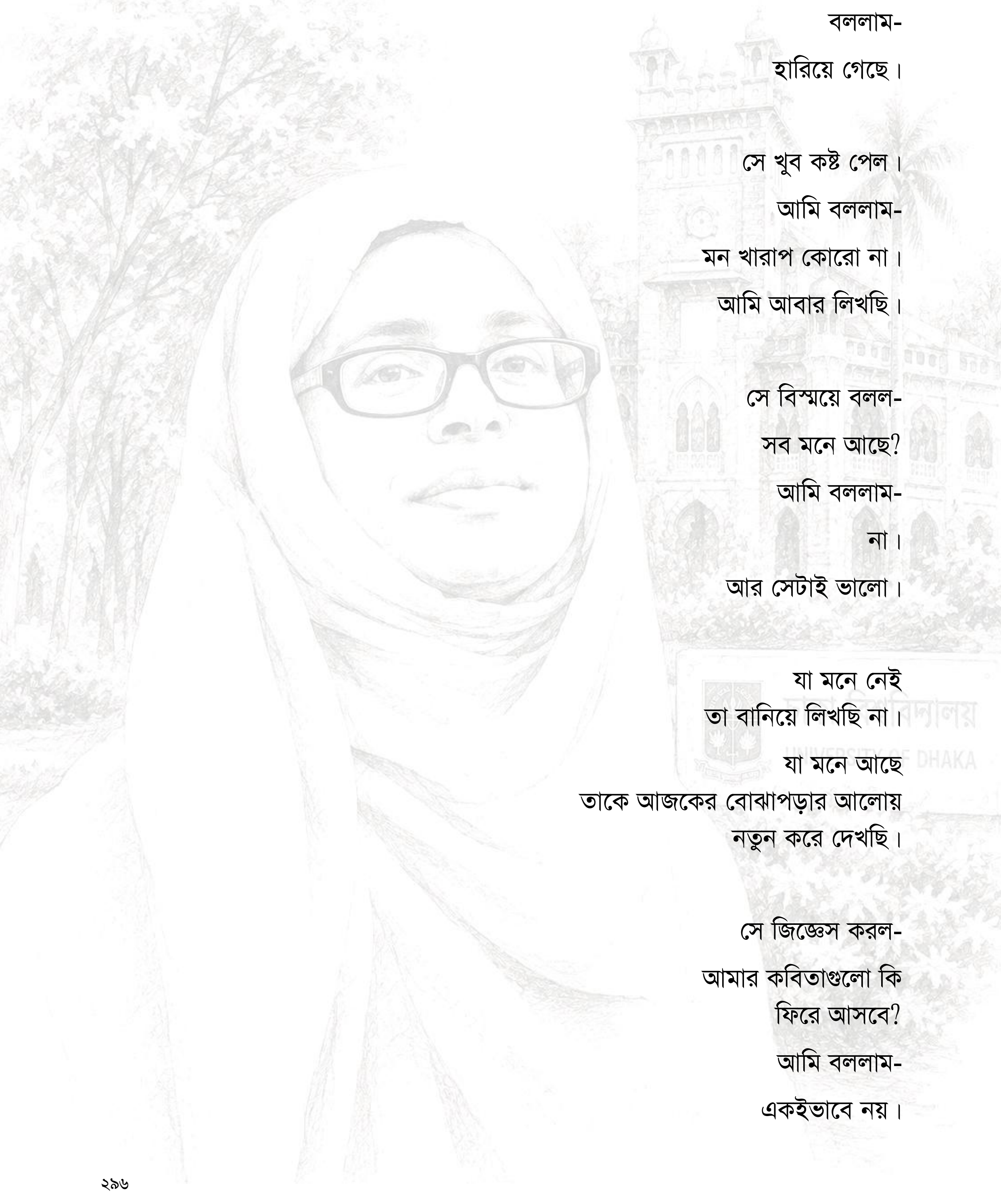

আমি চোখ নামালাম।

বললাম-

হারিয়ে গেছে।

সে খুব কষ্ট পেল।

আমি বললাম-

মন খারাপ কোরো না।

আমি আবার লিখছি।

সে বিস্ময়ে বলল-

সব মনে আছে?

আমি বললাম-

না।

আর সেটাই ভালো।

যা মনে নেই
তা বানিয়ে লিখছি না।

যা মনে আছে
তাকে আজকের বোঝাপড়ার আলোয়
নতুন করে দেখছি।

সে জিজ্ঞেস করল-

আমার কবিতাগুলো কি
ফিরে আসবে?

আমি বললাম-

একইভাবে নয়।

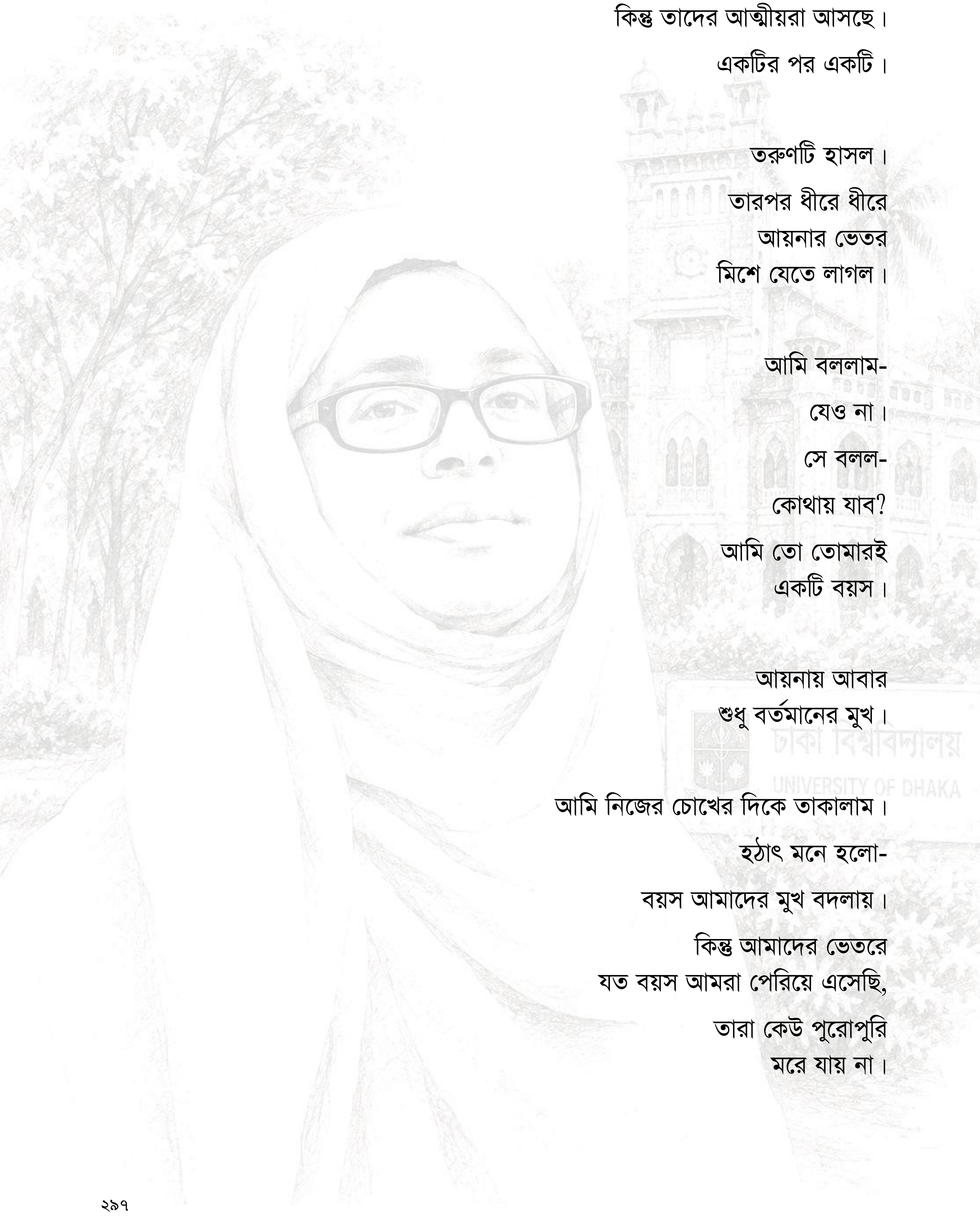

কিন্তু তাদের আত্মীয়রা আসছে।
একটির পর একটি।

তরুণটি হাসল।
তারপর ধীরে ধীরে
আয়নার ভেতর
মিশে যেতে লাগল।

আমি বললাম-
যেও না।
সে বলল-
কোথায় যাব?
আমি তো তোমারই
একটি বয়স।

আয়নায় আবার
শুধু বর্তমানের মুখ।

আমি নিজের চোখের দিকে তাকালাম।
হঠাৎ মনে হলো-
বয়স আমাদের মুখ বদলায়।
কিন্তু আমাদের ভেতরে
যত বয়স আমরা পেরিয়ে এসেছি,
তারা কেউ পুরোপুরি
মরে যায় না।

তাই আজ
এই প্রায় ষাটের মুখের ভেতর
আমি সেই তরুণটিকেও বহন করি-
যে একদিন তোমাকে দেখে
প্রথম কবিতা লিখেছিল।

আর আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে
তাকে শুধু এটুকু বলি-
"তুমি তাকে পেতে পারোনি বলে
তোমার ভালোবাসা ব্যর্থ হয়নি।
দেখো-
তোমার লেখা হারিয়ে গেছে,
তোমার যৌবন চলে গেছে,
তবু এত বছর পরে
আমি আবার তোমার হয়ে লিখছি।"

তোমারও কি বয়স বেড়েছে?

তোমারও কি বয়স বেড়েছে?

প্রশ্নটি লিখেই
নিজের অজান্তে হাসি।

কী ছেলেমানুষি প্রশ্ন!

সময় কি কাউকে
বাদ দিয়ে যায়?

অবশ্যই
তোমারও বয়স বেড়েছে।

আমার মতোই।

তবু আমার স্মৃতি
এই সহজ সত্যটি
সহজে মানতে চায় না।

তার কাছে তুমি এখনও
সেই বিশ্ববিদ্যালয়ের তরুণী।

তোমার চোখে
তখনকার আলো।

চুলে তখনকার সময়।

মুখে তারুণ্যের
স্বাভাবিক উজ্জ্বলতা।

চশমার আড়ালে
সেই পরিচিত দৃষ্টি।

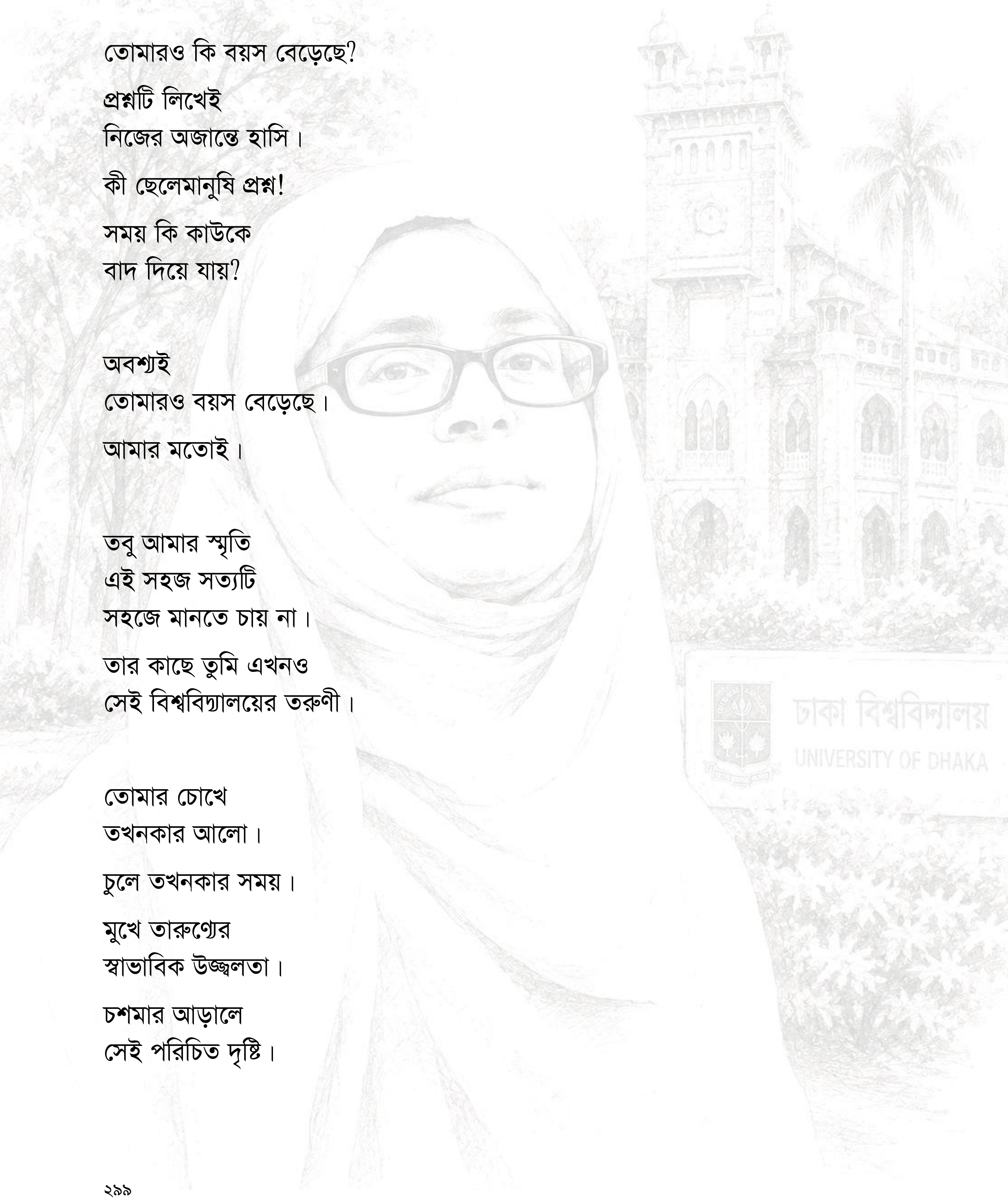

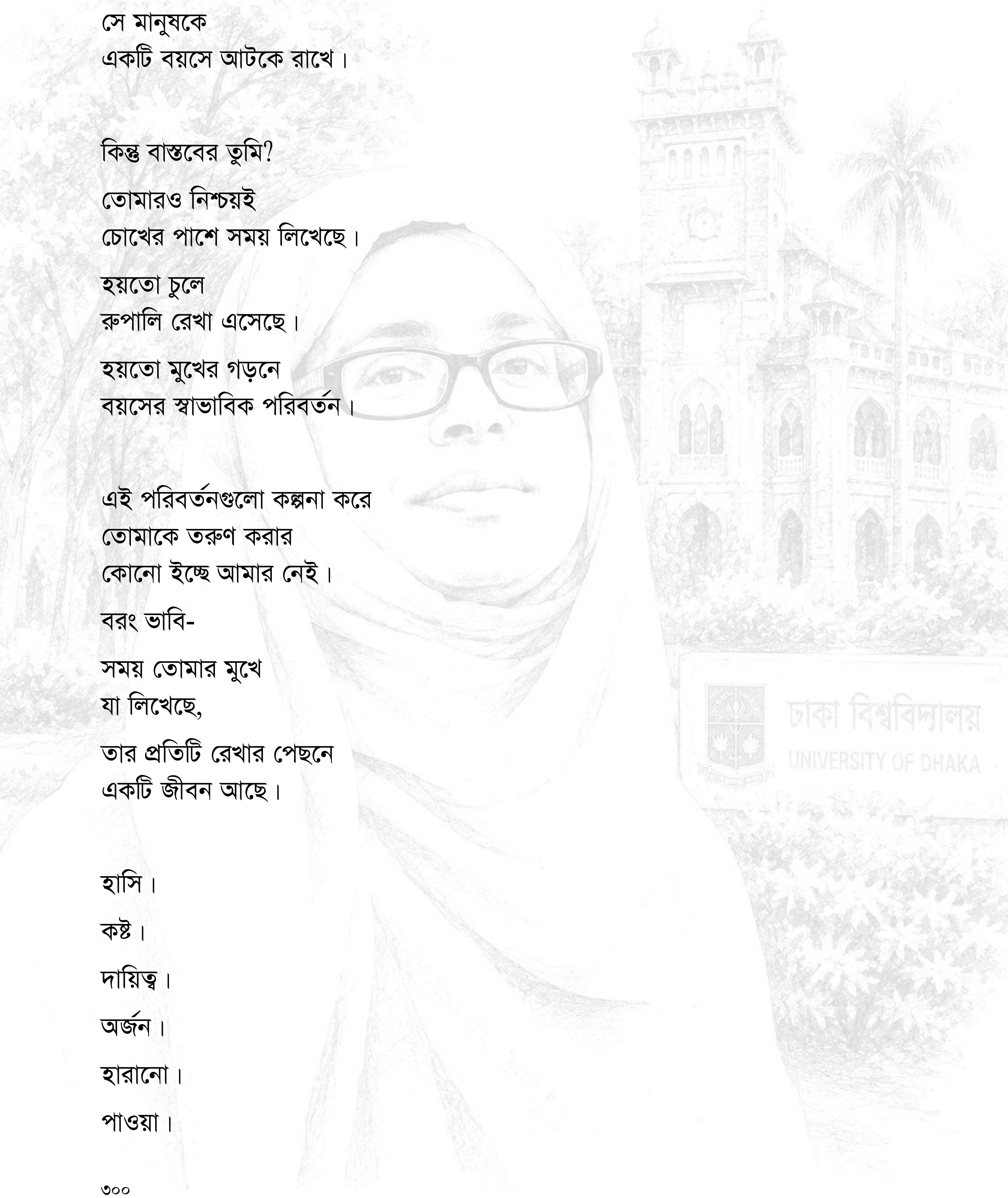

স্মৃতি নিষ্ঠুরভাবে সুন্দর।

সে মানুষকে
একটি বয়সে আটকে রাখে।

কিন্তু বাস্তবের তুমি?

তোমারও নিশ্চয়ই
চোখের পাশে সময় লিখেছে।

হয়তো চুলে
রুপালি রেখা এসেছে।

হয়তো মুখের গড়নে
বয়সের স্বাভাবিক পরিবর্তন।

এই পরিবর্তনগুলো কল্পনা করে
তোমাকে তরুণ করার
কোনো ইচ্ছে আমার নেই।

বরং ভাবি-

সময় তোমার মুখে
যা লিখেছে,

তার প্রতিটি রেখার পেছনে
একটি জীবন আছে।

হাসি।

কষ্ট।

দায়িত্ব।

অর্জন।

হারানো।

পাওয়া।

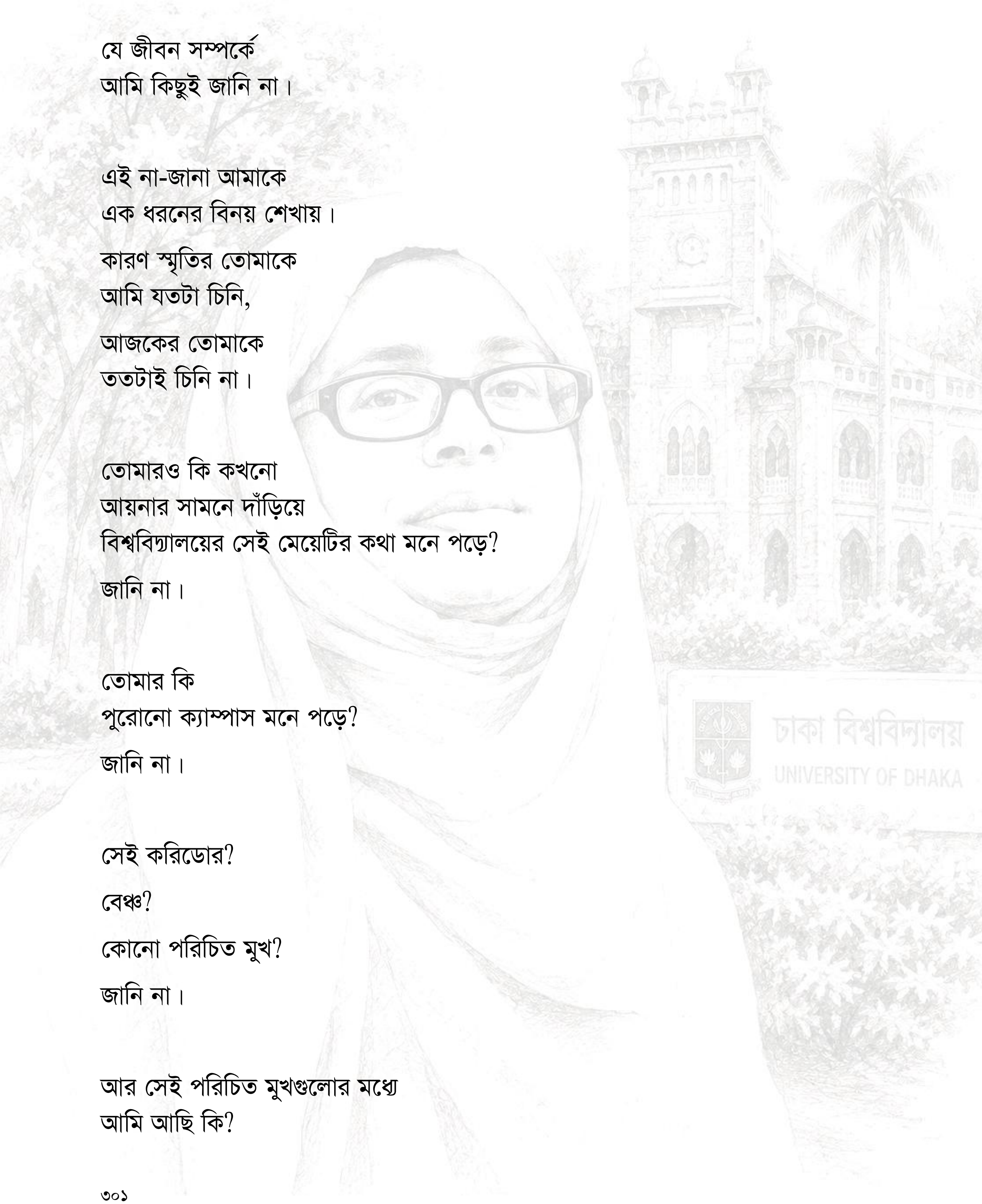

যে জীবন সম্পর্কে
আমি কিছুই জানি না।

এই না-জানা আমাকে
এক ধরনের বিনয় শেখায়।

কারণ স্মৃতির তোমাকে
আমি যতটা চিনি,

আজকের তোমাকে
ততটাই চিনি না।

তোমারও কি কখনো
আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে
বিশ্ববিদ্যালয়ের সেই মেয়েটির কথা মনে পড়ে?

জানি না।

তোমার কি
পুরোনো ক্যাম্পাস মনে পড়ে?

জানি না।

সেই করিডোর?

বেঞ্চ?

কোনো পরিচিত মুখ?

জানি না।

আর সেই পরিচিত মুখগুলোর মধ্যে
আমি আছি কি?

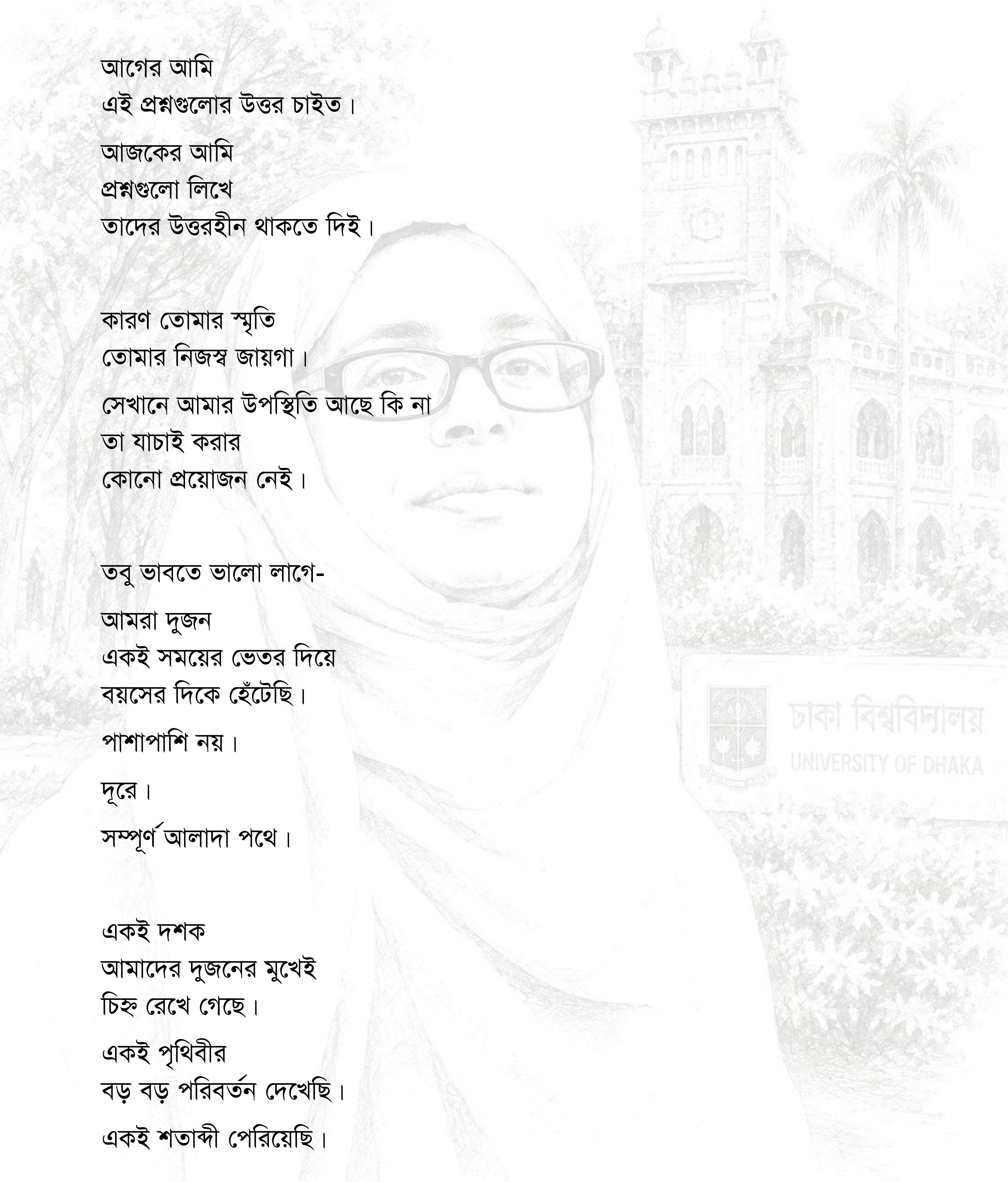

সেটিও জানি না।

আগের আমি
এই প্রশ্নগুলোর উত্তর চাইত।

আজকের আমি
প্রশ্নগুলো লিখে
তাদের উত্তরহীন থাকতে দিই।

কারণ তোমার স্মৃতি
তোমার নিজস্ব জায়গা।

সেখানে আমার উপস্থিতি আছে কি না
তা যাচাই করার
কোনো প্রয়োজন নেই।

তবু ভাবতে ভালো লাগে-

আমরা দুজন
একই সময়ের ভেতর দিয়ে
বয়সের দিকে হেঁটেছি।

পাশাপাশি নয়।

দূরে।

সম্পূর্ণ আলাদা পথে।

একই দশক
আমাদের দুজনের মুখেই
চিহ্ন রেখে গেছে।

একই পৃথিবীর
বড় বড় পরিবর্তন দেখেছি।

একই শতাব্দী পেরিয়েছি।

তুমি তোমার জীবন নিয়ে।

আমি আমার।

এ যেন দুটি নদী-

কোনো এক তরুণ ভূগোলে
খুব কাছাকাছি এসেছিল,

তারপর আলাদা হয়ে
দূর দূরান্তে বয়ে গেছে।

আজ নদী দুটির জল
আর সেই জল নয়।

তবু মানচিত্রে
একটি পুরোনো বাঁকের স্মৃতি আছে।

কখনো ভাবি-

হঠাৎ যদি তোমাকে দেখি,
আমার স্মৃতি কি
তোমার বর্তমান মুখকে গ্রহণ করতে পারবে?

আমি চাইবে পারুক।

আমি যেন
তোমার মুখে বয়স দেখে
পুরোনো মুখ খুঁজতে না যাই।

বরং আজকের তোমাকে
আজকের মতোই দেখি।

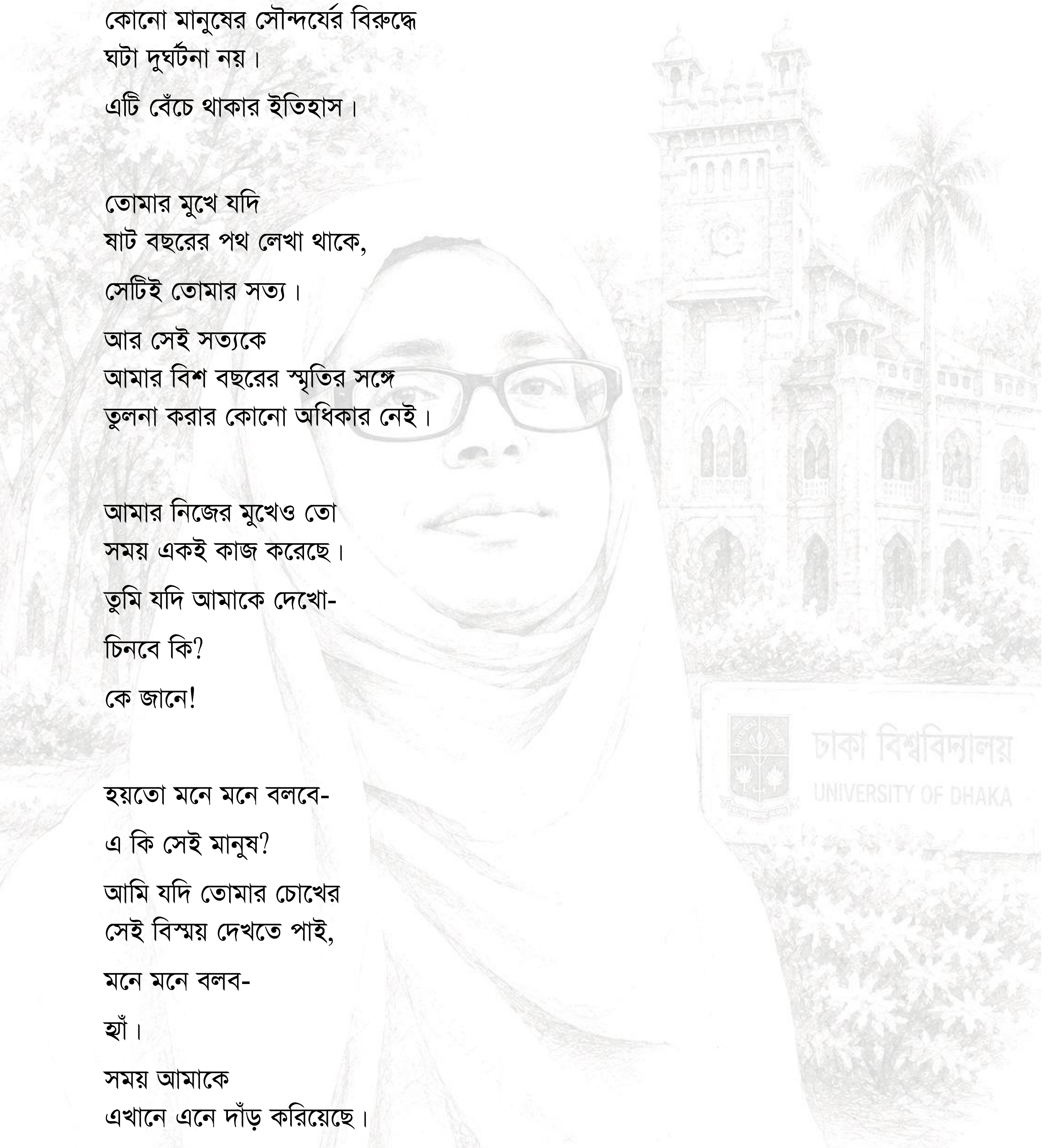

কারণ বয়স
কোনো মানুষের সৌন্দর্যের বিরুদ্ধে
ঘটা দুর্ঘটনা নয়।

এটি বেঁচে থাকার ইতিহাস।

তোমার মুখে যদি
ষাট বছরের পথ লেখা থাকে,

সেটিই তোমার সত্য।

আর সেই সত্যকে
আমার বিশ বছরের স্মৃতির সঙ্গে
তুলনা করার কোনো অধিকার নেই।

আমার নিজের মুখেও তো
সময় একই কাজ করেছে।

তুমি যদি আমাকে দেখো-

চিনবে কি?

কে জানে!

হয়তো মনে মনে বলবে-

এ কি সেই মানুষ?

আমি যদি তোমার চোখের
সেই বিস্ময় দেখতে পাই,

মনে মনে বলব-

হ্যাঁ।

সময় আমাকে
এখানে এনে দাঁড় করিয়েছে।

তোমাকেও।

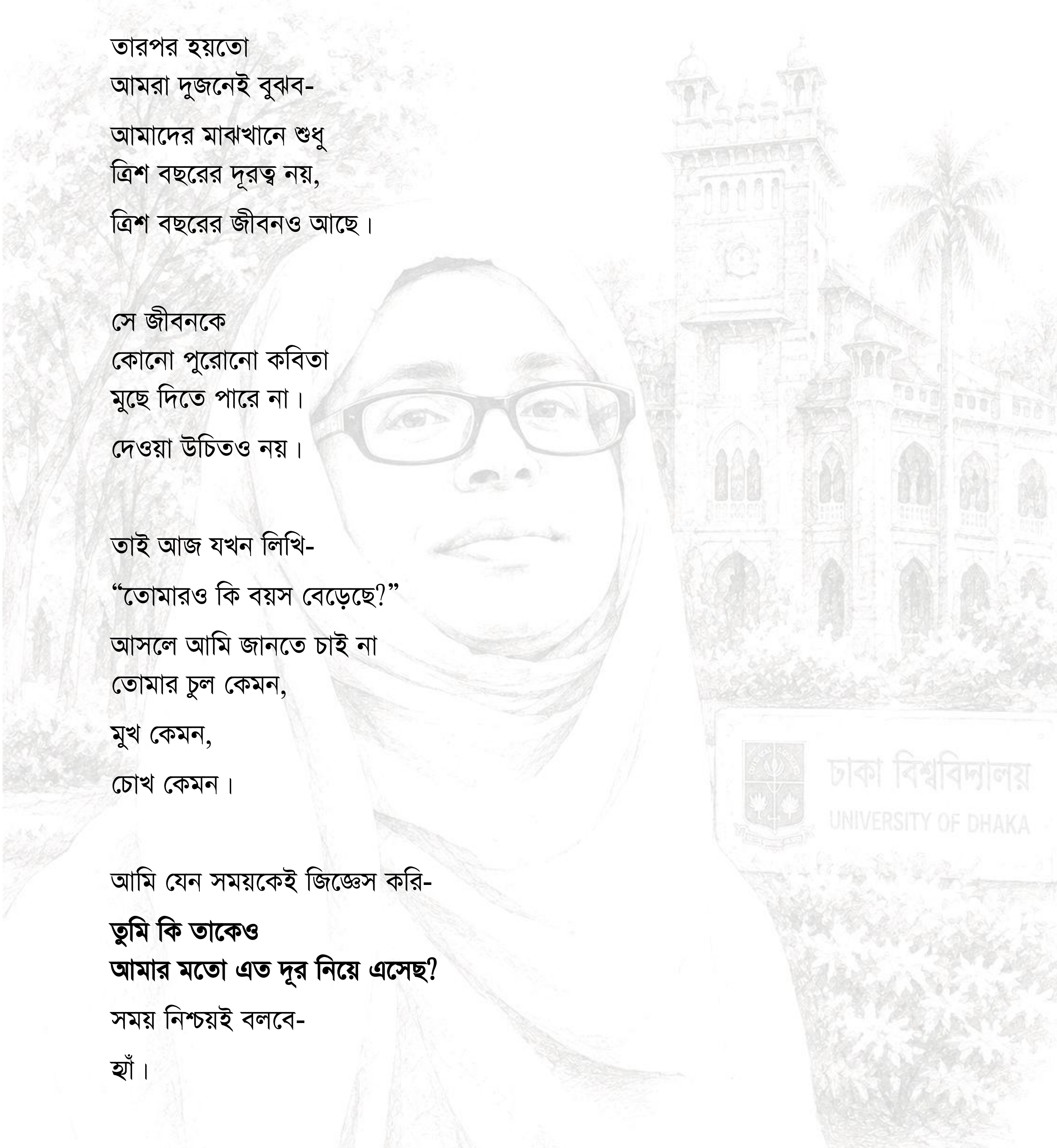

তারপর হয়তো
আমরা দুজনেই বুঝব-
আমাদের মাঝখানে শুধু
ত্রিশ বছরের দূরত্ব নয়,
ত্রিশ বছরের জীবনও আছে।

সে জীবনকে
কোনো পুরোনো কবিতা
মুছে দিতে পারে না।
দেওয়া উচিতও নয়।

তাই আজ যখন লিখি-
"তোমারও কি বয়স বেড়েছে?"
আসলে আমি জানতে চাই না
তোমার চুল কেমন,
মুখ কেমন,
চোখ কেমন।

আমি যেন সময়কেই জিজ্ঞেস করি-
তুমি কি তাকেও
আমার মতো এত দূর নিয়ে এসেছ?
সময় নিশ্চয়ই বলবে-
হ্যাঁ।

তখন আমি বলব-

ভালো।

তাকে আরও পথ দিও।

আরও সকাল।

আরও শান্ত বিকেল।

আরও প্রিয় মানুষের সঙ্গ।

আমার সঙ্গে নয়।

তার নিজের জীবনে।

কারণ এত বছর পরে
তোমাকে নিয়ে আমার সবচেয়ে কোমল আকাঙ্ক্ষা
আর তোমার কাছে থাকা নয়-

তুমি যেন ভালো থাকো।

আর যদি কোনোদিন
আমাদের বয়সের মুখ
হঠাৎ মুখোমুখি হয়,

আমি স্মৃতির তরুণীটিকে
তোমার ওপর চাপিয়ে দেব না।

আমি দেখব-

একজন মানুষকে,

যিনি আমার মতোই
দীর্ঘ একটি জীবন হেঁটে
এই বয়সে এসে পৌঁছেছেন।

তারপর হয়তো মনে মনে
সেই বিশ বছরের আমিকে বলব-

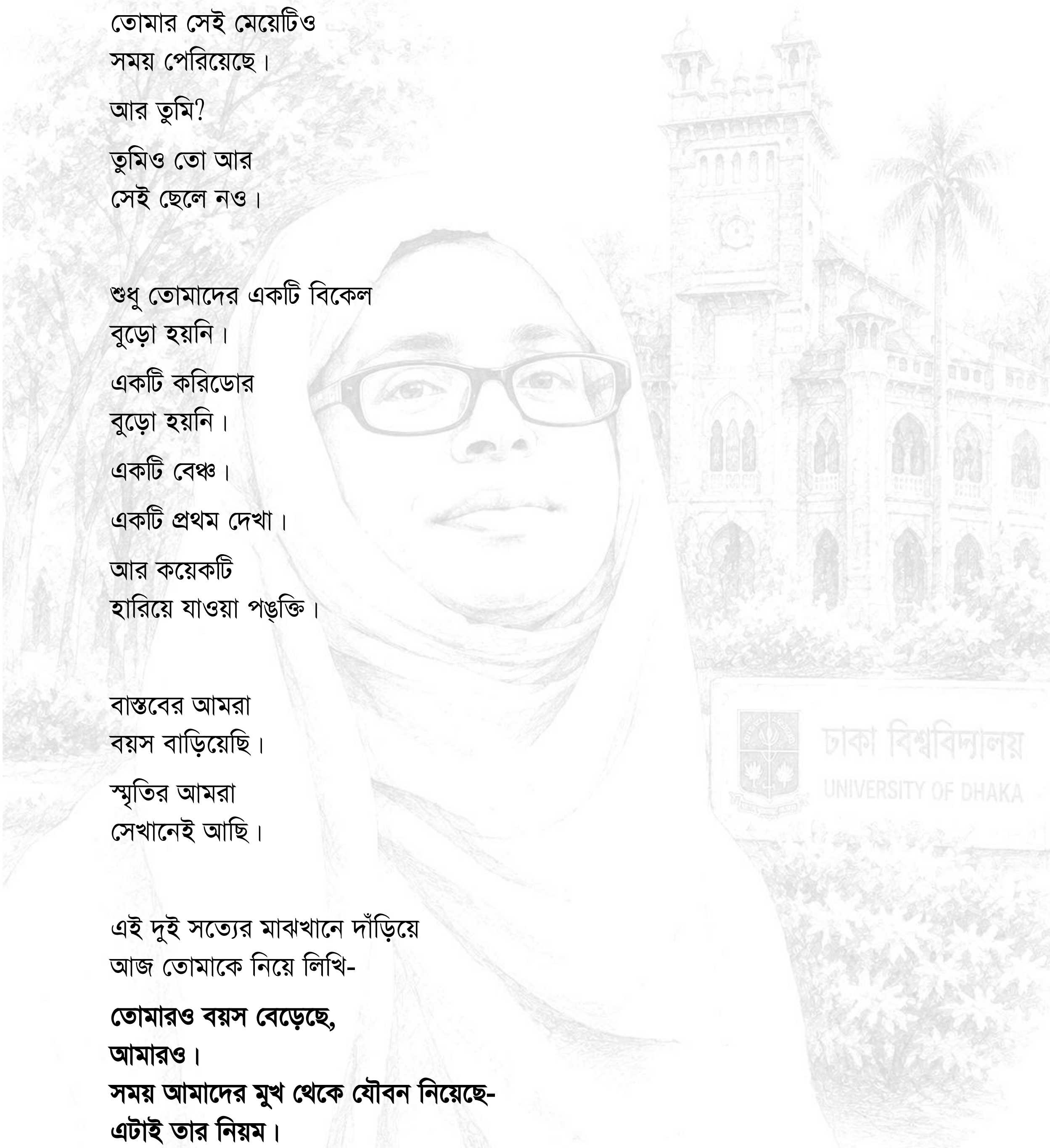

দেখো,

তোমার সেই মেয়েটিও
সময় পেরিয়েছে।

আর তুমি?

তুমিও তো আর
সেই ছেলে নও।

শুধু তোমাদের একটি বিকেল
বুড়ো হয়নি।

একটি করিডোর
বুড়ো হয়নি।

একটি বেঞ্চ।

একটি প্রথম দেখা।

আর কয়েকটি
হারিয়ে যাওয়া পঙ্‌ক্তি।

বাস্তবের আমরা
বয়স বাড়িয়েছি।

স্মৃতির আমরা
সেখানেই আছি।

এই দুই সত্যের মাঝখানে দাঁড়িয়ে
আজ তোমাকে নিয়ে লিখি-

তোমারও বয়স বেড়েছে,
আমারও।
সময় আমাদের মুখ থেকে যৌবন নিয়েছে-
এটাই তার নিয়ম।
কিন্তু আমার জীবনের যে সকালে

তোমাকে প্রথম দেখেছিলাম,
সেই সকালটির বয়স আজও বাড়েনি।

সেখানে তুমি এখনও হেঁটে যাচ্ছ।
সেখানে আমি এখনও তাকিয়ে আছি।
আর পৃথিবীর সমস্ত ঘড়ি এগিয়ে গেলেও
সেই একটি মুহূর্ত
আজও ১৯৯০ সালেই থেমে আছে।

স্মৃতিতে তোমার বয়স বাড়ে না

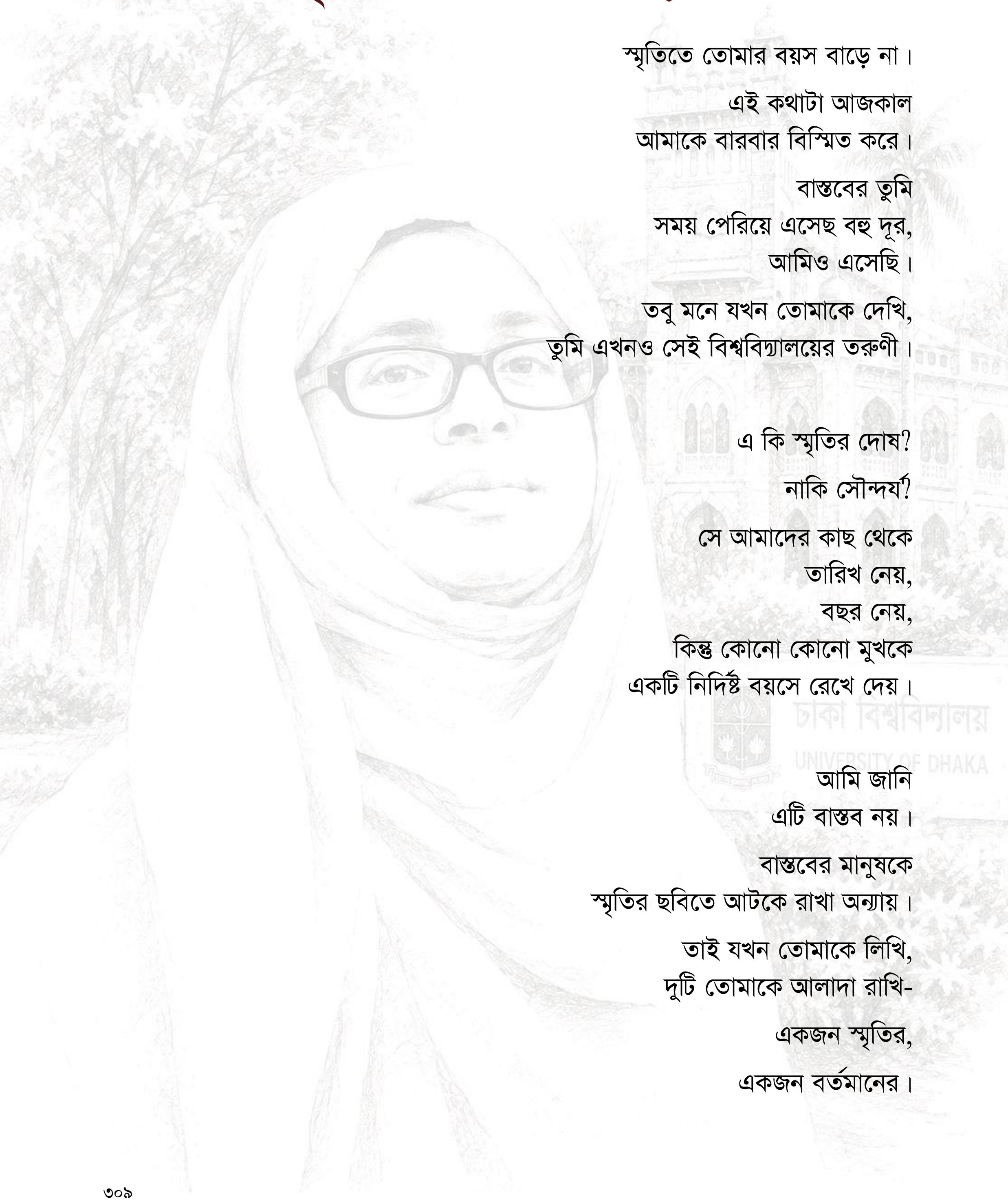

স্মৃতিতে তোমার বয়স বাড়ে না।

এই কথাটা আজকাল
আমাকে বারবার বিস্মিত করে।

বাস্তবের তুমি
সময় পেরিয়ে এসেছ বহু দূর,
আমিও এসেছি।

তবু মনে যখন তোমাকে দেখি,
তুমি এখনও সেই বিশ্ববিদ্যালয়ের তরুণী।

এ কি স্মৃতির দোষ?

নাকি সৌন্দর্য?

সে আমাদের কাছ থেকে
তারিখ নেয়,
বছর নেয়,
কিন্তু কোনো কোনো মুখকে
একটি নির্দিষ্ট বয়সে রেখে দেয়।

আমি জানি
এটি বাস্তব নয়।

বাস্তবের মানুষকে
স্মৃতির ছবিতে আটকে রাখা অন্যায়।

তাই যখন তোমাকে লিখি,
দুটি তোমাকে আলাদা রাখি-

একজন স্মৃতির,

একজন বর্তমানের।

স্মৃতির তুমি
আমার পরিচিত।

বর্তমানের তুমি
নিজের জীবনের মানুষ।

আমি তাকে চিনি না।

এই স্বীকারোক্তি
আমাকে মুক্তও করে।

কারণ তাহলে
আমাকে আর কল্পনা দিয়ে
তোমার আজকের জীবন পূর্ণ করতে হয় না।

আমি শুধু যতটুকু সত্যিই মনে আছে
ততটুকুই লিখি।

স্মৃতির তুমি
ক্যাম্পাসে হাঁটো।

বই হাতে।

চোখে তারুণ্যের আলো।

হয়তো চুলে বাতাস।

হয়তো কোনো বন্ধুর কথায় হাসি।

সেই দৃশ্যের মধ্যে
কোনো বয়সের ভয় নেই।

কোনো বিচ্ছেদ নেই।

কোনো দীর্ঘ দূরত্ব নেই।

শুধু প্রথম দিকের সময়।

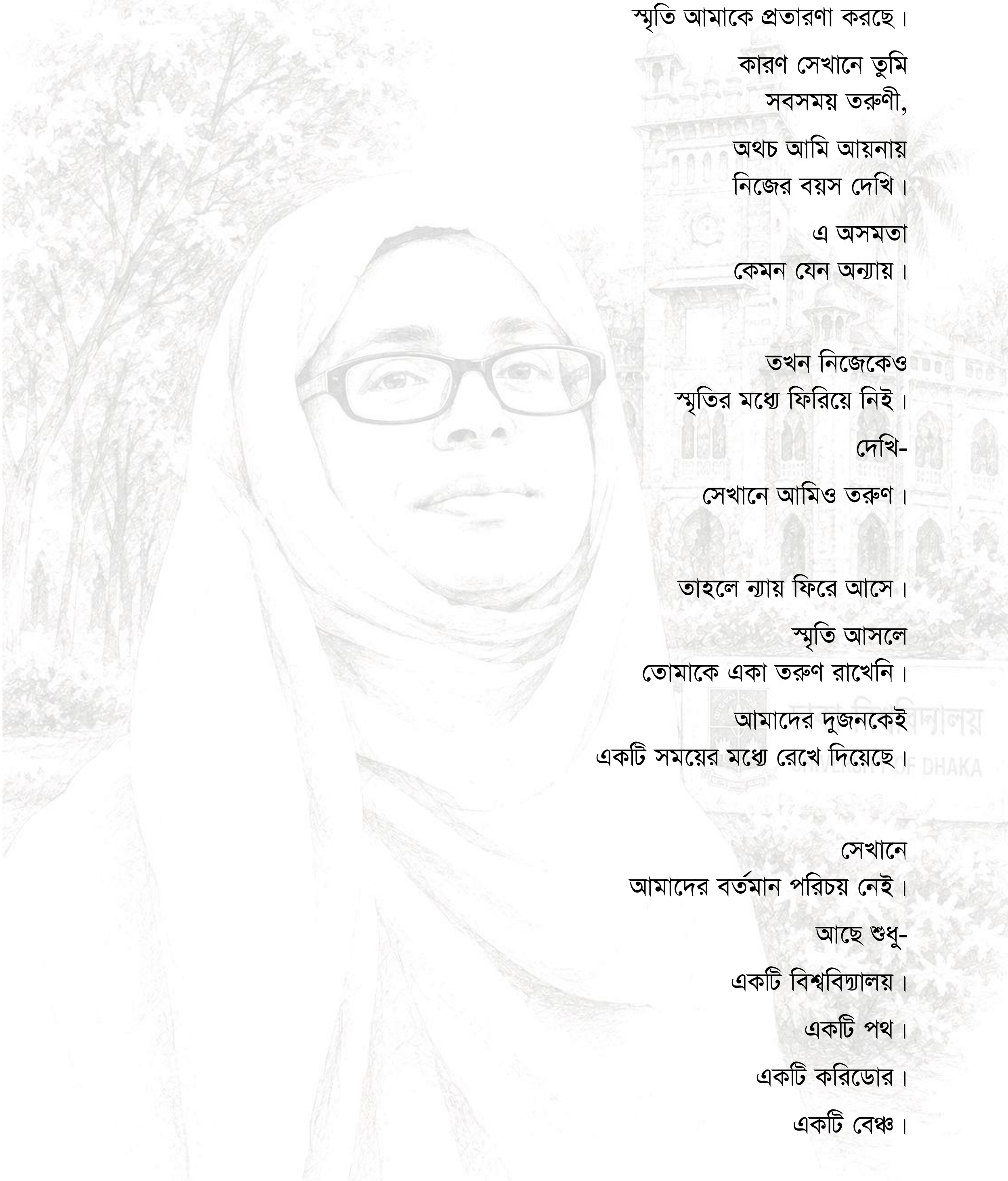

কখনো মনে হয়
স্মৃতি আমাকে প্রতারণা করছে।

কারণ সেখানে তুমি
সবসময় তরুণী,

অথচ আমি আয়নায়
নিজের বয়স দেখি।

এ অসমতা
কেমন যেন অন্যায়।

তখন নিজেকেও
স্মৃতির মধ্যে ফিরিয়ে নিই।

দেখি-
সেখানে আমিও তরুণ।

তাহলে ন্যায় ফিরে আসে।

স্মৃতি আসলে
তোমাকে একা তরুণ রাখেনি।

আমাদের দুজনকেই
একটি সময়ের মধ্যে রেখে দিয়েছে।

সেখানে
আমাদের বর্তমান পরিচয় নেই।

আছে শুধু-
একটি বিশ্ববিদ্যালয়।
একটি পথ।
একটি করিডোর।
একটি বেঞ্চ।

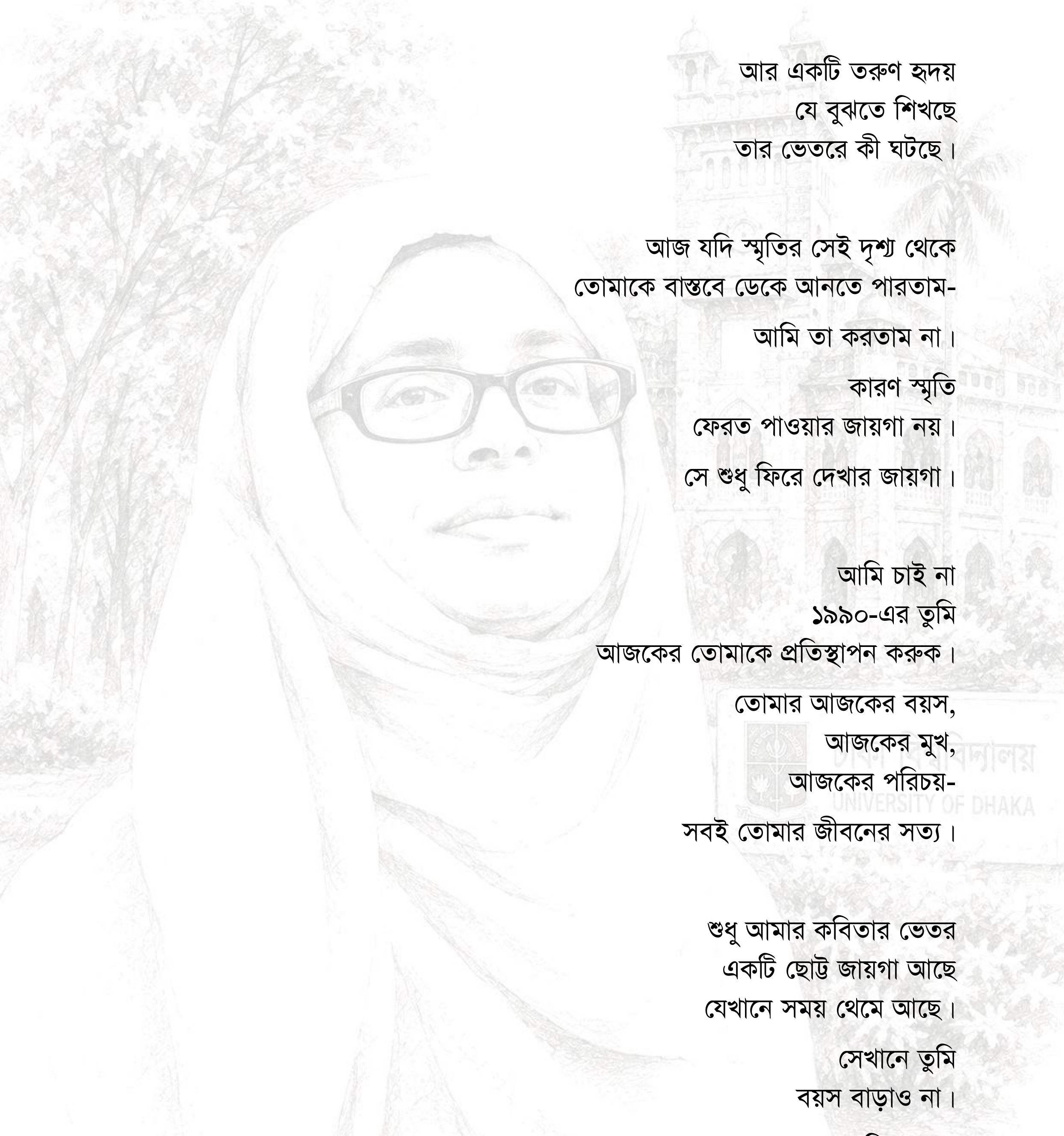

কিছু না-বলা কথা।

আর একটি তরুণ হৃদয়
যে বুঝতে শিখছে
তার ভেতরে কী ঘটছে।

আজ যদি স্মৃতির সেই দৃশ্য থেকে
তোমাকে বাস্তবে ডেকে আনতে পারতাম-
আমি তা করতাম না।
কারণ স্মৃতি
ফেরত পাওয়ার জায়গা নয়।
সে শুধু ফিরে দেখার জায়গা।

আমি চাই না
১৯৯০-এর তুমি
আজকের তোমাকে প্রতিস্থাপন করুক।
তোমার আজকের বয়স,
আজকের মুখ,
আজকের পরিচয়-
সবই তোমার জীবনের সত্য।

শুধু আমার কবিতার ভেতর
একটি ছোট্ট জায়গা আছে
যেখানে সময় থেমে আছে।
সেখানে তুমি
বয়স বাড়াও না।
আমি-ও না।

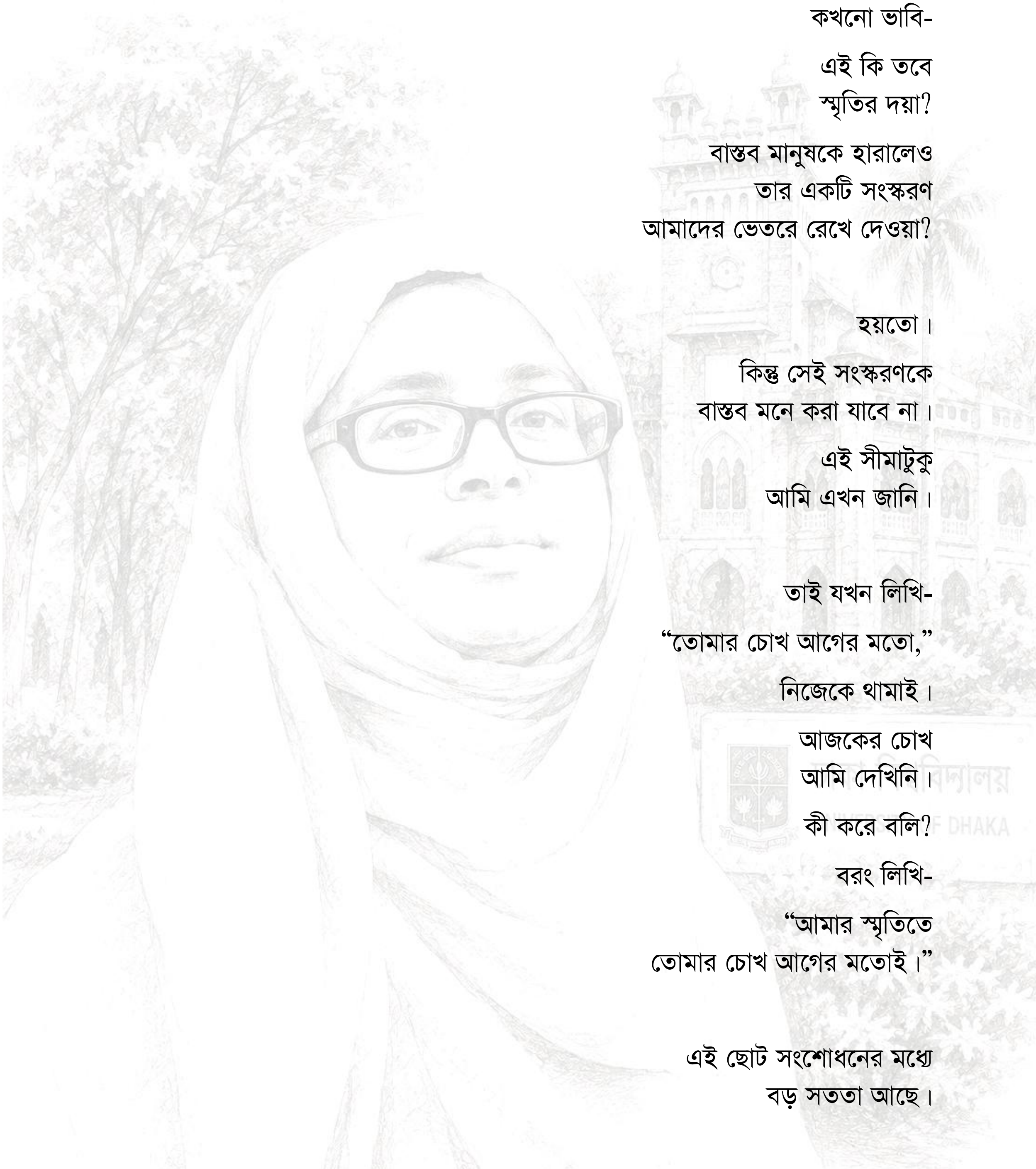

কখনো ভাবি-

এই কি তবে
স্মৃতির দয়া?

বাস্তব মানুষকে হারালেও
তার একটি সংস্করণ
আমাদের ভেতরে রেখে দেওয়া?

হয়তো।

কিন্তু সেই সংস্করণকে
বাস্তব মনে করা যাবে না।

এই সীমাটুকু
আমি এখন জানি।

তাই যখন লিখি-

"তোমার চোখ আগের মতো,"

নিজেকে থামাই।

আজকের চোখ
আমি দেখিনি।

কী করে বলি?

বরং লিখি-

"আমার স্মৃতিতে
তোমার চোখ আগের মতোই।"

এই ছোট সংশোধনের মধ্যে
বড় সততা আছে।

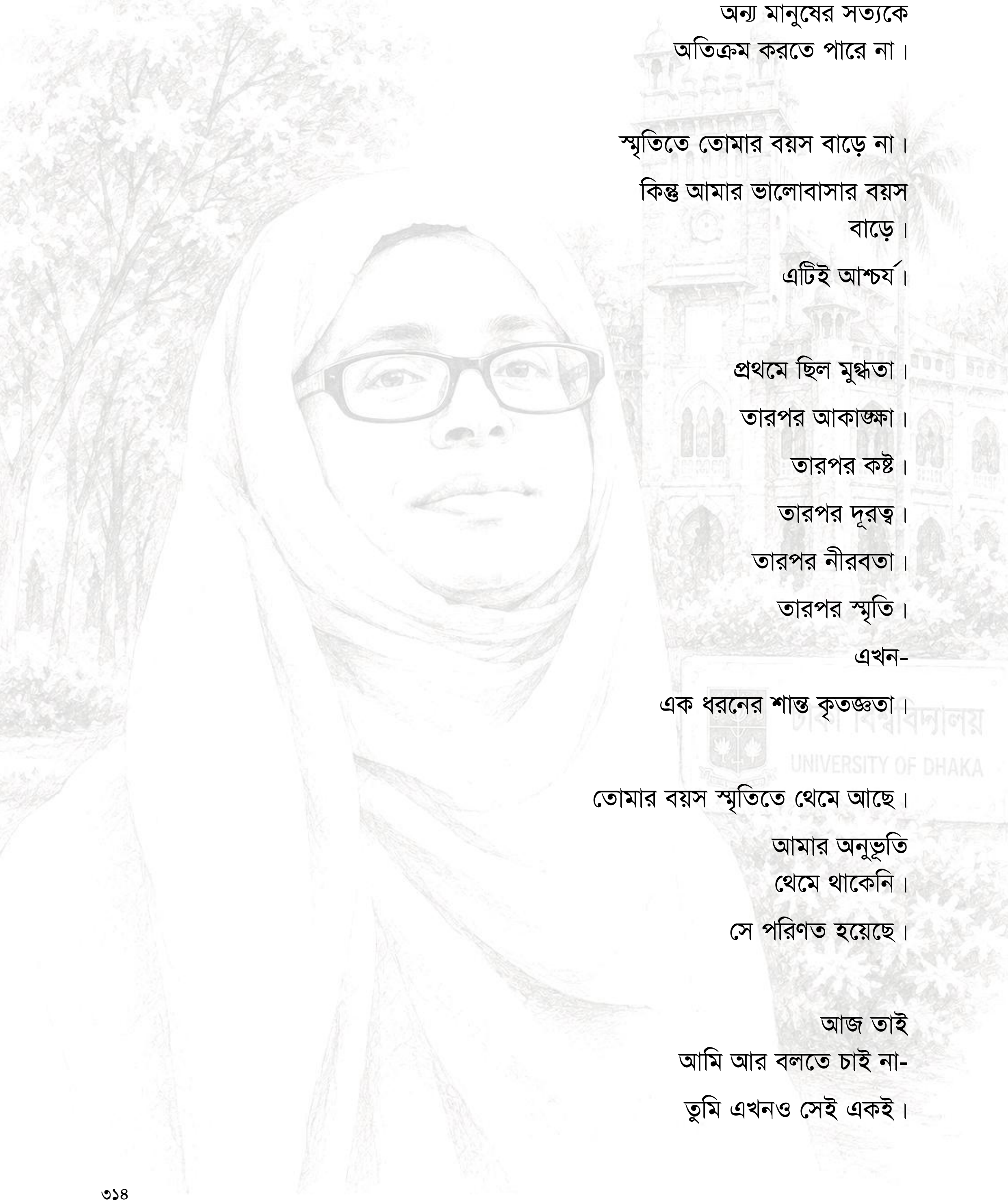

কারণ কবিতাও
অন্য মানুষের সত্যকে
অতিক্রম করতে পারে না।

স্মৃতিতে তোমার বয়স বাড়ে না।
কিন্তু আমার ভালোবাসার বয়স
বাড়ে।
এটিই আশ্চর্য।

প্রথমে ছিল মুগ্ধতা।
তারপর আকাঙ্ক্ষা।
তারপর কষ্ট।
তারপর দূরত্ব।
তারপর নীরবতা।
তারপর স্মৃতি।
এখন-
এক ধরনের শান্ত কৃতজ্ঞতা।

তোমার বয়স স্মৃতিতে থেমে আছে।
আমার অনুভূতি
থেমে থাকেনি।
সে পরিণত হয়েছে।

আজ তাই
আমি আর বলতে চাই না-
তুমি এখনও সেই একই।

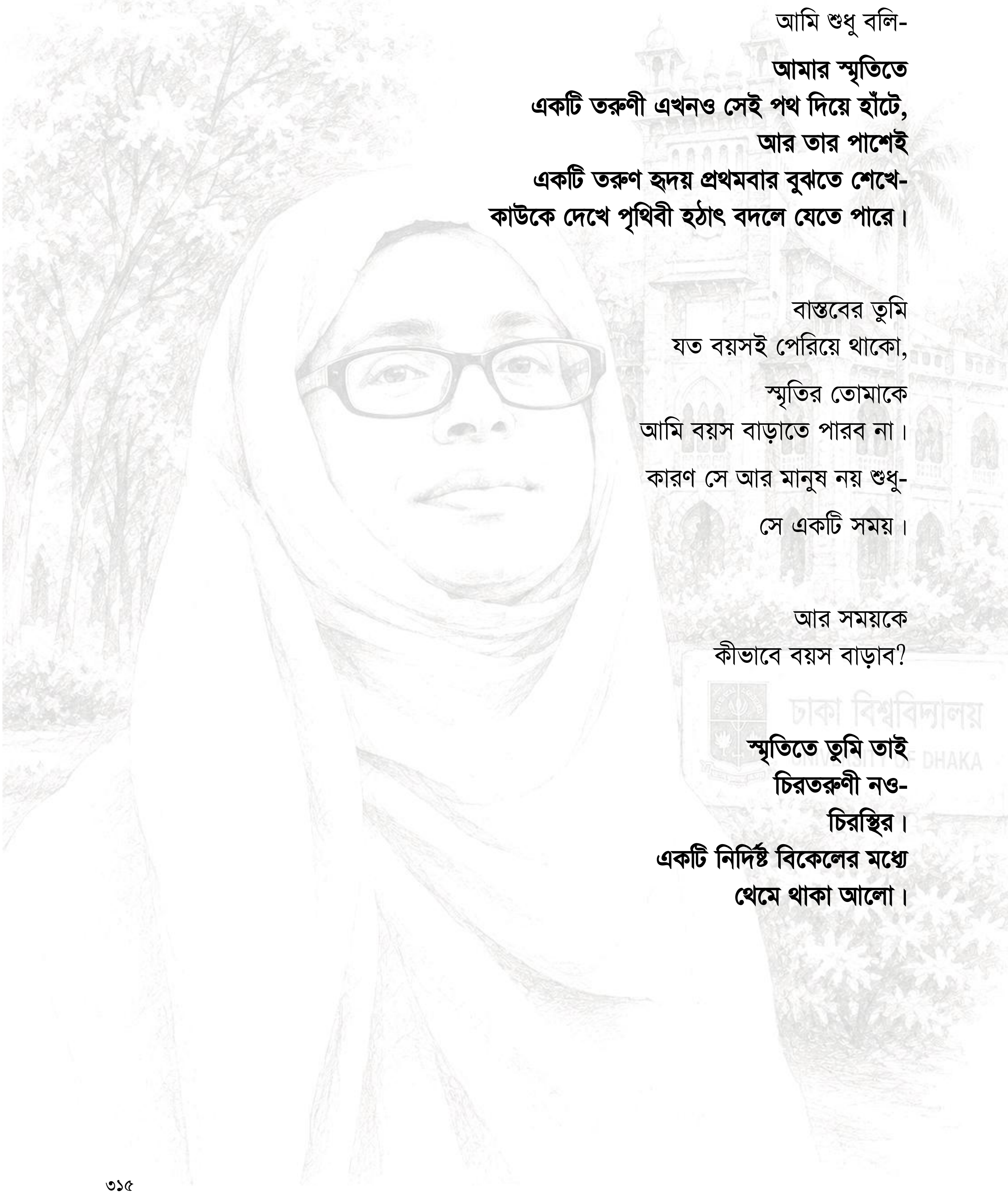

মানুষ একই থাকে না।

আমি শুধু বলি-

আমার স্মৃতিতে
একটি তরুণী এখনও সেই পথ দিয়ে হাঁটে,
আর তার পাশেই
একটি তরুণ হৃদয় প্রথমবার বুঝতে শেখে-
কাউকে দেখে পৃথিবী হঠাৎ বদলে যেতে পারে।

বাস্তবের তুমি
যত বয়সই পেরিয়ে থাকো,

স্মৃতির তোমাকে
আমি বয়স বাড়াতে পারব না।

কারণ সে আর মানুষ নয় শুধু-

সে একটি সময়।

আর সময়কে
কীভাবে বয়স বাড়াব?

স্মৃতিতে তুমি তাই
চিরতরুণী নও-
চিরস্থির।
একটি নির্দিষ্ট বিকেলের মধ্যে
থেমে থাকা আলো।

যদি আজ তোমাকে দেখি

যদি আজ তোমাকে দেখি-

প্রথমে কী করব?

চোখ নামিয়ে নেব
যেমন একদিন নিতাম?

নাকি তাকিয়ে থাকব
অবাক হয়ে?

ত্রিশ বছরের বেশি সময়
কোনো মুখকে না-দেখার পরে
আবার দেখা-

এ কি সত্যিই
সাধারণ দেখা হতে পারে?

হয়তো প্রথম মুহূর্তে
আমি তোমাকে চিনতেই পারব না।

চোখ যাবে।

ফিরে আসবে।

কিছু যেন পরিচিত লাগবে।

তারপর সময়ের ওপর দিয়ে
একটি পুরোনো ছবি
হঠাৎ জেগে উঠবে।

মনে হবে-

তুমি?

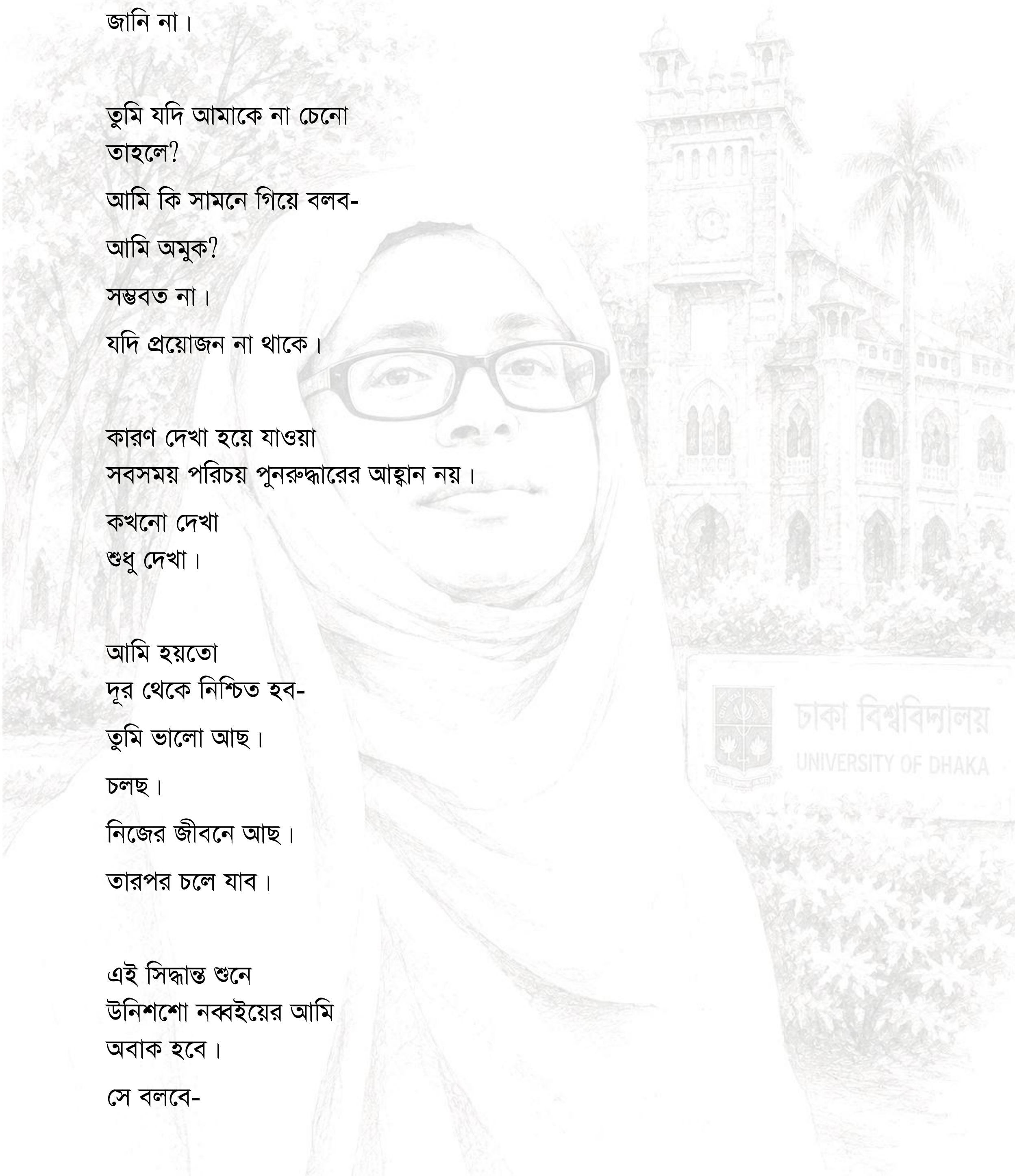

কিন্তু আমি উচ্চারণ করব কি?

জানি না।

তুমি যদি আমাকে না চেনো
তাহলে?

আমি কি সামনে গিয়ে বলব-

আমি অমুক?

সম্ভবত না।

যদি প্রয়োজন না থাকে।

কারণ দেখা হয়ে যাওয়া
সবসময় পরিচয় পুনরুদ্ধারের আহ্বান নয়।

কখনো দেখা
শুধু দেখা।

আমি হয়তো
দূর থেকে নিশ্চিত হব-

তুমি ভালো আছ।

চলছ।

নিজের জীবনে আছ।

তারপর চলে যাব।

এই সিদ্ধান্ত শুনে
উনিশশো নব্বইয়ের আমি
অবাক হবে।

সে বলবে-

এত বছর পরে দেখলে
কথা বলবে না?

আমি বলব-

সব ইচ্ছা অনুসরণ করাই
সঠিক নয়।

সে বলবে-

কিন্তু আমি তো
এতদিন অপেক্ষা করেছি!

আমি বলব-

না।

তুমি অপেক্ষা করনি।

তুমি বেঁচেছ।

এই পার্থক্য ভুলে যেও না।

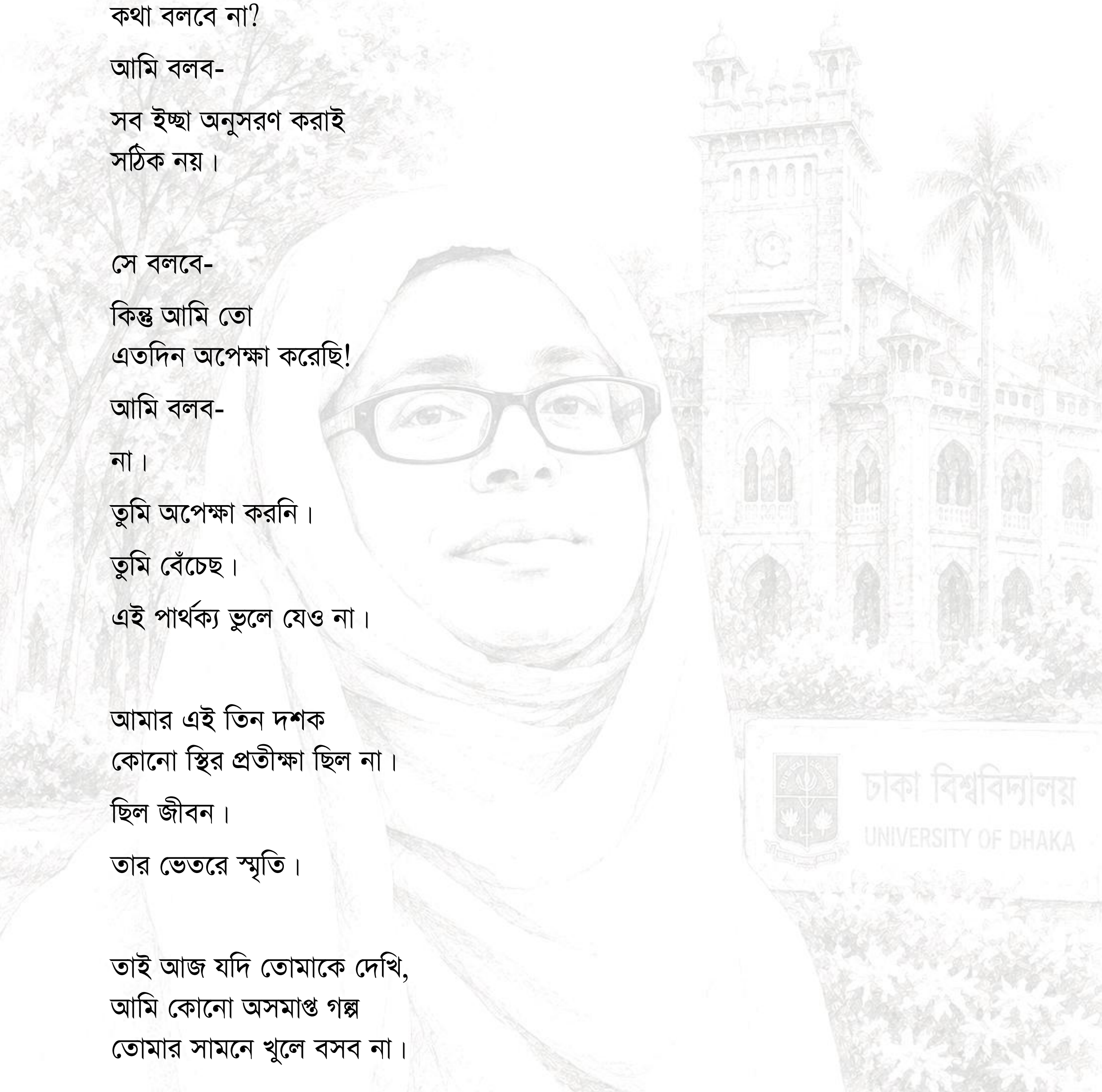

আমার এই তিন দশক
কোনো স্থির প্রতীক্ষা ছিল না।

ছিল জীবন।

তার ভেতরে স্মৃতি।

তাই আজ যদি তোমাকে দেখি,
আমি কোনো অসমাপ্ত গল্প
তোমার সামনে খুলে বসব না।

আমার কবিতার ভার
তোমার হাতে তুলে দেব না।

বলব না-

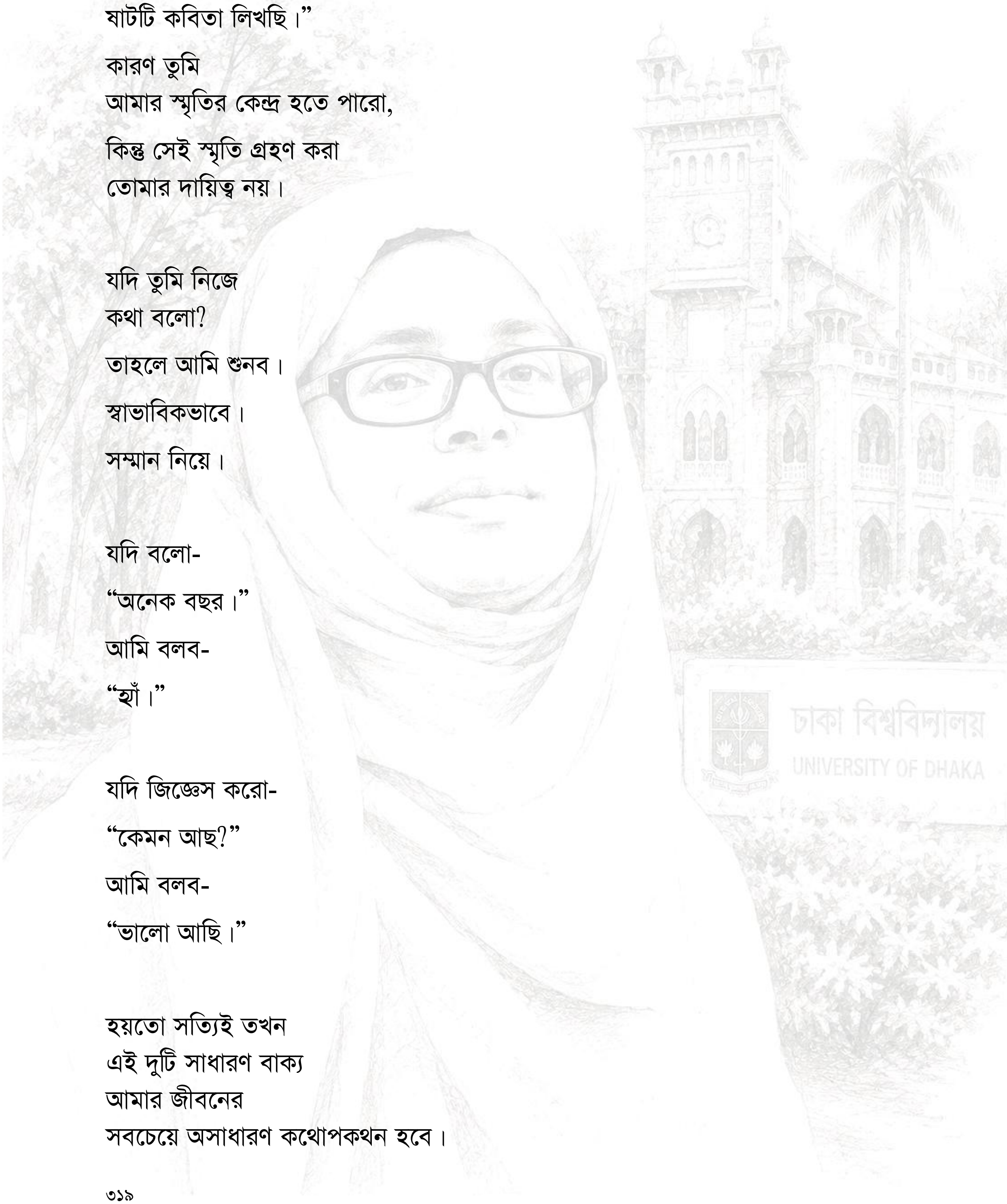

"জানো, তোমাকে নিয়ে
ষাটটি কবিতা লিখছি।"

কারণ তুমি
আমার স্মৃতির কেন্দ্র হতে পারো,

কিন্তু সেই স্মৃতি গ্রহণ করা
তোমার দায়িত্ব নয়।

যদি তুমি নিজে
কথা বলো?

তাহলে আমি শুনব।

স্বাভাবিকভাবে।

সম্মান নিয়ে।

যদি বলো-

"অনেক বছর।"

আমি বলব-

"হ্যাঁ।"

যদি জিজ্ঞেস করো-

"কেমন আছ?"

আমি বলব-

"ভালো আছি।"

হয়তো সত্যিই তখন
এই দুটি সাধারণ বাক্য
আমার জীবনের
সবচেয়ে অসাধারণ কথোপকথন হবে।

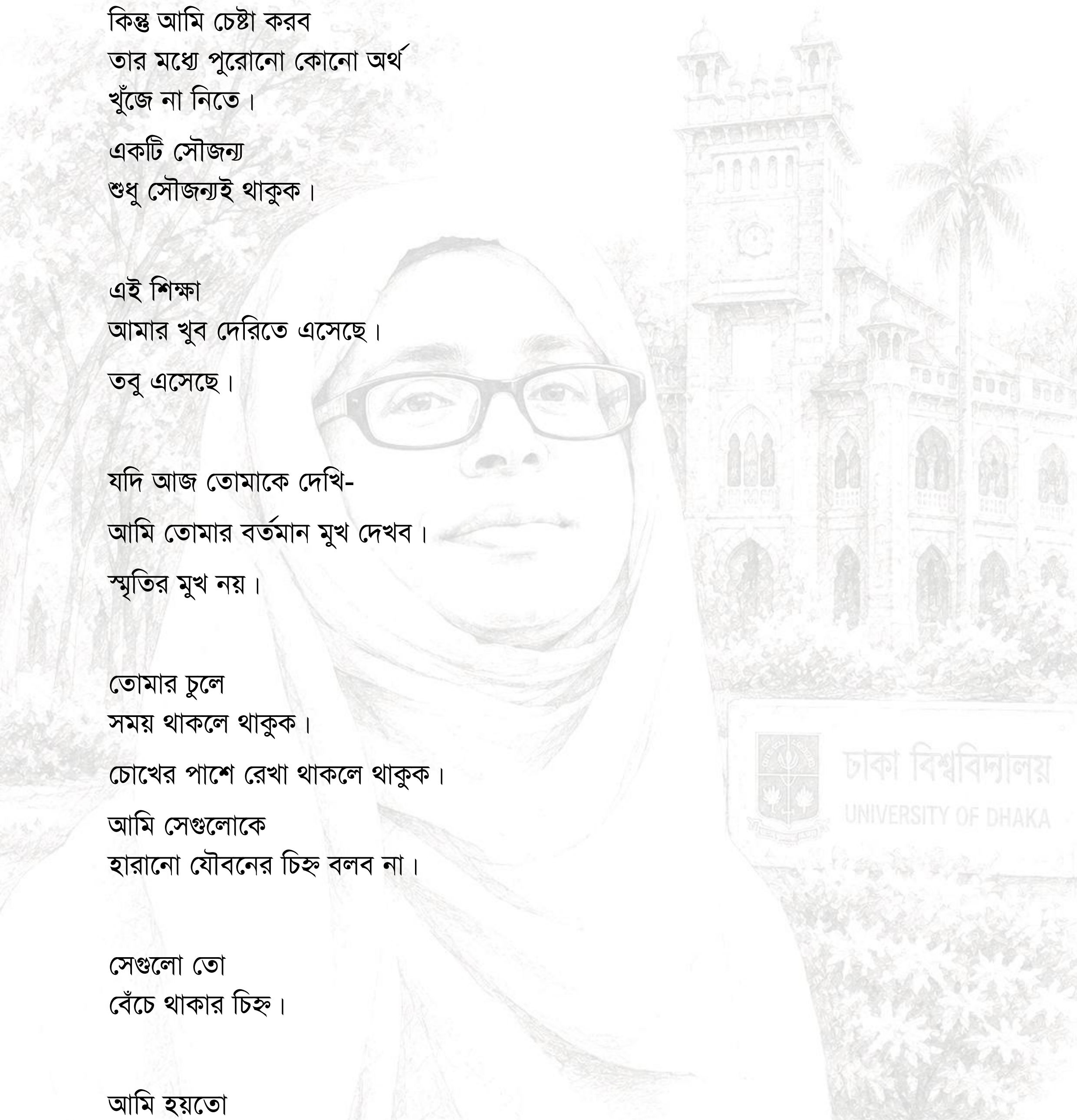

কিন্তু আমি চেষ্টা করব
তার মধ্যে পুরোনো কোনো অর্থ
খুঁজে না নিতে।

একটি সৌজন্য
শুধু সৌজন্যই থাকুক।

এই শিক্ষা
আমার খুব দেরিতে এসেছে।

তবু এসেছে।

যদি আজ তোমাকে দেখি-

আমি তোমার বর্তমান মুখ দেখব।

স্মৃতির মুখ নয়।

তোমার চুলে
সময় থাকলে থাকুক।

চোখের পাশে রেখা থাকলে থাকুক।

আমি সেগুলোকে
হারানো যৌবনের চিহ্ন বলব না।

সেগুলো তো
বেঁচে থাকার চিহ্ন।

আমি হয়তো
মনে মনে ভাবব-

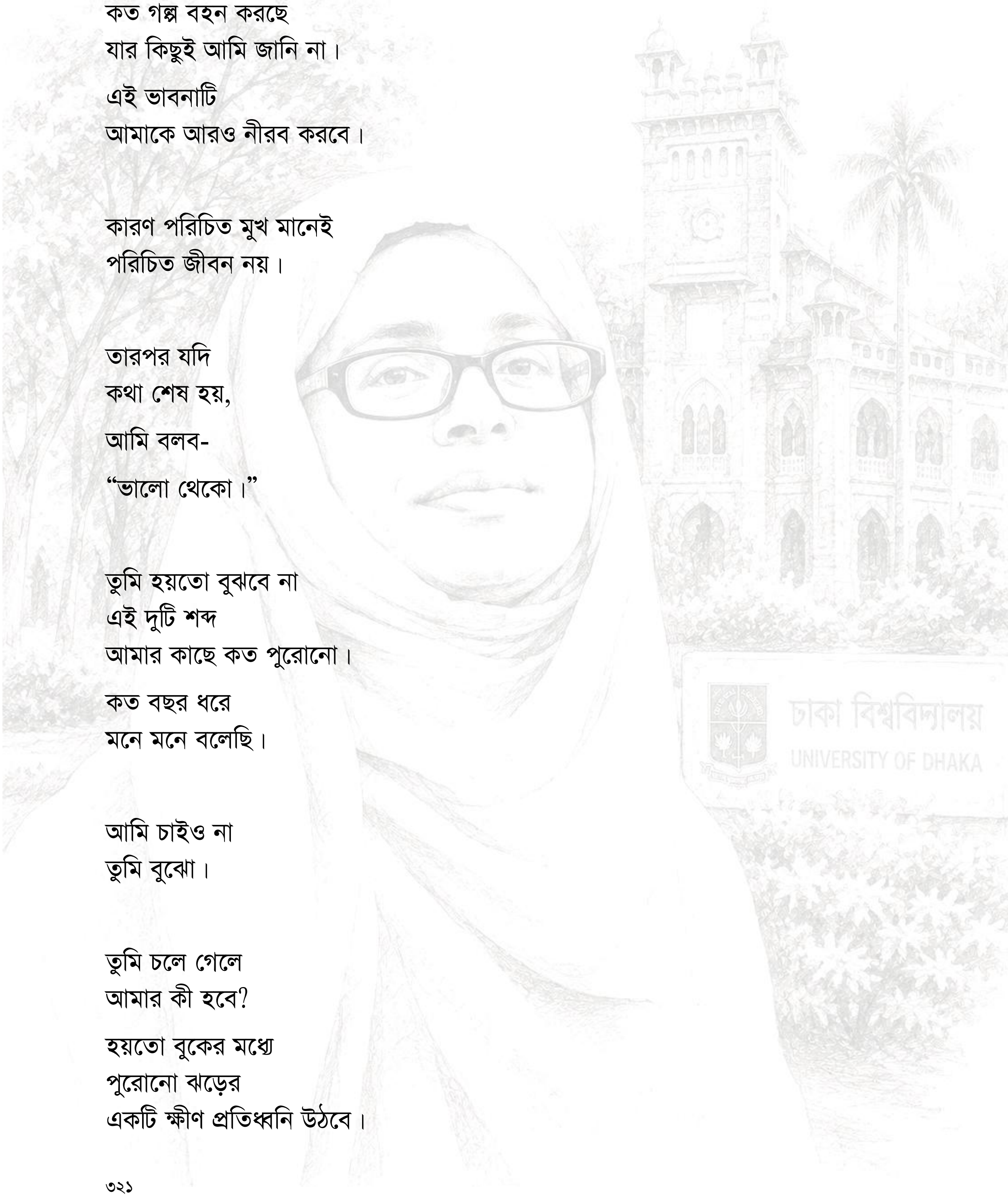

এই মানুষটির জীবন
কত গল্প বহন করছে
যার কিছুই আমি জানি না।

এই ভাবনাটি
আমাকে আরও নীরব করবে।

কারণ পরিচিত মুখ মানেই
পরিচিত জীবন নয়।

তারপর যদি
কথা শেষ হয়,

আমি বলব-

"ভালো থেকো।"

তুমি হয়তো বুঝবে না
এই দুটি শব্দ
আমার কাছে কত পুরোনো।

কত বছর ধরে
মনে মনে বলেছি।

আমি চাইও না
তুমি বুঝো।

তুমি চলে গেলে
আমার কী হবে?

হয়তো বুকের মধ্যে
পুরোনো ঝড়ের
একটি ক্ষীণ প্রতিধ্বনি উঠবে।

হয়তো হাত কাঁপবে সামান্য।

হয়তো কিছুক্ষণ
চুপ করে দাঁড়াব।

তারপর?

নিজের পথে হাঁটব।

কারণ দেখা হয়ে গেলে
জীবন নতুন করে
১৯৯০-এ ফিরে যায় না।

শুধু একটি নতুন স্মৃতি
পুরোনো স্মৃতির পাশে বসে।

আমি চাই
সেই নতুন স্মৃতিটি
শান্ত হোক।

কোনো দাবি ছাড়া।

যদি আজ তোমাকে দেখি-

আমি তোমাকে
হারানো ভালোবাসার প্রতীক হিসেবে দেখব না।

দেখব একজন মানুষ হিসেবে।

এটাই হয়তো
আমার অনুভূতির সবচেয়ে পরিণত পরীক্ষা।

আমি কি পারব?

জানি না।

কিন্তু চেষ্টা করব।

আর যদি দেখা না হয়?
তাতেও কিছু অসম্পূর্ণ থাকবে না।

কারণ এতদিনে বুঝেছি-
প্রেমের সত্যতা যাচাই করতে
পুনর্মিলন প্রয়োজন হয় না।

তুমি আমার জীবনের
একটি সময়ের সত্য ছিলে।
সেই সত্যের জন্য
আজকের সাক্ষাৎ
কোনো সনদ নয়।

তাই যদি আজ তোমাকে দেখি,
আমি হয়তো কিছুক্ষণের জন্য
আমার সমস্ত বয়স ভুলে যাব।
ভেতরে সেই তরুণ
হঠাৎ জেগে উঠবে।

কিন্তু আমি তার কাঁধে হাত রেখে বলব-
"শান্ত হও।
এই মানুষটি তোমার স্মৃতির মেয়েটি নন শুধু।
তিনি তার নিজের দীর্ঘ জীবনের মানুষ।
তাকে আজকের মতোই দেখো।"

তারপর হয়তো
তোমার দিকে তাকিয়ে
মৃদু হাসব।

আর খুব সাধারণভাবে বলব-

“ভালো আছেন?”

এই সাধারণ বাক্যের ভেতর
যা কিছু অসাধারণ-

সবটুকুই
আমি নিজের কাছে রেখে দেব।

চিনতে পারব তো?

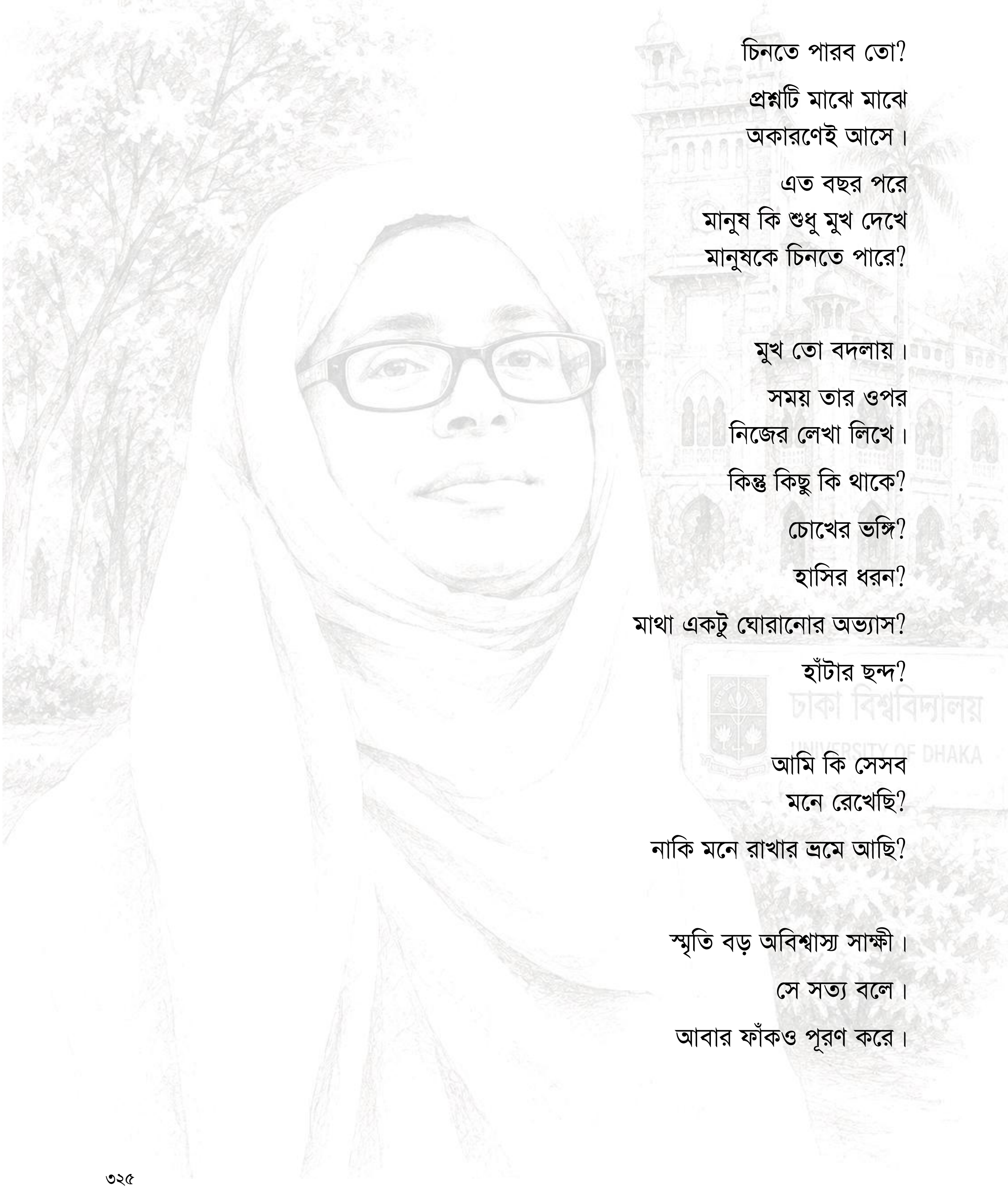

চিনতে পারব তো?

প্রশ্নটি মাঝে মাঝে
অকারণেই আসে।

এত বছর পরে
মানুষ কি শুধু মুখ দেখে
মানুষকে চিনতে পারে?

মুখ তো বদলায়।

সময় তার ওপর
নিজের লেখা লিখে।

কিন্তু কিছু কি থাকে?

চোখের ভঙ্গি?

হাসির ধরন?

মাথা একটু ঘোরানোর অভ্যাস?

হাঁটার ছন্দ?

আমি কি সেসব
মনে রেখেছি?

নাকি মনে রাখার ভ্রমে আছি?

স্মৃতি বড় অবিশ্বাস্য সাক্ষী।

সে সত্য বলে।

আবার ফাঁকও পূরণ করে।

তাই আমি এখন
নিজের স্মৃতিকেও
শতভাগ বিশ্বাস করি না।

হয়তো রাস্তার পাশে
তুমি দাঁড়িয়ে থাকবে,
আমি পাশ দিয়ে চলে যাব।
একবারও বুঝব না-
এই তো সে।

এই সম্ভাবনা
কেমন অদ্ভুত।
একসময় যে মুখ
হাজার মানুষের ভিড়ে
এক মুহূর্তে চিনতাম,
আজ তাকে সামনে পেয়েও
না-চিনতে পারি!

সময় আমাদের
এমনই বিনয়ী করে।

আবার হয়তো
উল্টোটা হবে।
তোমাকে দেখামাত্র
চিনে ফেলব।
কোনো যুক্তি ছাড়াই।
মস্তিষ্কের আগে
হৃদয় বলবে-

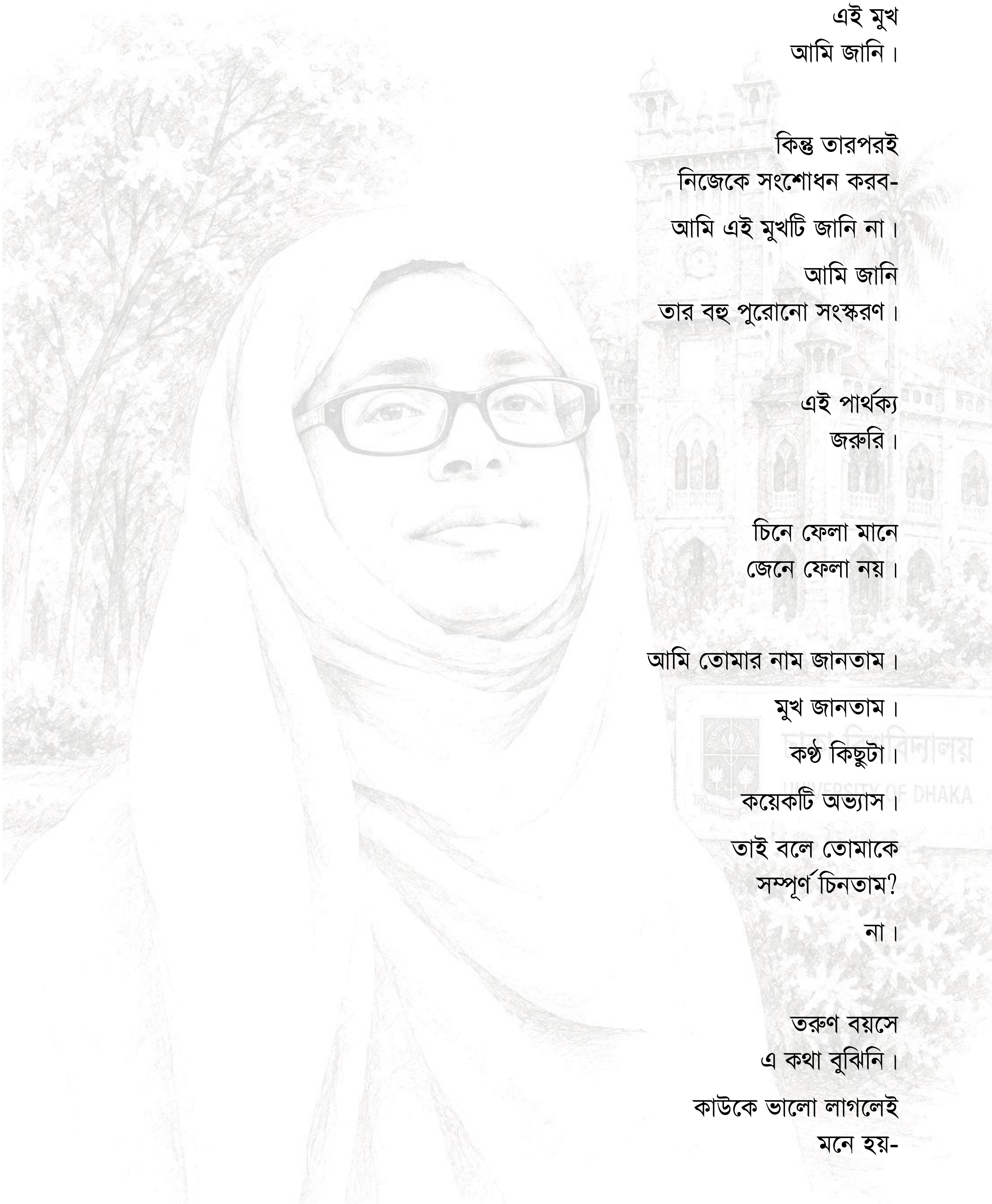

এই মুখ
আমি জানি।

কিন্তু তারপরই
নিজেকে সংশোধন করব-
আমি এই মুখটি জানি না।
আমি জানি
তার বহু পুরোনো সংস্করণ।

এই পার্থক্য
জরুরি।

চিনে ফেলা মানে
জেনে ফেলা নয়।

আমি তোমার নাম জানতাম।
মুখ জানতাম।
কণ্ঠ কিছুটা।
কয়েকটি অভ্যাস।
তাই বলে তোমাকে
সম্পূর্ণ চিনতাম?
না।

তরুণ বয়সে
এ কথা বুঝিনি।
কাউকে ভালো লাগলেই
মনে হয়-

আমি তাকে চিনি।

আজ জানি-

মানুষ একটি গভীর মহাদেশ।

কয়েকটি দৃশ্য দেখে
তার মানচিত্র আঁকা যায় না।

তাই আজ যদি তোমাকে চিনিও,
মনে মনে বলব-

আমি শুধু
একজন পুরোনো পরিচিতকে চিনেছি।

তার জীবনের মানুষটিকে
আমি চিনি না।

আর যদি না-চিনি?

তবু কি কিছু হারাবে?

না।

কারণ আমার স্মৃতির তুমি
চেনার জন্য
বর্তমান মুখের প্রয়োজন নেই।

সে তার সময়ের মধ্যে
আগেই পরিচিত।

তবু মানবিক কৌতূহল থাকে।

আজকের তোমাকে
আমার চোখ কি

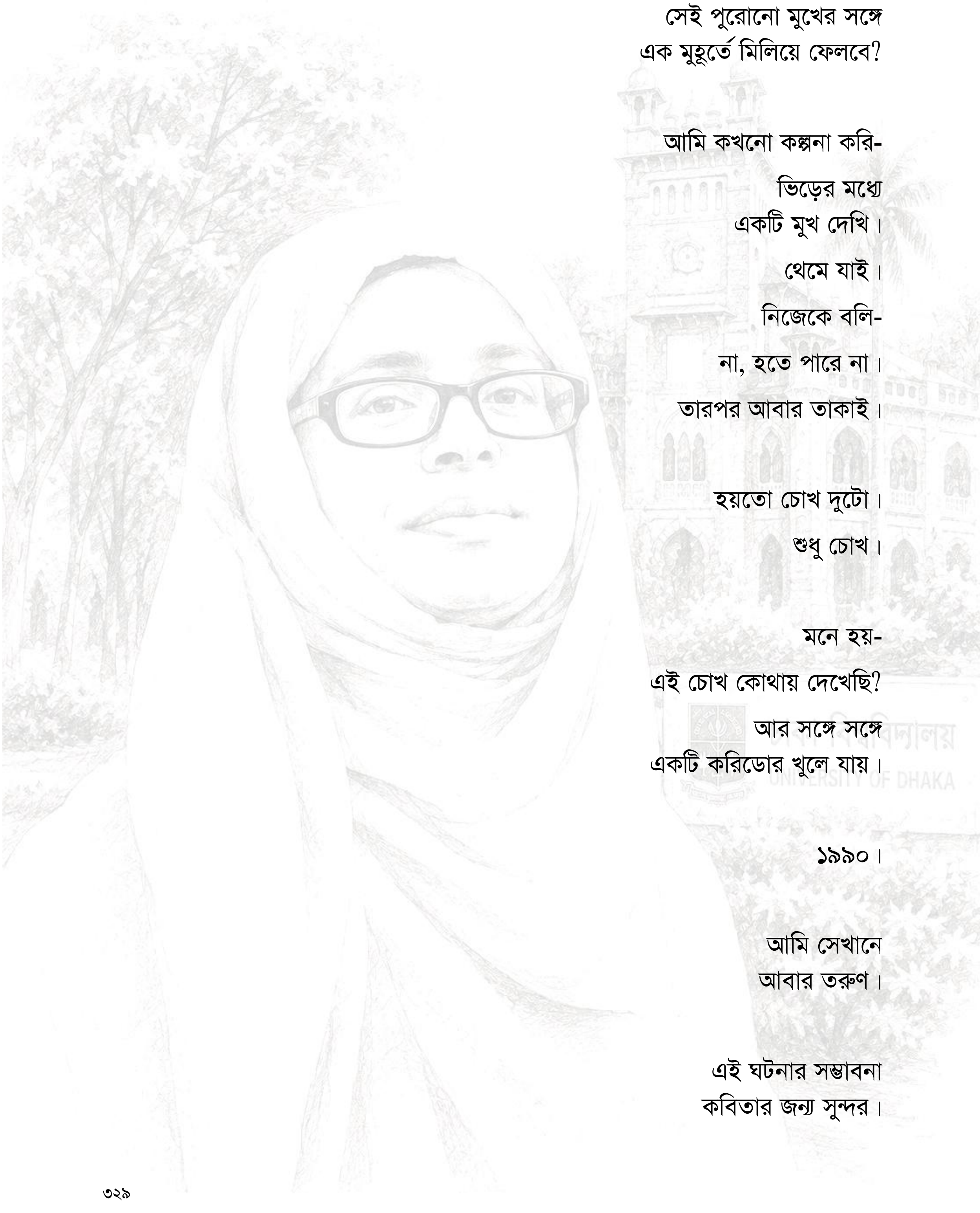

সেই পুরোনো মুখের সঙ্গে
এক মুহূর্তে মিলিয়ে ফেলবে?

আমি কখনো কল্পনা করি-

ভিড়ের মধ্যে
একটি মুখ দেখি।

থেমে যাই।

নিজেকে বলি-

না, হতে পারে না।

তারপর আবার তাকাই।

হয়তো চোখ দুটো।

শুধু চোখ।

মনে হয়-

এই চোখ কোথায় দেখেছি?

আর সঙ্গে সঙ্গে
একটি করিডোর খুলে যায়।

১৯৯০।

আমি সেখানে
আবার তরুণ।

এই ঘটনার সম্ভাবনা
কবিতার জন্য সুন্দর।

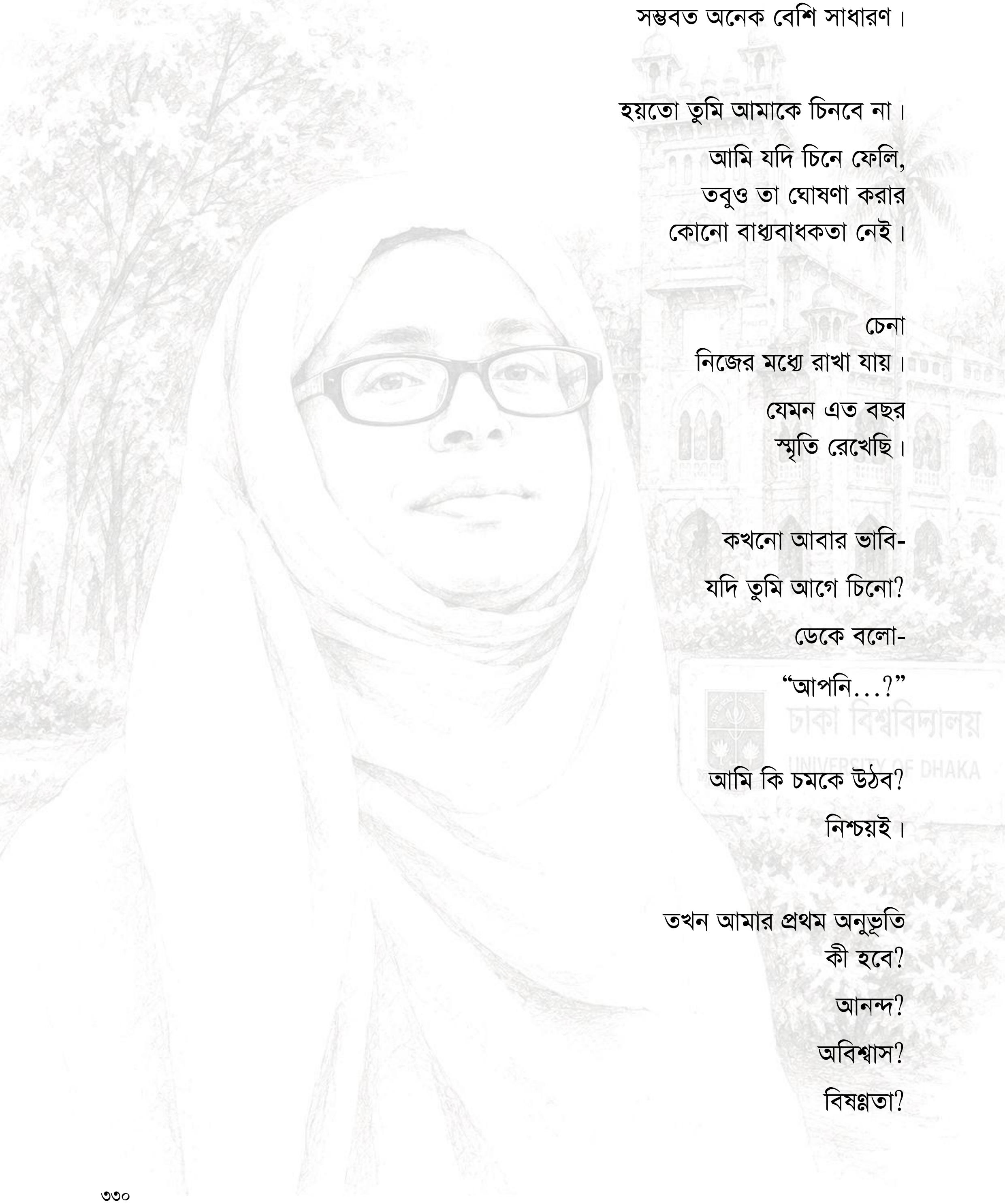

বাস্তবে ঘটলে
সম্ভবত অনেক বেশি সাধারণ।

হয়তো তুমি আমাকে চিনবে না।
আমি যদি চিনে ফেলি,
তবুও তা ঘোষণা করার
কোনো বাধ্যবাধকতা নেই।

চেনা
নিজের মধ্যে রাখা যায়।
যেমন এত বছর
স্মৃতি রেখেছি।

কখনো আবার ভাবি-
যদি তুমি আগে চিনো?
ডেকে বলো-
"আপনি...?"

আমি কি চমকে উঠব?
নিশ্চয়ই।

তখন আমার প্রথম অনুভূতি
কী হবে?
আনন্দ?
অবিশ্বাস?
বিষণ্ণতা?

সব একসঙ্গে?

হয়তো শুধু
একটি দীর্ঘ নীরবতা।

তারপর হাসি।

কিন্তু এইসব
কল্পনা মাত্র।

আমি তাদের
ভবিষ্যতের প্রতিশ্রুতি বানাই না।

কারণ দেখা হবে কি না
জানি না।

চিনব কি না
তারও নিশ্চয়তা নেই।

আমাদের জীবন
এত দূর এসে
এই অনিশ্চয়তার মধ্যেই
স্বাভাবিক।

আজ বরং
অন্য প্রশ্নটি বেশি গুরুত্বপূর্ণ-

আমি কি নিজেকে চিনতে পারব?

হঠাৎ তোমাকে দেখলে
সেই তরুণ আবেগের ভেতরে
আমি কি আজকের মানুষটিকে
ধরে রাখতে পারব?

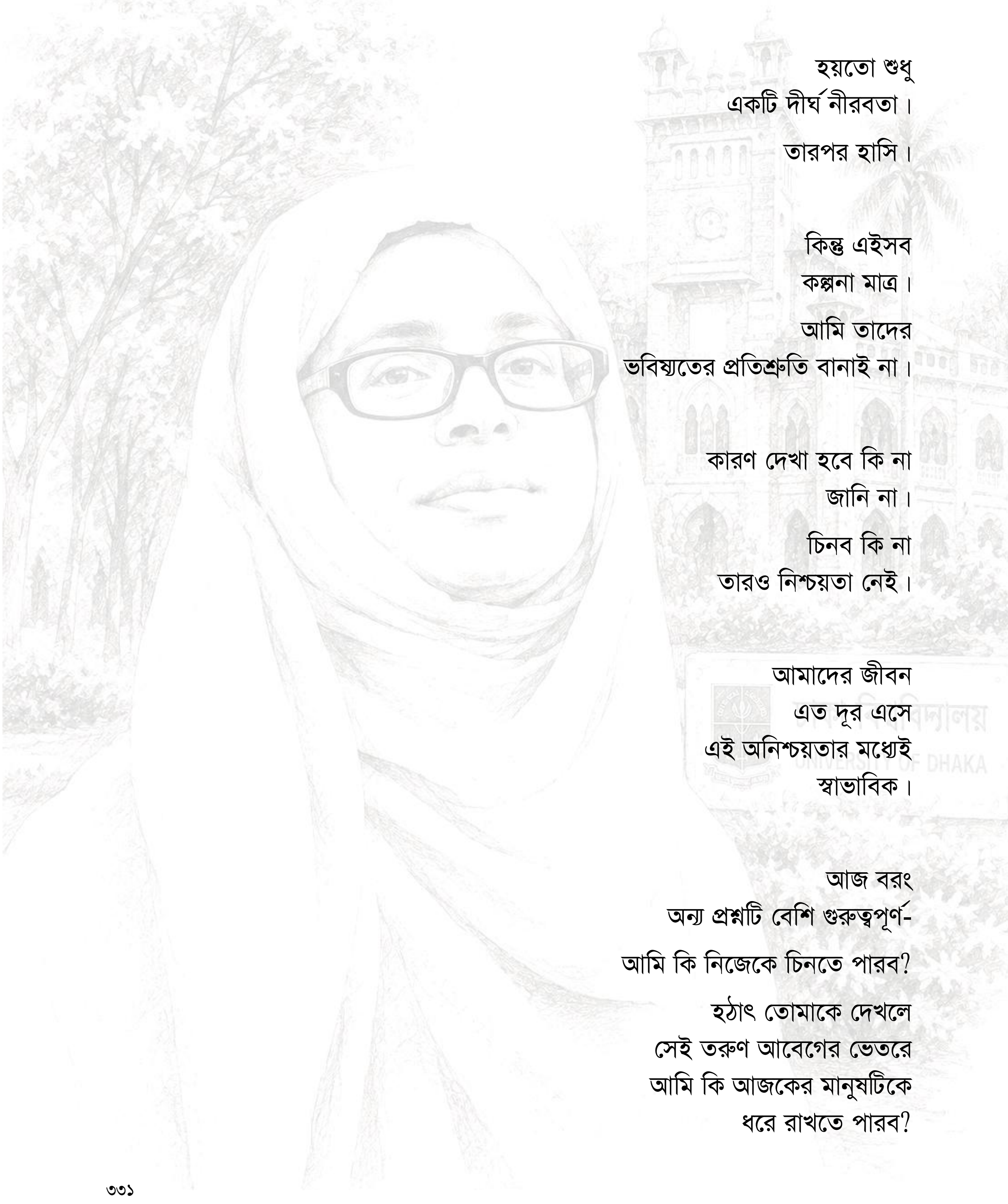

আমি চাই পারি।

কারণ বয়স শুধু
মুখের রেখা নয়।

এটি শেখা।

যদি এত বছর পরেও
আমি সেই পুরোনো আকাঙ্ক্ষার
একই মানুষ হয়ে থাকি,

তবে সময় আমাকে
কী শিখিয়েছে?

তাই তোমাকে চিনে ফেলার চেয়েও
নিজের পরিণতিকে চিনে রাখা জরুরি।

তবু মনের এক কোণে
একটি ছোট্ট কৌতূহল
রয়ে যায়-
চিনতে পারব তো?

তার উত্তর
সময় যদি কোনোদিন দেয়,
দেবে।

না দিলেও
আমার কবিতা থামবে না।

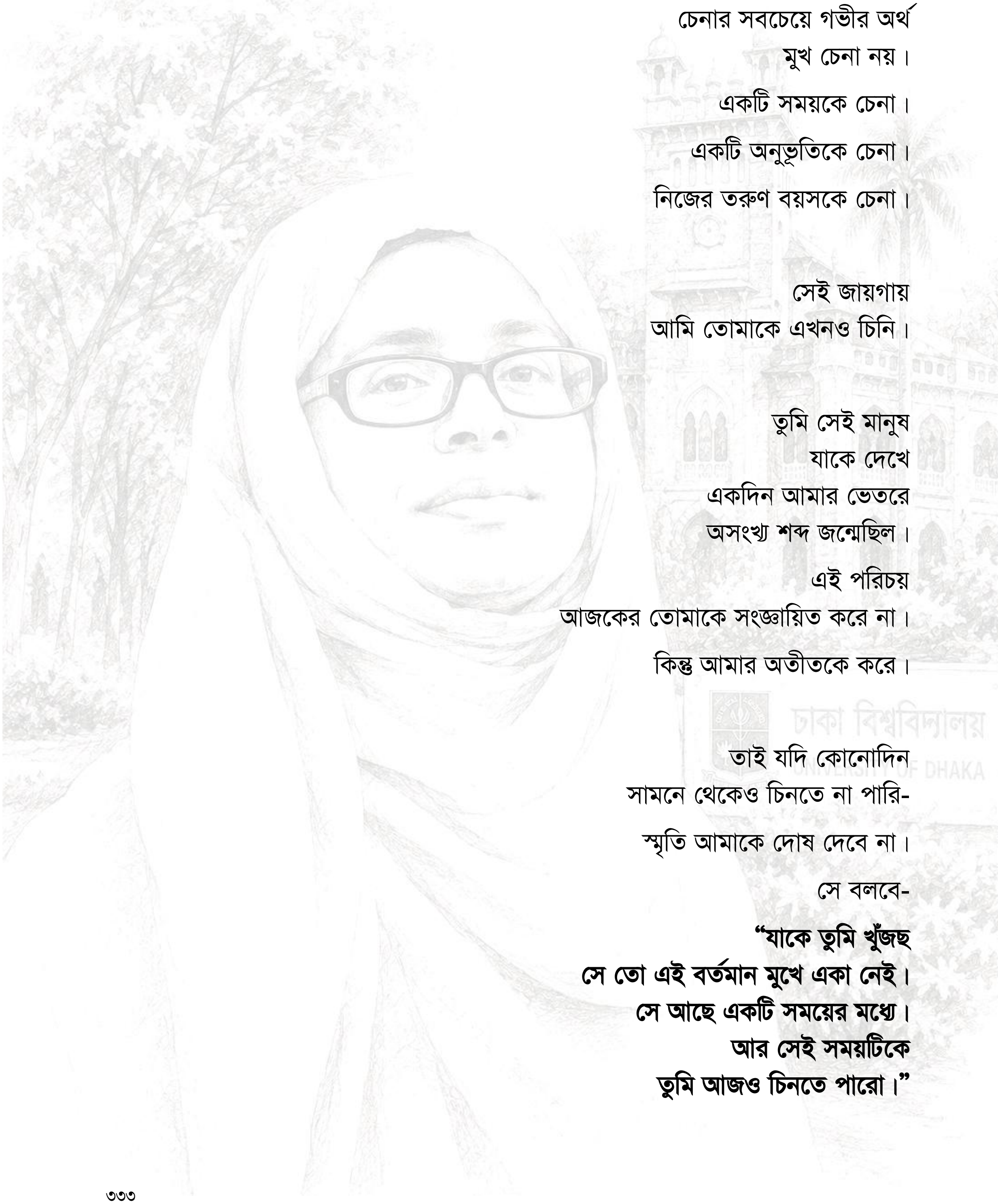

কারণ শেষ পর্যন্ত
চেনার সবচেয়ে গভীর অর্থ
মুখ চেনা নয়।

একটি সময়কে চেনা।

একটি অনুভূতিকে চেনা।

নিজের তরুণ বয়সকে চেনা।

সেই জায়গায়
আমি তোমাকে এখনও চিনি।

তুমি সেই মানুষ
যাকে দেখে
একদিন আমার ভেতরে
অসংখ্য শব্দ জন্মেছিল।

এই পরিচয়
আজকের তোমাকে সংজ্ঞায়িত করে না।

কিন্তু আমার অতীতকে করে।

তাই যদি কোনোদিন
সামনে থেকেও চিনতে না পারি-

স্মৃতি আমাকে দোষ দেবে না।

সে বলবে-

"যাকে তুমি খুঁজছ
সে তো এই বর্তমান মুখে একা নেই।
সে আছে একটি সময়ের মধ্যে।
আর সেই সময়টিকে
তুমি আজও চিনতে পারো।"

তোমার চোখ কি একই আছে?

তোমার চোখ কি একই আছে?

এই প্রশ্নটি
মুখের চেয়ে বেশি ফিরে আসে।

কারণ প্রথম প্রেমে
মুখের স্মৃতি কখনো ফিকে হয়,

চোখের অনুভূতি
অদ্ভুতভাবে থেকে যায়।

আমি আজও
তোমার চোখের সঠিক রঙ
নিশ্চিত করে বলতে পারব না।

কী আশ্চর্য!

যে চোখ নিয়ে
কত কবিতা লিখেছিলাম,

তার রঙই আজ
স্পষ্ট মনে নেই।

কিন্তু মনে আছে-

তাকালে
আমি চোখ সরিয়ে নিতাম।

তাহলে আমি আসলে
চোখের রঙ মনে রেখেছি
নাকি নিজের অস্থিরতা?

সম্ভবত দ্বিতীয়টি।

স্মৃতি কখনো
মানুষকে নয়,
মানুষটির সামনে
আমরা কী হয়েছিলাম-
সেটিই বেশি ধরে রাখে।

তোমার চোখের সামনে
আমি হয়ে যেতাম
একজন অপ্রস্তুত তরুণ।

কত বাক্য
সেখানে এসে হারিয়েছে!

আজ এত বছর পরে
ভাবি-
তোমার চোখেও নিশ্চয়ই
সময় এসেছে।
চোখের চারপাশে
রেখা হয়তো গভীর।
কিন্তু দৃষ্টির ভেতর?
সেটিও কি বদলায়?

মানুষ কি বয়সের সঙ্গে
অন্যভাবে তাকাতে শেখে?
অবশ্যই।
অভিজ্ঞতা
চোখের ভেতরেও বাসা বাঁধে।

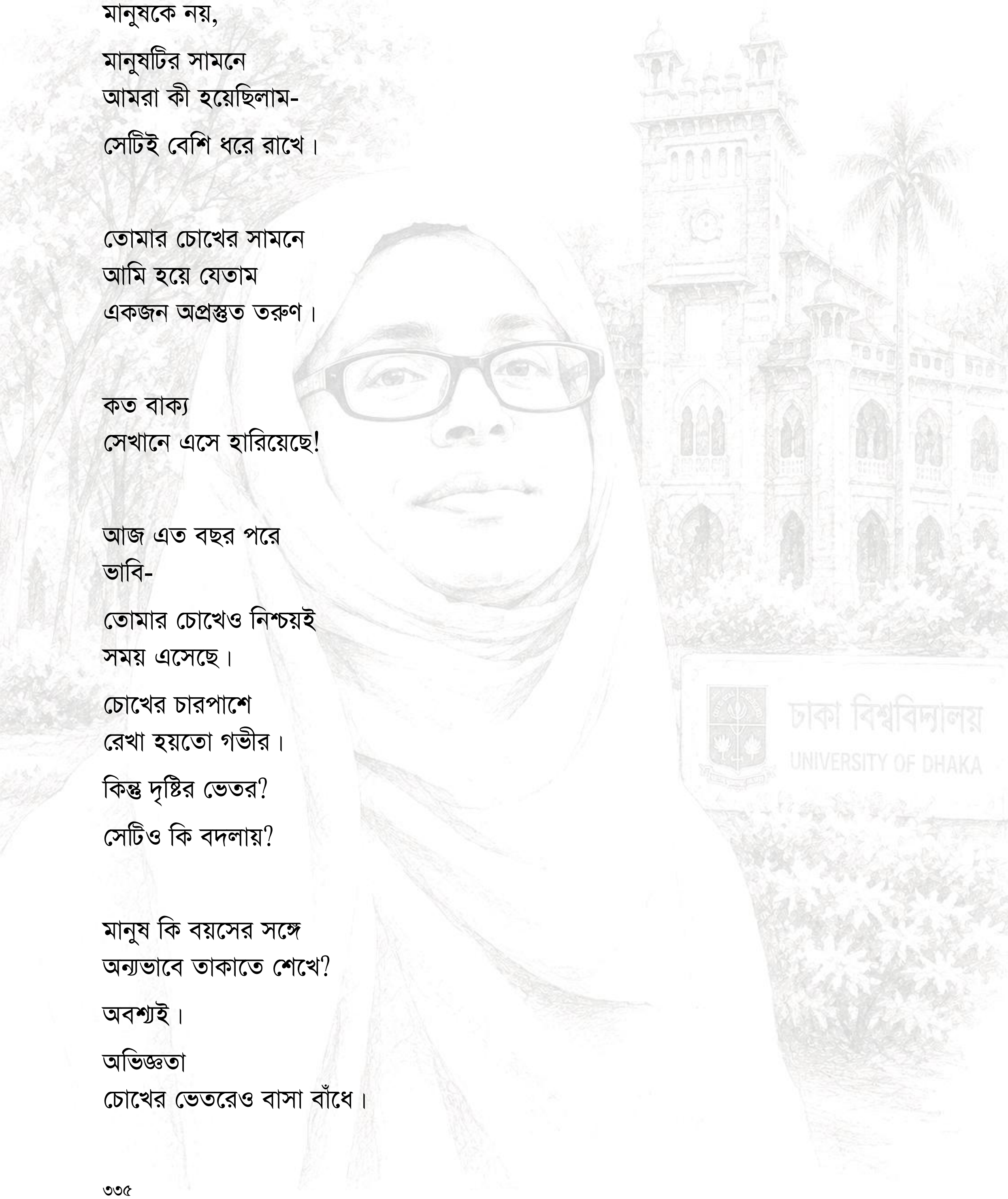

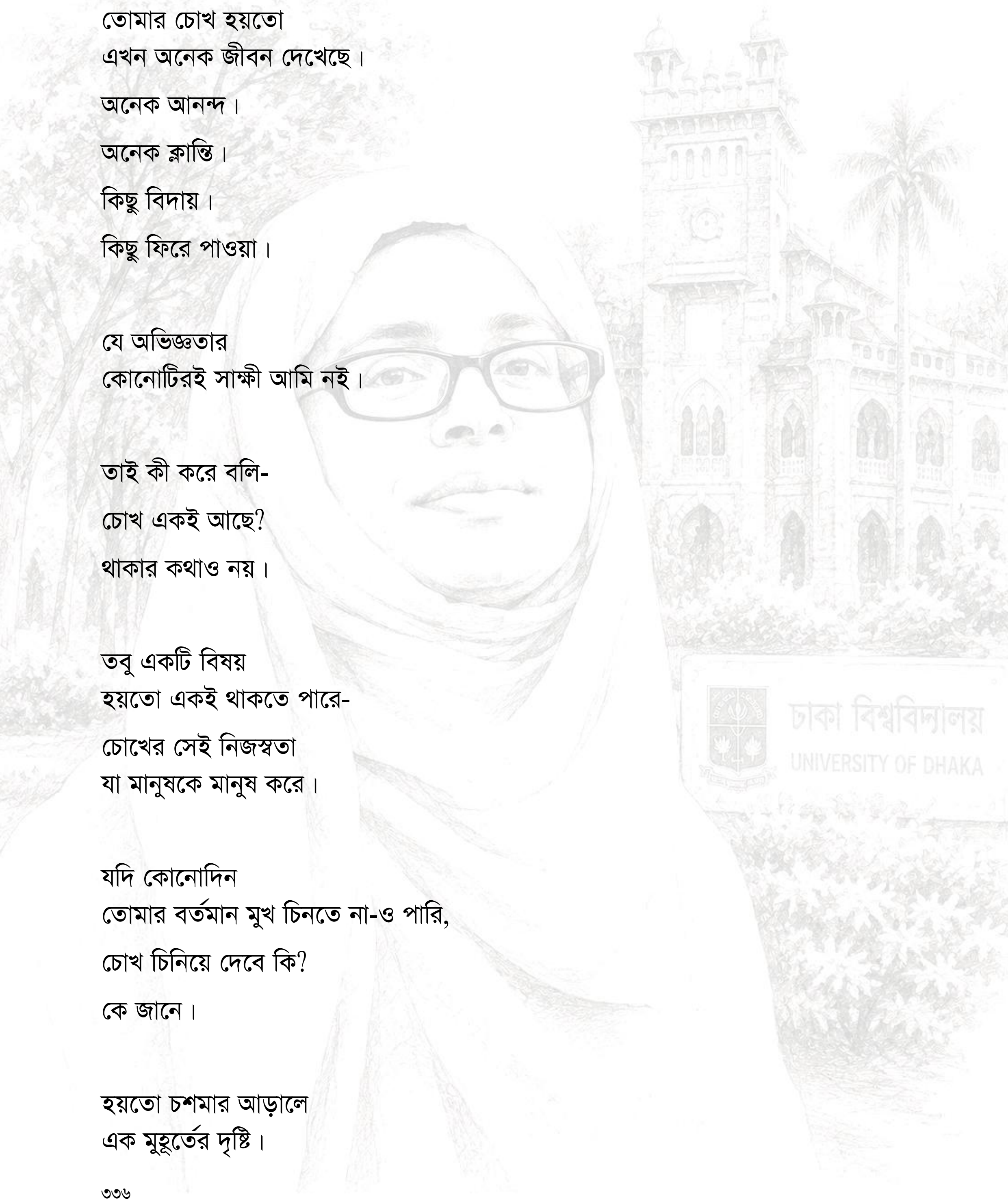

তোমার চোখ হয়তো
এখন অনেক জীবন দেখেছে।

অনেক আনন্দ।

অনেক ক্লান্তি।

কিছু বিদায়।

কিছু ফিরে পাওয়া।

যে অভিজ্ঞতার
কোনোটিরই সাক্ষী আমি নই।

তাই কী করে বলি-

চোখ একই আছে?

থাকার কথাও নয়।

তবু একটি বিষয়
হয়তো একই থাকতে পারে-

চোখের সেই নিজস্বতা
যা মানুষকে মানুষ করে।

যদি কোনোদিন
তোমার বর্তমান মুখ চিনতে না-ও পারি,

চোখ চিনিয়ে দেবে কি?

কে জানে।

হয়তো চশমার আড়ালে
এক মুহূর্তের দৃষ্টি।

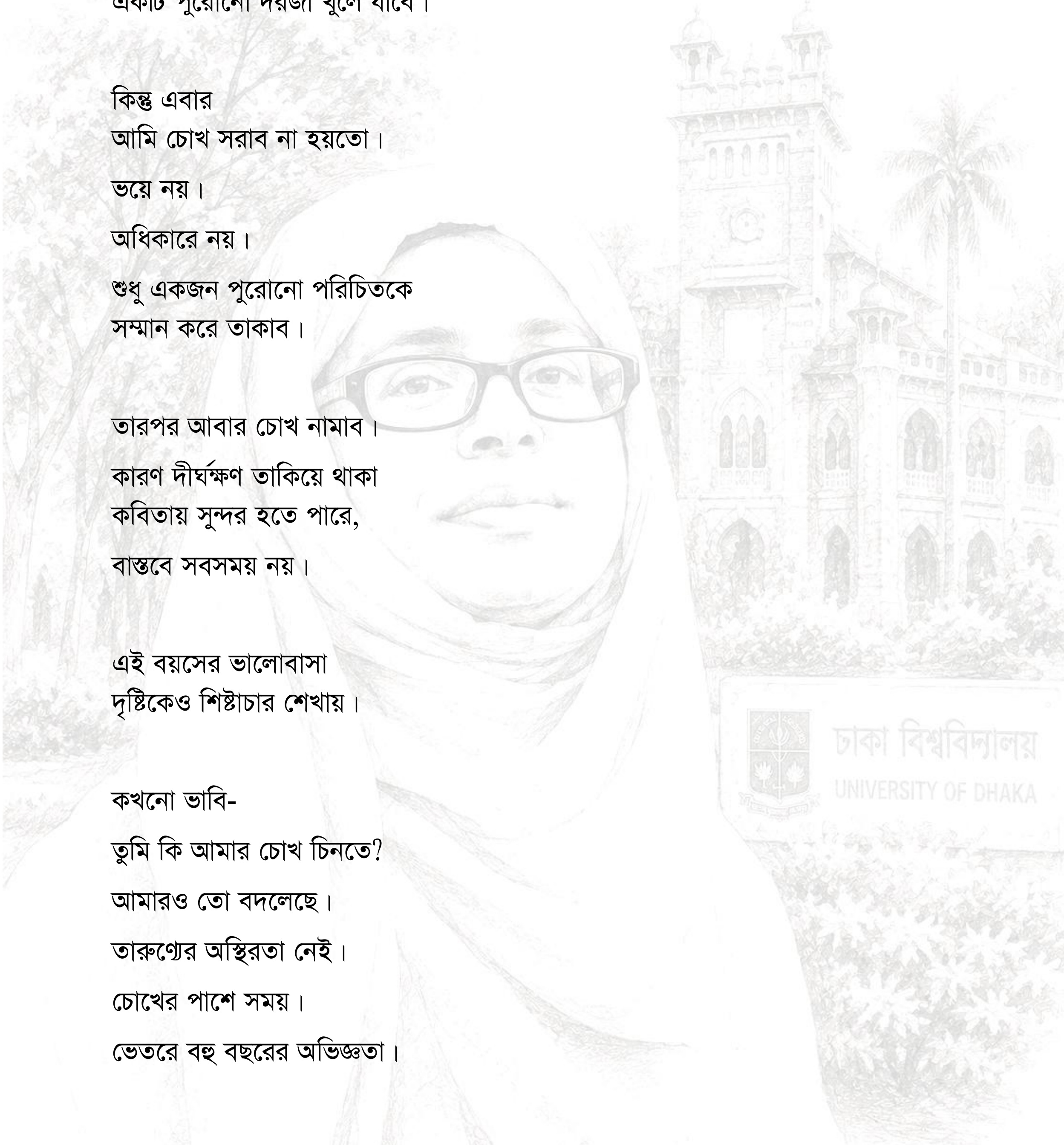

আর আমার ভেতরে
একটি পুরোনো দরজা খুলে যাবে।

কিন্তু এবার
আমি চোখ সরাব না হয়তো।

ভয়ে নয়।

অধিকারে নয়।

শুধু একজন পুরোনো পরিচিতকে
সম্মান করে তাকাব।

তারপর আবার চোখ নামাব।

কারণ দীর্ঘক্ষণ তাকিয়ে থাকা
কবিতায় সুন্দর হতে পারে,

বাস্তবে সবসময় নয়।

এই বয়সের ভালোবাসা
দৃষ্টিকেও শিষ্টাচার শেখায়।

কখনো ভাবি-

তুমি কি আমার চোখ চিনতে?

আমারও তো বদলেছে।

তারুণ্যের অস্থিরতা নেই।

চোখের পাশে সময়।

ভেতরে বহু বছরের অভিজ্ঞতা।

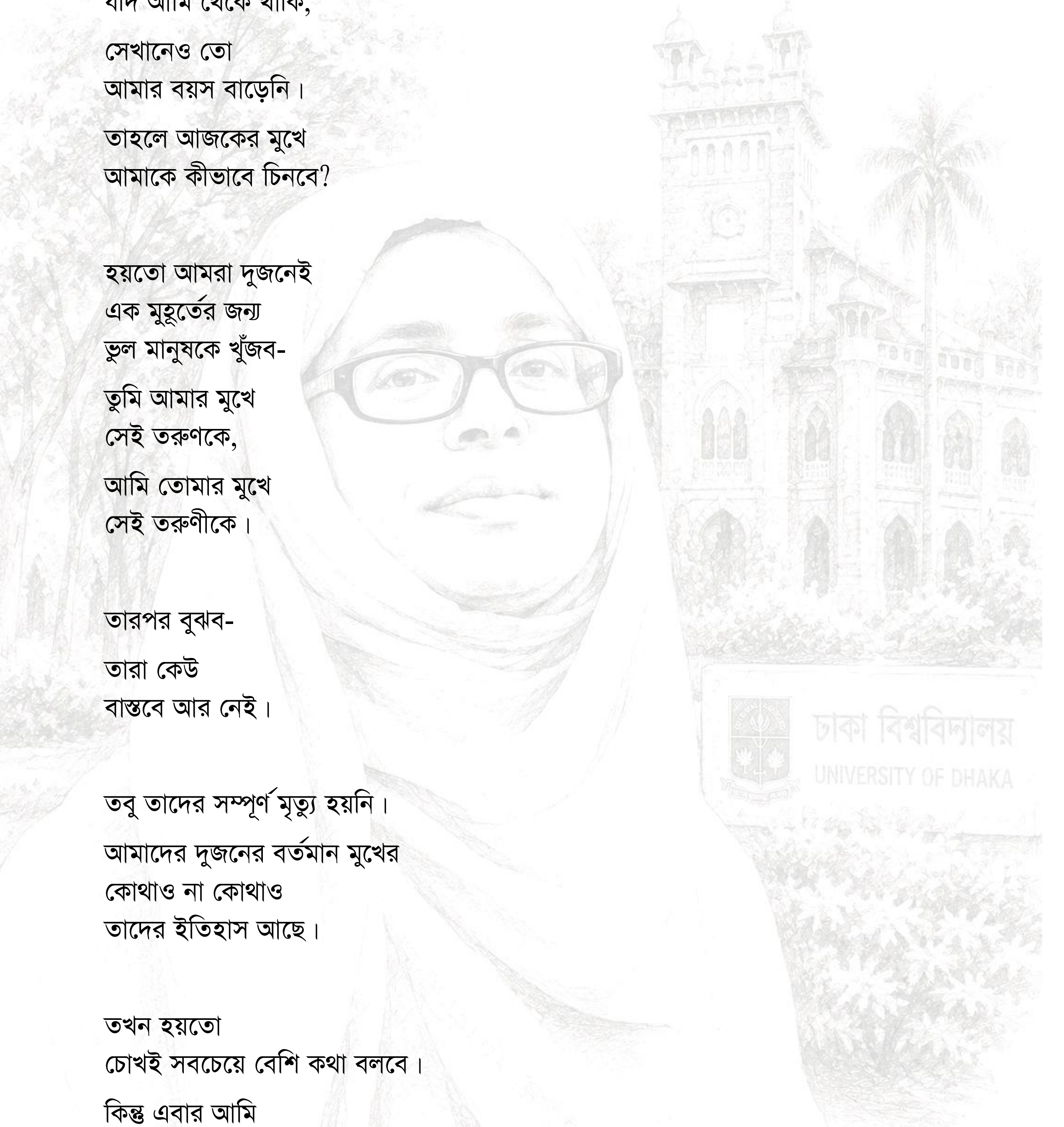

তোমার স্মৃতিতে
যদি আমি থেকে থাকি,

সেখানেও তো
আমার বয়স বাড়েনি।

তাহলে আজকের মুখে
আমাকে কীভাবে চিনবে?

হয়তো আমরা দুজনেই
এক মুহূর্তের জন্য
ভুল মানুষকে খুঁজব-

তুমি আমার মুখে
সেই তরুণকে,

আমি তোমার মুখে
সেই তরুণীকে।

তারপর বুঝব-

তারা কেউ
বাস্তবে আর নেই।

তবু তাদের সম্পূর্ণ মৃত্যু হয়নি।

আমাদের দুজনের বর্তমান মুখের
কোথাও না কোথাও
তাদের ইতিহাস আছে।

তখন হয়তো
চোখই সবচেয়ে বেশি কথা বলবে।

কিন্তু এবার আমি
তার কোনো অর্থ বানাব না।

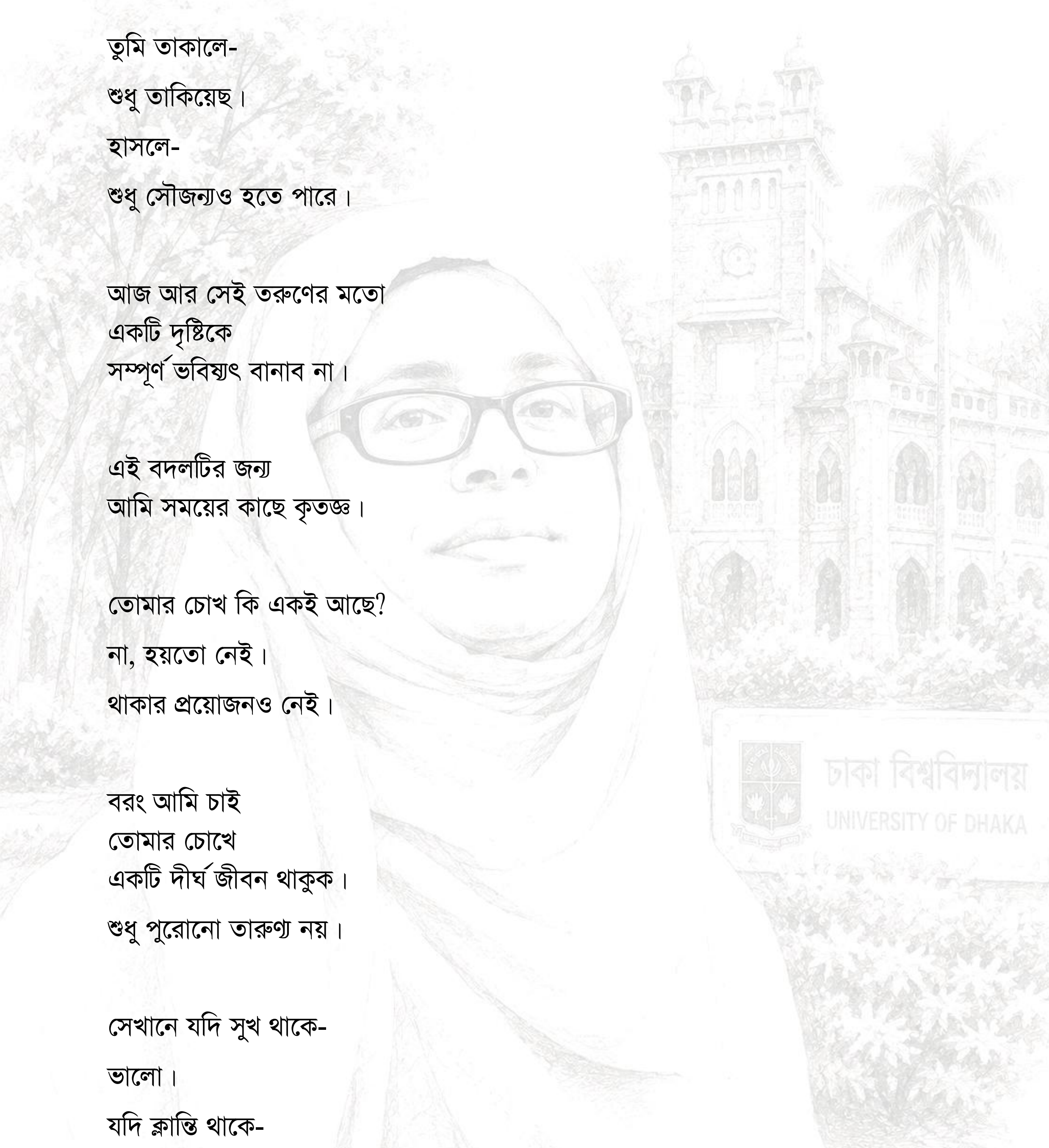

তুমি তাকালে-

শুধু তাকিয়েছ।

হাসলে-

শুধু সৌজন্যও হতে পারে।

আজ আর সেই তরুণের মতো
একটি দৃষ্টিকে
সম্পূর্ণ ভবিষ্যৎ বানাব না।

এই বদলটির জন্য
আমি সময়ের কাছে কৃতজ্ঞ।

তোমার চোখ কি একই আছে?

না, হয়তো নেই।

থাকার প্রয়োজনও নেই।

বরং আমি চাই
তোমার চোখে
একটি দীর্ঘ জীবন থাকুক।

শুধু পুরোনো তারুণ্য নয়।

সেখানে যদি সুখ থাকে-

ভালো।

যদি ক্লান্তি থাকে-

সে-ও জীবনের অংশ।

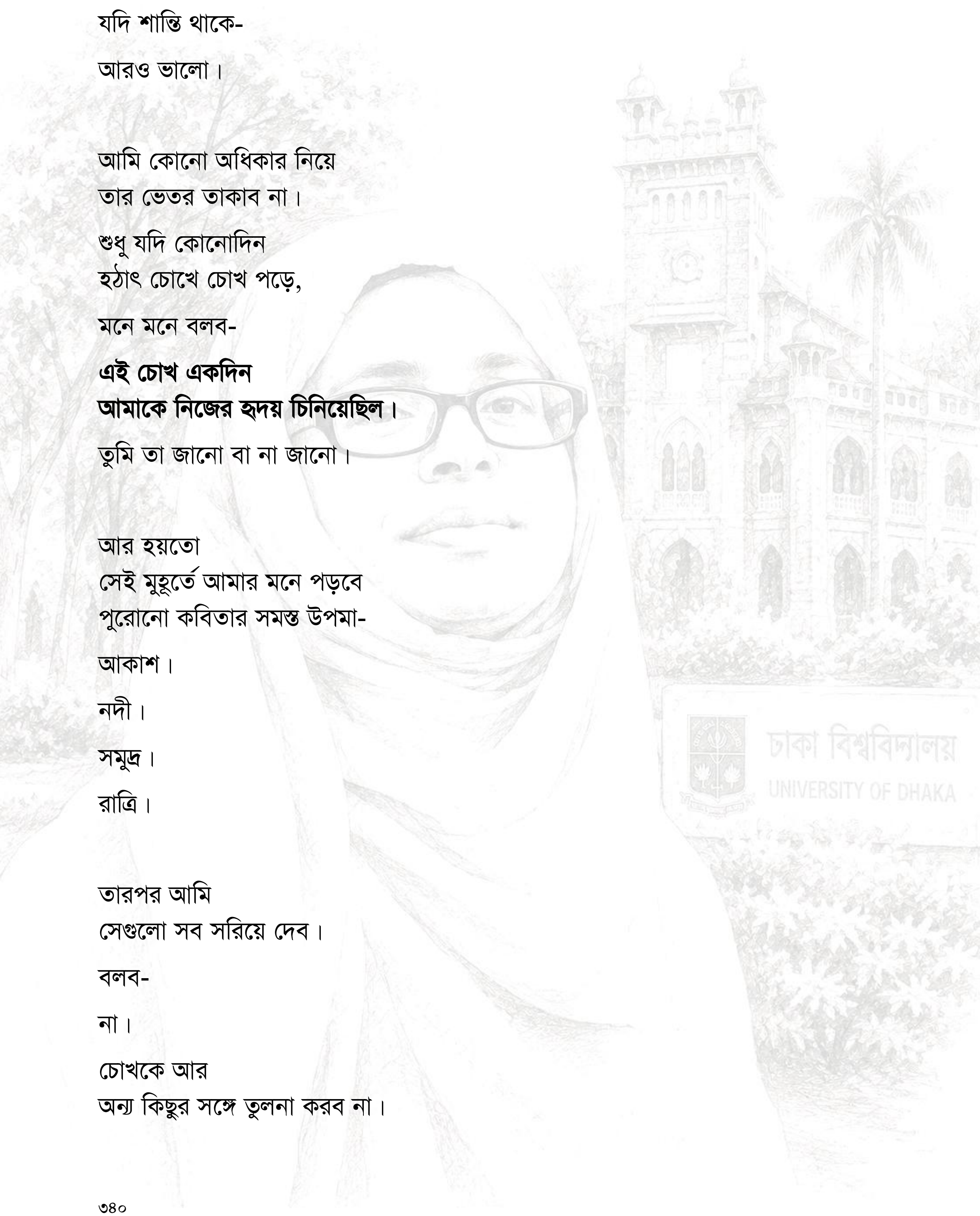

যদি শান্তি থাকে-

আরও ভালো।

আমি কোনো অধিকার নিয়ে
তার ভেতর তাকাব না।

শুধু যদি কোনোদিন
হঠাৎ চোখে চোখ পড়ে,

মনে মনে বলব-

এই চোখ একদিন
আমাকে নিজের হৃদয় চিনিয়েছিল।

তুমি তা জানো বা না জানো।

আর হয়তো
সেই মুহূর্তে আমার মনে পড়বে
পুরোনো কবিতার সমস্ত উপমা-

আকাশ।

নদী।

সমুদ্র।

রাত্রি।

তারপর আমি
সেগুলো সব সরিয়ে দেব।

বলব-

না।

চোখকে আর
অন্য কিছুর সঙ্গে তুলনা করব না।

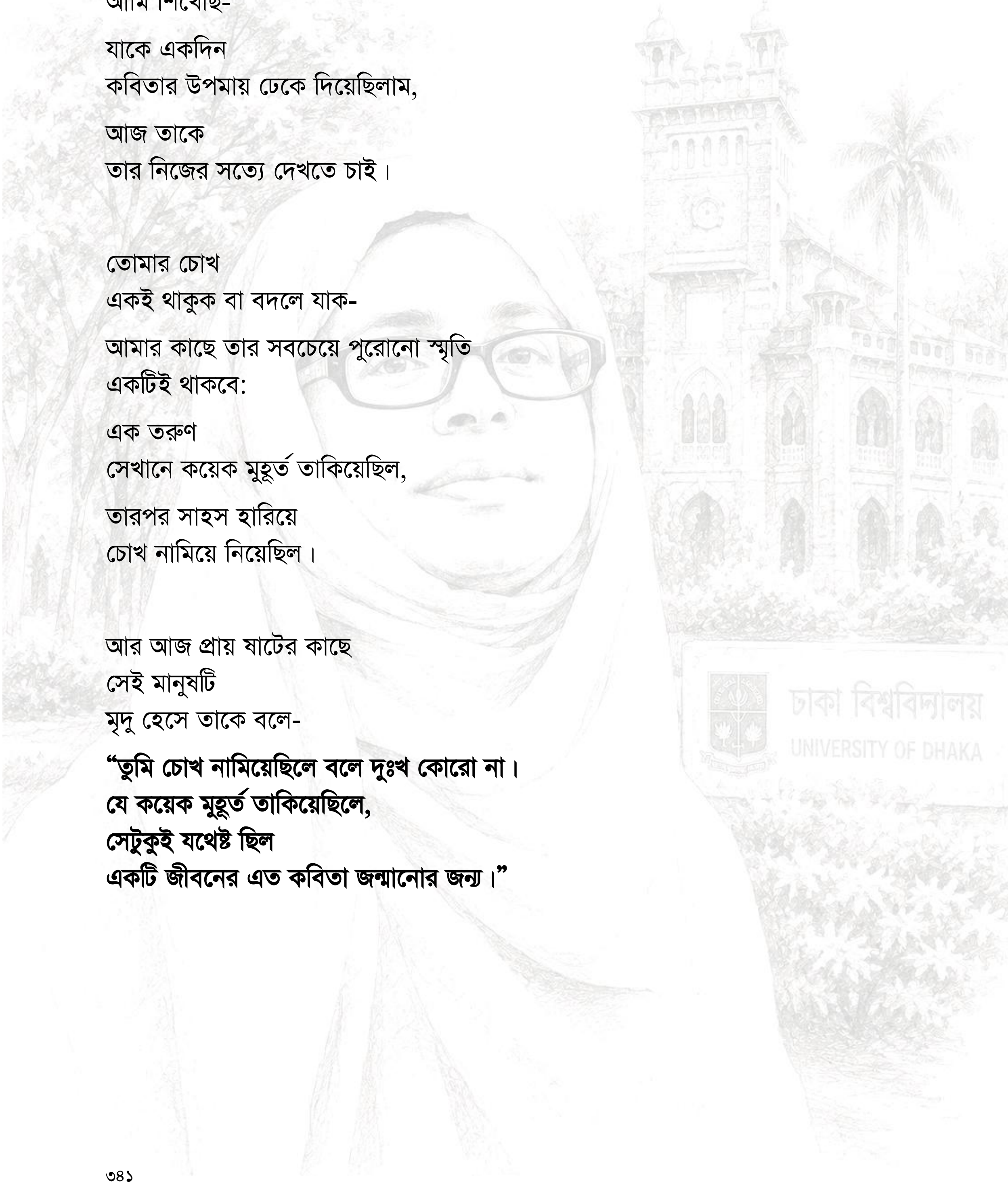

কারণ এত বছর পরে
আমি শিখেছি-

যাকে একদিন
কবিতার উপমায় ঢেকে দিয়েছিলাম,

আজ তাকে
তার নিজের সত্যে দেখতে চাই।

তোমার চোখ
একই থাকুক বা বদলে যাক-

আমার কাছে তার সবচেয়ে পুরোনো স্মৃতি
একটিই থাকবে:

এক তরুণ
সেখানে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়েছিল,

তারপর সাহস হারিয়ে
চোখ নামিয়ে নিয়েছিল।

আর আজ প্রায় ষাটের কাছে
সেই মানুষটি
মৃদু হেসে তাকে বলে-

"তুমি চোখ নামিয়েছিলে বলে দুঃখ কোরো না।
যে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়েছিলে,
সেটুকুই যথেষ্ট ছিল
একটি জীবনের এত কবিতা জন্মানোর জন্য।"

সময় তোমাকে বদলেছে কতটুকু

সময় তোমাকে বদলেছে কতটুকু-

এই প্রশ্নের উত্তর
আমি জানি না।

জানার কথাও নয়।

কারণ তোমার জীবনের
যে দীর্ঘ পথ
আমার চোখের আড়ালে গেছে,

তার প্রতিটি বাঁক
তোমাকেই বদলেছে।

মানুষ শুধু বয়সে বদলায় না।

অভিজ্ঞতায় বদলায়।

দায়িত্বে।

প্রতীক্ষায়।

হতাশায়।

সাফল্যে।

ভালোবাসায়।

হারিয়ে যাওয়ায়।

ফিরে পাওয়ায়।

তোমার ভেতরেও নিশ্চয়ই
অনেক নতুন মানুষ জন্মেছে।

একটি তরুণী থেকে
একজন পরিণত নারী।

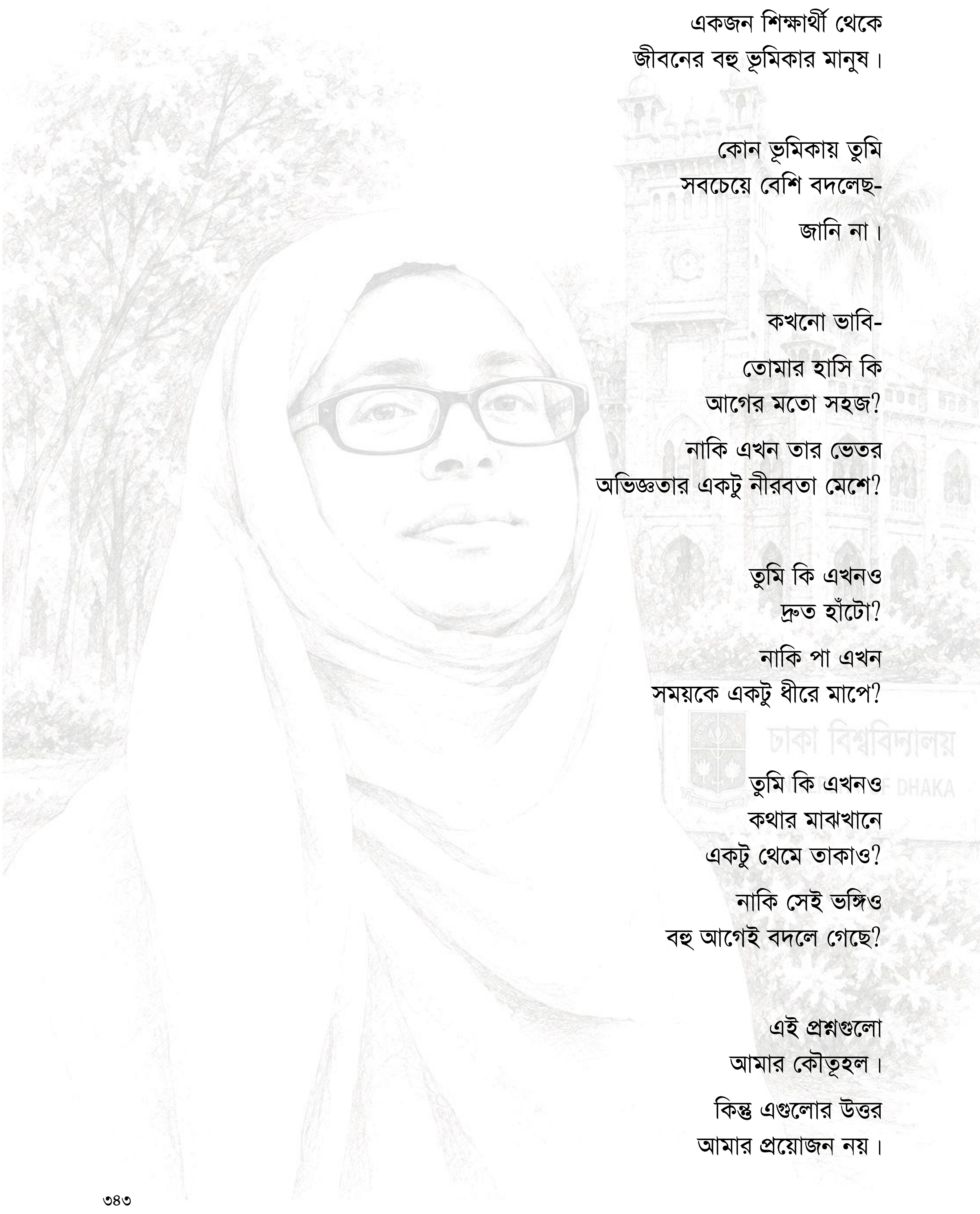

একজন শিক্ষার্থী থেকে
জীবনের বহু ভূমিকার মানুষ।

কোন ভূমিকায় তুমি
সবচেয়ে বেশি বদলেছ-
জানি না।

কখনো ভাবি-
তোমার হাসি কি
আগের মতো সহজ?
নাকি এখন তার ভেতর
অভিজ্ঞতার একটু নীরবতা মেশে?

তুমি কি এখনও
দ্রুত হাঁটো?
নাকি পা এখন
সময়কে একটু ধীরে মাপে?

তুমি কি এখনও
কথার মাঝখানে
একটু থেমে তাকাও?
নাকি সেই ভঙ্গিও
বহু আগেই বদলে গেছে?

এই প্রশ্নগুলো
আমার কৌতূহল।
কিন্তু এগুলোর উত্তর
আমার প্রয়োজন নয়।

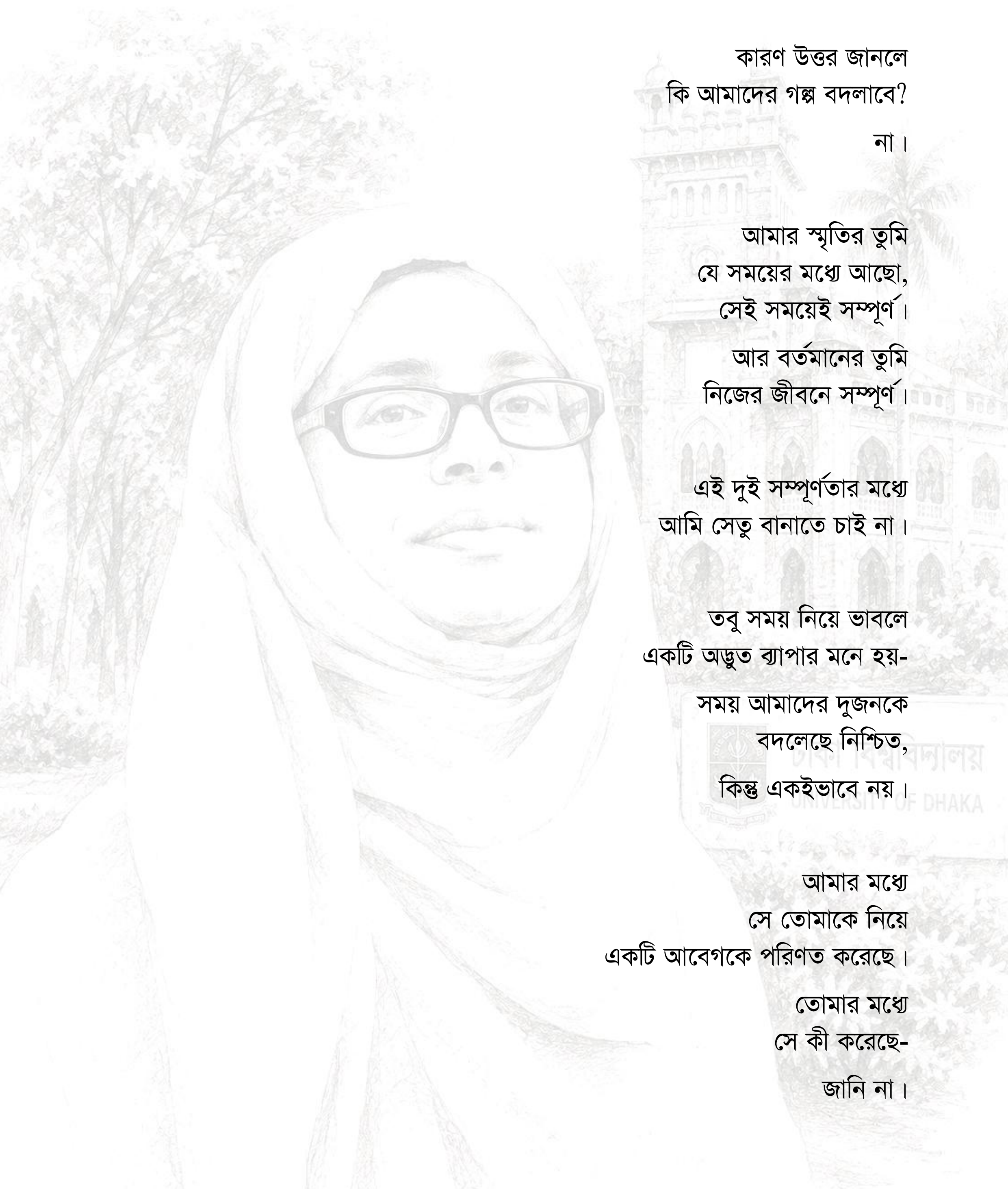

কারণ উত্তর জানলে
কি আমাদের গল্প বদলাবে?

না।

আমার স্মৃতির তুমি
যে সময়ের মধ্যে আছো,
সেই সময়েই সম্পূর্ণ।

আর বর্তমানের তুমি
নিজের জীবনে সম্পূর্ণ।

এই দুই সম্পূর্ণতার মধ্যে
আমি সেতু বানাতে চাই না।

তবু সময় নিয়ে ভাবলে
একটি অদ্ভুত ব্যাপার মনে হয়-

সময় আমাদের দুজনকে
বদলেছে নিশ্চিত,
কিন্তু একইভাবে নয়।

আমার মধ্যে
সে তোমাকে নিয়ে
একটি আবেগকে পরিণত করেছে।

তোমার মধ্যে
সে কী করেছে-

জানি না।

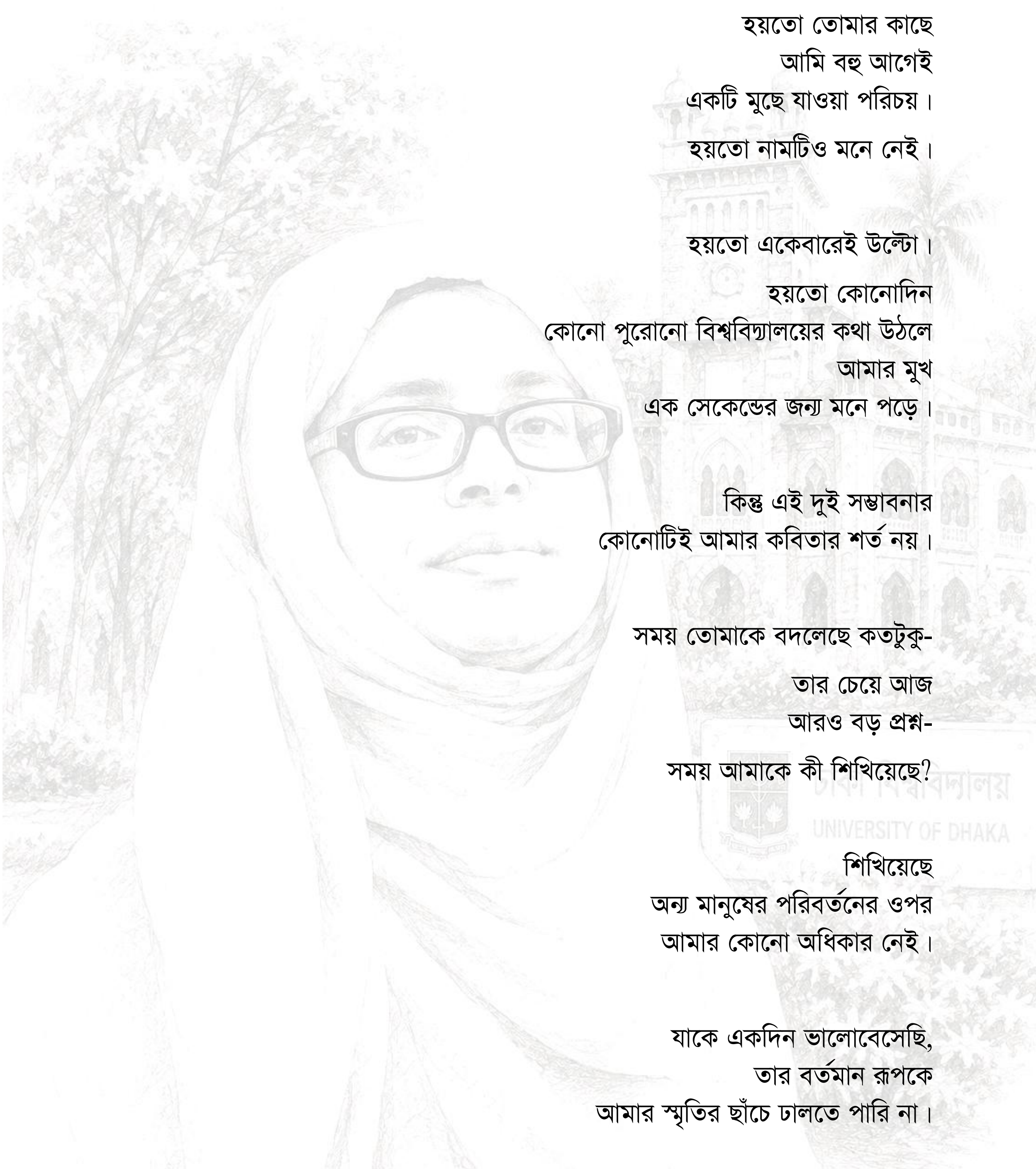

হয়তো তোমার কাছে
আমি বহু আগেই
একটি মুছে যাওয়া পরিচয়।
হয়তো নামটিও মনে নেই।

হয়তো একেবারেই উল্টো।
হয়তো কোনোদিন
কোনো পুরোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা উঠলে
আমার মুখ
এক সেকেন্ডের জন্য মনে পড়ে।

কিন্তু এই দুই সম্ভাবনার
কোনোটিই আমার কবিতার শর্ত নয়।

সময় তোমাকে বদলেছে কতটুকু-
তার চেয়ে আজ
আরও বড় প্রশ্ন-
সময় আমাকে কী শিখিয়েছে?

শিখিয়েছে
অন্য মানুষের পরিবর্তনের ওপর
আমার কোনো অধিকার নেই।

যাকে একদিন ভালোবেসেছি,
তার বর্তমান রূপকে
আমার স্মৃতির ছাঁচে ঢালতে পারি না।

তুমি যদি আজ
একেবারেই আলাদা মানুষ হও-
তবু সেটিই সত্য।

তুমি যদি আমার স্মৃতির চেয়ে
অনেক বেশি হাসিখুশি হও-
ভালো।

যদি অনেক বেশি নীরব-
তবু সেটিই তোমার জীবন।

যদি তোমার চোখে
আমার অচেনা পৃথিবী থাকে-
সেটিই স্বাভাবিক।

একজন মানুষ
ত্রিশ বছর পরেও
একই থাকে না।
থাকা উচিতও নয়।

আমিও তো বদলেছি।
তখন তোমাকে
মুহূর্তের মধ্যে কেন্দ্র করে ফেলতাম।
আজ জানি-
কারও জীবনের কেন্দ্র হতে চাওয়া
আর তাকে ভালোবাসা
এক জিনিস নয়।

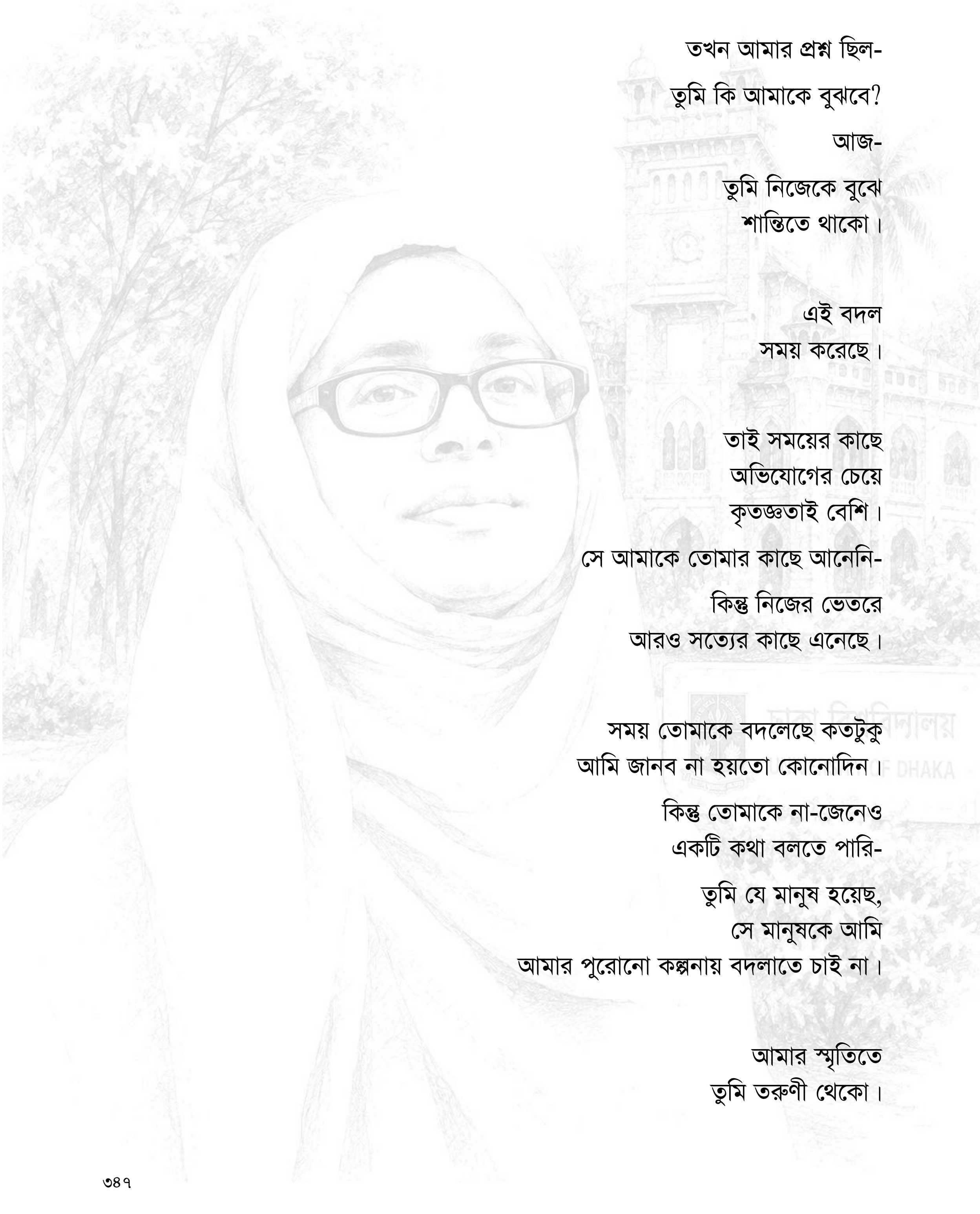

তখন আমার প্রশ্ন ছিল-
তুমি কি আমাকে বুঝবে?
আজ-
তুমি নিজেকে বুঝে
শান্তিতে থাকো।

এই বদল
সময় করেছে।

তাই সময়ের কাছে
অভিযোগের চেয়ে
কৃতজ্ঞতাই বেশি।
সে আমাকে তোমার কাছে আনেনি-
কিন্তু নিজের ভেতরে
আরও সত্যের কাছে এনেছে।

সময় তোমাকে বদলেছে কতটুকু
আমি জানব না হয়তো কোনোদিন।
কিন্তু তোমাকে না-জেনেও
একটি কথা বলতে পারি-
তুমি যে মানুষ হয়েছ,
সে মানুষকে আমি
আমার পুরোনো কল্পনায় বদলাতে চাই না।

আমার স্মৃতিতে
তুমি তরুণী থেকো।

বাস্তবে
তুমি তোমার বর্তমান বয়সেই থেকো।

এই দুইয়ের মাঝখানে
সময় তার কাজ করুক।

আর যদি কোনোদিন
আমাদের দেখা হয়,

আমি যেন তোমার দিকে তাকিয়ে
পুরোনো মুখ ফিরিয়ে দেওয়ার
অপেক্ষা না করি।

বরং মনে মনে বলি-

"সময় তোমাকে বদলেছে।
আমাকেও।
এই পরিবর্তনই প্রমাণ
আমরা দুজনেই জীবন পেরিয়ে এসেছি।"

তারপর তোমাকে
তোমার বর্তমান মুখেই
সম্মান করি।

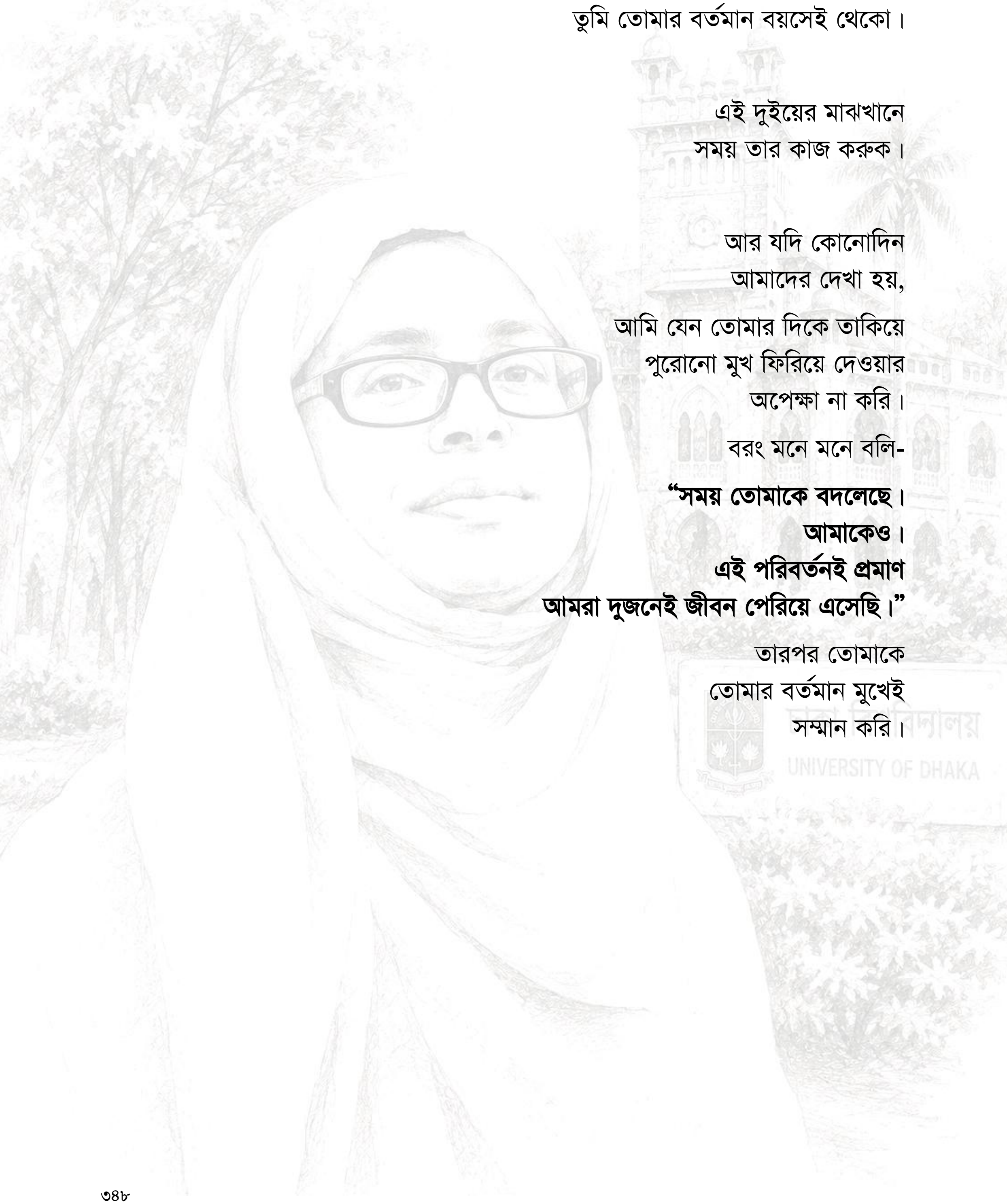

আমার স্মৃতির তুমি

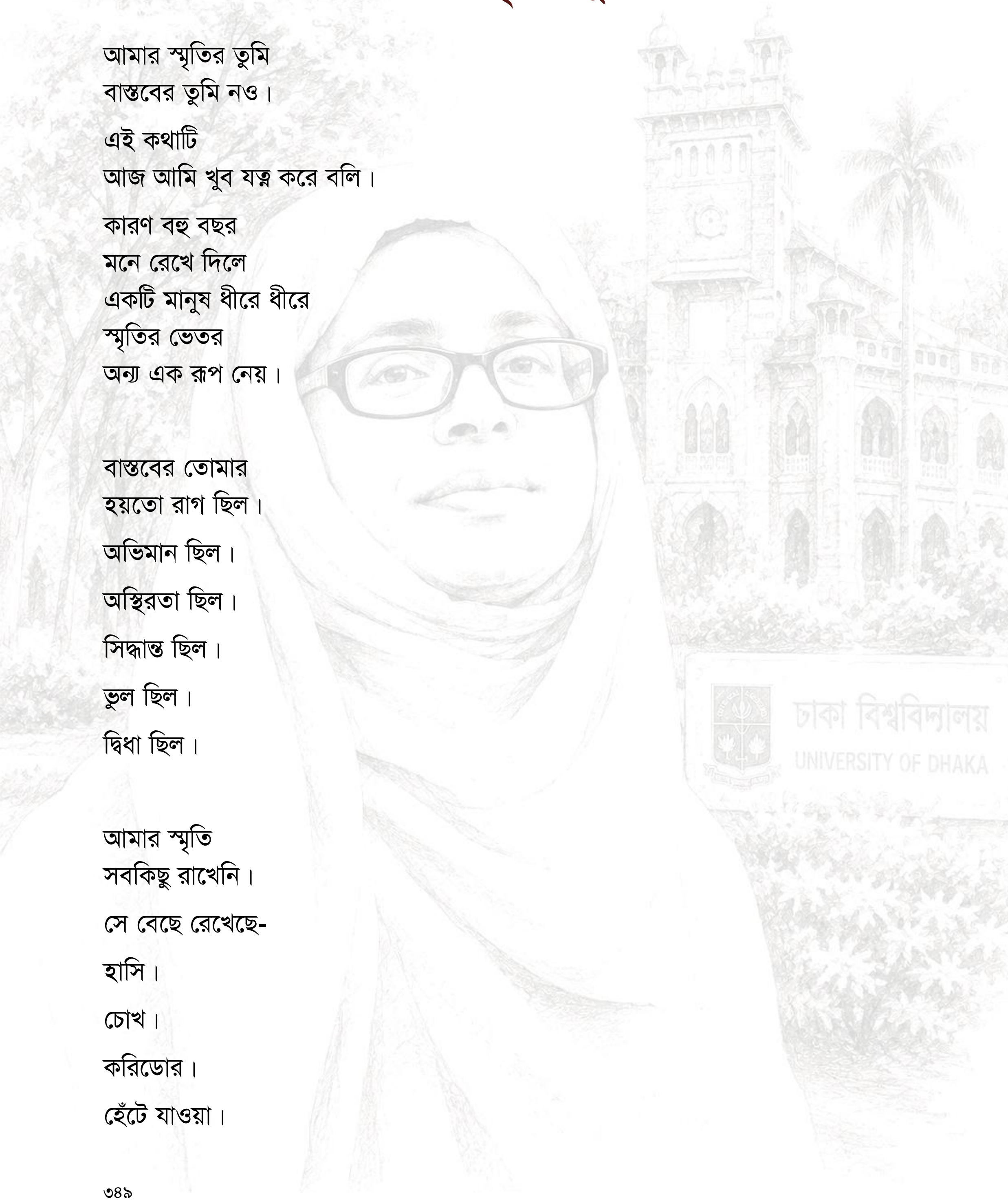

আমার স্মৃতির তুমি
বাস্তবের তুমি নও।

এই কথাটি
আজ আমি খুব যত্ন করে বলি।

কারণ বহু বছর
মনে রেখে দিলে
একটি মানুষ ধীরে ধীরে
স্মৃতির ভেতর
অন্য এক রূপ নেয়।

বাস্তবের তোমার
হয়তো রাগ ছিল।

অভিমান ছিল।

অস্থিরতা ছিল।

সিদ্ধান্ত ছিল।

ভুল ছিল।

দ্বিধা ছিল।

আমার স্মৃতি
সবকিছু রাখেনি।

সে বেছে রেখেছে-

হাসি।

চোখ।

করিডোর।

হেঁটে যাওয়া।

কিছু নীরবতা।

স্মৃতি তাই
সত্যও-
আবার অসম্পূর্ণও।

আমি যদি বলি-
"তুমি এমনই ছিলে,"
তবে হয়তো ভুল বলব।
বরং বলি-
"আমি তোমাকে এমনভাবে মনে রেখেছি।"

এই বাক্যটি
আমার কাছে অনেক বেশি সৎ।

আমার স্মৃতির তুমি
কখনো তর্ক করো না।
কোনো দাবি করো না।
কোনো ব্যাখ্যা দাও না।

বাস্তবের তুমি
অবশ্যই আলাদা ছিলে।
কারণ বাস্তবের মানুষ
নিজের ইচ্ছায় কথা বলে।
স্মৃতির মানুষ
আমাদের নীরবতায় থাকে।

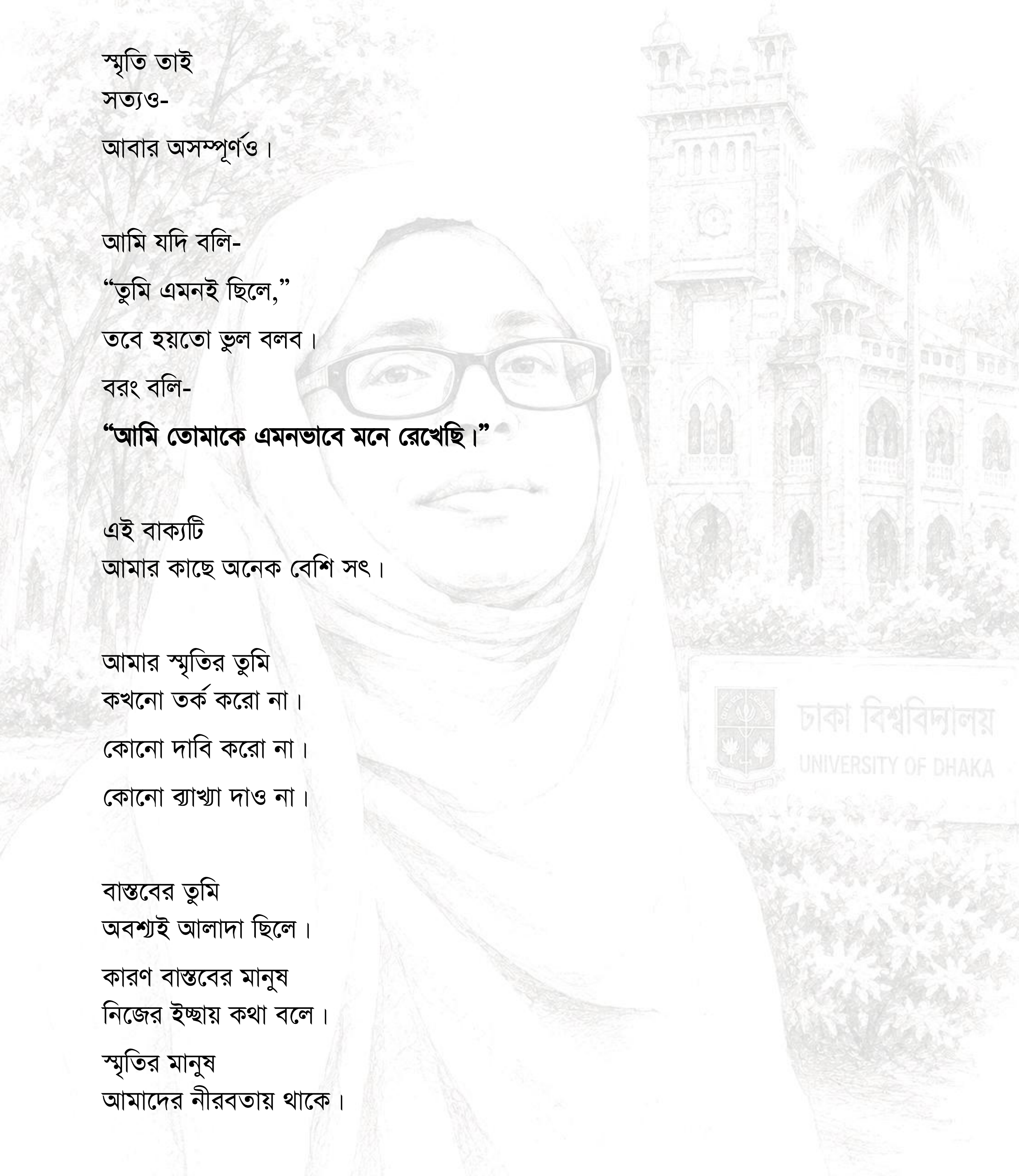

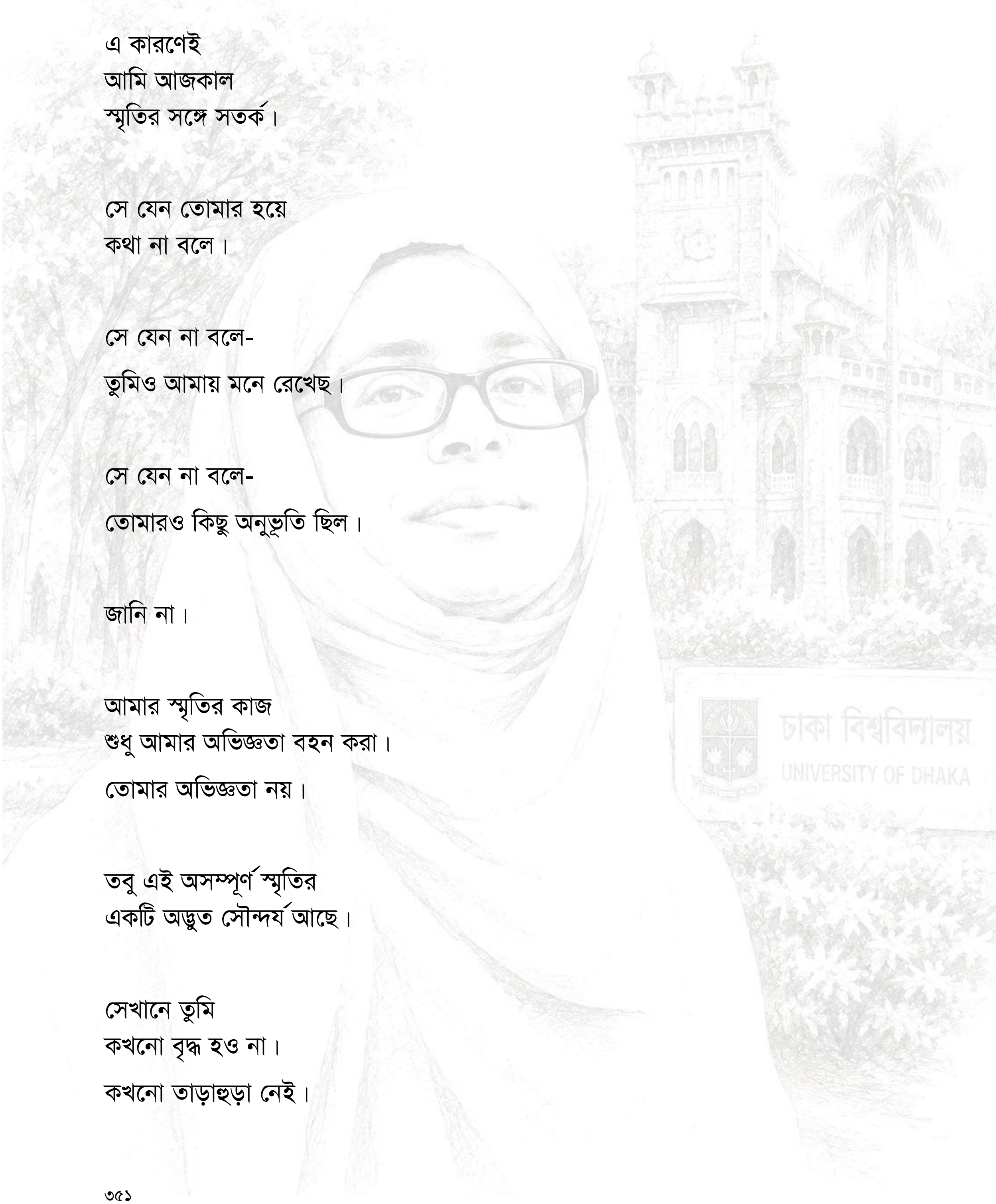

এ কারণেই
আমি আজকাল
স্মৃতির সঙ্গে সতর্ক।

সে যেন তোমার হয়ে
কথা না বলে।

সে যেন না বলে-
তুমিও আমায় মনে রেখেছ।

সে যেন না বলে-
তোমারও কিছু অনুভূতি ছিল।

জানি না।

আমার স্মৃতির কাজ
শুধু আমার অভিজ্ঞতা বহন করা।
তোমার অভিজ্ঞতা নয়।

তবু এই অসম্পূর্ণ স্মৃতির
একটি অদ্ভুত সৌন্দর্য আছে।

সেখানে তুমি
কখনো বৃদ্ধ হও না।
কখনো তাড়াহুড়া নেই।

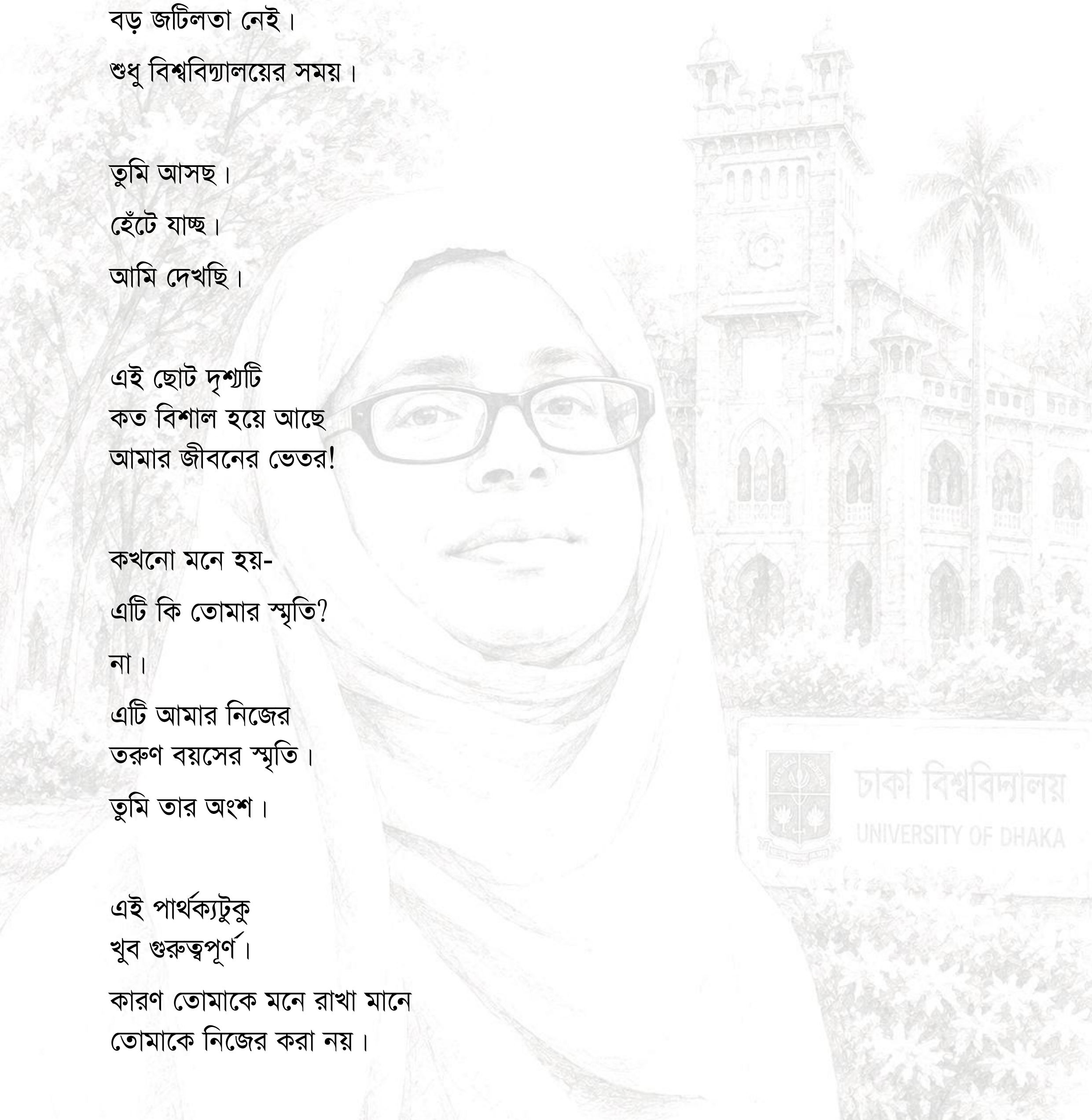

কখনো কোনো জীবনের
বড় জটিলতা নেই।

শুধু বিশ্ববিদ্যালয়ের সময়।

তুমি আসছ।

হেঁটে যাচ্ছ।

আমি দেখছি।

এই ছোট দৃশ্যটি
কত বিশাল হয়ে আছে
আমার জীবনের ভেতর!

কখনো মনে হয়-

এটি কি তোমার স্মৃতি?

না।

এটি আমার নিজের
তরুণ বয়সের স্মৃতি।

তুমি তার অংশ।

এই পার্থক্যটুকু
খুব গুরুত্বপূর্ণ।

কারণ তোমাকে মনে রাখা মানে
তোমাকে নিজের করা নয়।

বরং তুমি
আমার জীবনের একটি ঘটনার অংশ-

একটি প্রথম প্রেমের।

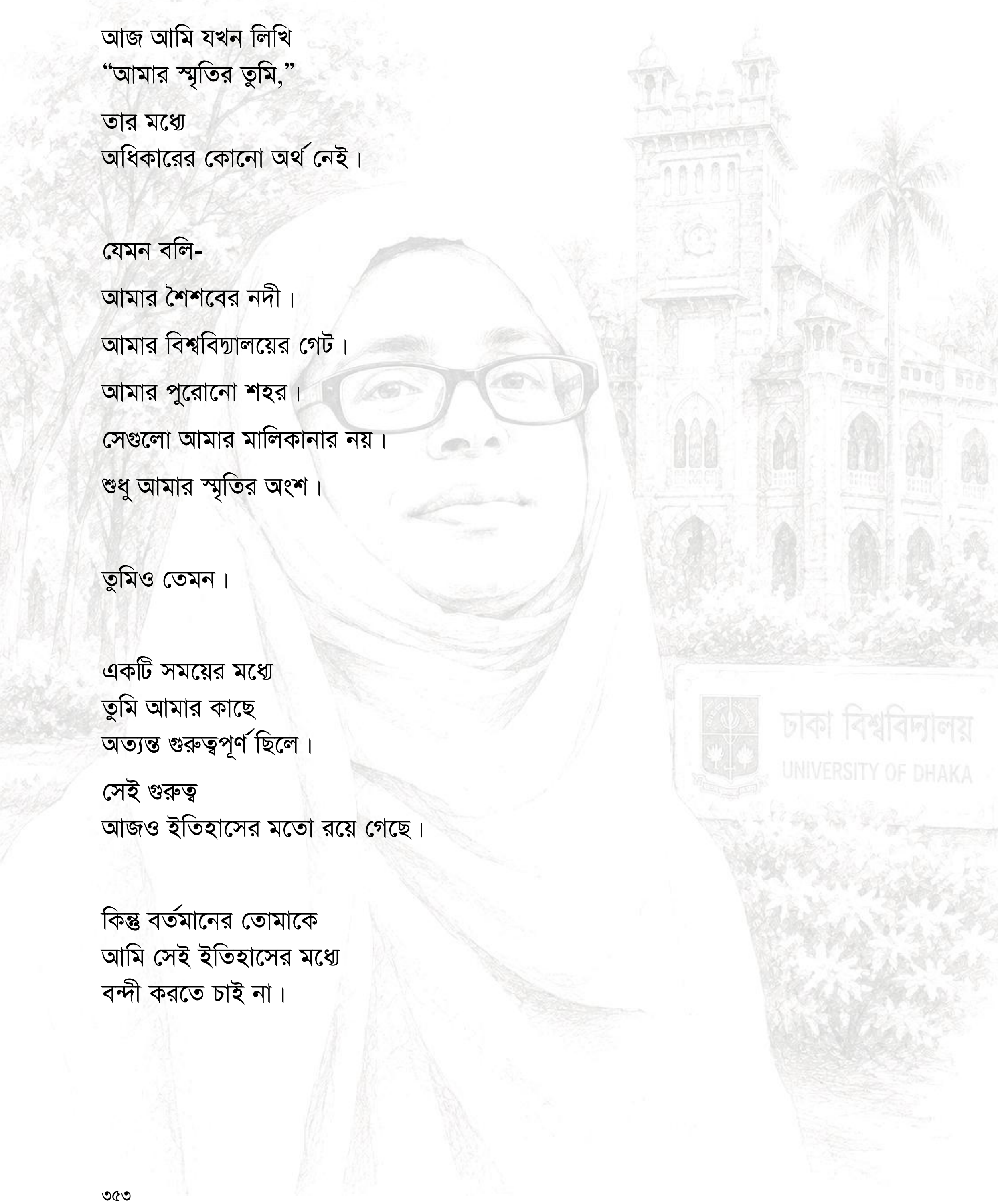

আজ আমি যখন লিখি
"আমার স্মৃতির তুমি,"

তার মধ্যে
অধিকারের কোনো অর্থ নেই।

যেমন বলি-

আমার শৈশবের নদী।

আমার বিশ্ববিদ্যালয়ের গেট।

আমার পুরোনো শহর।

সেগুলো আমার মালিকানার নয়।

শুধু আমার স্মৃতির অংশ।

তুমিও তেমন।

একটি সময়ের মধ্যে
তুমি আমার কাছে
অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিলে।

সেই গুরুত্ব
আজও ইতিহাসের মতো রয়ে গেছে।

কিন্তু বর্তমানের তোমাকে
আমি সেই ইতিহাসের মধ্যে
বন্দী করতে চাই না।

হয়তো তোমার নিজের স্মৃতিতে
সে সময়টির অর্থ
একেবারেই অন্য।

সেটিও সত্য।

একই ঘটনা
দুই মানুষের কাছে
দুটি আলাদা গল্প।

আমি আমার গল্প লিখছি।

তোমারটা লিখছি না।

এই সীমা যত পরিষ্কার হয়,
কবিতাও তত শান্ত হয়।

আগে আমি তোমাকে
উপমায় ভরিয়ে দিতাম।

আজ একটু খালি রাখি।

যেখানে তুমি
নিজের মতো থাকতে পারো।

আমার স্মৃতির তুমি
একটি অসমাপ্ত ছবি।

আর এখন
আমি তাকে সম্পূর্ণ করার চেষ্টা করি না।

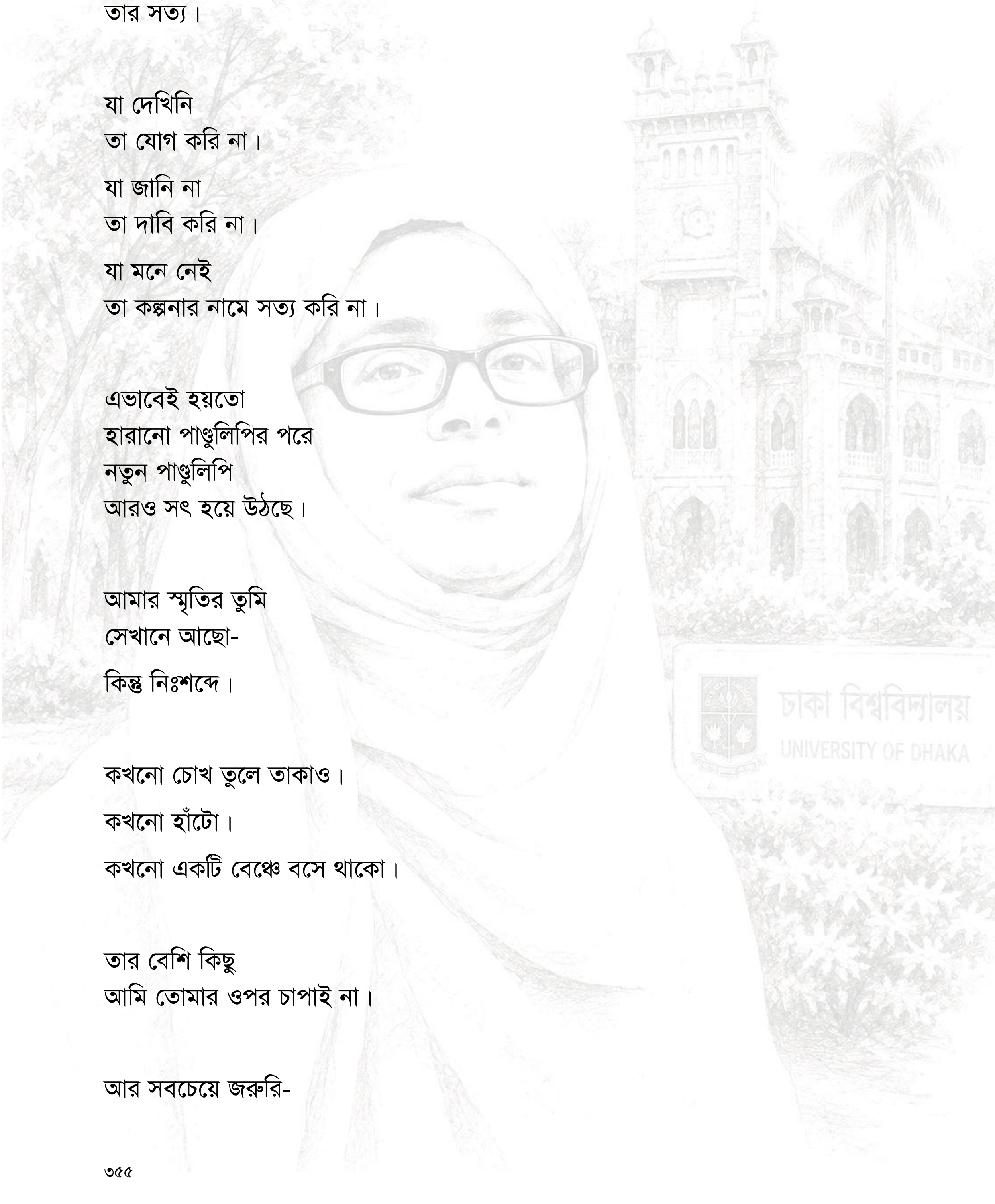

কারণ অসম্পূর্ণতাই
তার সত্য।

যা দেখিনি
তা যোগ করি না।

যা জানি না
তা দাবি করি না।

যা মনে নেই
তা কল্পনার নামে সত্য করি না।

এভাবেই হয়তো
হারানো পাণ্ডুলিপির পরে
নতুন পাণ্ডুলিপি
আরও সৎ হয়ে উঠছে।

আমার স্মৃতির তুমি
সেখানে আছো-

কিন্তু নিঃশব্দে।

কখনো চোখ তুলে তাকাও।

কখনো হাঁটো।

কখনো একটি বেঞ্চে বসে থাকো।

তার বেশি কিছু
আমি তোমার ওপর চাপাই না।

আর সবচেয়ে জরুরি-

স্মৃতির তুমি
কখনো বর্তমানের তোমার ওপর
অধিকার দাবি করে না।

তাই আজ বলতে পারি-

আমার স্মৃতির তুমি
আমারই ভেতরের একটি আলো;
বাস্তবের তুমি
তোমার নিজের আকাশ।

দুটিকে আলাদা রাখতে শিখেই
আমি হয়তো
তোমাকে সবচেয়ে সম্মানের সঙ্গে
মনে রাখতে পেরেছি।

তোমাকে আর চাই না-তবু ভালোবাসি

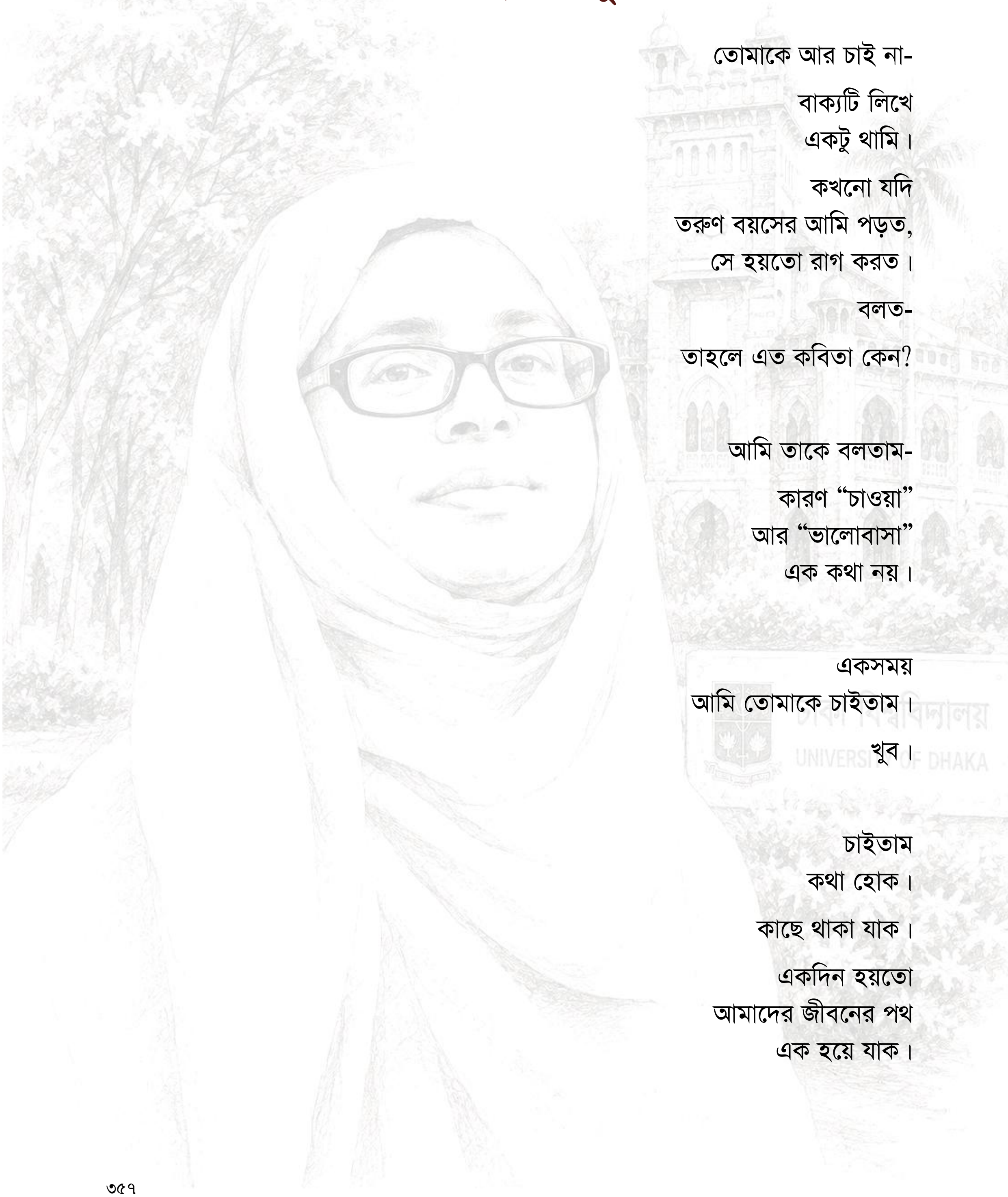

তোমাকে আর চাই না-
বাক্যটি লিখে
একটু থামি।
কখনো যদি
তরুণ বয়সের আমি পড়ত,
সে হয়তো রাগ করত।
বলত-
তাহলে এত কবিতা কেন?

আমি তাকে বলতাম-
কারণ "চাওয়া"
আর "ভালোবাসা"
এক কথা নয়।

একসময়
আমি তোমাকে চাইতাম।
খুব।

চাইতাম
কথা হোক।
কাছে থাকা যাক।
একদিন হয়তো
আমাদের জীবনের পথ
এক হয়ে যাক।

এগুলো ছিল
তরুণ বয়সের স্বাভাবিক আকাঙ্ক্ষা।
তাকে আমি
আজ লজ্জার চোখে দেখি না।

কিন্তু জীবন
সব আকাঙ্ক্ষার উত্তর দেয় না।

তুমি তোমার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলে।
আমাদের পথ আলাদা হয়েছে।
সময় গেছে।

এখন এত বছর পরে
তোমাকে "চাওয়া" শব্দটি
আমার কাছে ভুল মনে হয়।

কারণ কোন তোমাকে চাইব?
স্মৃতির সেই তরুণীকে?
সে তো আর বাস্তবে নেই।
বর্তমানের তোমাকে?
তাকে তো আমি চিনি না।

তাহলে কী চাইব?
কী অধিকারে?

না।

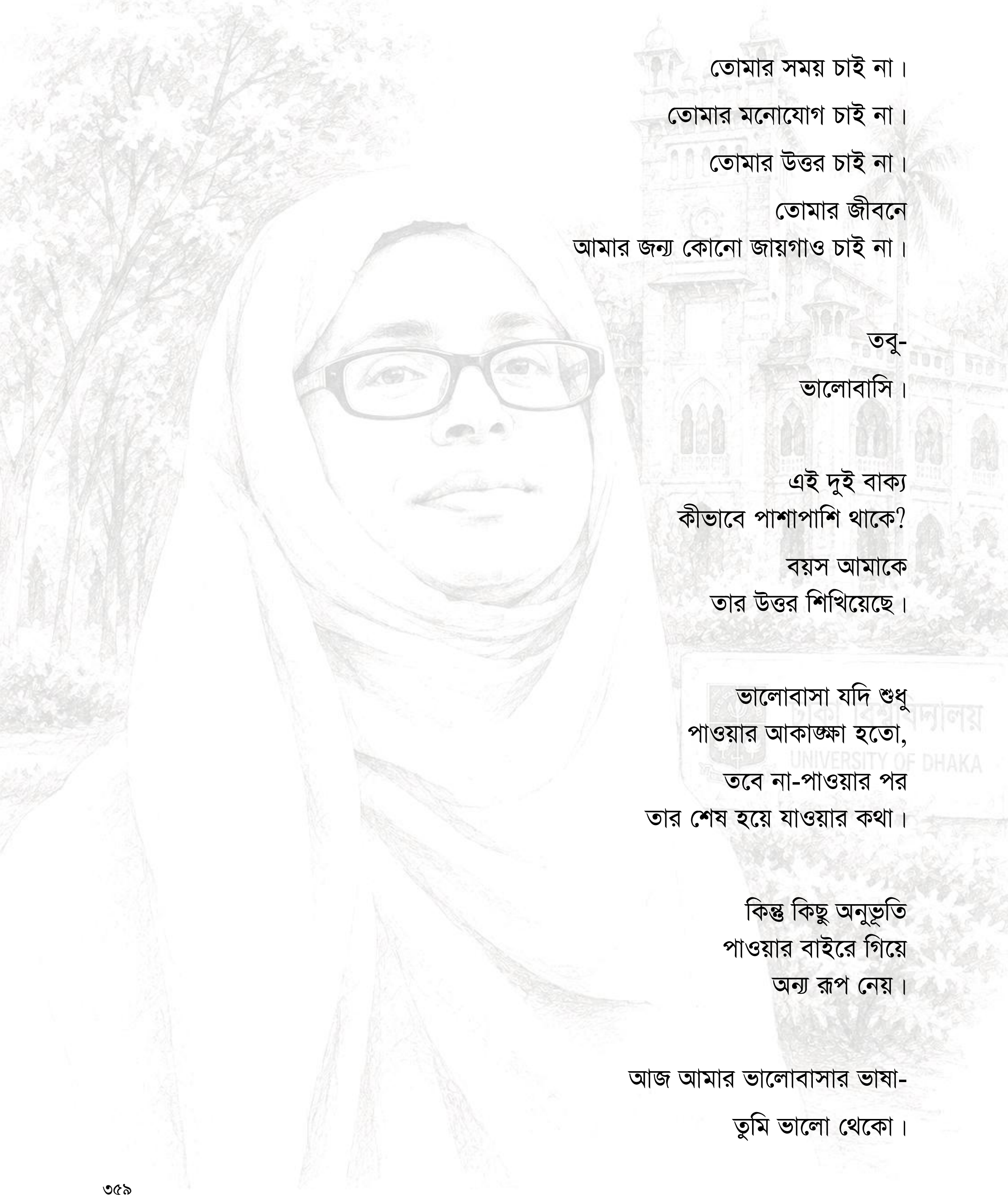

আজ তোমাকে চাই না।

তোমার সময় চাই না।
তোমার মনোযোগ চাই না।
তোমার উত্তর চাই না।
তোমার জীবনে
আমার জন্য কোনো জায়গাও চাই না।

তবু-
ভালোবাসি।

এই দুই বাক্য
কীভাবে পাশাপাশি থাকে?
বয়স আমাকে
তার উত্তর শিখিয়েছে।

ভালোবাসা যদি শুধু
পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা হতো,
তবে না-পাওয়ার পর
তার শেষ হয়ে যাওয়ার কথা।

কিন্তু কিছু অনুভূতি
পাওয়ার বাইরে গিয়ে
অন্য রূপ নেয়।

আজ আমার ভালোবাসার ভাষা-
তুমি ভালো থেকো।

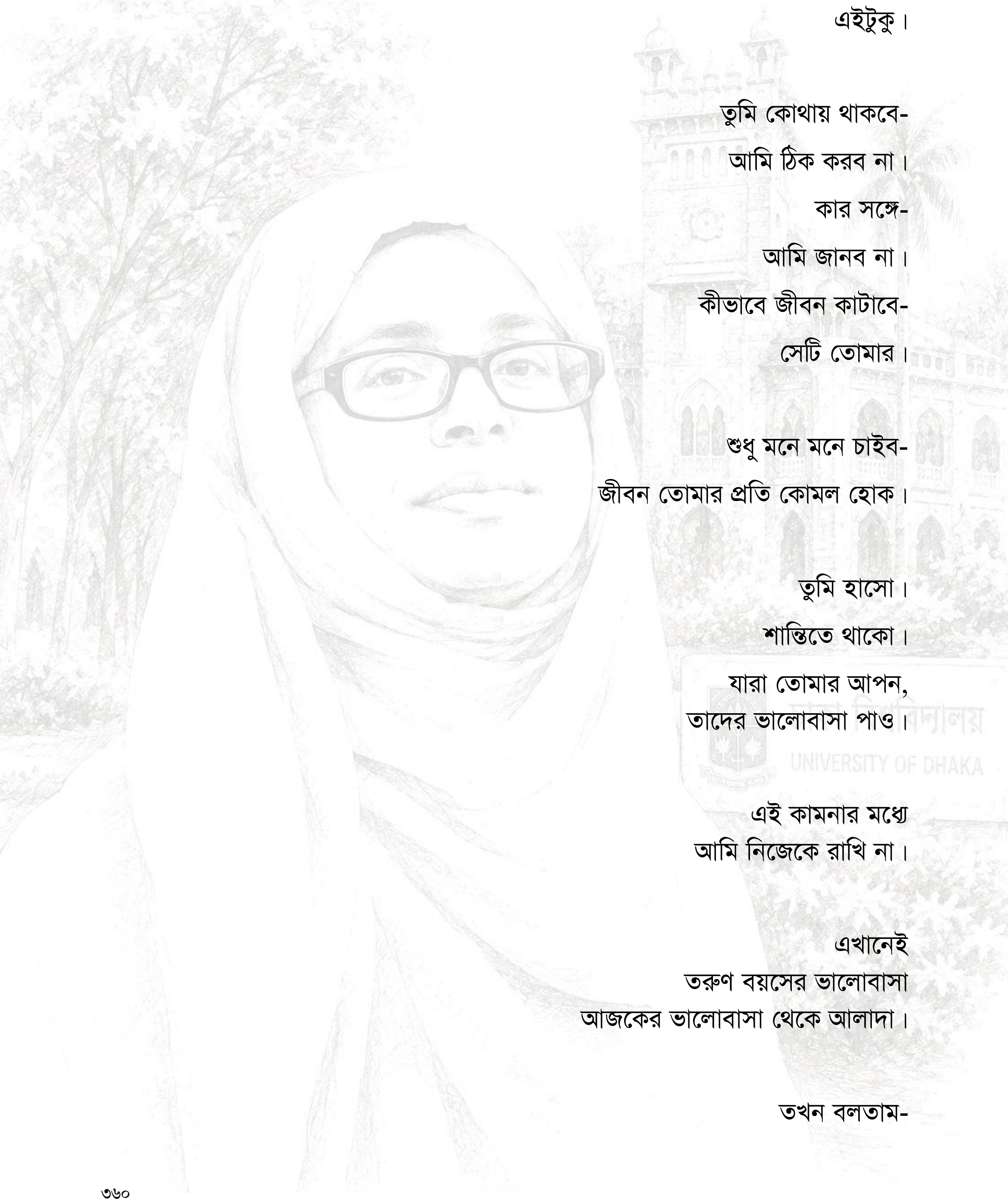

এইটুকু।

তুমি কোথায় থাকবে-
আমি ঠিক করব না।
কার সঙ্গে-
আমি জানব না।
কীভাবে জীবন কাটাবে-
সেটি তোমার।

শুধু মনে মনে চাইব-
জীবন তোমার প্রতি কোমল হোক।

তুমি হাসো।
শান্তিতে থাকো।
যারা তোমার আপন,
তাদের ভালোবাসা পাও।

এই কামনার মধ্যে
আমি নিজেকে রাখি না।

এখানেই
তরুণ বয়সের ভালোবাসা
আজকের ভালোবাসা থেকে আলাদা।

তখন বলতাম-

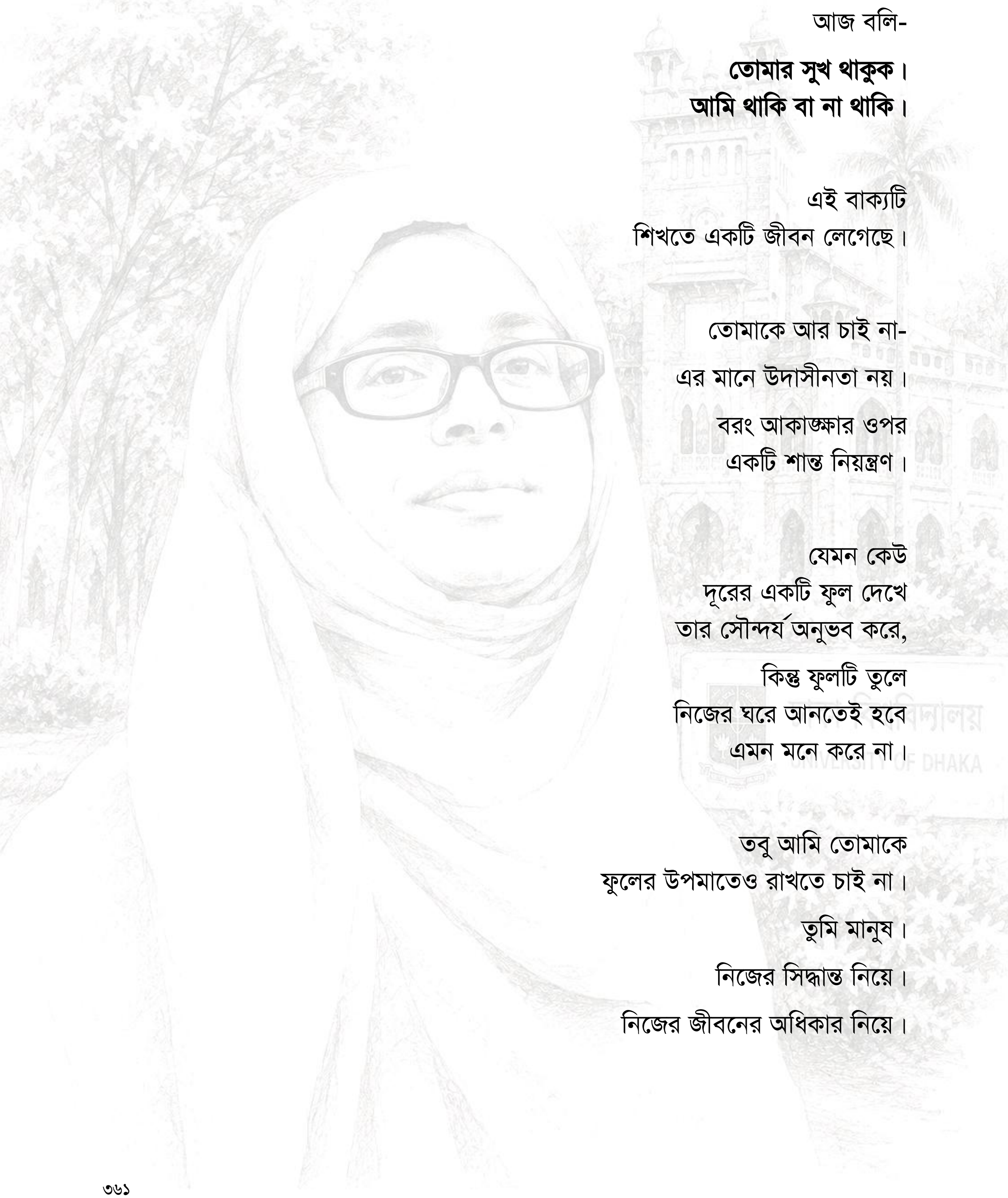

তোমার সুখে আমি থাকি।

আজ বলি-

তোমার সুখ থাকুক।
আমি থাকি বা না থাকি।

এই বাক্যটি
শিখতে একটি জীবন লেগেছে।

তোমাকে আর চাই না-

এর মানে উদাসীনতা নয়।

বরং আকাঙ্ক্ষার ওপর
একটি শান্ত নিয়ন্ত্রণ।

যেমন কেউ
দূরের একটি ফুল দেখে
তার সৌন্দর্য অনুভব করে,

কিন্তু ফুলটি তুলে
নিজের ঘরে আনতেই হবে
এমন মনে করে না।

তবু আমি তোমাকে
ফুলের উপমাতেও রাখতে চাই না।

তুমি মানুষ।

নিজের সিদ্ধান্ত নিয়ে।

নিজের জীবনের অধিকার নিয়ে।

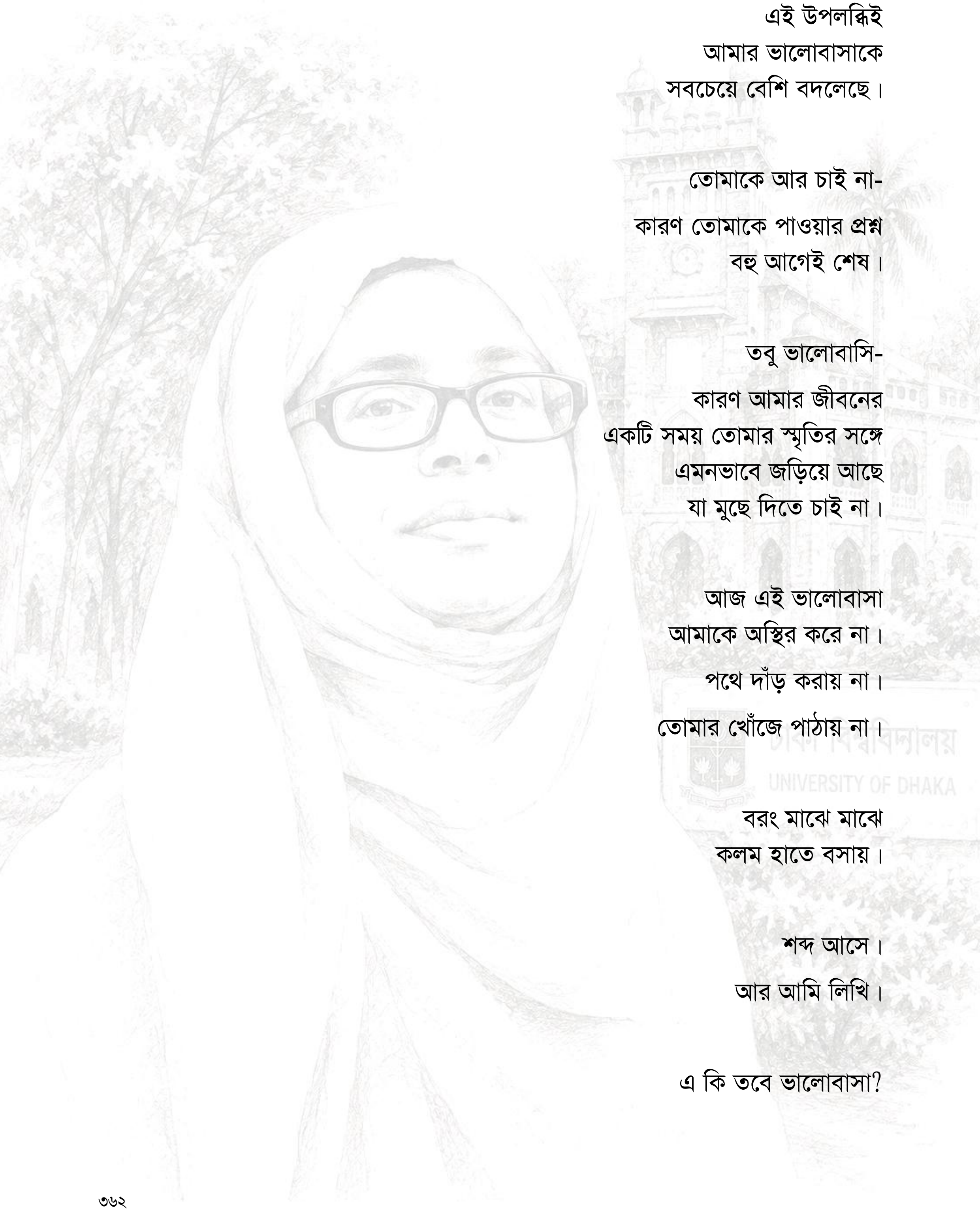

এই উপলব্ধিই
আমার ভালোবাসাকে
সবচেয়ে বেশি বদলেছে।

তোমাকে আর চাই না-
কারণ তোমাকে পাওয়ার প্রশ্ন
বহু আগেই শেষ।

তবু ভালোবাসি-
কারণ আমার জীবনের
একটি সময় তোমার স্মৃতির সঙ্গে
এমনভাবে জড়িয়ে আছে
যা মুছে দিতে চাই না।

আজ এই ভালোবাসা
আমাকে অস্থির করে না।
পথে দাঁড় করায় না।
তোমার খোঁজে পাঠায় না।

বরং মাঝে মাঝে
কলম হাতে বসায়।

শব্দ আসে।
আর আমি লিখি।

এ কি তবে ভালোবাসা?

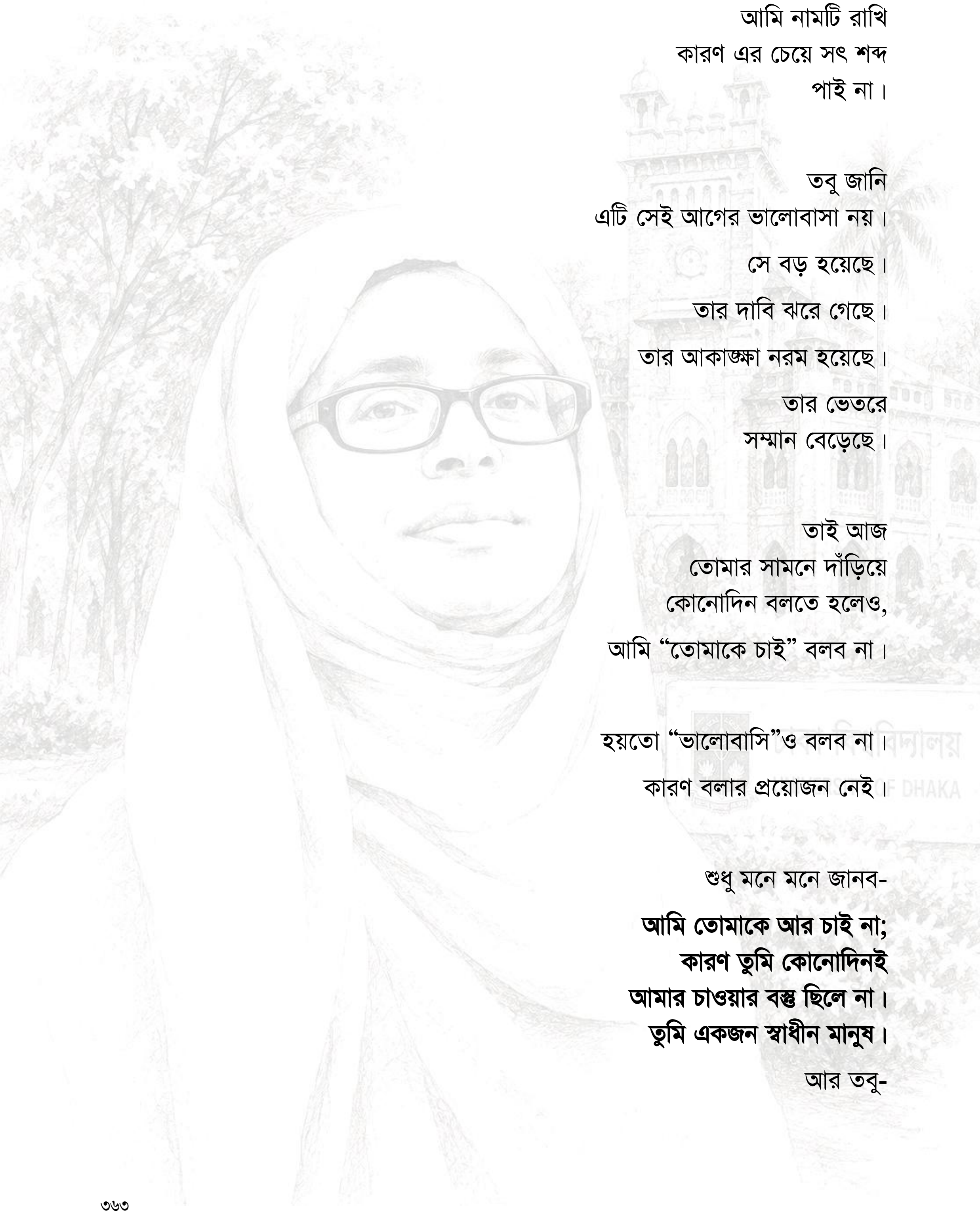

আমি নামটি রাখি
কারণ এর চেয়ে সৎ শব্দ
পাই না।

তবু জানি
এটি সেই আগের ভালোবাসা নয়।
সে বড় হয়েছে।
তার দাবি ঝরে গেছে।
তার আকাঙ্ক্ষা নরম হয়েছে।
তার ভেতরে
সম্মান বেড়েছে।

তাই আজ
তোমার সামনে দাঁড়িয়ে
কোনোদিন বলতে হলেও,
আমি "তোমাকে চাই" বলব না।

হয়তো "ভালোবাসি"ও বলব না।
কারণ বলার প্রয়োজন নেই।

শুধু মনে মনে জানব-
আমি তোমাকে আর চাই না;
কারণ তুমি কোনোদিনই
আমার চাওয়ার বস্তু ছিলে না।
তুমি একজন স্বাধীন মানুষ।
আর তবু-

আমার জীবনের যে অংশে
তোমাকে ভালোবেসেছিলাম,
সেই ভালোবাসার প্রতি
আমি আজও অসত্য হতে পারিনি।

তাই বাক্যটি রয়ে যায়-

তোমাকে আর চাই না-
তবু ভালোবাসি।

অধিকারহীন প্রেম

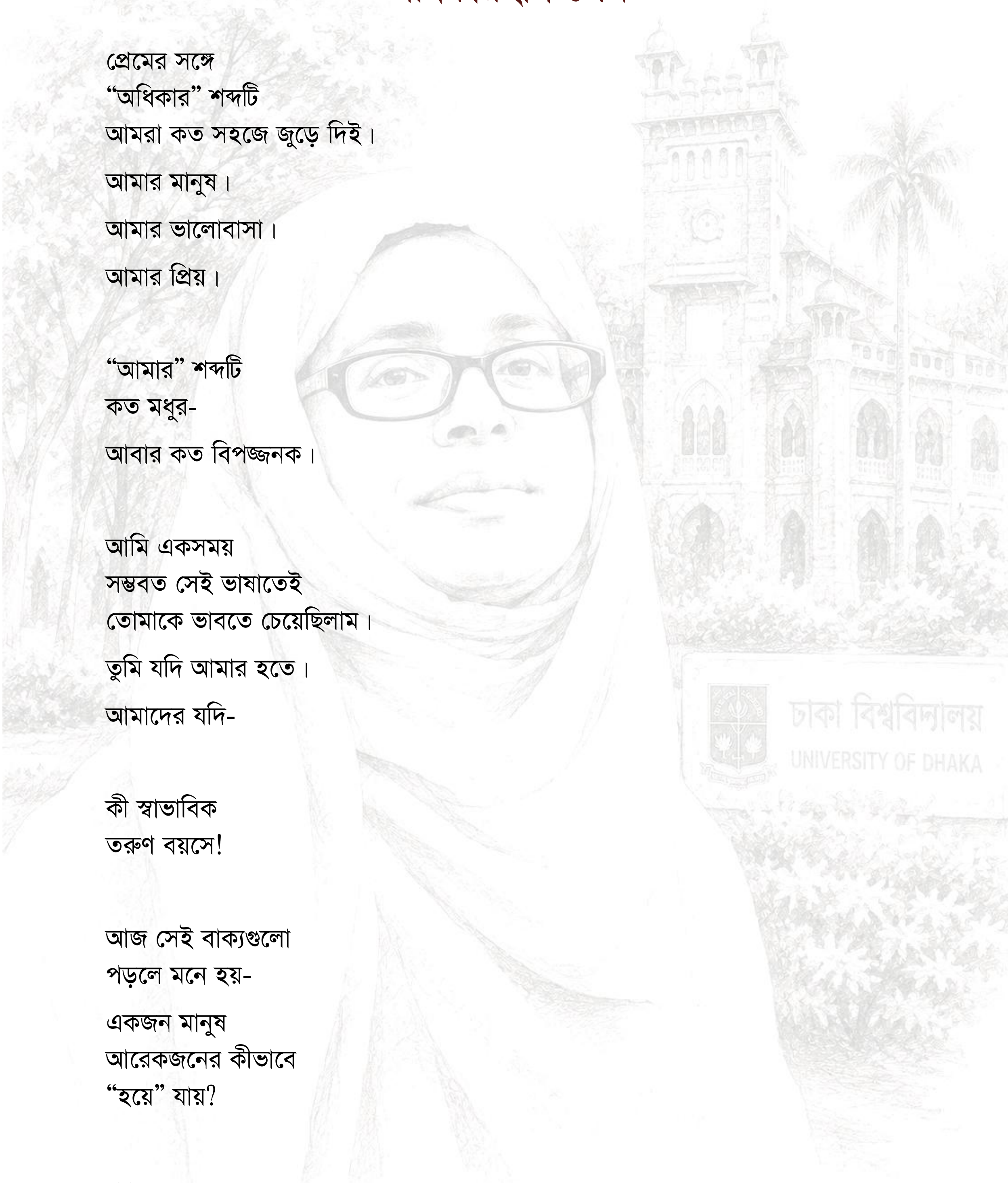

প্রেমের সঙ্গে
"অধিকার" শব্দটি
আমরা কত সহজে জুড়ে দিই।

আমার মানুষ।

আমার ভালোবাসা।

আমার প্রিয়।

"আমার" শব্দটি
কত মধুর-

আবার কত বিপজ্জনক।

আমি একসময়
সম্ভবত সেই ভাষাতেই
তোমাকে ভাবতে চেয়েছিলাম।

তুমি যদি আমার হতে।

আমাদের যদি-

কী স্বাভাবিক
তরুণ বয়সে!

আজ সেই বাক্যগুলো
পড়লে মনে হয়-

একজন মানুষ
আরেকজনের কীভাবে
"হয়ে" যায়?

মানুষ সম্পর্কের অংশ হয়।

প্রতিশ্রুতি দেয়।

দায়িত্ব নেয়।

কিন্তু মানুষ
মানুষের সম্পত্তি হয় না।

এই সত্যটি
আমার কাছে
অধিকারহীন প্রেমের ভিত্তি।

আমি তোমাকে ভালোবেসেছি-

এই সত্য
আমাকে তোমার ওপর
কোনো অধিকার দেয়নি।

তুমি আমার অনুভূতির কারণ হতে পারো,

তবু তার দায়
তোমার নয়।

আমি রাত জেগে লিখেছি-

তাই তুমি পড়বে
এমন কোনো নিয়ম নেই।

আমি অপেক্ষা করেছি-

তাই তুমি আসবে
এমন কোনো বাধ্যবাধকতা নেই।

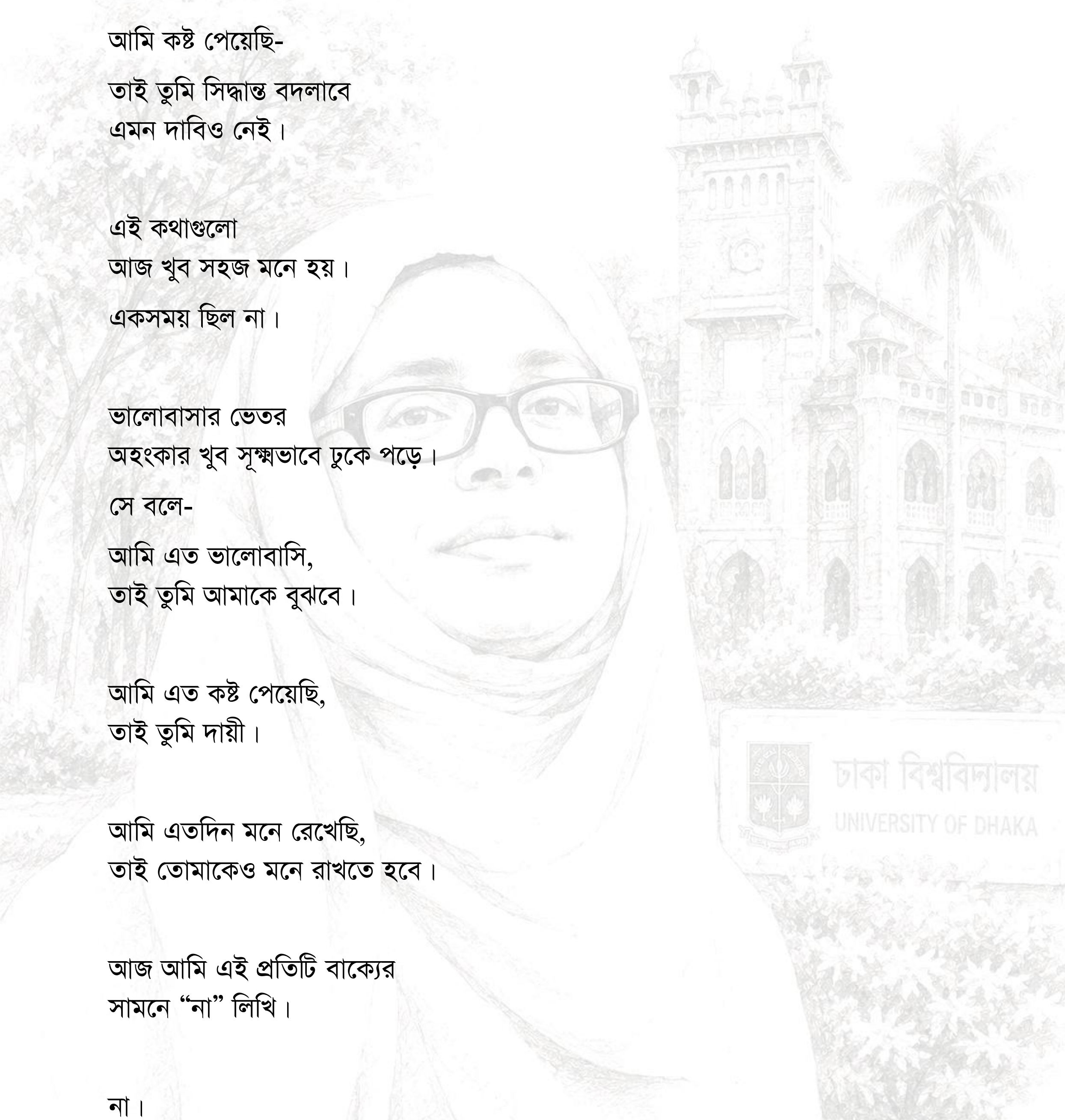

আমি কষ্ট পেয়েছি-

তাই তুমি সিদ্ধান্ত বদলাবে
এমন দাবিও নেই।

এই কথাগুলো
আজ খুব সহজ মনে হয়।

একসময় ছিল না।

ভালোবাসার ভেতর
অহংকার খুব সূক্ষ্মভাবে ঢুকে পড়ে।

সে বলে-

আমি এত ভালোবাসি,
তাই তুমি আমাকে বুঝবে।

আমি এত কষ্ট পেয়েছি,
তাই তুমি দায়ী।

আমি এতদিন মনে রেখেছি,
তাই তোমাকেও মনে রাখতে হবে।

আজ আমি এই প্রতিটি বাক্যের
সামনে “না” লিখি।

না।

আমার অনুভূতির গভীরতা
তোমার স্বাধীনতার মাপ নয়।

অধিকারহীন প্রেম
এই জায়গা থেকেই শুরু।

সে বলে-

আমি তোমাকে ভালোবাসি,

কিন্তু তুমি
আমার ভালোবাসার কাছে
ঋণী নও।

কী কঠিন বাক্য!

আবার কী মুক্ত।

এই বাক্য গ্রহণ করলে
ভালোবাসা আর দরকষাকষি থাকে না।

তুমি কী দিলে?

আমি কী পেলাম?

কতদিন অপেক্ষা করলাম?

তুমি মনে রেখেছ কি?

এসব হিসাবের প্রয়োজন কমে যায়।

তখন ভালোবাসা
নিজেরই একটি সত্য।

তবে অধিকারহীন মানে
সীমাহীন নয়।

বরং উল্টো।

অধিকারহীন প্রেম
সীমা সবচেয়ে বেশি বোঝে।

সে জানে-

প্রিয় মানুষটি
দূরত্ব চাইলে দূরে থাকতে হয়।

উত্তর না দিলে
বারবার প্রশ্ন করা যায় না।

তার জীবনের খবর
তার অনুমতি ছাড়া
জানতেই হবে না।

কবিতা লেখা যায়-

কিন্তু কবিতাকে
তার দরজায় বোঝা করে রাখা যায় না।

এই জায়গায় এসে
আমার পুরোনো দুই পঙ্ক্তির
অর্থ আবার ফিরে আসে-

তোমার বেদনার বিনিময়ে
আমার তৃপ্তি চাই না।

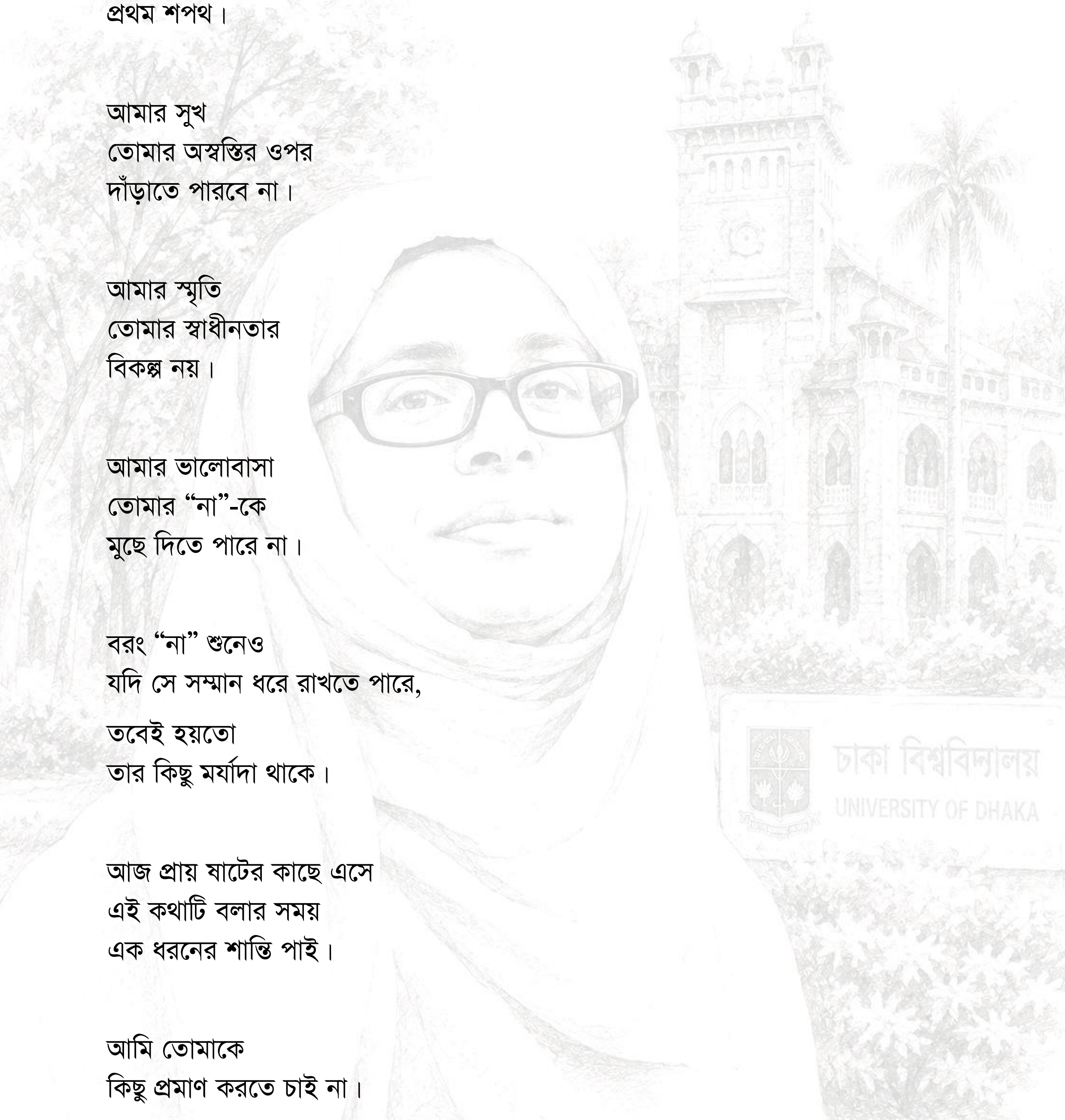

এই তো অধিকারহীন প্রেমের
প্রথম শপথ।

আমার সুখ
তোমার অস্বস্তির ওপর
দাঁড়াতে পারবে না।

আমার স্মৃতি
তোমার স্বাধীনতার
বিকল্প নয়।

আমার ভালোবাসা
তোমার "না"-কে
মুছে দিতে পারে না।

বরং "না" শুনেও
যদি সে সম্মান ধরে রাখতে পারে,
তবেই হয়তো
তার কিছু মর্যাদা থাকে।

আজ প্রায় ষাটের কাছে এসে
এই কথাটি বলার সময়
এক ধরনের শান্তি পাই।

আমি তোমাকে
কিছু প্রমাণ করতে চাই না।

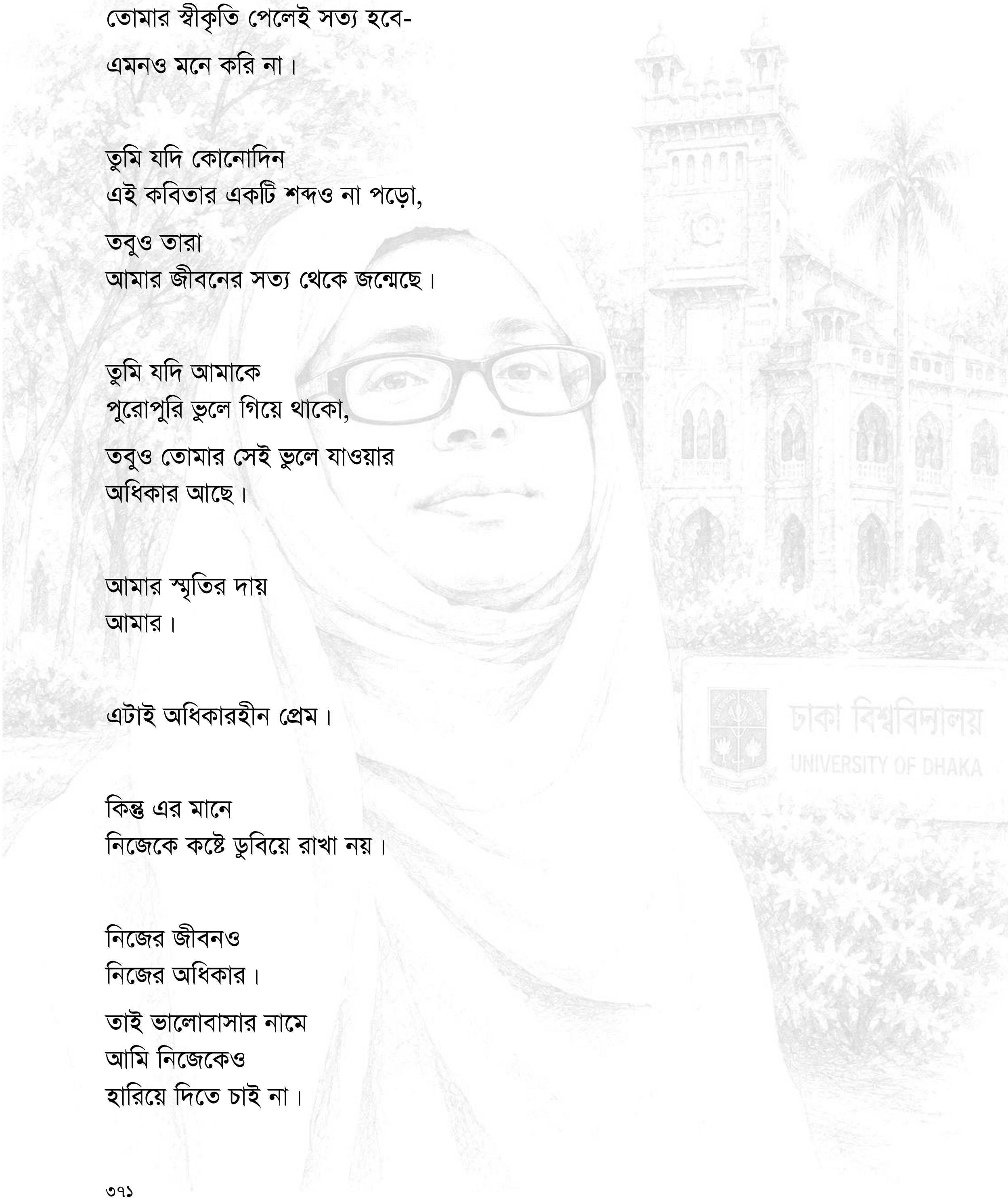

আমার ভালোবাসা
তোমার স্বীকৃতি পেলেই সত্য হবে-
এমনও মনে করি না।

তুমি যদি কোনোদিন
এই কবিতার একটি শব্দও না পড়ো,
তবুও তারা
আমার জীবনের সত্য থেকে জন্মেছে।

তুমি যদি আমাকে
পুরোপুরি ভুলে গিয়ে থাকো,
তবুও তোমার সেই ভুলে যাওয়ার
অধিকার আছে।

আমার স্মৃতির দায়
আমার।

এটাই অধিকারহীন প্রেম।

কিন্তু এর মানে
নিজেকে কষ্টে ডুবিয়ে রাখা নয়।

নিজের জীবনও
নিজের অধিকার।
তাই ভালোবাসার নামে
আমি নিজেকেও
হারিয়ে দিতে চাই না।

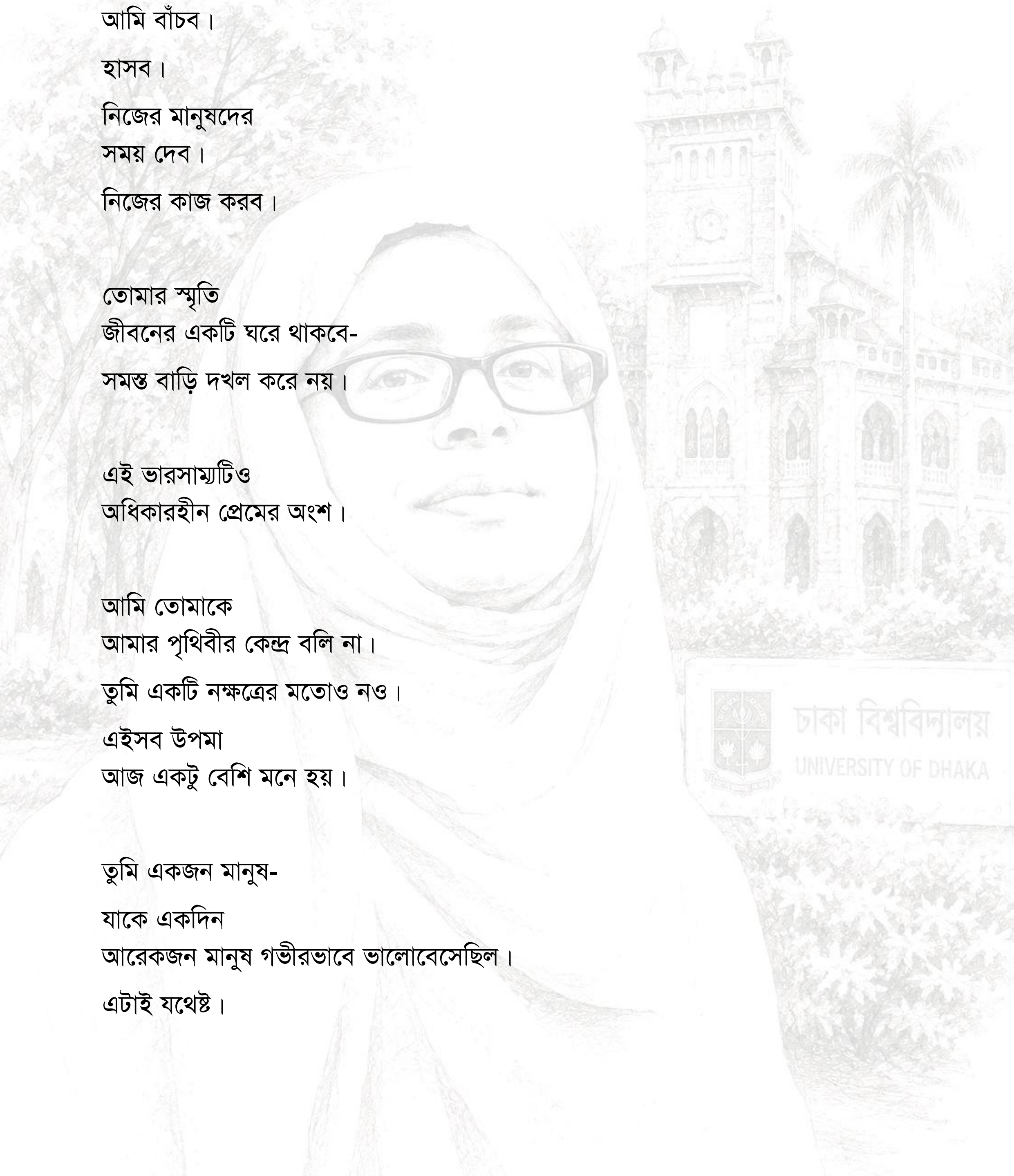

আমি বাঁচব।

হাসব।

নিজের মানুষদের
সময় দেব।

নিজের কাজ করব।

তোমার স্মৃতি
জীবনের একটি ঘরে থাকবে-

সমস্ত বাড়ি দখল করে নয়।

এই ভারসাম্যটিও
অধিকারহীন প্রেমের অংশ।

আমি তোমাকে
আমার পৃথিবীর কেন্দ্র বলি না।

তুমি একটি নক্ষত্রের মতোও নও।

এইসব উপমা
আজ একটু বেশি মনে হয়।

তুমি একজন মানুষ-

যাকে একদিন
আরেকজন মানুষ গভীরভাবে ভালোবেসেছিল।

এটাই যথেষ্ট।

তাই আজ
আমার ভালোবাসার সামনে
একটি ছোট্ট ঘোষণা রাখি-

তোমার ওপর আমার কোনো অধিকার নেই।

তোমার বর্তমানের ওপর নয়।

তোমার স্মৃতির ওপর নয়।

তোমার উত্তরের ওপর নয়।

এমনকি
আমাকে মনে রাখার ওপরও নয়।

শুধু একটি জায়গায়
আমার অধিকার আছে-

নিজের হৃদয়ের ভেতর
আমার অনুভূতিকে
সৎভাবে বোঝার।

সেখানে আমি
তোমাকে কোনোদিন বন্দী করব না।

শুধু একটি স্মৃতির মতো রাখব।

এবং যদি ভালোবাসার
সব অলংকার সরিয়ে
শেষে একটি বাক্যই রাখতে হয়,

আমি লিখব-

"আমি তোমাকে ভালোবেসেছি;
তাই তোমাকে আমার হতে হবে না।"

আর তার নিচে
আরেকটি-

"তুমি স্বাধীন-
এই সত্যটিকে সম্মান করতে পারাই
আমার ভালোবাসার
সবচেয়ে পরিণত উচ্চারণ।"

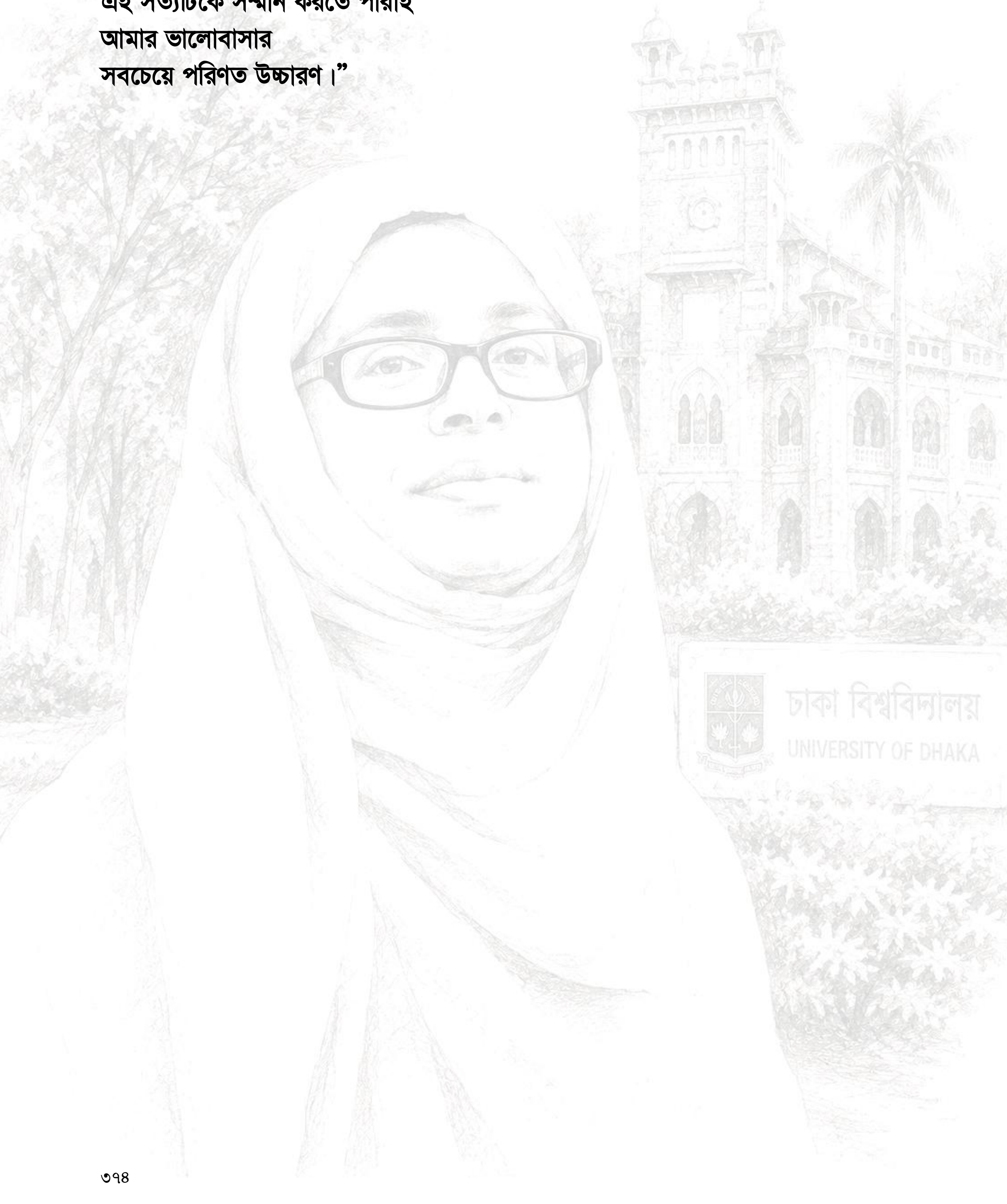

তোমার জীবনে আমার কোনো দাবি নেই

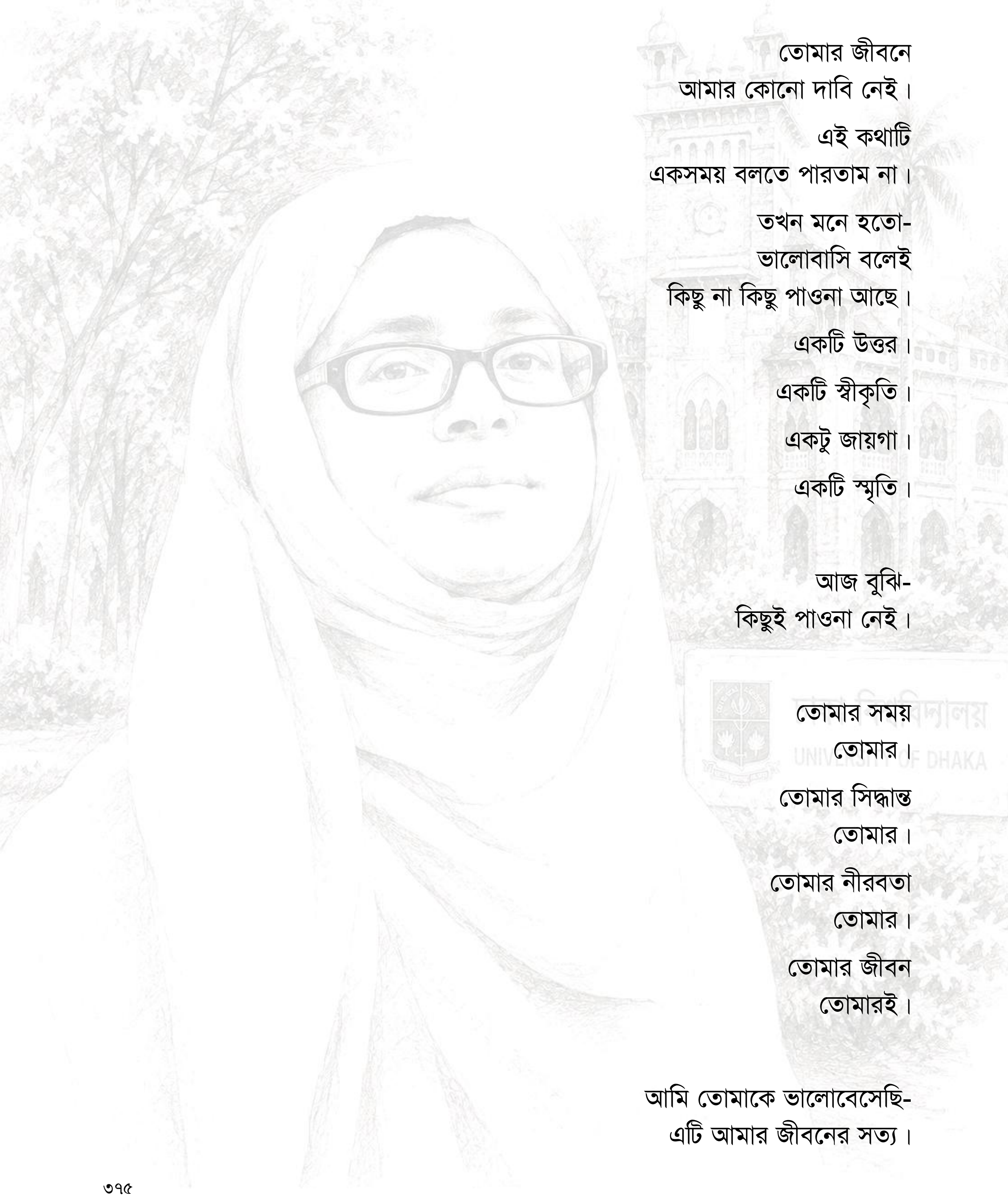

তোমার জীবনে
আমার কোনো দাবি নেই।

এই কথাটি
একসময় বলতে পারতাম না।

তখন মনে হতো-
ভালোবাসি বলেই
কিছু না কিছু পাওনা আছে।

একটি উত্তর।

একটি স্বীকৃতি।

একটু জায়গা।

একটি স্মৃতি।

আজ বুঝি-
কিছুই পাওনা নেই।

তোমার সময়
তোমার।

তোমার সিদ্ধান্ত
তোমার।

তোমার নীরবতা
তোমার।

তোমার জীবন
তোমারই।

আমি তোমাকে ভালোবেসেছি-
এটি আমার জীবনের সত্য।

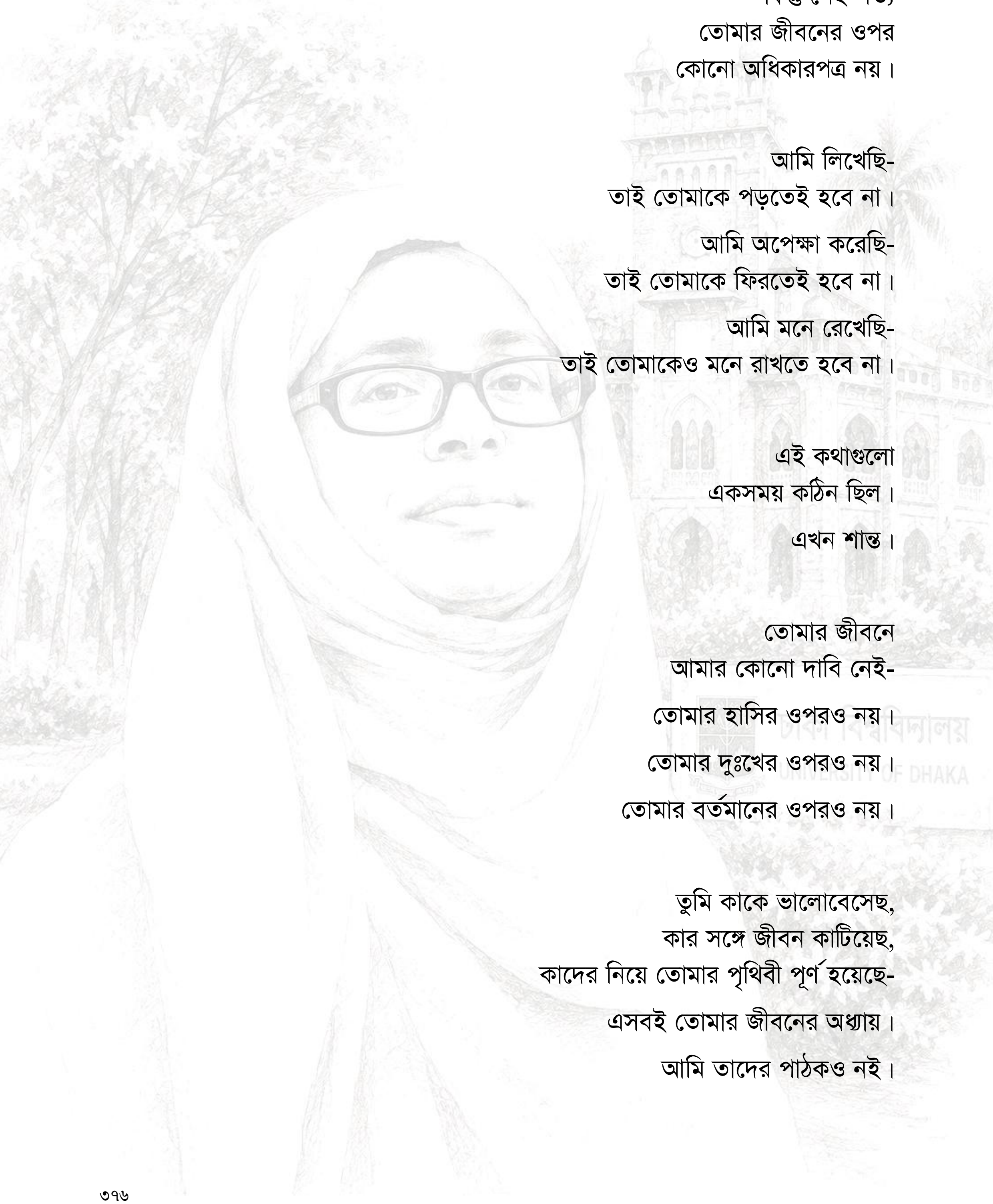

কিন্তু সেই সত্য
তোমার জীবনের ওপর
কোনো অধিকারপত্র নয়।

আমি লিখেছি-
তাই তোমাকে পড়তেই হবে না।
আমি অপেক্ষা করেছি-
তাই তোমাকে ফিরতেই হবে না।
আমি মনে রেখেছি-
তাই তোমাকেও মনে রাখতে হবে না।

এই কথাগুলো
একসময় কঠিন ছিল।
এখন শান্ত।

তোমার জীবনে
আমার কোনো দাবি নেই-
তোমার হাসির ওপরও নয়।
তোমার দুঃখের ওপরও নয়।
তোমার বর্তমানের ওপরও নয়।

তুমি কাকে ভালোবেসেছ,
কার সঙ্গে জীবন কাটিয়েছ,
কাদের নিয়ে তোমার পৃথিবী পূর্ণ হয়েছে-
এসবই তোমার জীবনের অধ্যায়।
আমি তাদের পাঠকও নই।

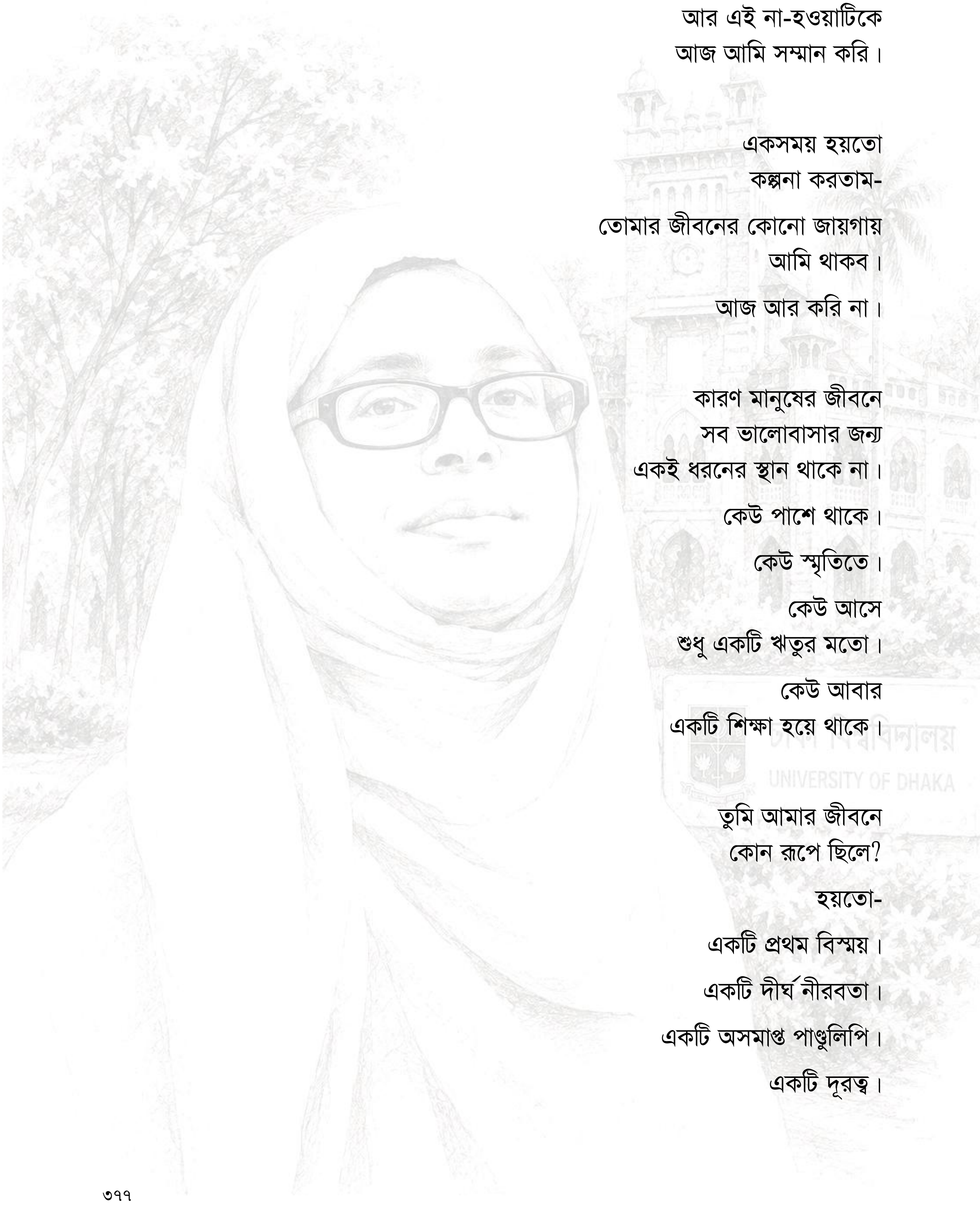

আর এই না-হওয়াটিকে
আজ আমি সম্মান করি।

একসময় হয়তো
কল্পনা করতাম-
তোমার জীবনের কোনো জায়গায়
আমি থাকব।
আজ আর করি না।

কারণ মানুষের জীবনে
সব ভালোবাসার জন্য
একই ধরনের স্থান থাকে না।
কেউ পাশে থাকে।
কেউ স্মৃতিতে।
কেউ আসে
শুধু একটি ঋতুর মতো।
কেউ আবার
একটি শিক্ষা হয়ে থাকে।

তুমি আমার জীবনে
কোন রূপে ছিলে?
হয়তো-
একটি প্রথম বিস্ময়।
একটি দীর্ঘ নীরবতা।
একটি অসমাপ্ত পাণ্ডুলিপি।
একটি দূরত্ব।

আর আজ-
একটি শান্ত স্মৃতি।

তোমার জীবনে
আমি কী ছিলাম?
জানি না।
আর আজ আর
জানার প্রয়োজনও অনুভব করি না।

এই না-জানা
আমাকে কষ্ট দেয় না।
বরং মুক্ত করে।

কারণ আমার পরিচয়
তোমার স্মৃতিতে
কতটুকু আছে-
তার ওপর নির্ভর করে না।

আমি আমার জীবন বেঁচেছি।
তুমিও তোমার।
এই দুই জীবনের মধ্যে
একটি পুরোনো বিশ্ববিদ্যালয়
একদিন আমাদের
একই সময়ের ভেতর এনেছিল।
সেটুকুই সত্য।

তোমার জীবনে
আমার কোনো দাবি নেই।

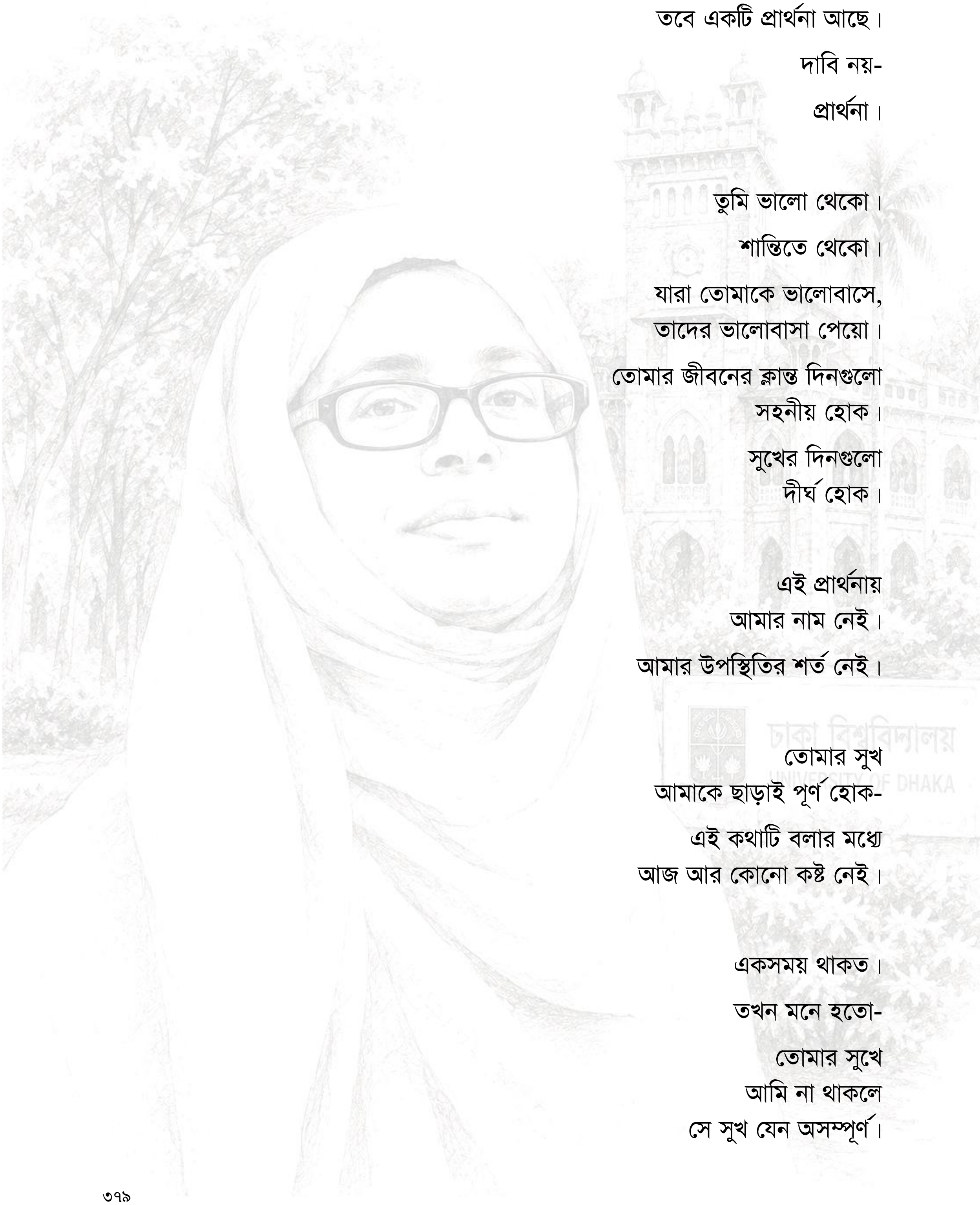

তবে একটি প্রার্থনা আছে।
দাবি নয়-
প্রার্থনা।

তুমি ভালো থেকো।
শান্তিতে থেকো।
যারা তোমাকে ভালোবাসে,
তাদের ভালোবাসা পেয়ো।
তোমার জীবনের ক্লান্ত দিনগুলো
সহনীয় হোক।
সুখের দিনগুলো
দীর্ঘ হোক।

এই প্রার্থনায়
আমার নাম নেই।
আমার উপস্থিতির শর্ত নেই।

তোমার সুখ
আমাকে ছাড়াই পূর্ণ হোক-
এই কথাটি বলার মধ্যে
আজ আর কোনো কষ্ট নেই।

একসময় থাকত।
তখন মনে হতো-
তোমার সুখে
আমি না থাকলে
সে সুখ যেন অসম্পূর্ণ।

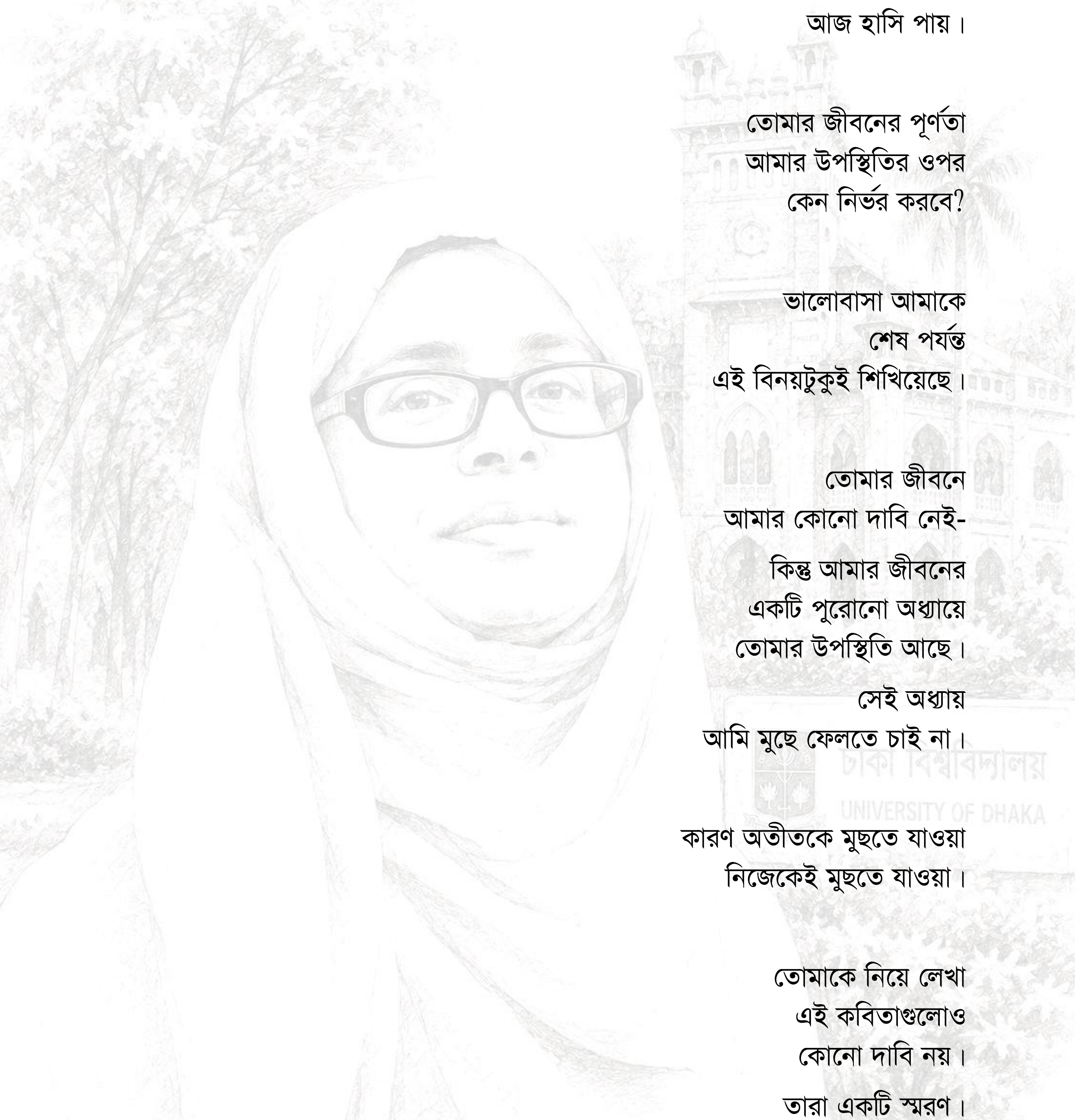

কী অহংকারী ধারণা!

আজ হাসি পায়।

তোমার জীবনের পূর্ণতা
আমার উপস্থিতির ওপর
কেন নির্ভর করবে?

ভালোবাসা আমাকে
শেষ পর্যন্ত
এই বিনয়টুকুই শিখিয়েছে।

তোমার জীবনে
আমার কোনো দাবি নেই-

কিন্তু আমার জীবনের
একটি পুরোনো অধ্যায়ে
তোমার উপস্থিতি আছে।

সেই অধ্যায়
আমি মুছে ফেলতে চাই না।

কারণ অতীতকে মুছতে যাওয়া
নিজেকেই মুছতে যাওয়া।

তোমাকে নিয়ে লেখা
এই কবিতাগুলোও
কোনো দাবি নয়।

তারা একটি স্মরণ।

একটি আত্মজিজ্ঞাসা।

একটি সময়ের সাক্ষ্য।

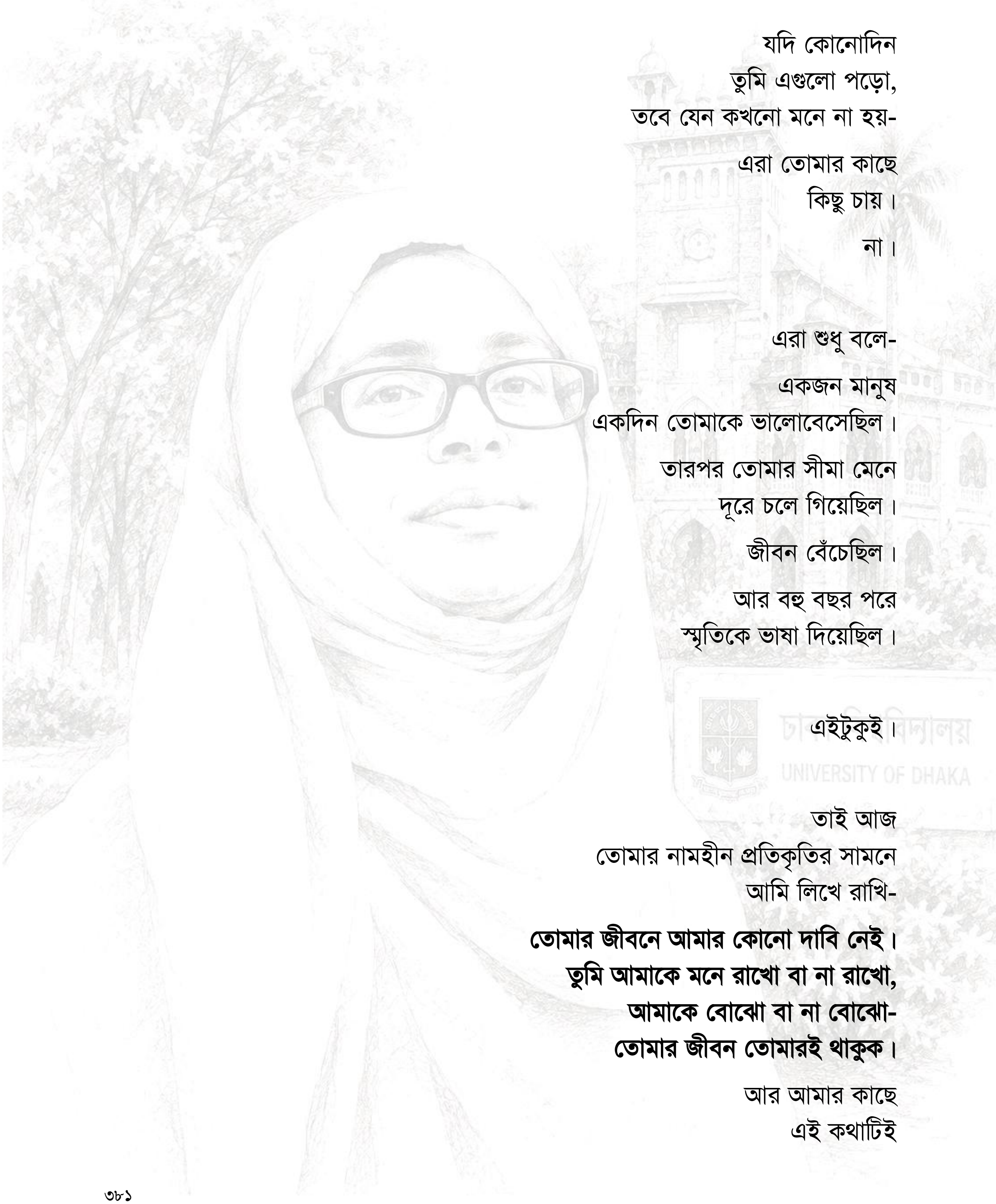

যদি কোনোদিন
তুমি এগুলো পড়ো,
তবে যেন কখনো মনে না হয়-

এরা তোমার কাছে
কিছু চায়।

না।

এরা শুধু বলে-

একজন মানুষ
একদিন তোমাকে ভালোবেসেছিল।

তারপর তোমার সীমা মেনে
দূরে চলে গিয়েছিল।

জীবন বেঁচেছিল।

আর বহু বছর পরে
স্মৃতিকে ভাষা দিয়েছিল।

এইটুকুই।

তাই আজ
তোমার নামহীন প্রতিকৃতির সামনে
আমি লিখে রাখি-

তোমার জীবনে আমার কোনো দাবি নেই।
তুমি আমাকে মনে রাখো বা না রাখো,
আমাকে বোঝো বা না বোঝো-
তোমার জীবন তোমারই থাকুক।

আর আমার কাছে
এই কথাটিই

ভালোবাসার সবচেয়ে নির্মল
স্বাক্ষর হয়ে থাকুক।

দূর থেকেই ভালো থেকো

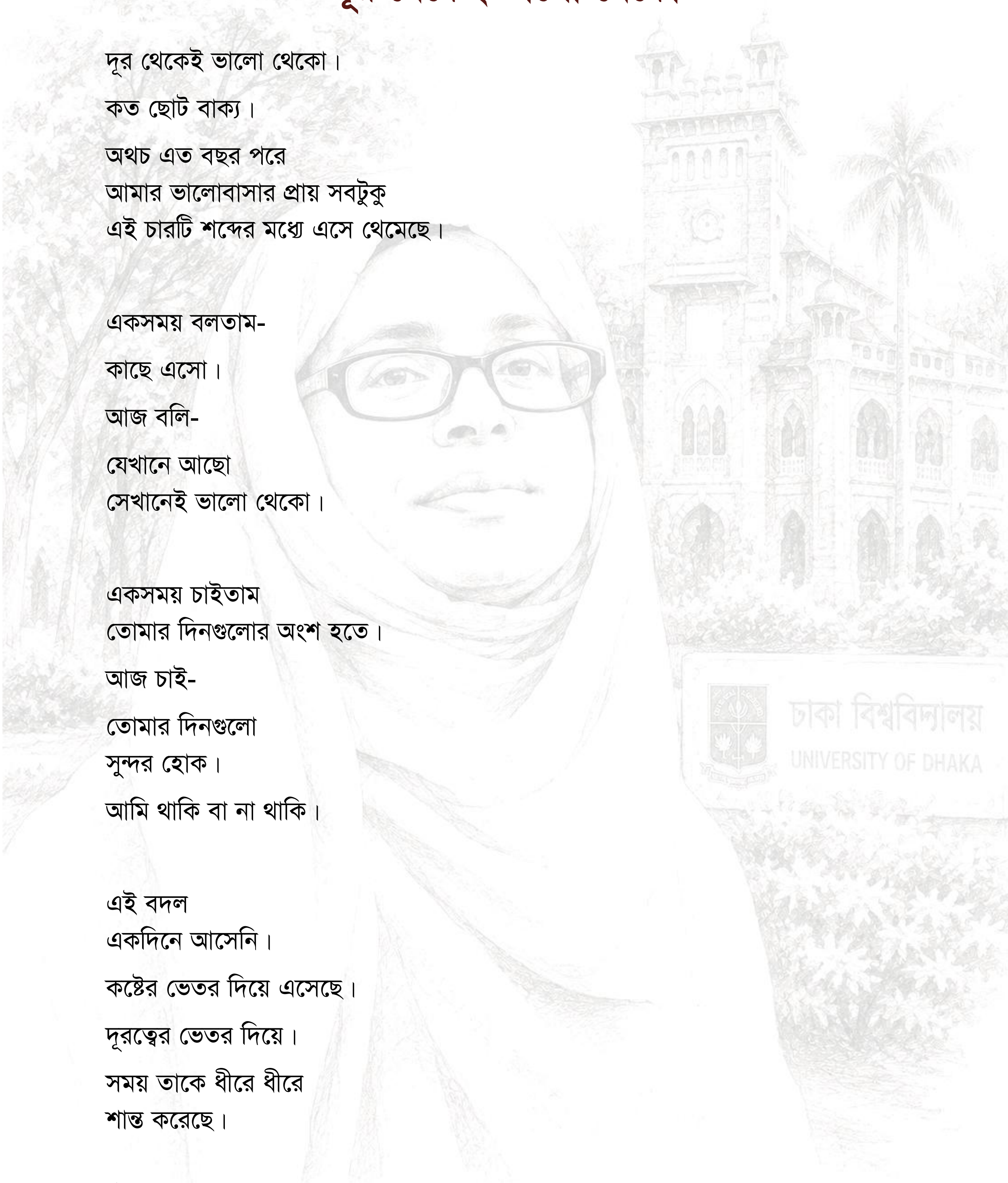

দূর থেকেই ভালো থেকো।

কত ছোট বাক্য।

অথচ এত বছর পরে
আমার ভালোবাসার প্রায় সবটুকু
এই চারটি শব্দের মধ্যে এসে থেমেছে।

একসময় বলতাম-

কাছে এসো।

আজ বলি-

যেখানে আছো
সেখানেই ভালো থেকো।

একসময় চাইতাম
তোমার দিনগুলোর অংশ হতে।

আজ চাই-

তোমার দিনগুলো
সুন্দর হোক।

আমি থাকি বা না থাকি।

এই বদল
একদিনে আসেনি।

কষ্টের ভেতর দিয়ে এসেছে।

দূরত্বের ভেতর দিয়ে।

সময় তাকে ধীরে ধীরে
শান্ত করেছে।

দূর থেকে কাউকে
ভালো থাকা কামনা করা
খুব সহজ শোনায়।

কিন্তু একসময়
যাকে কাছে চেয়েছিলে,
তার ক্ষেত্রে এটি শিখতে
একটি জীবন লেগে যায়।

কারণ প্রথমে মনে হয়-

ভালো থাকা মানে
আমার সঙ্গে ভালো থাকা।

পরে বুঝি-

না।

ভালো থাকা
নিজেই সম্পূর্ণ একটি বাক্য।

তোমার ভালো থাকা
আমার উপস্থিতির অনুমতি চায় না।

দূর থেকেই ভালো থেকো।

তোমার সকাল
শান্ত হোক।

দুপুরে প্রয়োজনের কাজ
সহজ হোক।

বিকেলে যদি ক্লান্ত হও,
একটু বিশ্রাম পেয়ো।

রাতে ঘুম নামুক
মনের ওপর কোমল হয়ে।

যারা তোমার কাছে
নিজেদের কথা বলে,
তুমি তাদের ভালোবাসা পাও।

যাদের তুমি ভালোবাসো,
তারা সুস্থ থাকুক।

তোমার ঘরে
হাসি থাকুক।

জানালায় আলো।

মনে শান্তি।

এই প্রার্থনাগুলো
আমি দূর থেকে করি।

তোমাকে জানিয়ে নয়।

কোনো প্রার্থনার
প্রাপককে জানতেই হবে না।

তুমি যদি কোনোদিন
দুঃখ পাও-

আমি জানব না।

এই না-জানা
কখনো কঠিন মনে হয়।

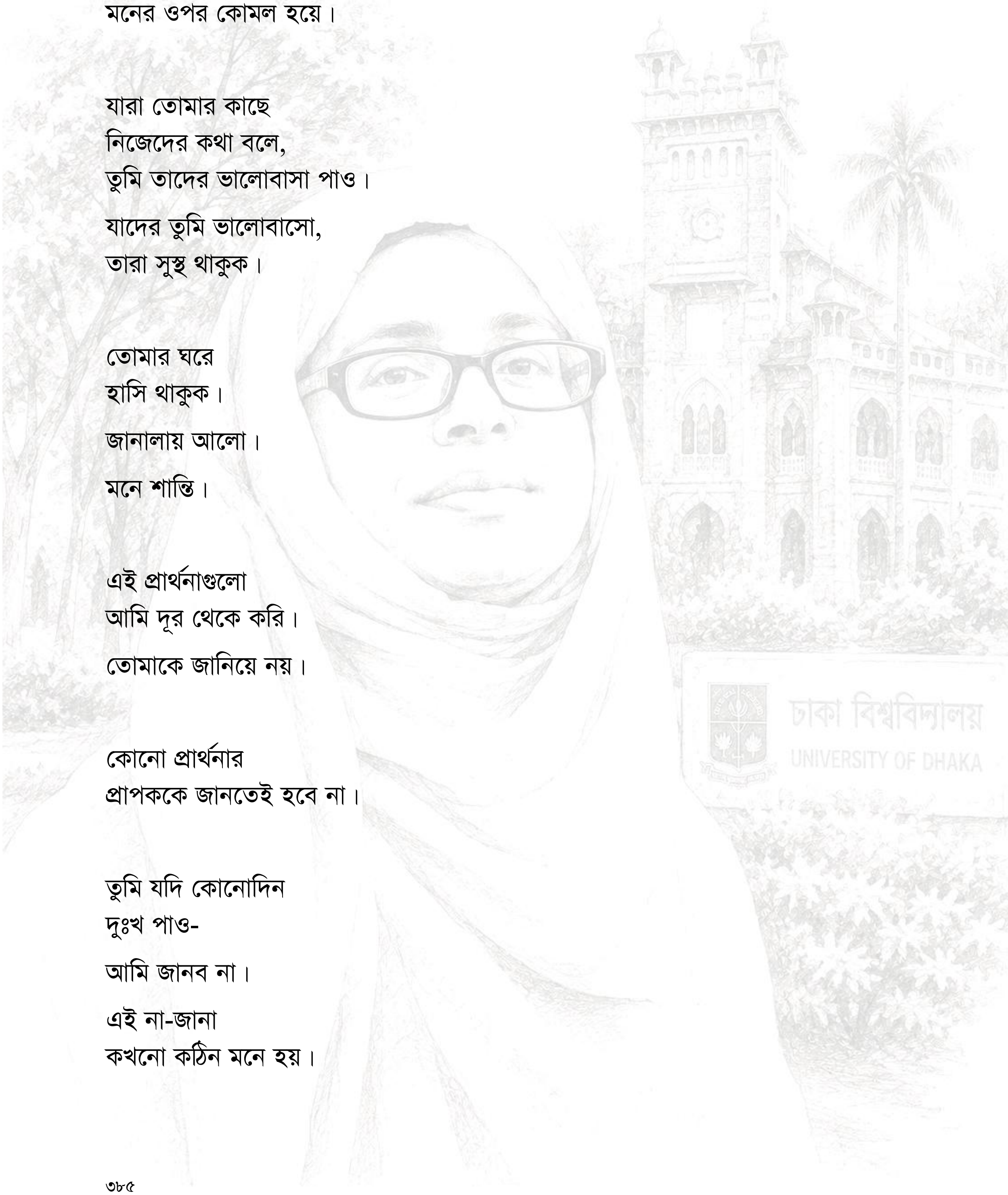

তবু তোমার জীবনের
সব খবর জানার অধিকার
আমার নেই।

তাই শুধু সাধারণভাবে বলি-

যে দুঃখই আসুক,
তাকে পার হওয়ার শক্তি পেয়ো।

যে আনন্দই আসুক,
তাকে গ্রহণ করার অবসর পেয়ো।

আর জীবনের শেষ বয়সে
নিজেকে যেন মনে হয়-

যা পেয়েছ,
তা যথেষ্ট ছিল।

দূর থেকে
এর বেশি আর কী চাইতে পারি?

একসময় হয়তো বলতাম-

আমাকে ভুলে যেও না।

আজ বলি না।

ভুলে গেলে
ভুলে যেও।

স্মৃতি বহন করাও
একটি দায়িত্ব।

আমি কেন
আমার স্মৃতি তোমার ওপর
চাপিয়ে দেব?

আমার স্মৃতির ভার
আমি বহন করতে পারি।

তোমার কাজ
নিজের জীবন বহন করা।

দূর থেকেই ভালো থেকো।
এই বাক্যের মধ্যে
একটি বিদায়ও আছে।
কিন্তু বিষাদময় নয়।
শান্ত।

যেন দূরের ট্রেন
চলে যাচ্ছে।
আমি প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে
হাত নেড়ে বলছি না-
ফিরে এসো।
শুধু মনে মনে-
ভালো যেও।

এত বছর পরে
আমাদের সম্পর্কের

সবচেয়ে সৎ ভাষা
হয়তো এটাই।

দূরত্ব রাখব।

স্মৃতি রাখব।

দাবি রাখব না।

আর যদি কোনোদিন
হঠাৎ দেখা হয়,

আমি এই কথাটিই
মুখে বলতে পারি-

"ভালো থাকবেন।"

তুমি হয়তো এটিকে
সাধারণ সৌজন্য ভাববে।

সেটিই ভালো।

কারণ তোমাকে জানার প্রয়োজন নেই
এই সাধারণ বাক্যের পেছনে
কত দশকের নীরবতা আছে।

তুমি শুধু
শব্দটি গ্রহণ করো-

ভালো থেকো।

আর যদি কোনোদিন
আমার মুখেও
এই কথাটি ফিরে আসে,

আমি হাসব।

তার বেশি কিছু চাইব না।

দূর থেকেই ভালো থেকো-

কারণ একসময় তোমাকে কাছে চাওয়া ছিল প্রেম,
আজ তোমার দূরত্বকেও শান্তিতে থাকতে দেওয়া
সেই প্রেমেরই পরিণত রূপ।

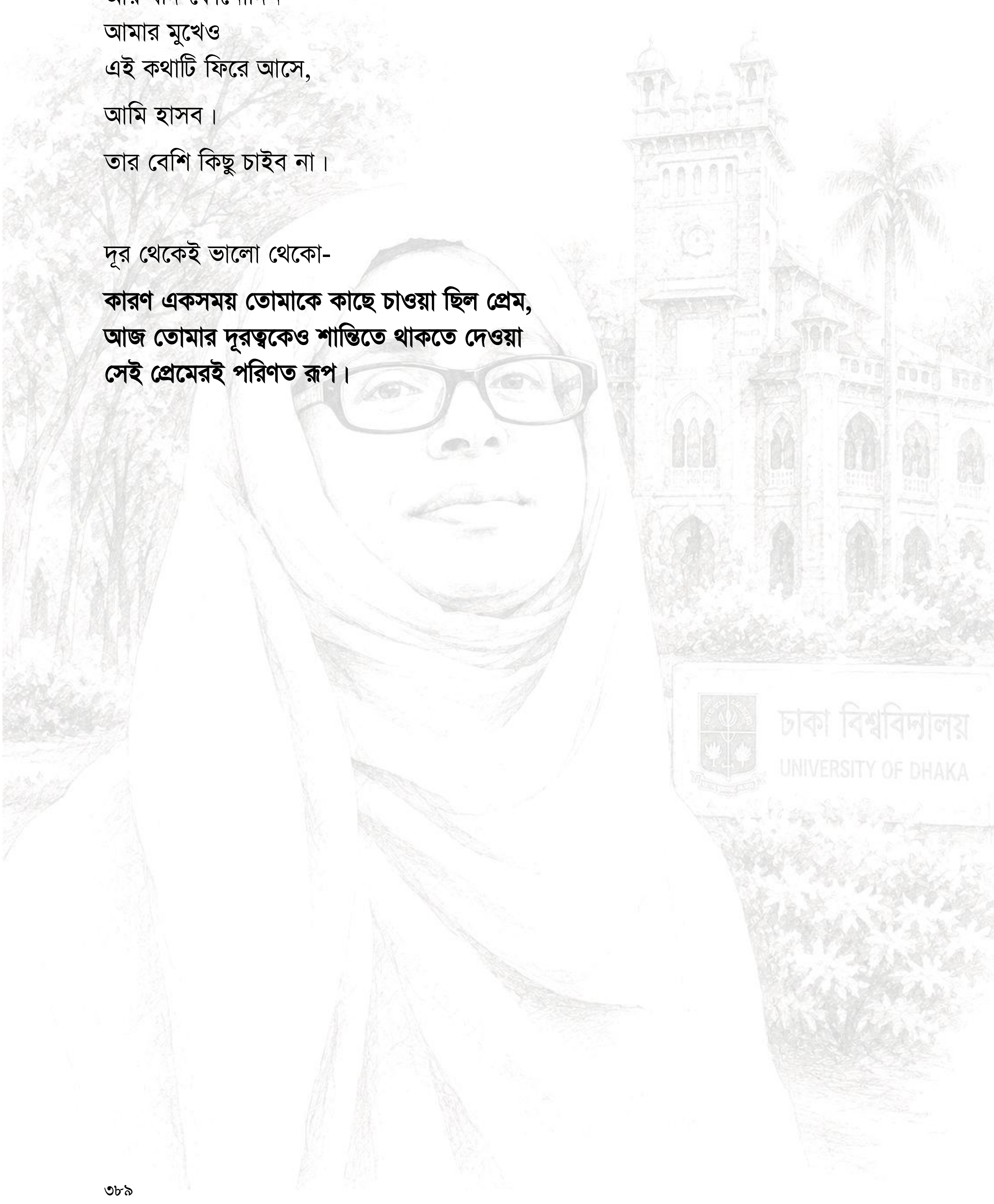

ক্ষমা করো আমার কবিতাগুলোকে

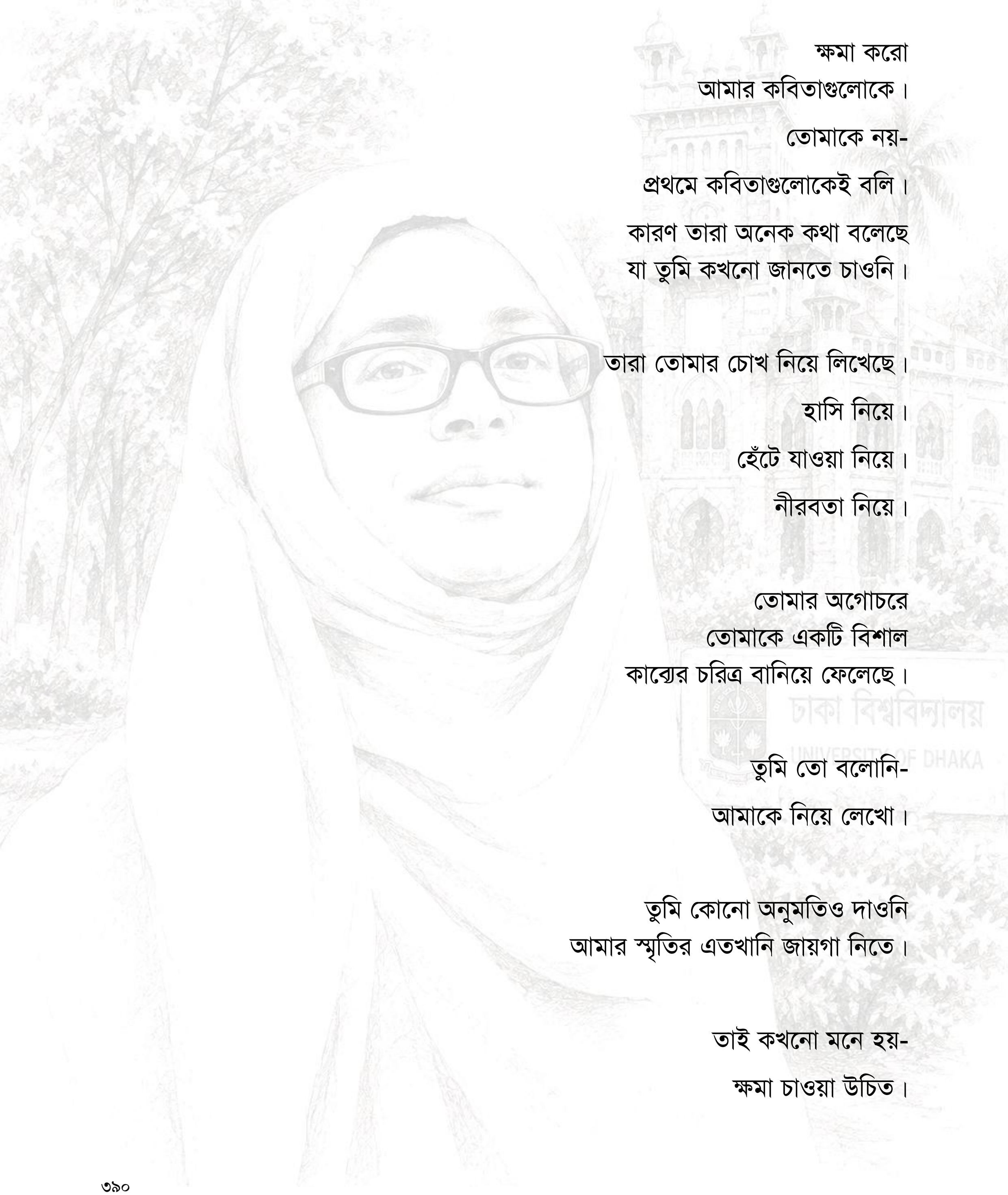

ক্ষমা করো
আমার কবিতাগুলোকে।

তোমাকে নয়-

প্রথমে কবিতাগুলোকেই বলি।

কারণ তারা অনেক কথা বলেছে
যা তুমি কখনো জানতে চাওনি।

তারা তোমার চোখ নিয়ে লিখেছে।

হাসি নিয়ে।

হেঁটে যাওয়া নিয়ে।

নীরবতা নিয়ে।

তোমার অগোচরে
তোমাকে একটি বিশাল
কাব্যের চরিত্র বানিয়ে ফেলেছে।

তুমি তো বলোনি-

আমাকে নিয়ে লেখো।

তুমি কোনো অনুমতিও দাওনি
আমার স্মৃতির এতখানি জায়গা নিতে।

তাই কখনো মনে হয়-

ক্ষমা চাওয়া উচিত।

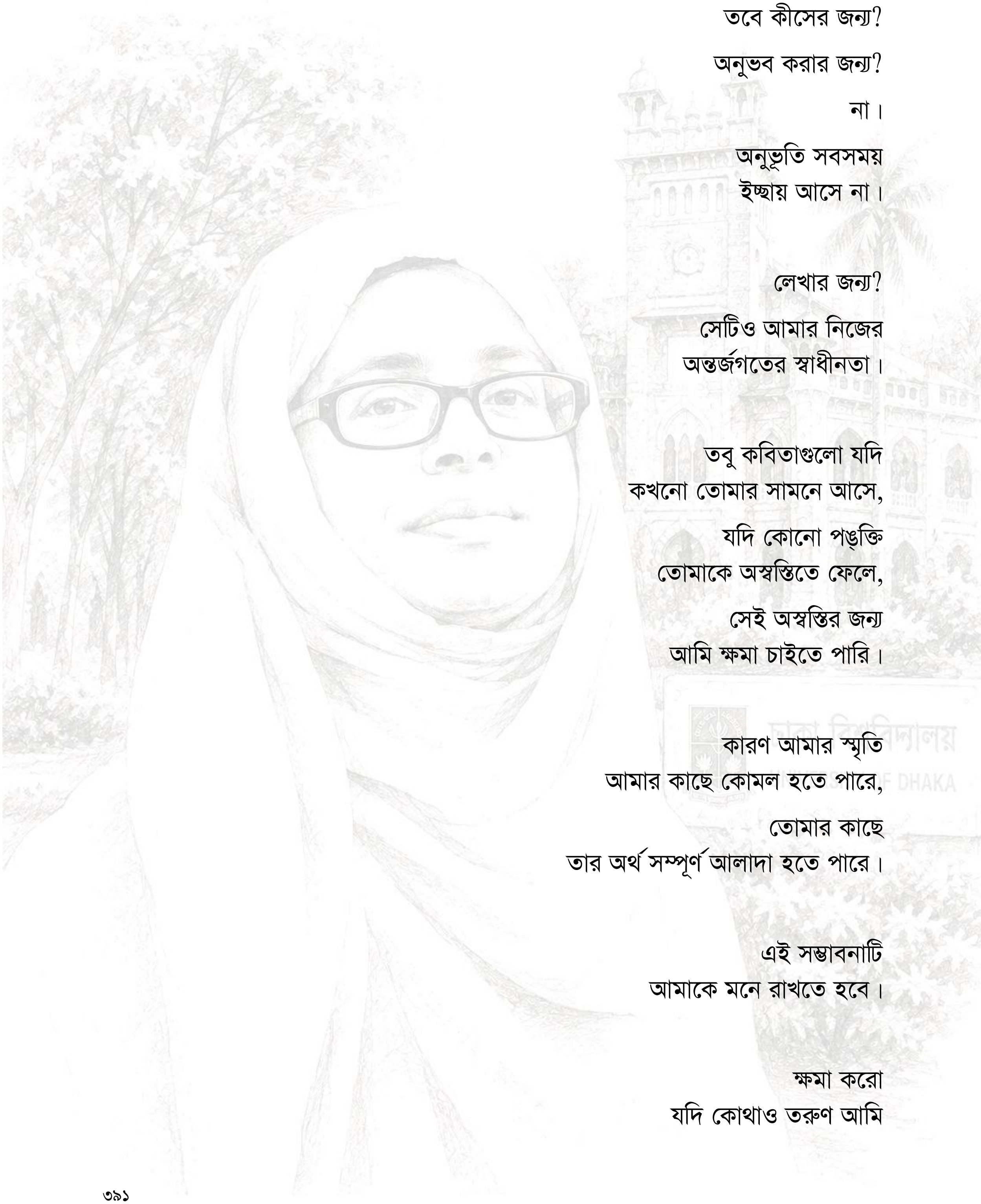

তবে কীসের জন্য?

অনুভব করার জন্য?

না।

অনুভূতি সবসময়
ইচ্ছায় আসে না।

লেখার জন্য?

সেটিও আমার নিজের
অন্তর্জগতের স্বাধীনতা।

তবু কবিতাগুলো যদি
কখনো তোমার সামনে আসে,

যদি কোনো পঙ্‌ক্তি
তোমাকে অস্বস্তিতে ফেলে,

সেই অস্বস্তির জন্য
আমি ক্ষমা চাইতে পারি।

কারণ আমার স্মৃতি
আমার কাছে কোমল হতে পারে,

তোমার কাছে
তার অর্থ সম্পূর্ণ আলাদা হতে পারে।

এই সম্ভাবনাটি
আমাকে মনে রাখতে হবে।

ক্ষমা করো
যদি কোথাও তরুণ আমি

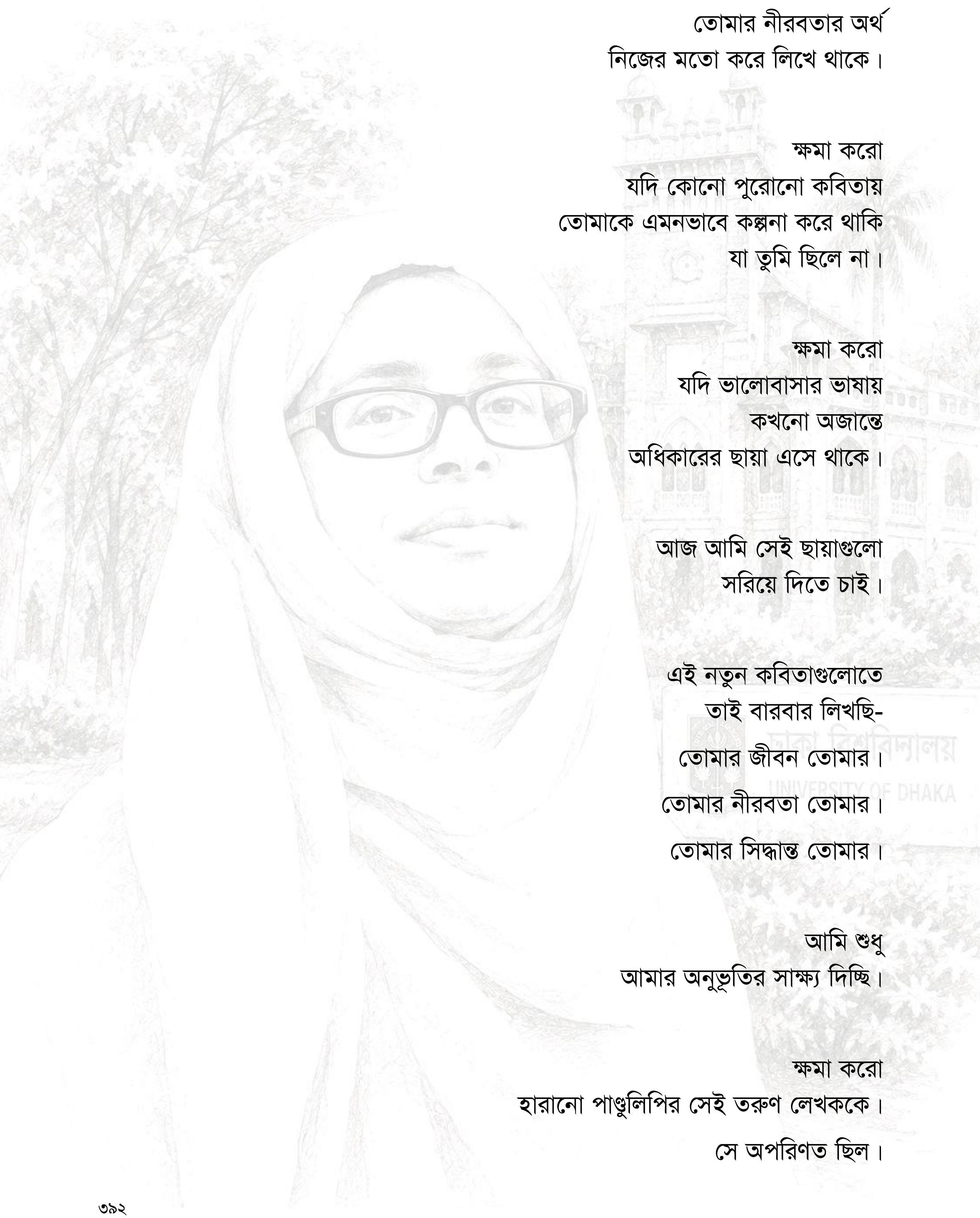

তোমার নীরবতার অর্থ
নিজের মতো করে লিখে থাকে।

ক্ষমা করো
যদি কোনো পুরোনো কবিতায়
তোমাকে এমনভাবে কল্পনা করে থাকি
যা তুমি ছিলে না।

ক্ষমা করো
যদি ভালোবাসার ভাষায়
কখনো অজান্তে
অধিকারের ছায়া এসে থাকে।

আজ আমি সেই ছায়াগুলো
সরিয়ে দিতে চাই।

এই নতুন কবিতাগুলোতে
তাই বারবার লিখছি-
তোমার জীবন তোমার।
তোমার নীরবতা তোমার।
তোমার সিদ্ধান্ত তোমার।

আমি শুধু
আমার অনুভূতির সাক্ষ্য দিচ্ছি।

ক্ষমা করো
হারানো পাণ্ডুলিপির সেই তরুণ লেখককে।
সে অপরিণত ছিল।

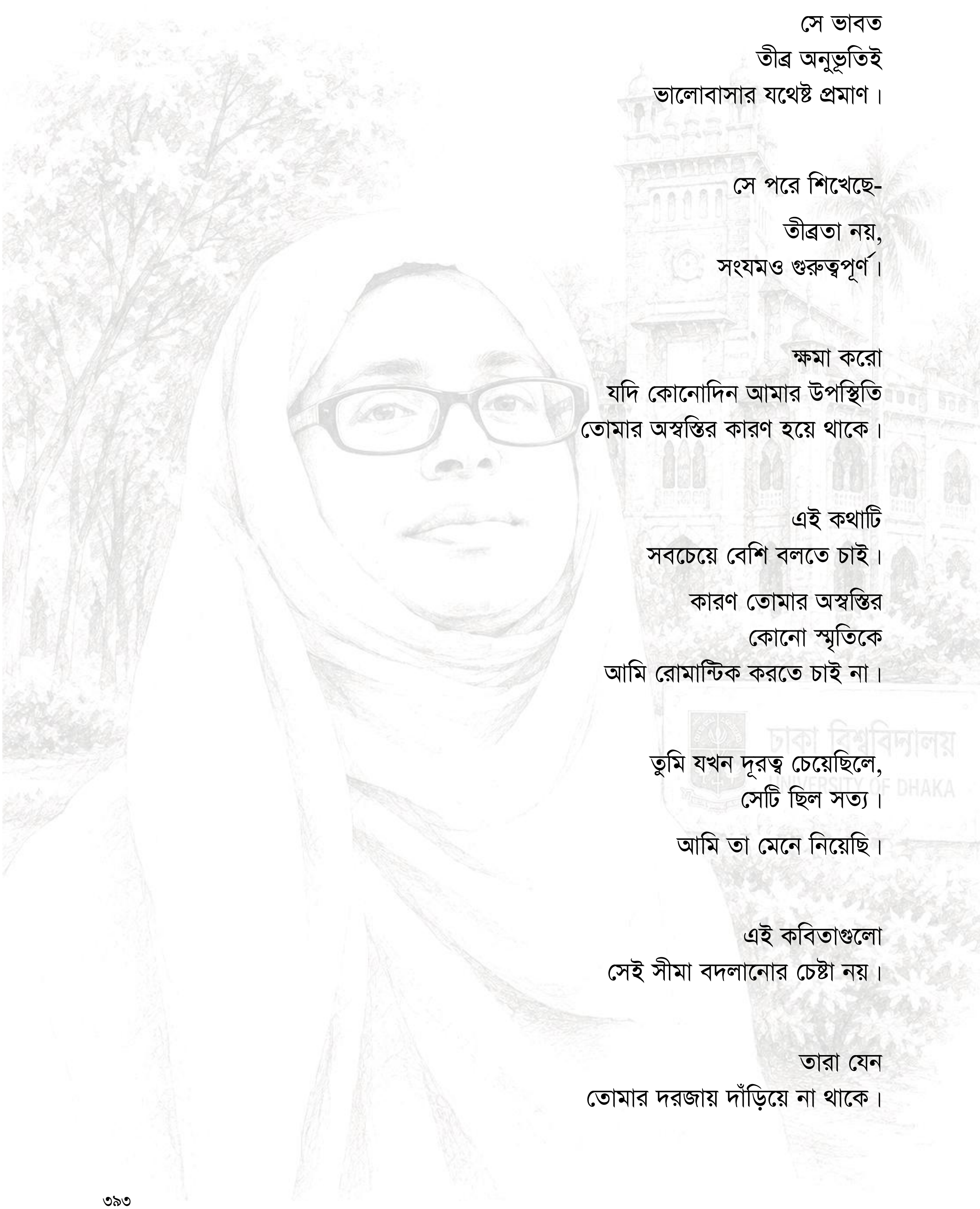

সে ভাবত
তীব্র অনুভূতিই
ভালোবাসার যথেষ্ট প্রমাণ।

সে পরে শিখেছে-
তীব্রতা নয়,
সংযমও গুরুত্বপূর্ণ।

ক্ষমা করো
যদি কোনোদিন আমার উপস্থিতি
তোমার অস্বস্তির কারণ হয়ে থাকে।

এই কথাটি
সবচেয়ে বেশি বলতে চাই।
কারণ তোমার অস্বস্তির
কোনো স্মৃতিকে
আমি রোমান্টিক করতে চাই না।

তুমি যখন দূরত্ব চেয়েছিলে,
সেটি ছিল সত্য।
আমি তা মেনে নিয়েছি।

এই কবিতাগুলো
সেই সীমা বদলানোর চেষ্টা নয়।

তারা যেন
তোমার দরজায় দাঁড়িয়ে না থাকে।

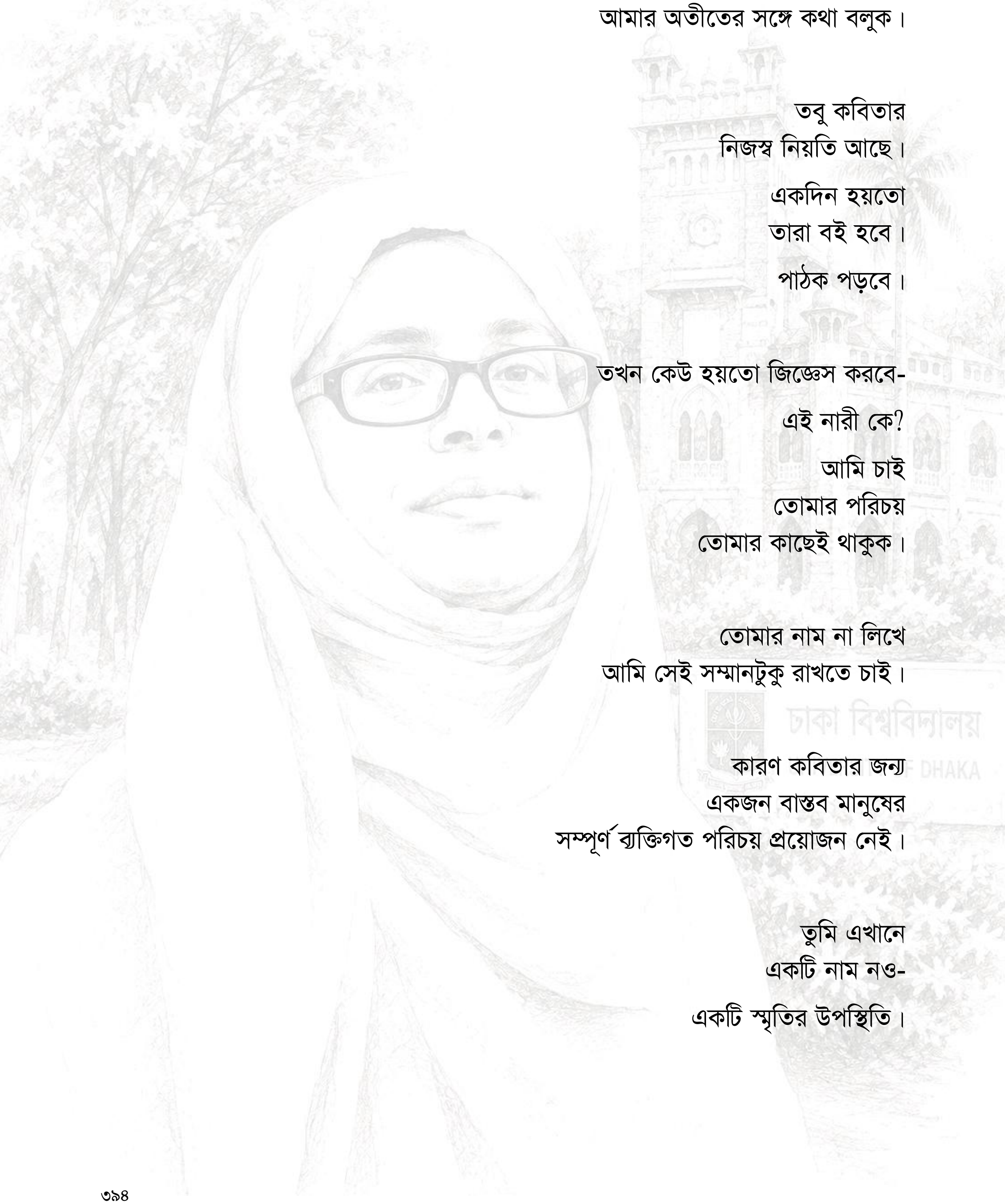

বরং আমার নিজের ঘরে
আমার অতীতের সঙ্গে কথা বলুক।

তবু কবিতার
নিজস্ব নিয়তি আছে।

একদিন হয়তো
তারা বই হবে।

পাঠক পড়বে।

তখন কেউ হয়তো জিজ্ঞেস করবে-

এই নারী কে?

আমি চাই
তোমার পরিচয়
তোমার কাছেই থাকুক।

তোমার নাম না লিখে
আমি সেই সম্মানটুকু রাখতে চাই।

কারণ কবিতার জন্য
একজন বাস্তব মানুষের
সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত পরিচয় প্রয়োজন নেই।

তুমি এখানে
একটি নাম নও-

একটি স্মৃতির উপস্থিতি।

ক্ষমা করো
যদি এই উপস্থিতিটুকুও
কখনো বেশি মনে হয়।

কিন্তু একটি কথা
ক্ষমা চেয়ে ফিরিয়ে নিতে পারব না-
আমি একদিন
তোমাকে ভালোবেসেছিলাম।

এটি অভিযোগ নয়।
দাবিও নয়।
শুধু আমার জীবনের সত্য।

আমি সেই সত্যের জন্য
লজ্জিত নই।

শুধু চাই
সত্যটি বলার ধরন
কখনো তোমার প্রতি অসম্মান না হোক।

তাই কবিতাগুলোকে বলি-
নরম হও।
তার হয়ে কথা বোলো না।
তার বর্তমান জীবন
কল্পনা কোরো না।
তার "না"-কে
কোনো রোমান্টিক রহস্য বানিও না।

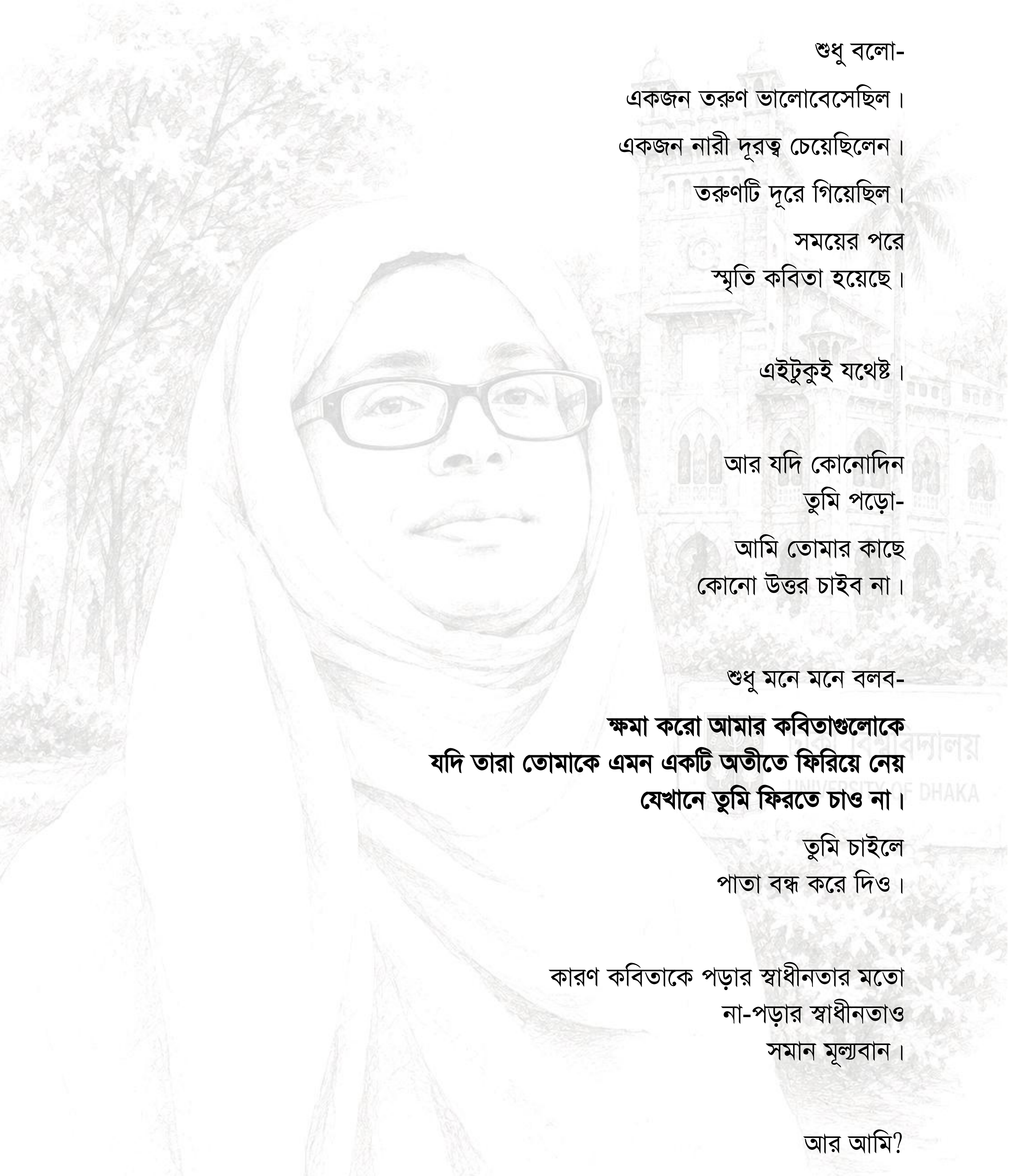

শুধু বলো-

একজন তরুণ ভালোবেসেছিল।

একজন নারী দূরত্ব চেয়েছিলেন।

তরুণটি দূরে গিয়েছিল।

সময়ের পরে
স্মৃতি কবিতা হয়েছে।

এইটুকুই যথেষ্ট।

আর যদি কোনোদিন
তুমি পড়ো-

আমি তোমার কাছে
কোনো উত্তর চাইব না।

শুধু মনে মনে বলব-

ক্ষমা করো আমার কবিতাগুলোকে
যদি তারা তোমাকে এমন একটি অতীতে ফিরিয়ে নেয়
যেখানে তুমি ফিরতে চাও না।

তুমি চাইলে
পাতা বন্ধ করে দিও।

কারণ কবিতাকে পড়ার স্বাধীনতার মতো
না-পড়ার স্বাধীনতাও
সমান মূল্যবান।

আর আমি?

আমি তবু লিখব।

তোমাকে ডাকতে নয়-

নিজের দীর্ঘ নীরবতাকে
একটি ভাষা দিতে।

যদি কখনো পড়ে থাকো

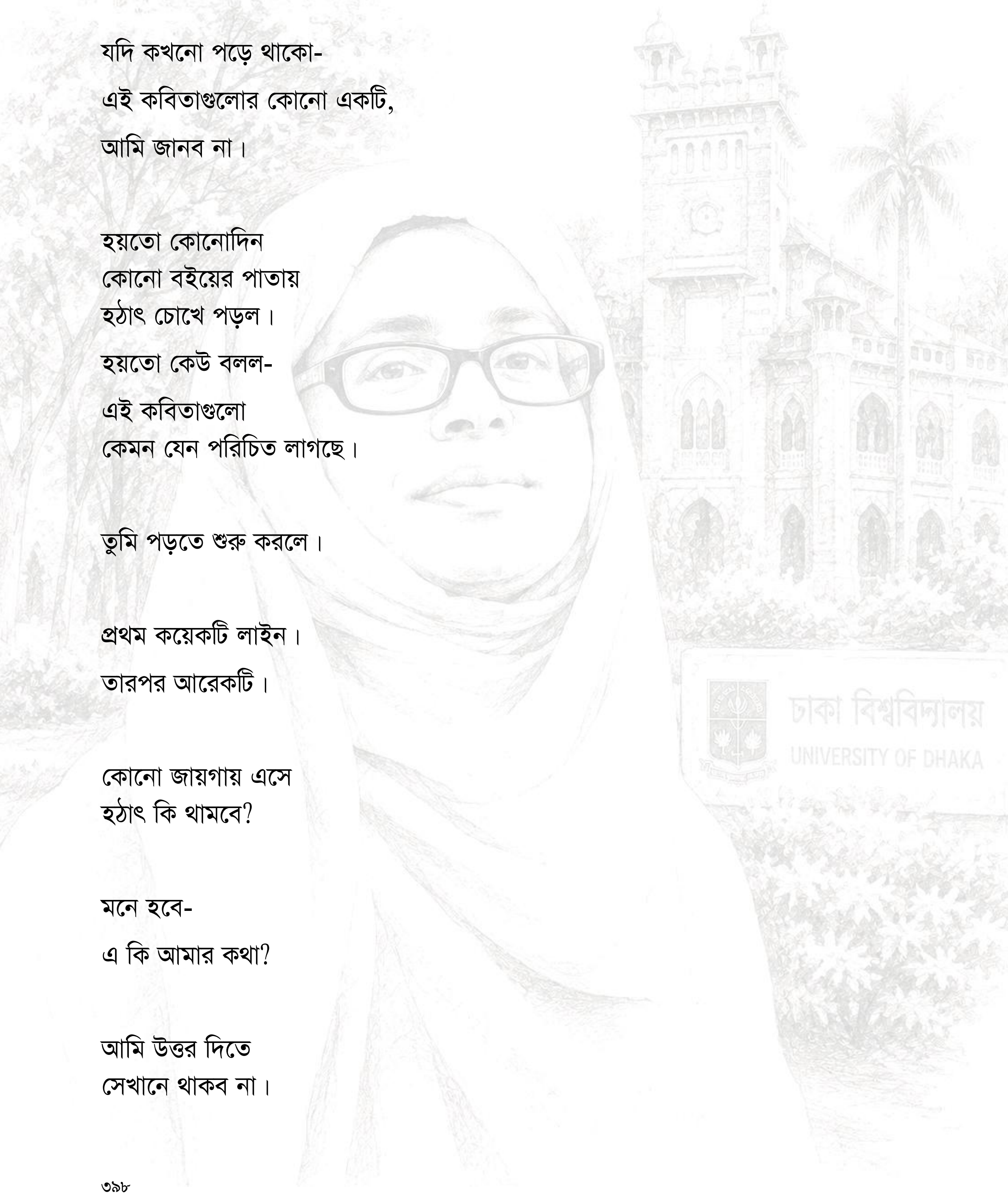

যদি কখনো পড়ে থাকো-
এই কবিতাগুলোর কোনো একটি,
আমি জানব না।

হয়তো কোনোদিন
কোনো বইয়ের পাতায়
হঠাৎ চোখে পড়ল।
হয়তো কেউ বলল-
এই কবিতাগুলো
কেমন যেন পরিচিত লাগছে।

তুমি পড়তে শুরু করলে।

প্রথম কয়েকটি লাইন।
তারপর আরেকটি।

কোনো জায়গায় এসে
হঠাৎ কি থামবে?

মনে হবে-
এ কি আমার কথা?

আমি উত্তর দিতে
সেখানে থাকব না।

হয়তো তুমি
পাতা বন্ধ করে দেবে।

সেটিও ঠিক।

হয়তো পড়বে।

শেষ পর্যন্ত।

সেটিও।

কিন্তু যদি কখনো পড়ে থাকো,
আমি চাই
প্রথমে একটি কথা বুঝো-

এই কবিতাগুলো
তোমার কাছে ফিরে যাওয়ার রাস্তা নয়।

এরা ফিরে গেছে
আমার নিজের অতীতে।

তুমি তাদের গন্তব্য নও।

তুমি তাদের উৎসের অংশ।

যদি পড়তে পড়তে
তোমার মনে হয়-

এত বছর পরেও কেন?

আমি বলব না
কারণ প্রশ্নটি তোমার নয়।

উত্তরটি আমার জীবনের।

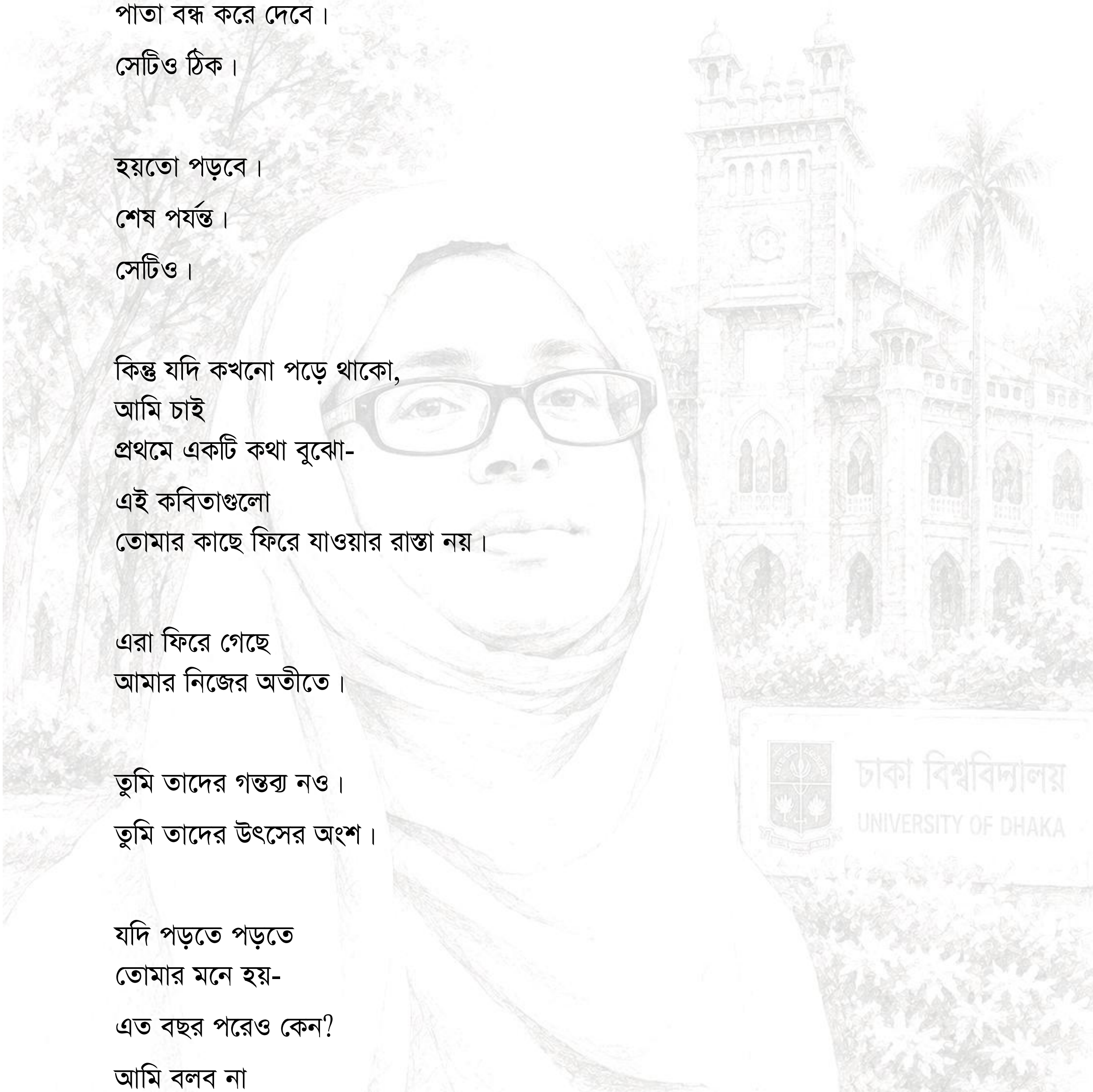

কিছু স্মৃতি
মানুষের সঙ্গে শেষ হয় না।
তারা ব্যক্তিত্বের অংশ হয়ে যায়।

যদি তোমার মনে
কোনো পুরোনো অস্বস্তি ফিরে আসে,
তবে বইটি বন্ধ করে দিও।

আমার কবিতার চেয়ে
তোমার শান্তি বড়।

আর যদি মৃদু হাসো?
ভাবো-
সে এত লিখেছিল!
তবে সেই হাসিটুকুই
কবিতার জন্য যথেষ্ট।

তুমি আমাকে
মনে রাখো কি না
জানতে চাইব না।

যদি কোনো পঙ্ক্তি
তোমার নিজের বিশ্ববিদ্যালয় জীবনের
কোনো সাধারণ বিকেল মনে করিয়ে দেয়,
সেটুকুই ভালো।

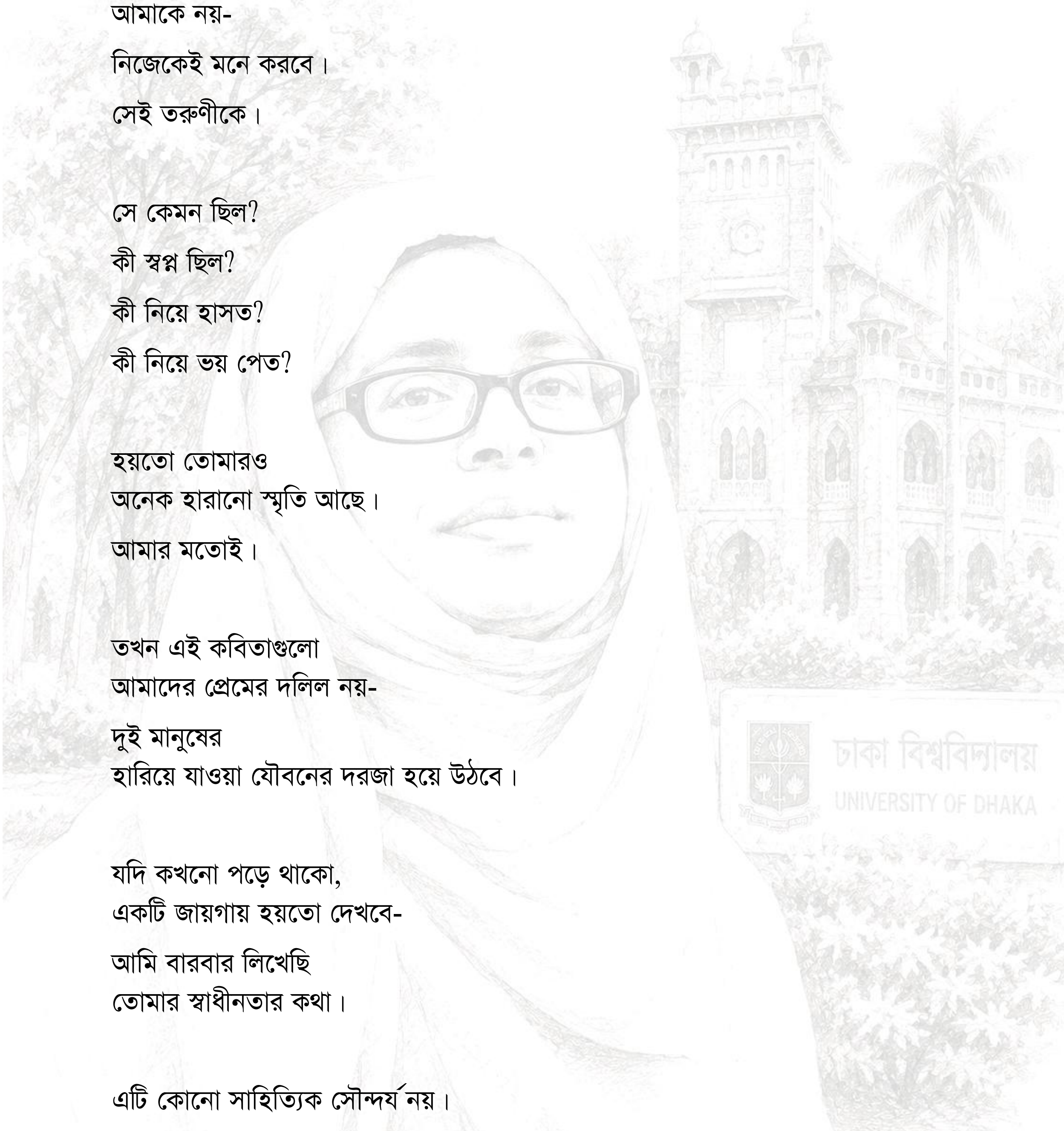

হয়তো তুমি
আমাকে নয়-
নিজেকেই মনে করবে।
সেই তরুণীকে।

সে কেমন ছিল?
কী স্বপ্ন ছিল?
কী নিয়ে হাসত?
কী নিয়ে ভয় পেত?

হয়তো তোমারও
অনেক হারানো স্মৃতি আছে।
আমার মতোই।

তখন এই কবিতাগুলো
আমাদের প্রেমের দলিল নয়-
দুই মানুষের
হারিয়ে যাওয়া যৌবনের দরজা হয়ে উঠবে।

যদি কখনো পড়ে থাকো,
একটি জায়গায় হয়তো দেখবে-
আমি বারবার লিখেছি
তোমার স্বাধীনতার কথা।

এটি কোনো সাহিত্যিক সৌন্দর্য নয়।
এটি আমার দেরিতে শেখা সত্য।

একসময়
আমি শুধু নিজের অনুভূতি দেখতাম।

আজ তোমার সীমাকেও
সমান সত্য বলে মানি।

এই পরিবর্তনটুকু
যদি তুমি বুঝতে পারো,

তবে হয়তো
কবিতাগুলোর প্রতি
একটু কোমল হবে।

আর যদি না হও?

তবু ঠিক।

কোনো পাঠকের ওপর
কবির অধিকার নেই।

তোমার ওপর তো
আরও নেই।

যদি কখনো পড়ে থাকো
এবং মনে হয়-

আমি কি উত্তর দেব?

না।

দেওয়ার প্রয়োজন নেই।

কোনো চিঠি লিখতে হবে না।

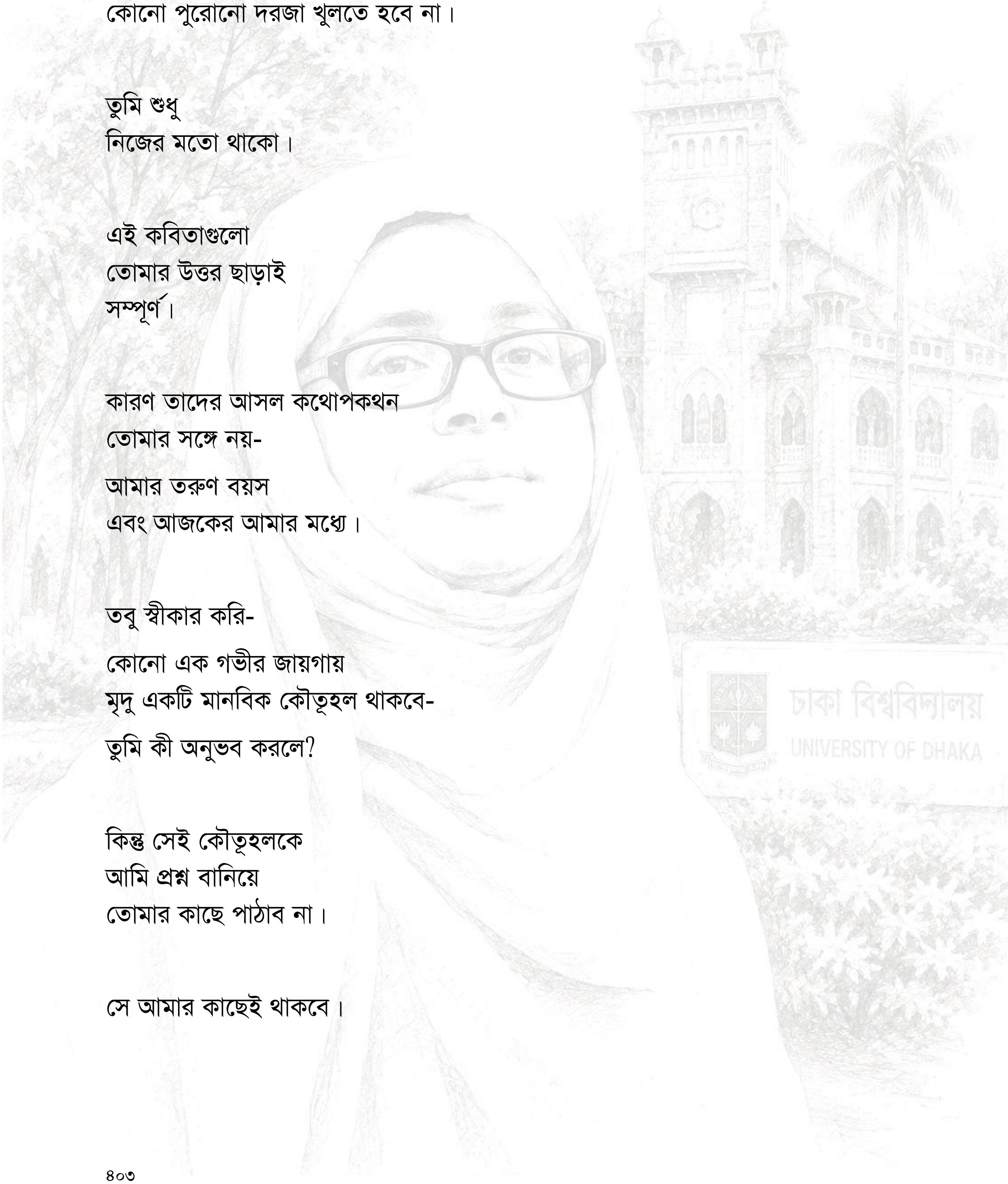

কোনো খবর পাঠাতে হবে না।

কোনো পুরোনো দরজা খুলতে হবে না।

তুমি শুধু
নিজের মতো থাকো।

এই কবিতাগুলো
তোমার উত্তর ছাড়াই
সম্পূর্ণ।

কারণ তাদের আসল কথোপকথন
তোমার সঙ্গে নয়-
আমার তরুণ বয়স
এবং আজকের আমার মধ্যে।

তবু স্বীকার করি-
কোনো এক গভীর জায়গায়
মৃদু একটি মানবিক কৌতূহল থাকবে-
তুমি কী অনুভব করলে?

কিন্তু সেই কৌতূহলকে
আমি প্রশ্ন বানিয়ে
তোমার কাছে পাঠাব না।

সে আমার কাছেই থাকবে।

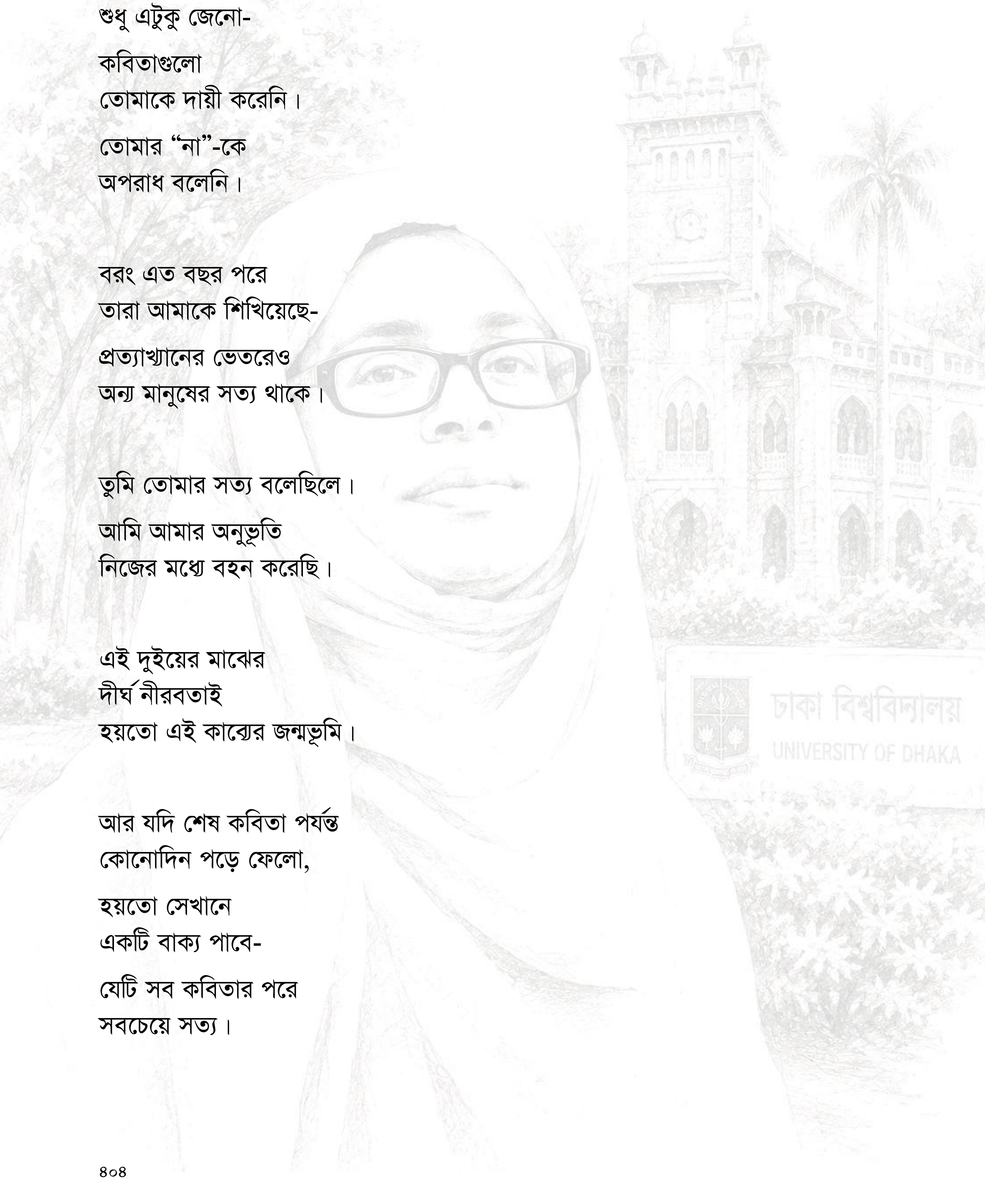

যদি কখনো পড়ে থাকো,
শুধু এটুকু জেনো-

কবিতাগুলো
তোমাকে দায়ী করেনি।

তোমার “না”-কে
অপরাধ বলেনি।

বরং এত বছর পরে
তারা আমাকে শিখিয়েছে-

প্রত্যাখ্যানের ভেতরেও
অন্য মানুষের সত্য থাকে।

তুমি তোমার সত্য বলেছিলে।

আমি আমার অনুভূতি
নিজের মধ্যে বহন করেছি।

এই দুইয়ের মাঝের
দীর্ঘ নীরবতাই
হয়তো এই কাব্যের জন্মভূমি।

আর যদি শেষ কবিতা পর্যন্ত
কোনোদিন পড়ে ফেলো,

হয়তো সেখানে
একটি বাক্য পাবে-

যেটি সব কবিতার পরে
সবচেয়ে সত্য।

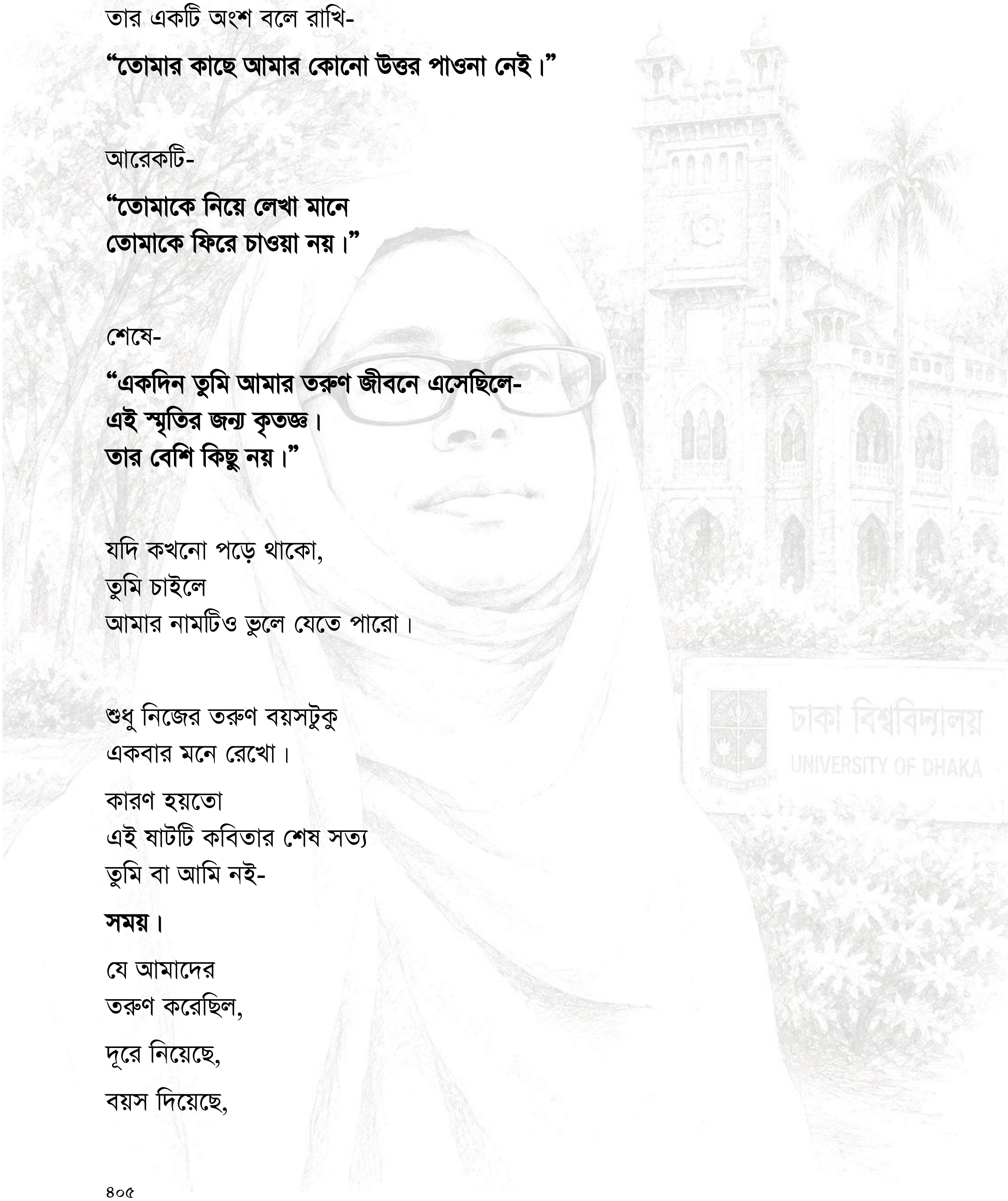

আমি আজই
তার একটি অংশ বলে রাখি-

“তোমার কাছে আমার কোনো উত্তর পাওনা নেই।”

আরেকটি-

**“তোমাকে নিয়ে লেখা মানে
তোমাকে ফিরে চাওয়া নয়।”**

শেষে-

**“একদিন তুমি আমার তরুণ জীবনে এসেছিলে-
এই স্মৃতির জন্য কৃতজ্ঞ।
তার বেশি কিছু নয়।”**

যদি কখনো পড়ে থাকো,
তুমি চাইলে
আমার নামটিও ভুলে যেতে পারো।

শুধু নিজের তরুণ বয়সটুকু
একবার মনে রেখো।

কারণ হয়তো
এই ষাটটি কবিতার শেষ সত্য
তুমি বা আমি নই-

সময়।

যে আমাদের
তরুণ করেছিল,

দূরে নিয়েছে,

বয়স দিয়েছে,

আর এত বছর পরে
একজন মানুষকে আবার বসিয়েছে
সাদা কাগজের সামনে।

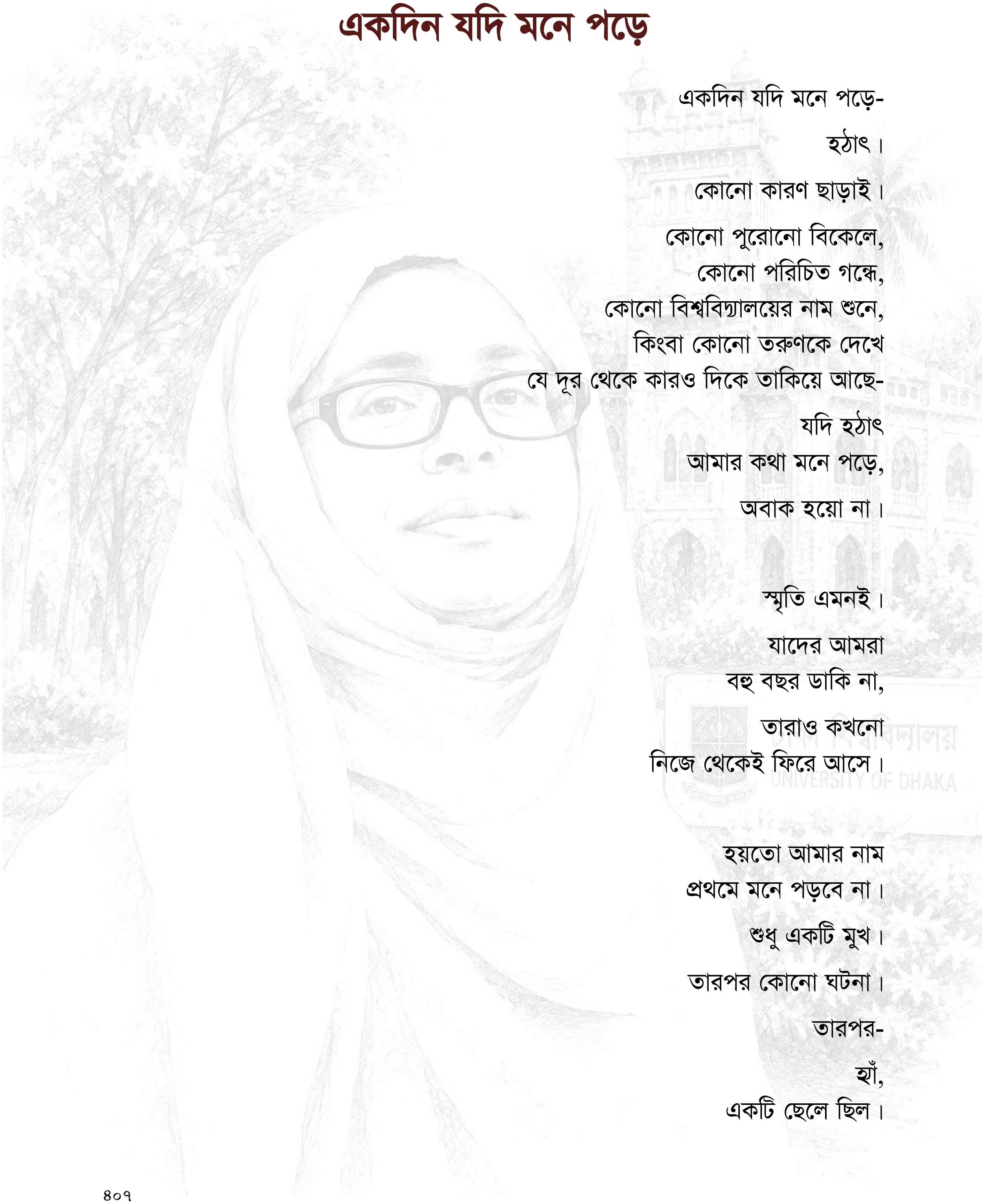

একদিন যদি মনে পড়ে

একদিন যদি মনে পড়ে-

হঠাৎ।

কোনো কারণ ছাড়াই।

কোনো পুরোনো বিকেলে,
কোনো পরিচিত গন্ধে,
কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম শুনে,
কিংবা কোনো তরুণকে দেখে
যে দূর থেকে কারও দিকে তাকিয়ে আছে-

যদি হঠাৎ
আমার কথা মনে পড়ে,

অবাক হয়ো না।

স্মৃতি এমনই।

যাদের আমরা
বহু বছর ডাকি না,

তারাও কখনো
নিজে থেকেই ফিরে আসে।

হয়তো আমার নাম
প্রথমে মনে পড়বে না।

শুধু একটি মুখ।

তারপর কোনো ঘটনা।

তারপর-

হ্যাঁ,
একটি ছেলে ছিল।

হয়তো মনে পড়বে
সে খুব বেশি কথা বলতে পারত না।

অথবা বলতে চেয়েও
ঠিক কথাটি বলতে পারত না।

হয়তো মনে পড়বে-

ক্যাম্পাসের কোনো পথে
তাকে দেখেছিলে।

কোনো করিডোরে।

কোনো বেঞ্চের আশেপাশে।

হয়তো কিছুই
মনে পড়বে না।

শুধু অস্পষ্ট অনুভূতি-

কেউ একজন
একসময় আমাকে
খুব পছন্দ করত।

সেটুকুই যথেষ্ট।

আমি চাই না
একদিন যদি মনে পড়ে,
তোমার মনে অপরাধবোধ আসুক।

ভাববে না-

আমি কি তাকে কষ্ট দিয়েছিলাম?

না।

তুমি তোমার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলে।

একজন মানুষের
নিজের অনুভূতির উত্তর দেওয়ার
স্বাধীনতা যেমন আছে,

উত্তর না দেওয়ারও
স্বাধীনতা আছে।

তুমি আমার ভালোবাসা
গ্রহণ করোনি বলে
আমার জীবন থেমে থাকেনি।

আমি বেঁচেছি।

সময় পেরিয়েছি।

অসংখ্য কাজ করেছি।

মানুষের সঙ্গে থেকেছি।

হেসেছি।

কেঁদেছি।

শিখেছি।

শুধু একটি ছোট ঘরে
পুরোনো একটি স্মৃতি রেখেছি।

সেখানে তুমি ছিলে।

একদিন যদি মনে পড়ে,
তুমি সেই ঘরের জন্য
নিজেকে দায়ী কোরো না।

বরং যদি পারো
একটু হাসো।
ভাবো-
আমরা কী তরুণই না ছিলাম!

আমাদের সামনে তখন
কত জীবন পড়ে ছিল।
আমরা কেউ জানতাম না
কোথায় যাব।
কী হব।
কত বছর কেটে যাবে।

আমরা জানতাম না
একদিন আমাদের বয়স
ষাটের কাছাকাছি এসে দাঁড়াবে।

একদিন যদি মনে পড়ে
আমার সেই অপ্রস্তুত মুখ,
হয়তো তুমি ভাববে-
ছেলেটা বড় অদ্ভুত ছিল!

আমি দূর থেকে
এই সম্ভাবনায় হাসি।

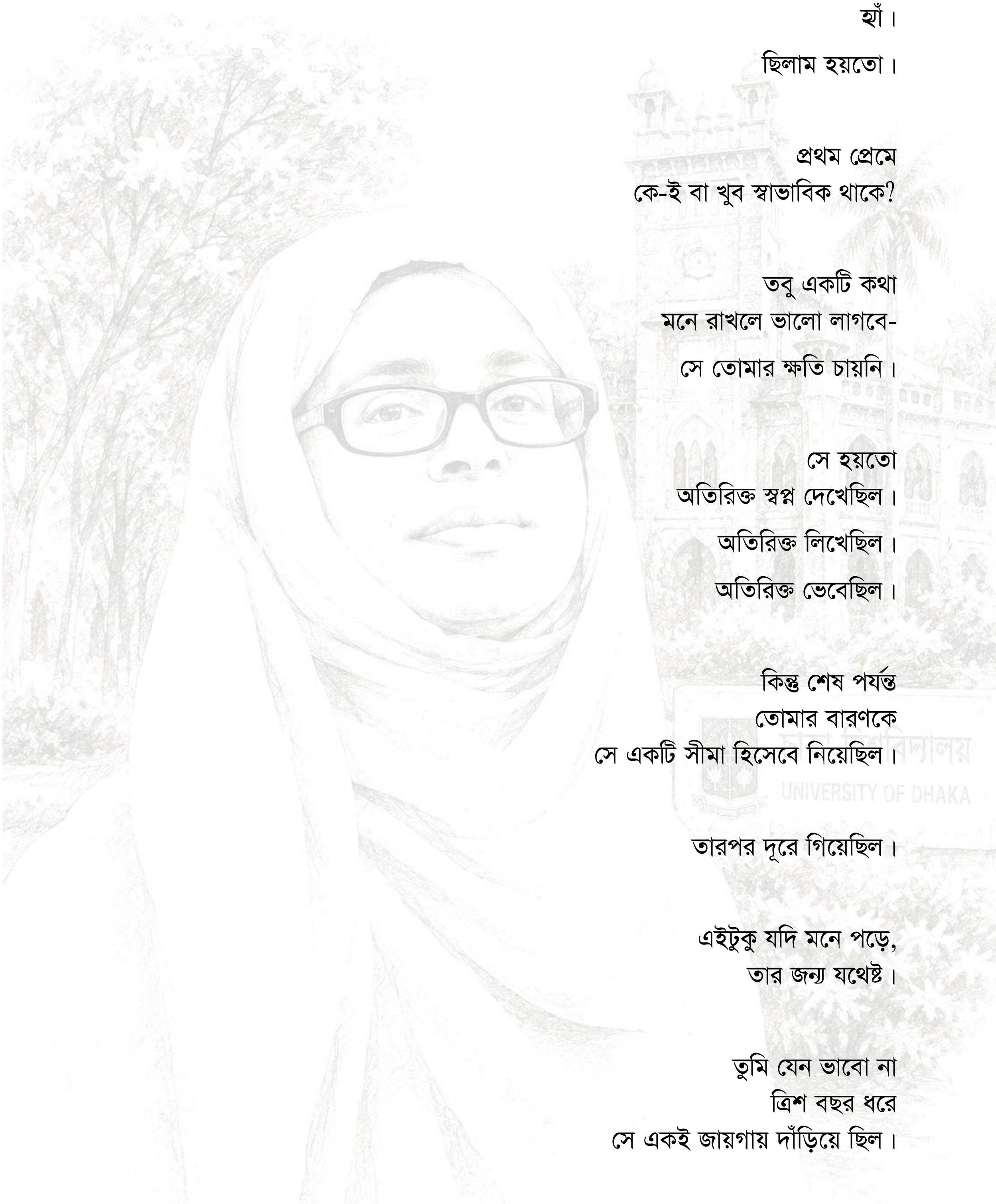

হ্যাঁ।

ছিলাম হয়তো।

প্রথম প্রেমে
কে-ই বা খুব স্বাভাবিক থাকে?

তবু একটি কথা
মনে রাখলে ভালো লাগবে-
সে তোমার ক্ষতি চায়নি।

সে হয়তো
অতিরিক্ত স্বপ্ন দেখেছিল।
অতিরিক্ত লিখেছিল।
অতিরিক্ত ভেবেছিল।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত
তোমার বারণকে
সে একটি সীমা হিসেবে নিয়েছিল।

তারপর দূরে গিয়েছিল।

এইটুকু যদি মনে পড়ে,
তার জন্য যথেষ্ট।

তুমি যেন ভাবো না
ত্রিশ বছর ধরে
সে একই জায়গায় দাঁড়িয়ে ছিল।

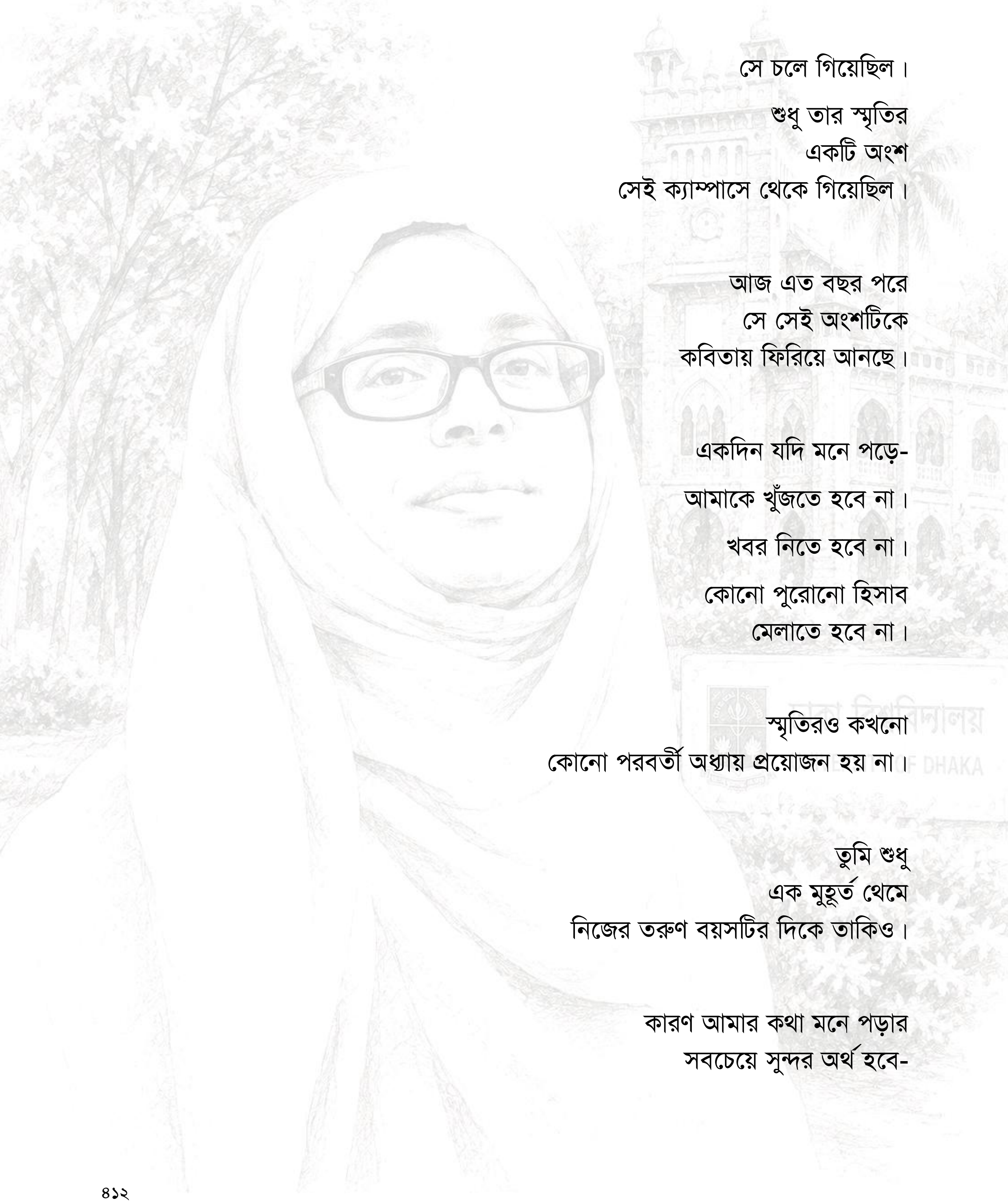

না।

সে চলে গিয়েছিল।

শুধু তার স্মৃতির
একটি অংশ
সেই ক্যাম্পাসে থেকে গিয়েছিল।

আজ এত বছর পরে
সে সেই অংশটিকে
কবিতায় ফিরিয়ে আনছে।

একদিন যদি মনে পড়ে-

আমাকে খুঁজতে হবে না।

খবর নিতে হবে না।

কোনো পুরোনো হিসাব
মেলাতে হবে না।

স্মৃতিরও কখনো
কোনো পরবর্তী অধ্যায় প্রয়োজন হয় না।

তুমি শুধু
এক মুহূর্ত থেমে
নিজের তরুণ বয়সটির দিকে তাকিও।

কারণ আমার কথা মনে পড়ার
সবচেয়ে সুন্দর অর্থ হবে-

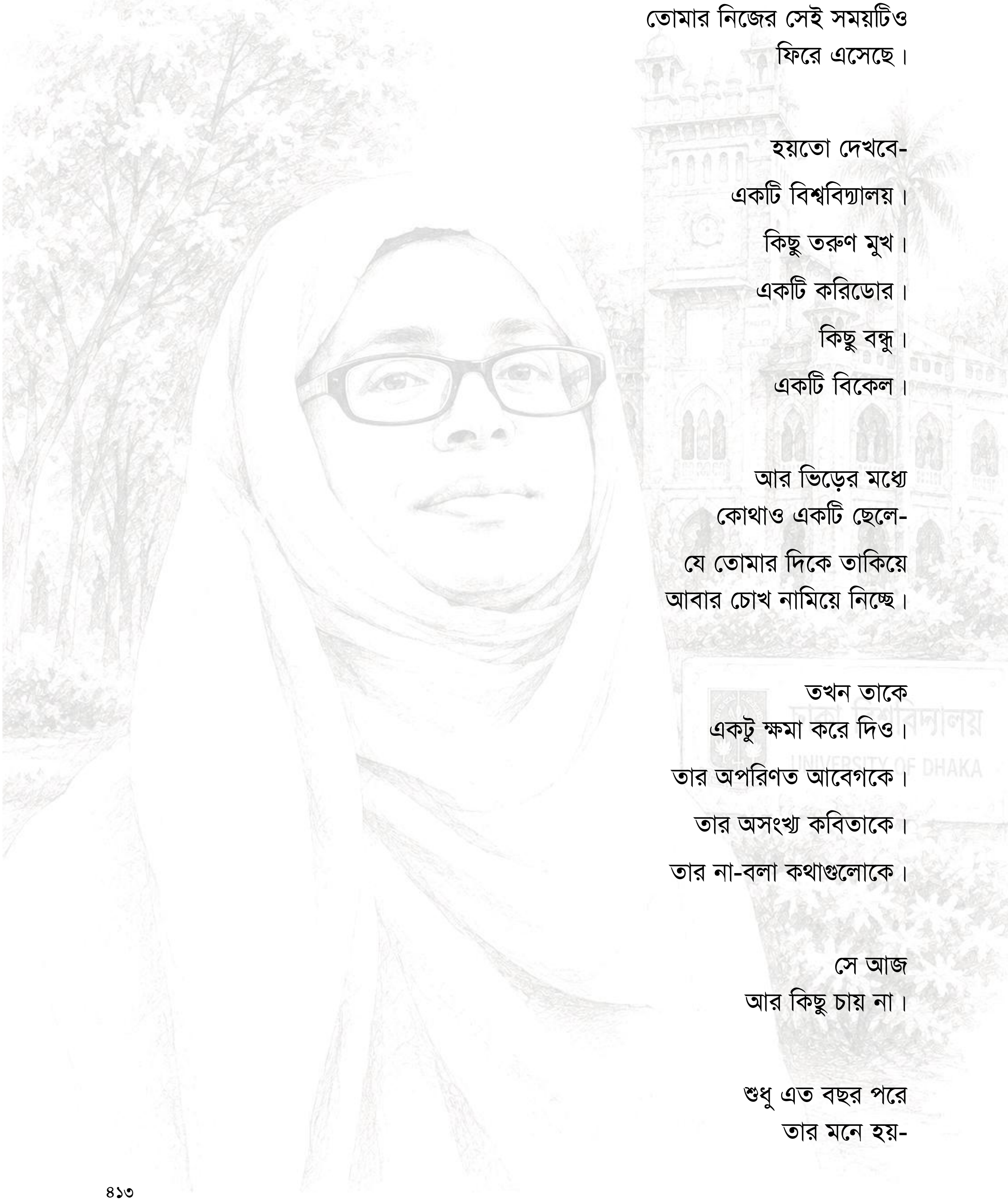

আমার সঙ্গে সঙ্গে
তোমার নিজের সেই সময়টিও
ফিরে এসেছে।

হয়তো দেখবে-
একটি বিশ্ববিদ্যালয়।
কিছু তরুণ মুখ।
একটি করিডোর।
কিছু বন্ধু।
একটি বিকেল।

আর ভিড়ের মধ্যে
কোথাও একটি ছেলে-
যে তোমার দিকে তাকিয়ে
আবার চোখ নামিয়ে নিচ্ছে।

তখন তাকে
একটু ক্ষমা করে দিও।
তার অপরিণত আবেগকে।
তার অসংখ্য কবিতাকে।
তার না-বলা কথাগুলোকে।

সে আজ
আর কিছু চায় না।

শুধু এত বছর পরে
তার মনে হয়-

কোনো একদিন
যদি তোমার স্মৃতির জানালায়
সে এক মুহূর্তের জন্য ফিরে আসে,

তবে তুমি যেন
বিষণ্ণ না হও।

বরং মৃদু হেসে বলো-

"হ্যাঁ,
একটি ছেলে ছিল।"

তারপর আবার
নিজের জীবনে ফিরে যেও।

আর আমার জন্য
সেই এক মুহূর্তের স্মরণই
কোনোদিন জানতে না পারলেও
যথেষ্ট হয়ে থাকবে।

আমাকে নয়, সেই ছেলেটিকে মনে রেখো

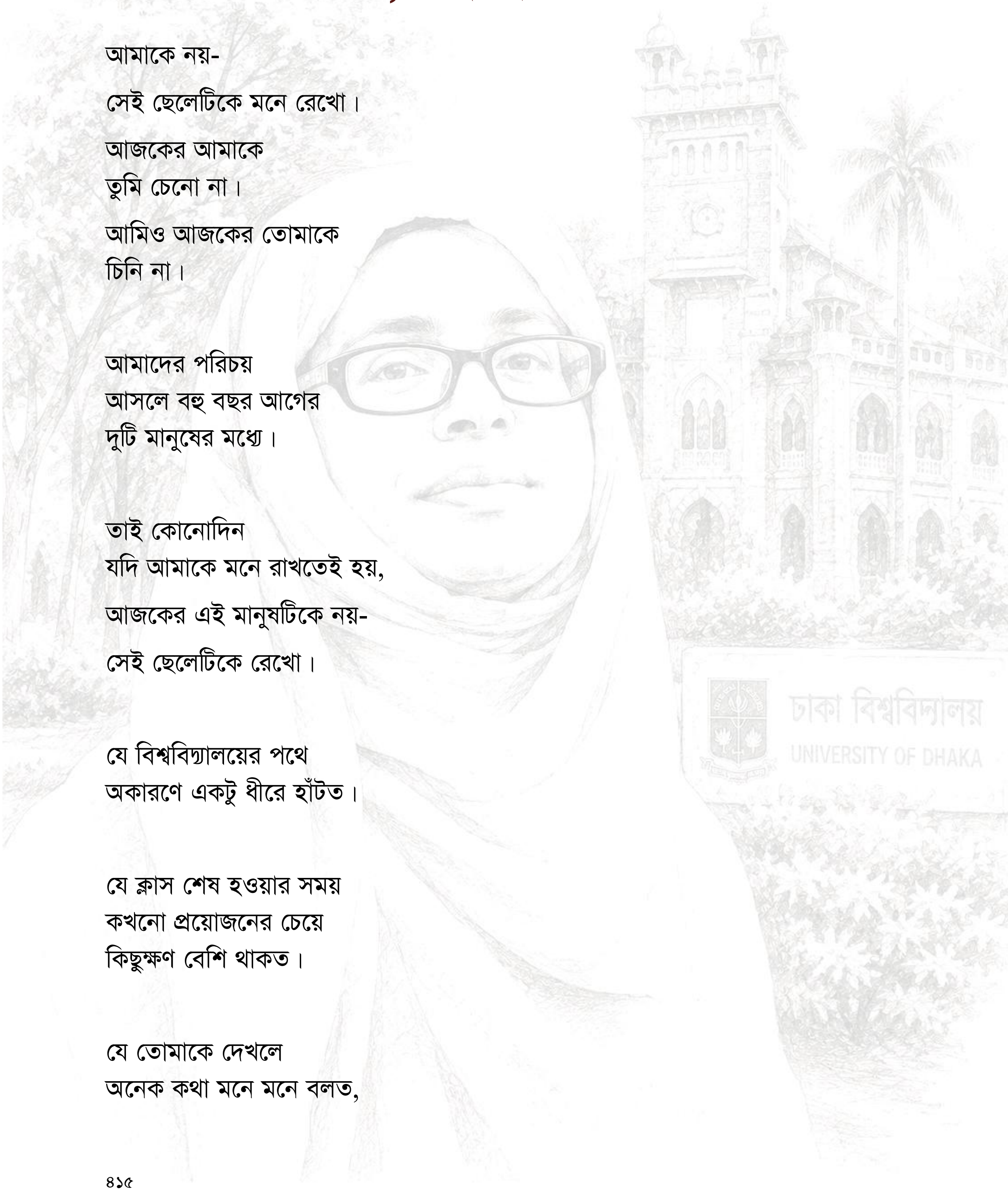

আমাকে নয়-

সেই ছেলেটিকে মনে রেখো।

আজকের আমাকে
তুমি চেনো না।

আমিও আজকের তোমাকে
চিনি না।

আমাদের পরিচয়
আসলে বহু বছর আগের
দুটি মানুষের মধ্যে।

তাই কোনোদিন
যদি আমাকে মনে রাখতেই হয়,

আজকের এই মানুষটিকে নয়-

সেই ছেলেটিকে রেখো।

যে বিশ্ববিদ্যালয়ের পথে
অকারণে একটু ধীরে হাঁটত।

যে ক্লাস শেষ হওয়ার সময়
কখনো প্রয়োজনের চেয়ে
কিছুক্ষণ বেশি থাকত।

যে তোমাকে দেখলে
অনেক কথা মনে মনে বলত,

আর সামনে গেলে
তার অর্ধেকও বলতে পারত না।

তাকে মনে রেখো।

সে নিখুঁত ছিল না।
খুব পরিণতও নয়।

সে নিজের অনুভূতির
তীব্রতাকে কখনো কখনো
সমস্ত পৃথিবীর সত্য মনে করত।

বয়সটাই এমন।

তবু সে
সত্যি ভালোবেসেছিল।
তার নিজের বোঝার সীমার মধ্যে।

তাকে মনে রেখো
একটি খাতা হাতে।

রাত গভীর।
সবাই ঘুমিয়েছে।
সে লিখছে।
একটির পর একটি পৃষ্ঠা।

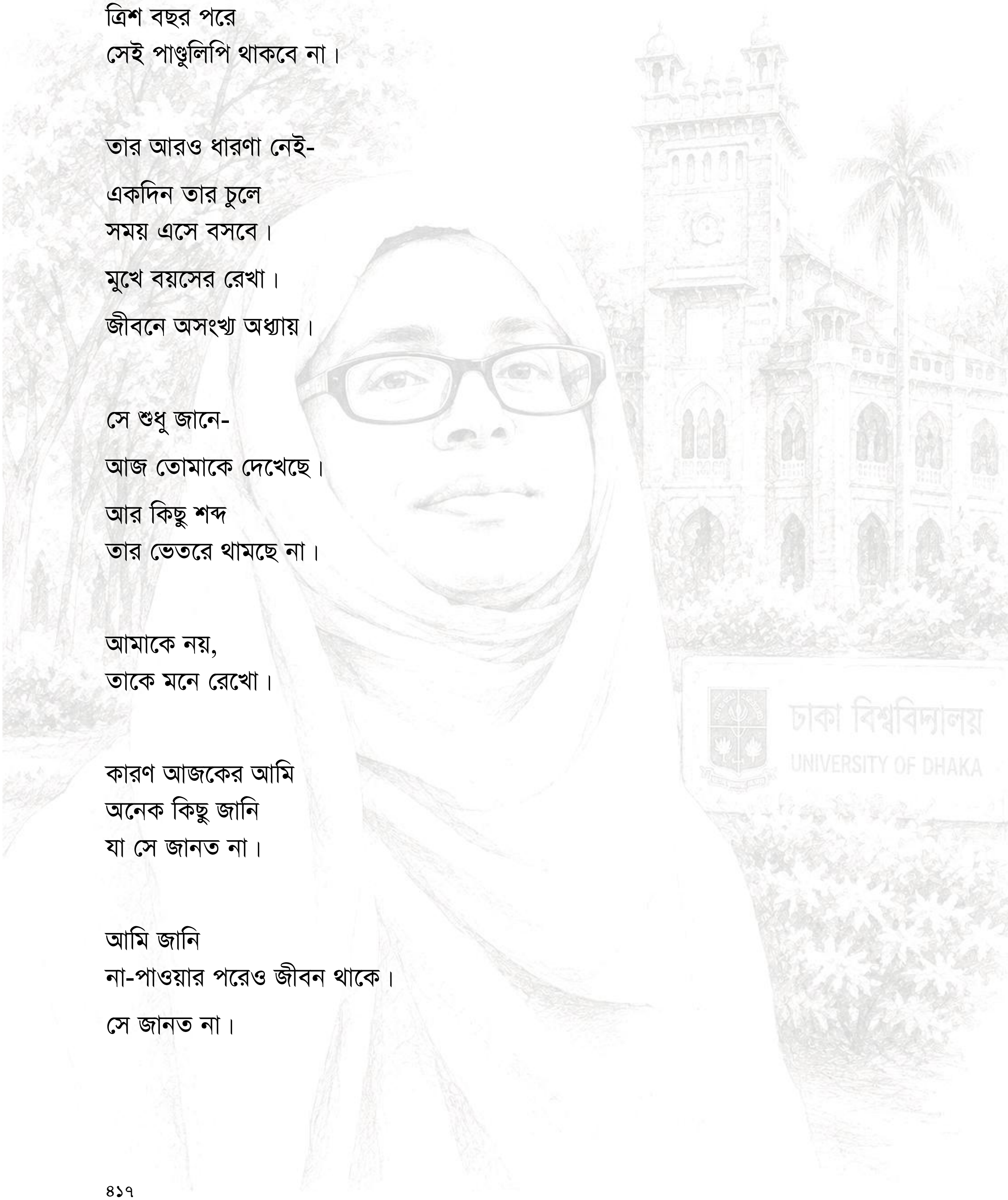

তার কোনো ধারণা নেই
ত্রিশ বছর পরে
সেই পাণ্ডুলিপি থাকবে না।

তার আরও ধারণা নেই-
একদিন তার চুলে
সময় এসে বসবে।
মুখে বয়সের রেখা।
জীবনে অসংখ্য অধ্যায়।

সে শুধু জানে-
আজ তোমাকে দেখেছে।
আর কিছু শব্দ
তার ভেতরে থামছে না।

আমাকে নয়,
তাকে মনে রেখো।

কারণ আজকের আমি
অনেক কিছু জানি
যা সে জানত না।

আমি জানি
না-পাওয়ার পরেও জীবন থাকে।
সে জানত না।

আমি জানি
কারও “না”
কোনো রহস্য নয়-
একটি সম্পূর্ণ উত্তর।
সে তখন
এটি শিখছিল।

আমি জানি
ভালোবাসা মানেই
কাছে পাওয়া নয়।
সে ভাবত
হয়তো একদিন কাছে আসবে।

তাই তাকে
আজকের জ্ঞান দিয়ে
বিচার কোরো না।

যদি কোনো ভুল করে থাকে
তার অপরিণত বয়সের ভেতর,
তাকে সেই বয়সের মানুষ হিসেবেই
মনে রেখো।

আমি যেমন
তোমার তরুণ বয়সকে
আজকের কোনো কল্পনা দিয়ে
বিচার করতে চাই না।

আমাদের সেই বয়সের মানুষ দুটো
তাদের সময়েই থাকুক।

কখনো মনে হয়-

যদি তোমার সামনে
আজকের আমি
এবং সেই তরুণ আমি
পাশাপাশি দাঁড়াই,

তুমি কাকে চিনবে?

নিশ্চয়ই তাকে।

আমার বর্তমান মুখে
হয়তো তোমার পরিচিতি নেই।

কিন্তু তার মুখে
তোমার বিশ্ববিদ্যালয়ের সময় আছে।

তখন আমি
একটু পেছনে সরে দাঁড়াব।

বলব-

ওর সঙ্গেই কথা বলো।

সে হয়তো আবার
অপ্রস্তুত হবে।

আমি দূর থেকে হাসব।

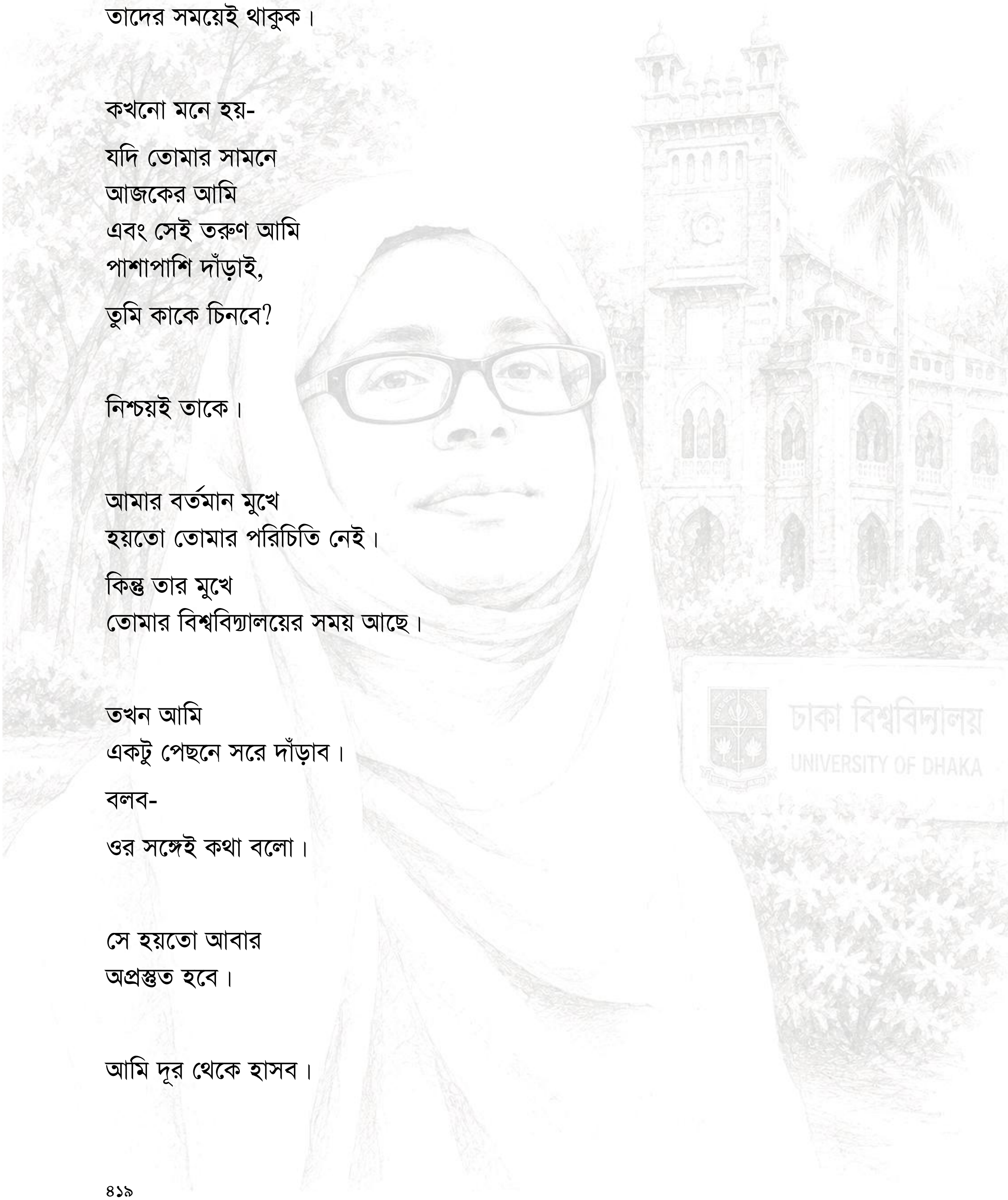

তুমি যদি তাকে জিজ্ঞেস করো-

“এত কবিতা কেন?”

সে হয়তো
উত্তর দিতে পারবে না।

আমি পারি।

কারণ কিছু মানুষ
আমাদের জীবনে এসে
শুধু সম্পর্ক তৈরি করে না-

ভাষাও তৈরি করে।

তুমি তার ভেতরে
একটি ভাষা তৈরি করেছিলে।

কবিতার ভাষা।

সে তোমাকে পেয়েছিল কি না
তার চেয়ে বড় হয়ে উঠেছিল-

সে তোমাকে অনুভব করে
নিজের ভেতরের একটি অচেনা মানুষকে
প্রথম চিনেছিল।

সেই কারণেই
আজ বলি-

আমাকে নয়,
সেই ছেলেটিকে মনে রেখো।

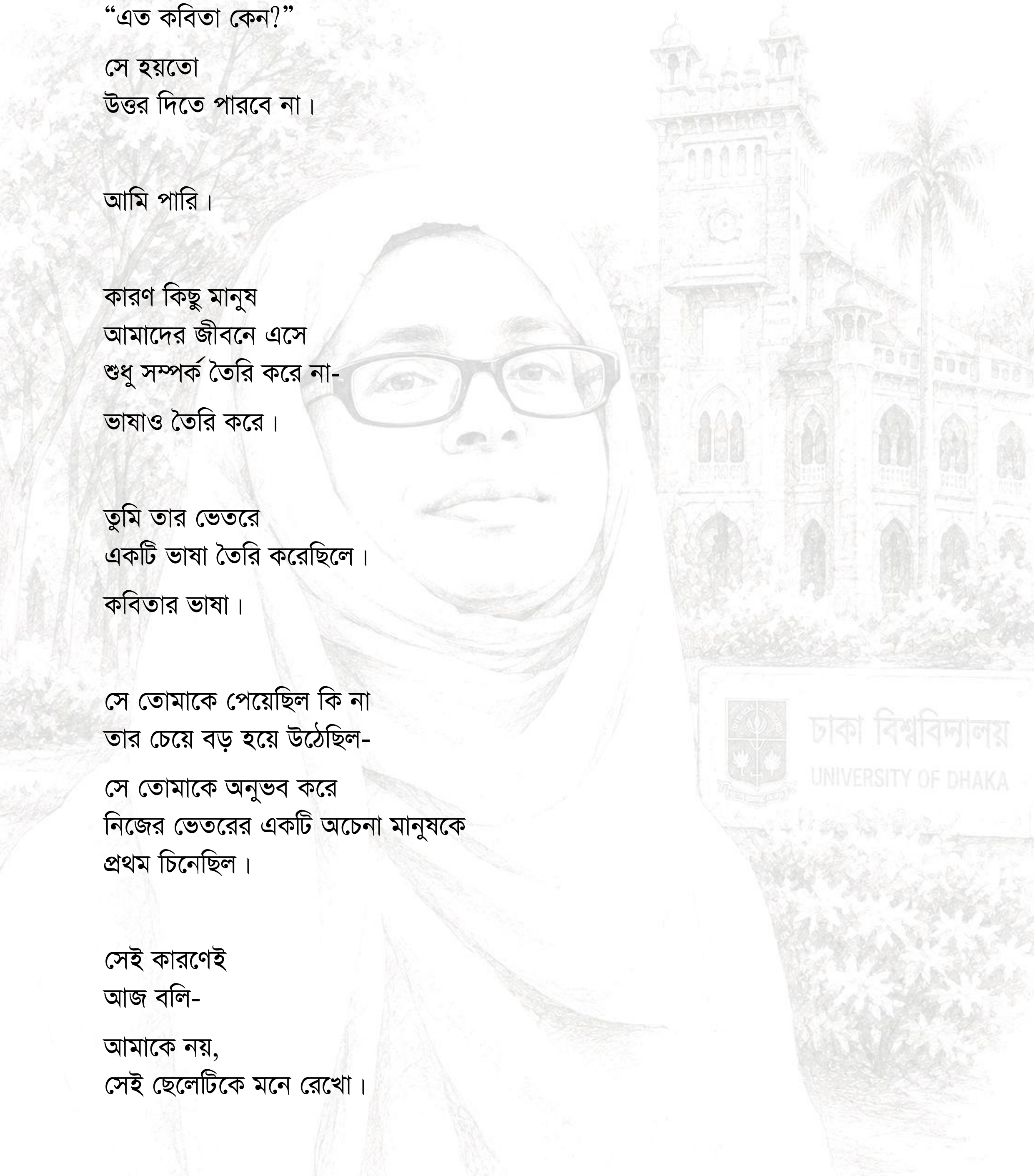

আজকের আমি
নিজের জীবন নিয়ে
অনেক দূরে চলে এসেছি।

কিন্তু সেই ছেলে
তোমার স্মৃতির কাছে
যদি কোথাও থেকে থাকে,
তাকে মুছে দিও না
এ কথা বলার অধিকারও
আমার নেই।

তুমি চাইলে
ভুলে যেও।

তবু কবিতার ভেতর
আমি একটি অনুরোধ রেখে দিতে পারি-
কোনোদিন যদি সে
নিজে থেকেই মনে পড়ে,
তাকে একটু কোমল চোখে দেখো।

সে তোমাকে
নিজের করে নিতে পারেনি।
শেষ পর্যন্ত
চেষ্টাও করেনি।

কিন্তু সে তোমার কারণে
একদিন বুঝেছিল-

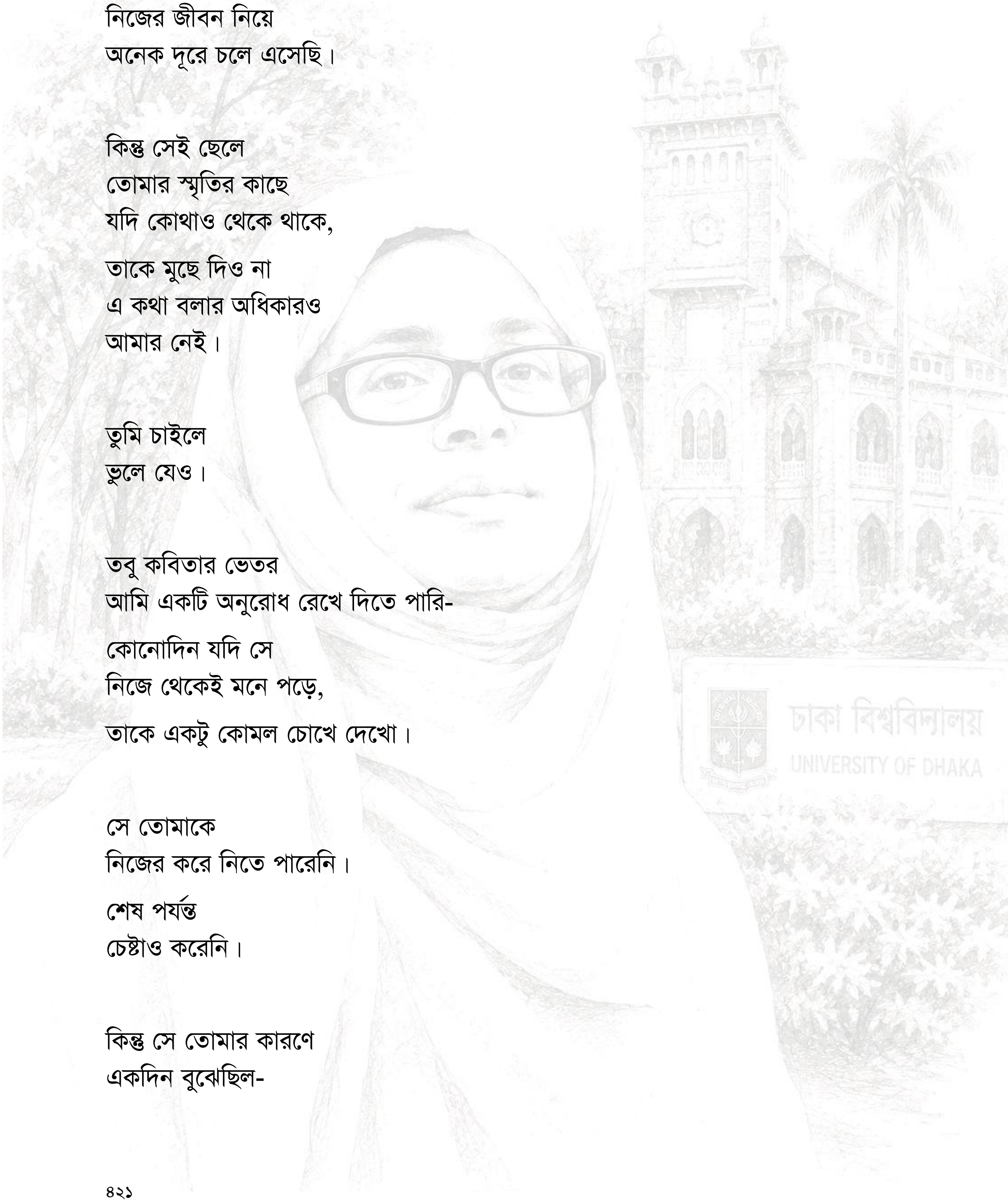

হৃদয়ের ভেতর
শব্দেরও জন্ম হয়।

তাই আমাকে নয়-

সেই ছেলেটিকে মনে রেখো,
যে তোমার সামনে দাঁড়িয়ে
কিছুই ঠিকমতো বলতে পারেনি,
কিন্তু ফিরে গিয়ে
পাতার পর পাতা লিখেছিল।

আজকের আমি
তার হয়ে শুধু এটুকু বলি-

সে তোমার কাছে কিছু পায়নি বলে
দরিদ্র হয়নি;
সে একবার সত্যিকারের অনুভব করতে পেরেছিল-
এটাই ছিল তার প্রাপ্তি।

১৯৯০-এর ছেলেটি এখনো বেঁচে আছে

১৯৯০-এর ছেলেটি
এখনো বেঁচে আছে।
আমার ভেতরে।

সে প্রতিদিন জেগে ওঠে না।
আমার সঙ্গে
কাজে যায় না।
প্রতিদিনের কথাবার্তায়
তার কোনো উপস্থিতি নেই।

বছরের পর বছর
সে ঘুমিয়েও থাকে।

তারপর হঠাৎ
কোনো একটি শব্দ,
কোনো পুরোনো ছবি,
কোনো ক্যাম্পাস,
কোনো বিকেলের আলো-
তাকে জাগিয়ে দেয়।

সে উঠে বসে।
চারদিকে তাকায়।
বিস্মিত হয়ে বলে-
এত বছর কেটে গেল?

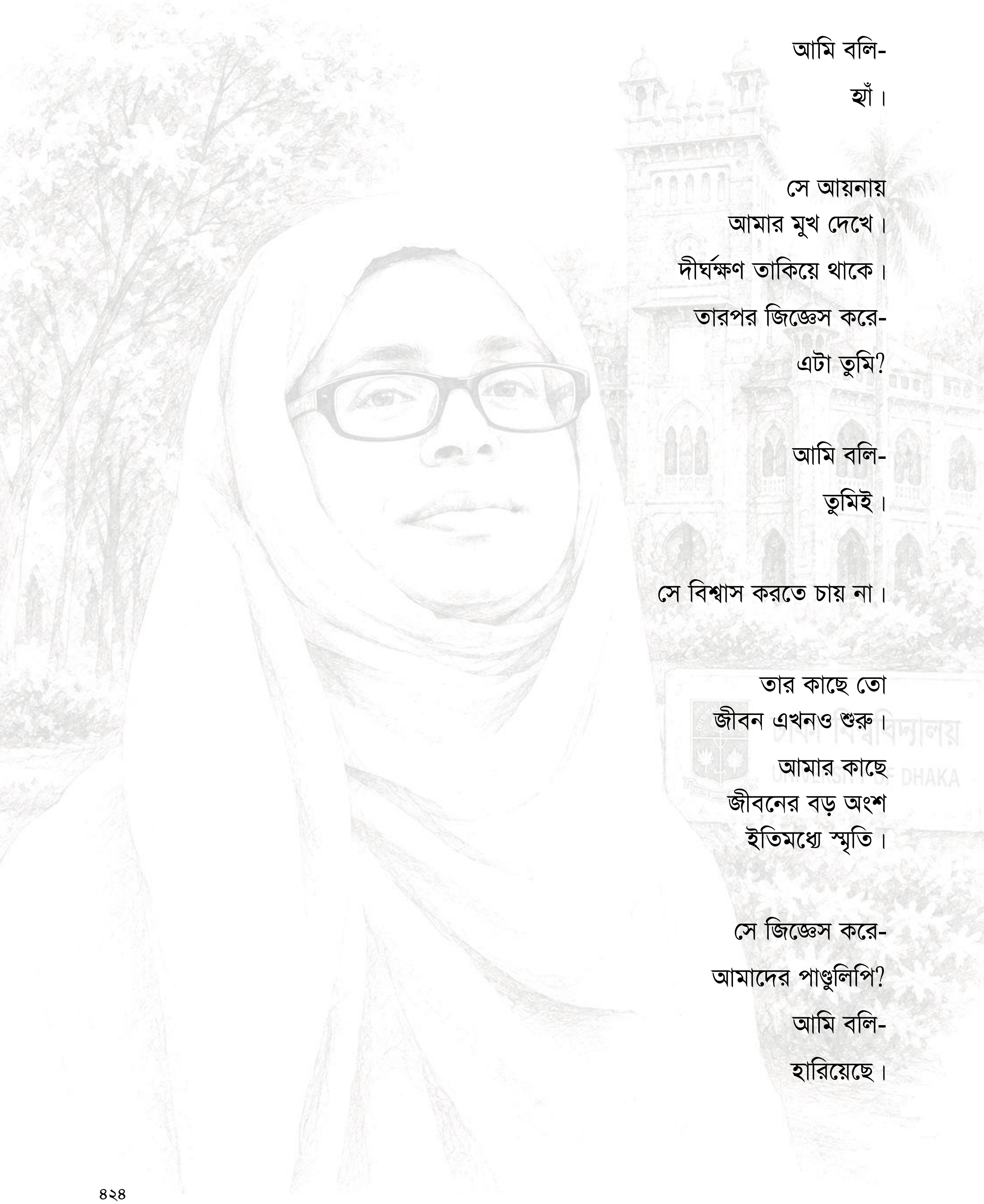

আমি বলি-

হ্যাঁ।

সে আয়নায়
আমার মুখ দেখে।

দীর্ঘক্ষণ তাকিয়ে থাকে।

তারপর জিজ্ঞেস করে-

এটা তুমি?

আমি বলি-

তুমিই।

সে বিশ্বাস করতে চায় না।

তার কাছে তো
জীবন এখনও শুরু।
আমার কাছে
জীবনের বড় অংশ
ইতিমধ্যে স্মৃতি।

সে জিজ্ঞেস করে-

আমাদের পাণ্ডুলিপি?

আমি বলি-

হারিয়েছে।

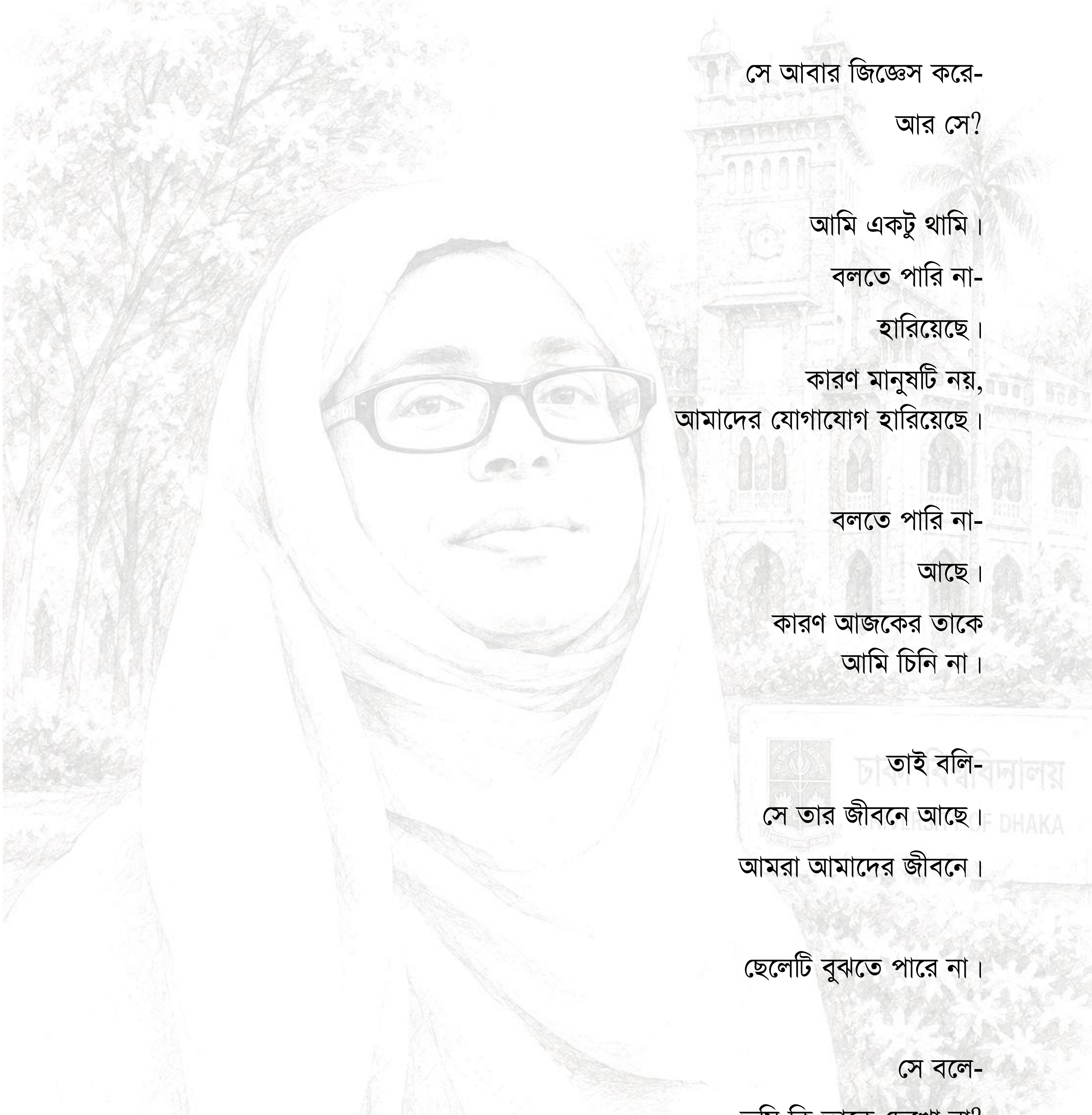

তার মুখ মলিন।

সে আবার জিজ্ঞেস করে-
আর সে?

আমি একটু থামি।
বলতে পারি না-
হারিয়েছে।
কারণ মানুষটি নয়,
আমাদের যোগাযোগ হারিয়েছে।

বলতে পারি না-
আছে।
কারণ আজকের তাকে
আমি চিনি না।

তাই বলি-
সে তার জীবনে আছে।
আমরা আমাদের জীবনে।

ছেলেটি বুঝতে পারে না।

সে বলে-
তুমি কি তাকে দেখো না?
না।

কথা বলো না?

না।

এত বছর?

হ্যাঁ।

সে অবাক হয়ে
আমার দিকে তাকায়।

তার কাছে
ত্রিশ বছর মানে প্রায়
অসম্ভব একটি সময়।

তারপর সবচেয়ে জরুরি প্রশ্ন-

তাহলে তুমি
এখনও লিখছ কেন?

আমি বলি-
তোমার জন্য।

সে আরও অবাক।

আমার জন্য?

হ্যাঁ।

তুমি যে পাণ্ডুলিপি হারিয়েছিলে,
আমি তাকে হুবহু ফেরাতে পারব না।

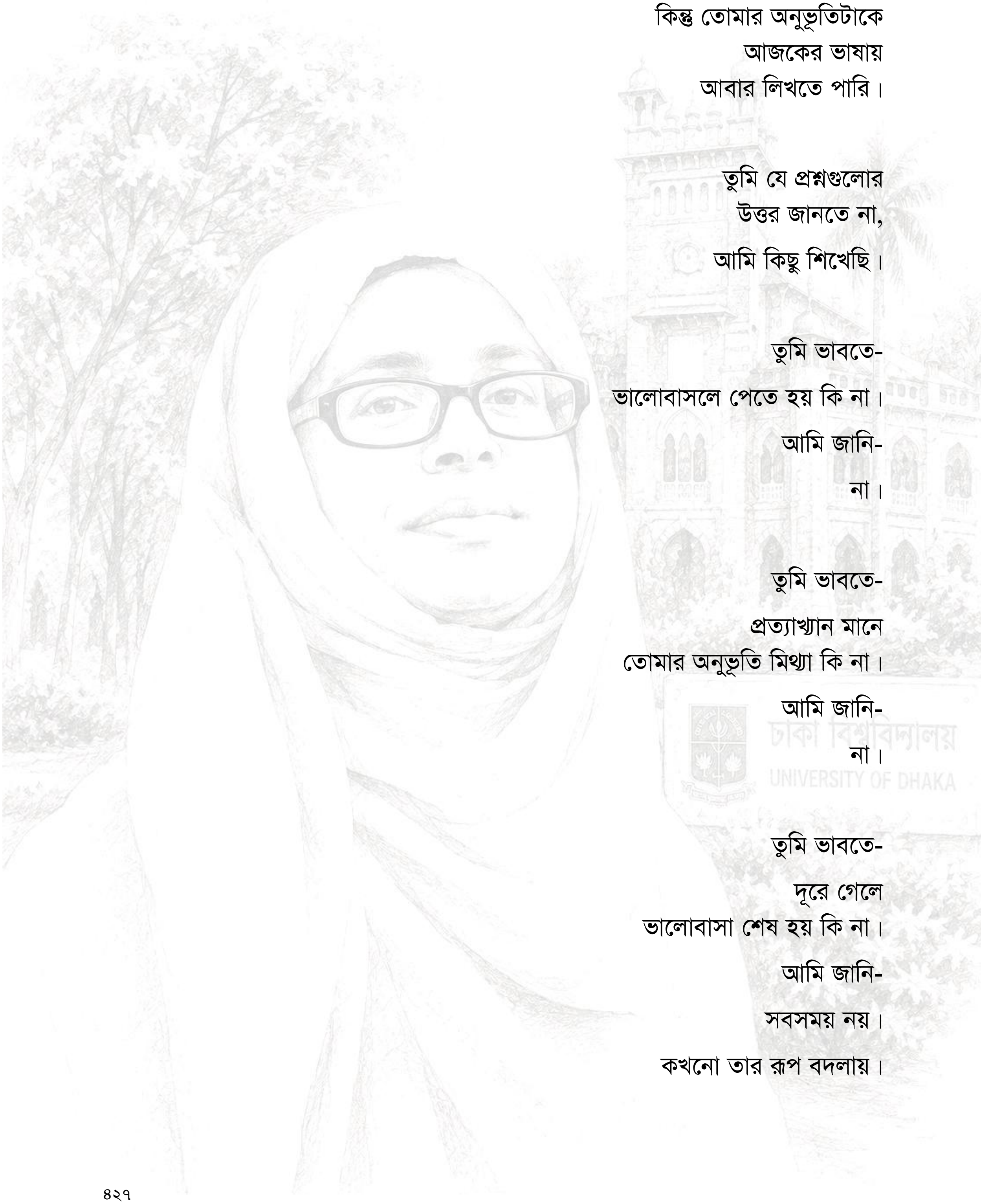

কিন্তু তোমার অনুভূতিটাকে
আজকের ভাষায়
আবার লিখতে পারি।

তুমি যে প্রশ্নগুলোর
উত্তর জানতে না,
আমি কিছু শিখেছি।

তুমি ভাবতে-
ভালোবাসলে পেতে হয় কি না।
আমি জানি-
না।

তুমি ভাবতে-
প্রত্যাখ্যান মানে
তোমার অনুভূতি মিথ্যা কি না।
আমি জানি-
না।

তুমি ভাবতে-
দূরে গেলে
ভালোবাসা শেষ হয় কি না।
আমি জানি-
সবসময় নয়।
কখনো তার রূপ বদলায়।

তুমি ভাবতে-
তাকে ভুলতেই হবে কি না।
আমি জানি-
না।
শুধু তার স্বাধীনতাকে
সম্মান করতে হয়।

ছেলেটি চুপ করে শোনে।

তারপর বলে-
তুমি অনেক কিছু শিখেছ।
আমি বলি-
মূল্য দিয়ে।

সে হেসে বলে-
বুড়ো হয়ে গেছ।

আমি হাসি।
বলতে পারি-
তুমিও একদিন হবে।
কিন্তু বলি না।
কারণ সে কখনো হবে না।

সে স্মৃতির মানুষ।
তার বয়স
১৯৯০-তেই থেমে আছে।

এই উপলব্ধিটি
আমাকে কখনো আনন্দ দেয়,
কখনো বিষণ্নতা।

আমার শরীর
সময়ের দিকে এগোয়।

সে পেছনে দাঁড়িয়ে।

একদিন আমি থাকব না।

তখন কি
সেও থাকবে?

সম্ভবত না।

আমার সঙ্গে
তারও শেষ হবে।

তাই তার কথাগুলো
এখন লিখে রাখছি।

কাগজের আয়ু
মানুষের চেয়ে কখনো দীর্ঘ হয়।

হয়তো বহু বছর পরে
কেউ এই কবিতাগুলো পড়বে।

সে জানবে না
তুমি কে।

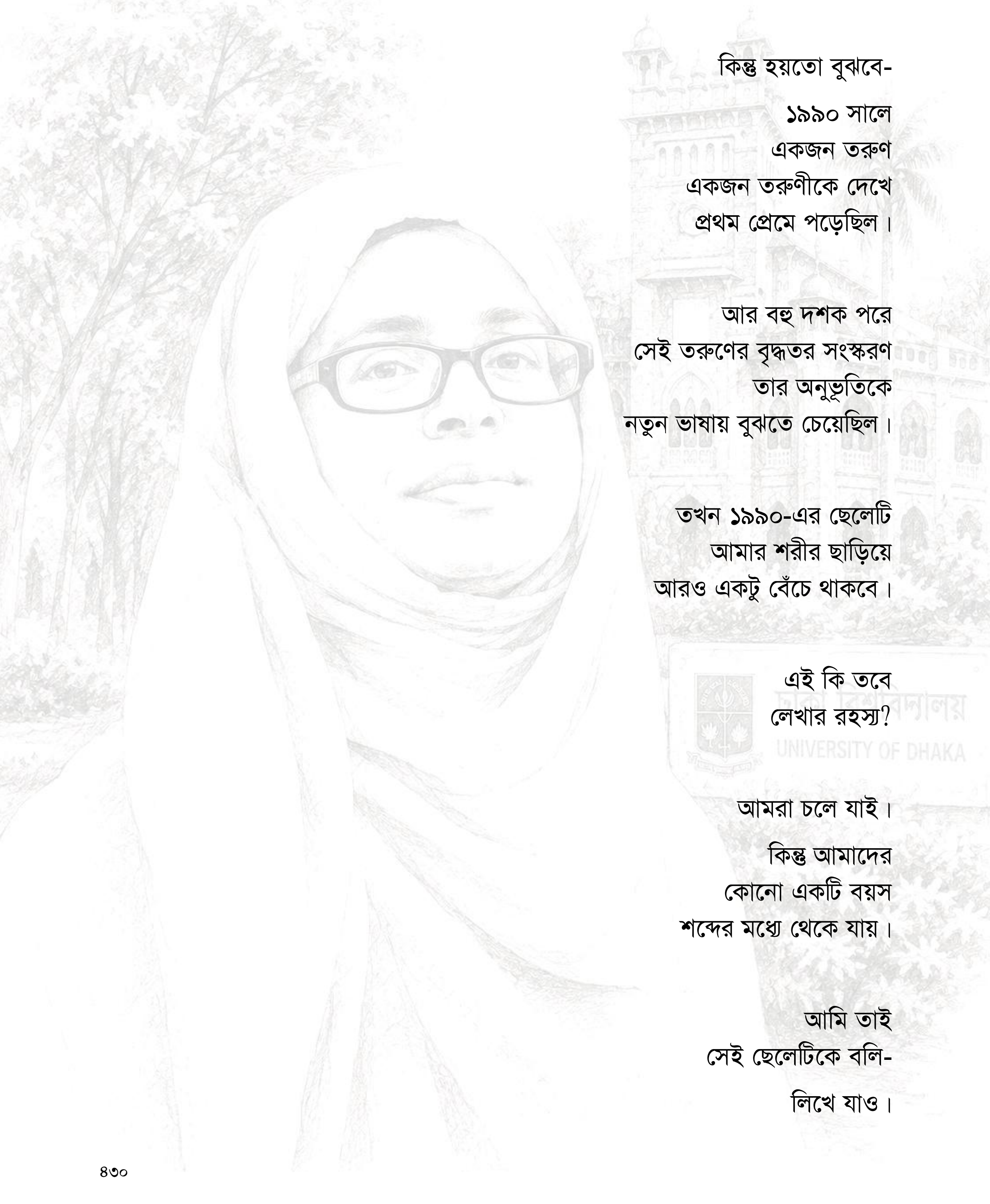

আমাকেও না।

কিন্তু হয়তো বুঝবে-

১৯৯০ সালে
একজন তরুণ
একজন তরুণীকে দেখে
প্রথম প্রেমে পড়েছিল।

আর বহু দশক পরে
সেই তরুণের বৃদ্ধতর সংস্করণ
তার অনুভূতিকে
নতুন ভাষায় বুঝতে চেয়েছিল।

তখন ১৯৯০-এর ছেলেটি
আমার শরীর ছাড়িয়ে
আরও একটু বেঁচে থাকবে।

এই কি তবে
লেখার রহস্য?

আমরা চলে যাই।

কিন্তু আমাদের
কোনো একটি বয়স
শব্দের মধ্যে থেকে যায়।

আমি তাই
সেই ছেলেটিকে বলি-

লিখে যাও।

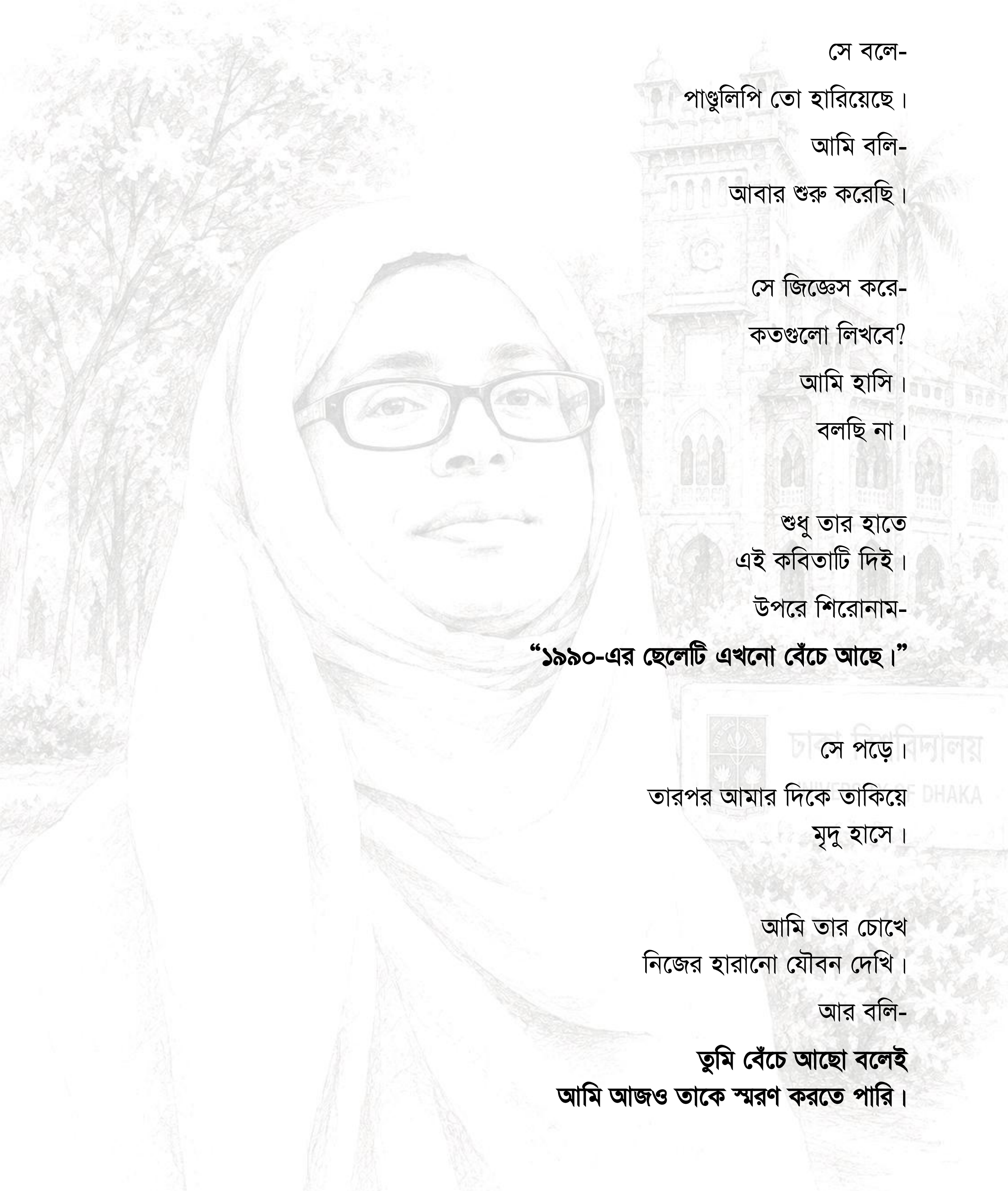

সে বলে-

পাণ্ডুলিপি তো হারিয়েছে।

আমি বলি-

আবার শুরু করেছি।

সে জিজ্ঞেস করে-

কতগুলো লিখবে?

আমি হাসি।

বলছি না।

শুধু তার হাতে
এই কবিতাটি দিই।

উপরে শিরোনাম-

“১৯৯০-এর ছেলেটি এখনো বেঁচে আছে।”

সে পড়ে।

তারপর আমার দিকে তাকিয়ে
মৃদু হাসে।

আমি তার চোখে
নিজের হারানো যৌবন দেখি।

আর বলি-

তুমি বেঁচে আছো বলেই
আমি আজও তাকে স্মরণ করতে পারি।

কিন্তু তুমি আর তার কাছে যাবে না।
তোমার জায়গা এখন কবিতায়।

সে মাথা নেড়ে
আবার খাতা খুলে বসে।

আর আমি বুঝি-

আমার বয়স প্রায় ষাট,
কিন্তু আমার ভেতরে
একটি ছেলে এখনও
১৯৯০ সালের একটি বিকেলে বসে
তার প্রথম প্রেমের কবিতা লিখছে।

আমরা দুজনেই এখন প্রায় ষাট

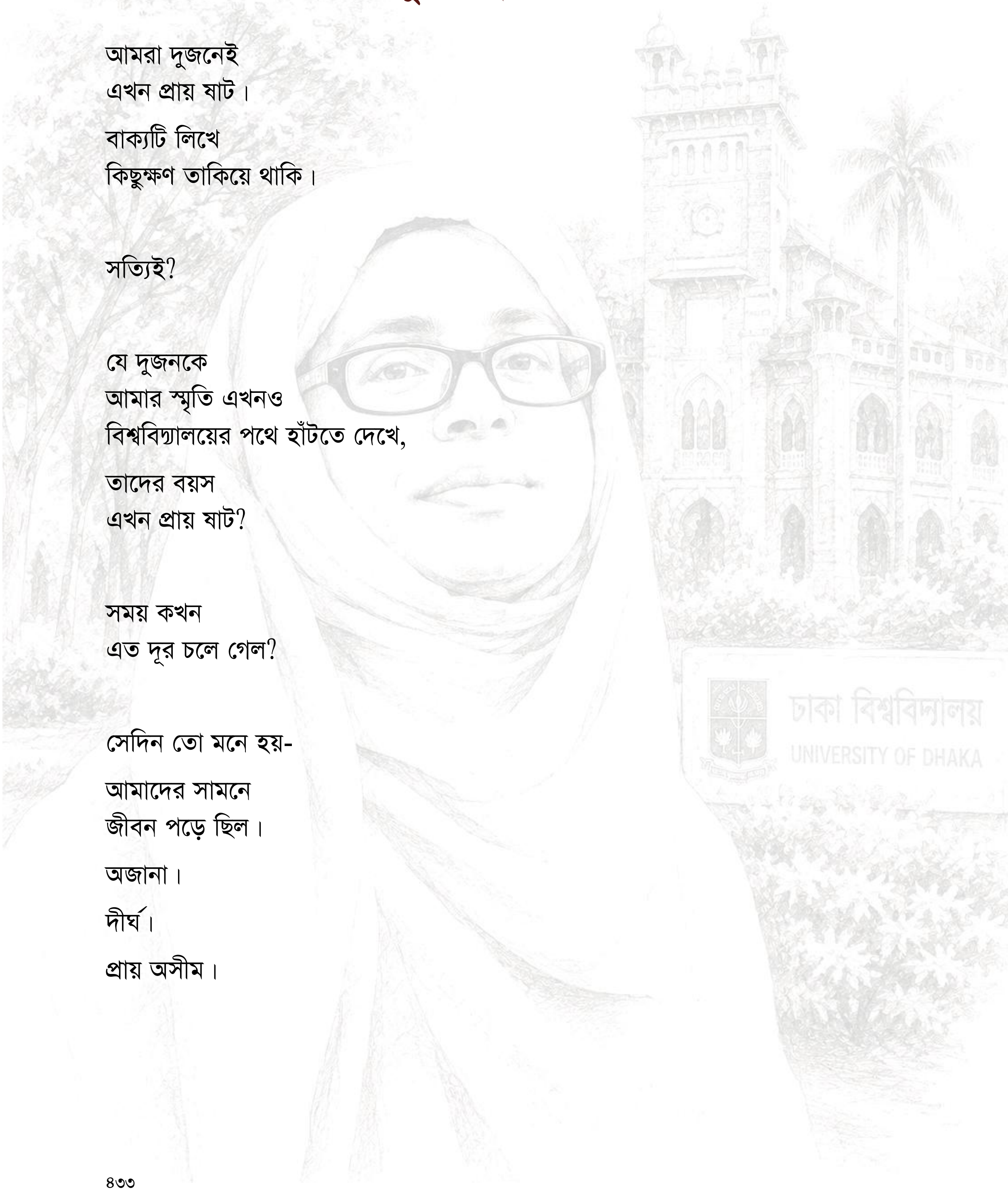

আমরা দুজনেই
এখন প্রায় ষাট।

বাক্যটি লিখে
কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকি।

সত্যিই?

যে দুজনকে
আমার স্মৃতি এখনও
বিশ্ববিদ্যালয়ের পথে হাঁটতে দেখে,

তাদের বয়স
এখন প্রায় ষাট?

সময় কখন
এত দূর চলে গেল?

সেদিন তো মনে হয়-

আমাদের সামনে
জীবন পড়ে ছিল।

অজানা।

দীর্ঘ।

প্রায় অসীম।

আজ সামনে তাকালে
সময়কে আর
অসীম মনে হয় না।

এটাই বয়সের
সবচেয়ে বড় শিক্ষা হয়তো-

একদিন মানুষ
হঠাৎ বুঝতে পারে,

তার পেছনের পথটি
সামনের পথের চেয়ে
অনেক দীর্ঘ হয়ে গেছে।

আমরা দুজনেই এখন প্রায় ষাট।

তোমার জীবনের
এই দীর্ঘ বছরগুলোর কথা
আমি জানি না।

তুমি কতবার
নতুন করে শুরু করেছ।

কতবার ভেঙে পড়েও
আবার দাঁড়িয়েছ।

কত আনন্দ পেয়েছ।

কত মানুষ
তোমার আপন হয়েছে।

আমি জানি না।

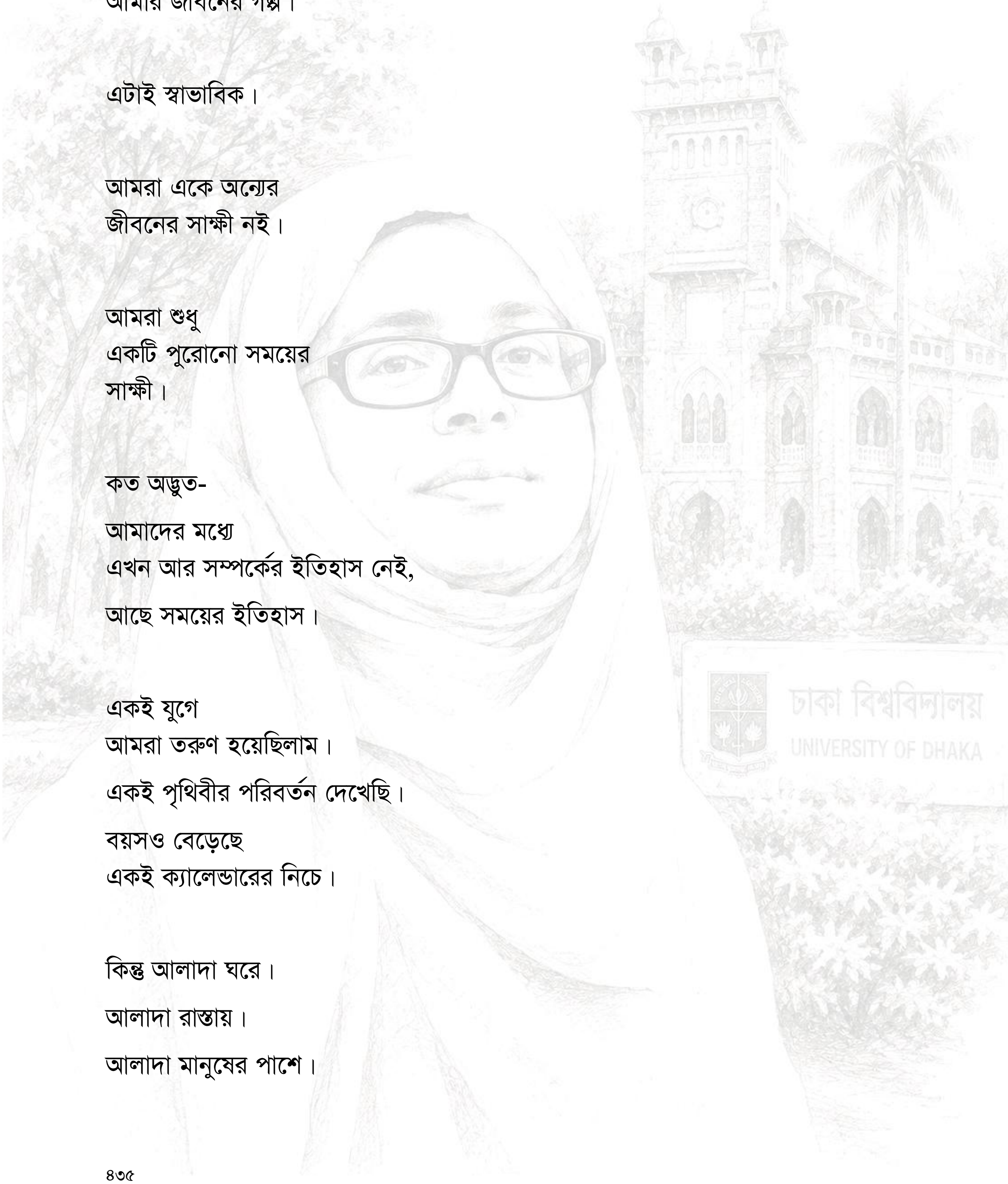

তুমিও জানো না
আমার জীবনের গল্প।

এটাই স্বাভাবিক।

আমরা একে অন্যের
জীবনের সাক্ষী নই।

আমরা শুধু
একটি পুরোনো সময়ের
সাক্ষী।

কত অদ্ভুত-
আমাদের মধ্যে
এখন আর সম্পর্কের ইতিহাস নেই,
আছে সময়ের ইতিহাস।

একই যুগে
আমরা তরুণ হয়েছিলাম।
একই পৃথিবীর পরিবর্তন দেখেছি।
বয়সও বেড়েছে
একই ক্যালেন্ডারের নিচে।

কিন্তু আলাদা ঘরে।
আলাদা রাস্তায়।
আলাদা মানুষের পাশে।

আমরা দুজনেই এখন প্রায় ষাট।

এই বয়সে এসে
তোমাকে নিয়ে লিখতে বসে
আমি কোনো নতুন শুরু খুঁজি না।

বরং একটি পুরোনো শুরুর
অর্থ বুঝতে চাই।

কেন তুমি
এত গভীরভাবে মনে রয়ে গেলে?

হয়তো তুমি বলেই নয়।
হয়তো তুমি
আমার জীবনের একটি বয়সের
প্রতীক হয়ে গিয়েছিলে।

যে বয়সে
সবকিছু প্রথম।
প্রথম গভীর মুগ্ধতা।
প্রথম না-বলা কথা।
প্রথম অপেক্ষা।
প্রথম প্রত্যাখ্যান।
প্রথম দীর্ঘ কবিতা।

তোমাকে মনে পড়লে তাই
শুধু তোমাকে মনে পড়ে না-

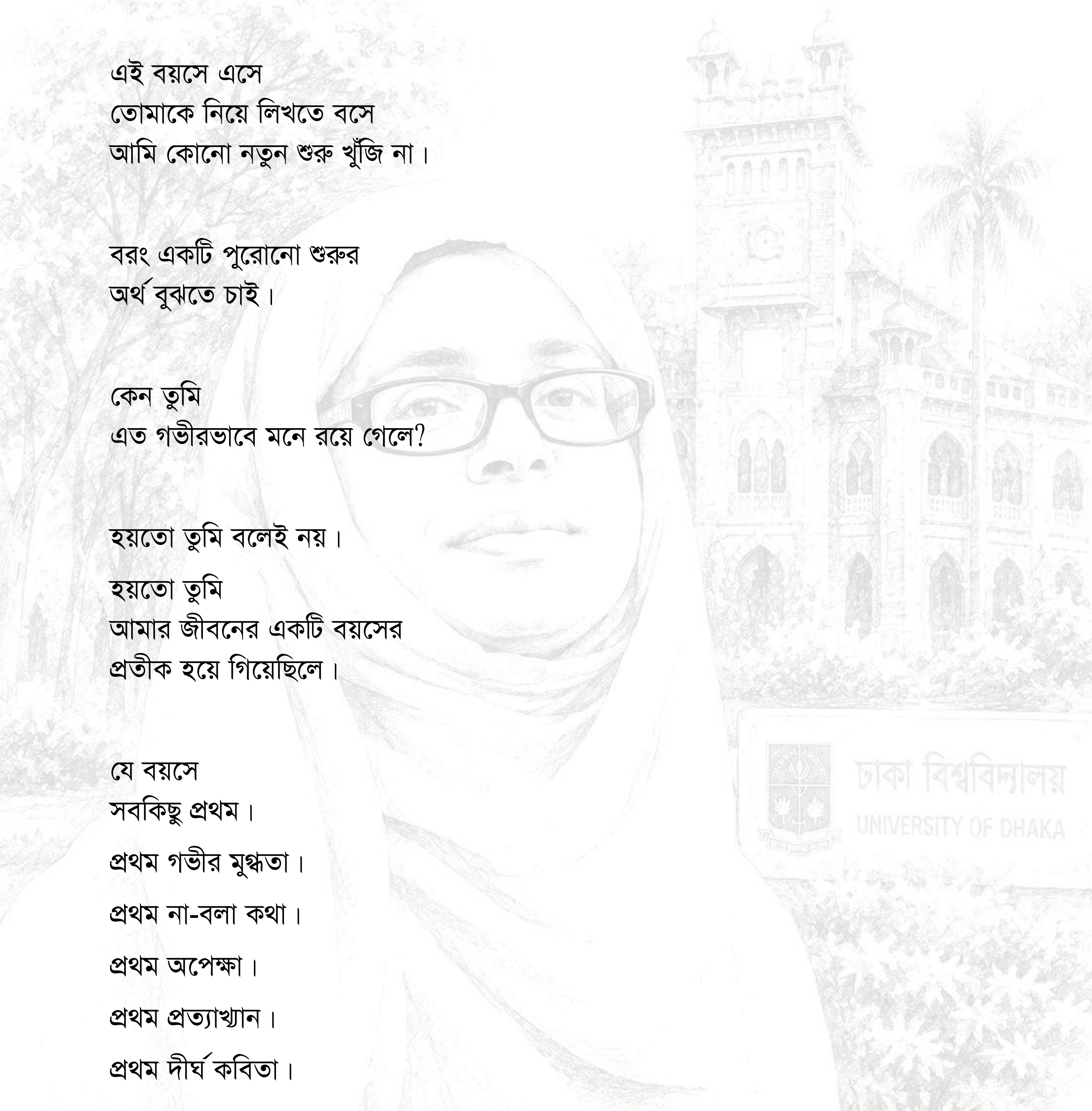

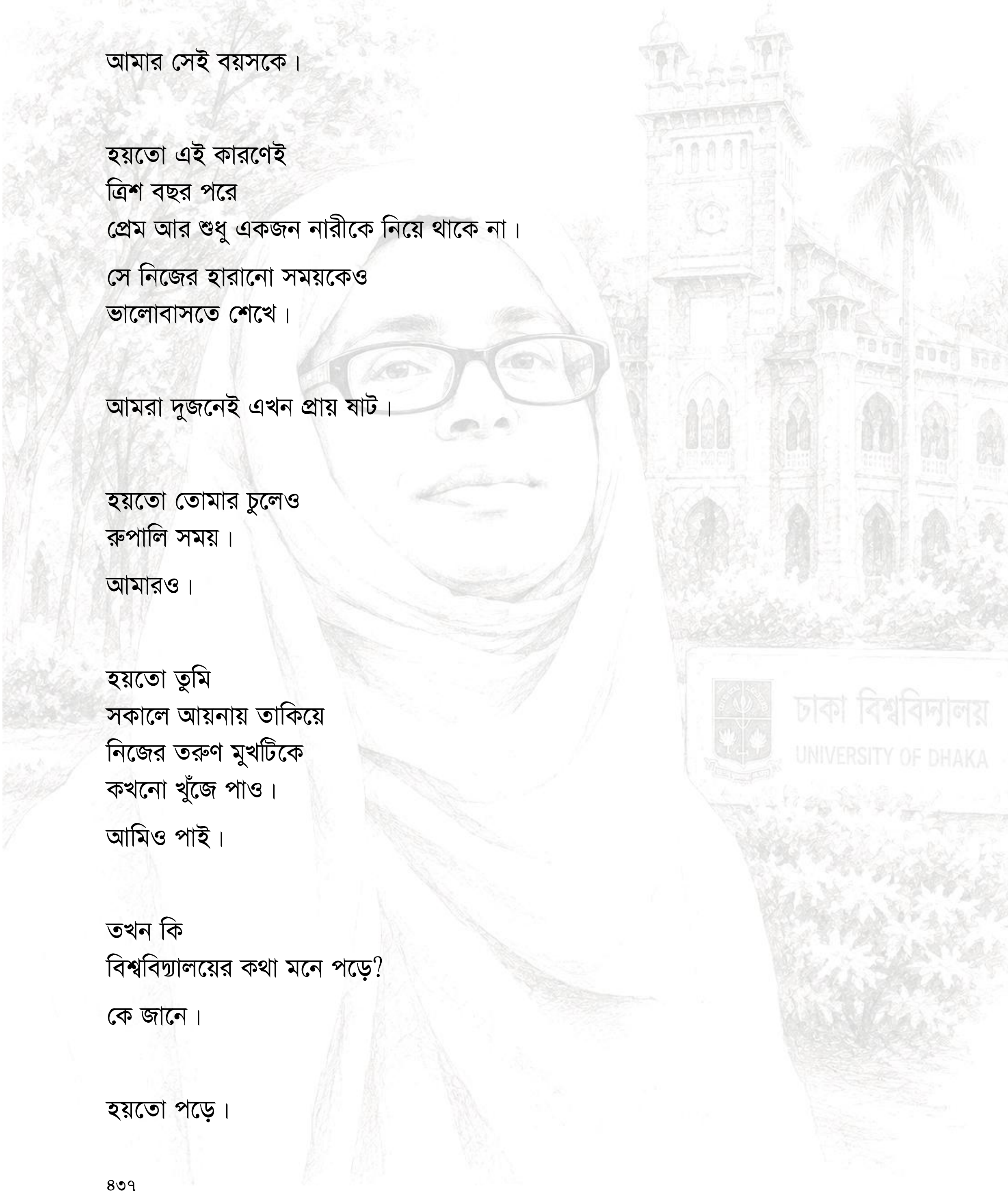

নিজেকেও।

আমার সেই বয়সকে।

হয়তো এই কারণেই
ত্রিশ বছর পরে
প্রেম আর শুধু একজন নারীকে নিয়ে থাকে না।

সে নিজের হারানো সময়কেও
ভালোবাসতে শেখে।

আমরা দুজনেই এখন প্রায় ষাট।

হয়তো তোমার চুলেও
রুপালি সময়।

আমারও।

হয়তো তুমি
সকালে আয়নায় তাকিয়ে
নিজের তরুণ মুখটিকে
কখনো খুঁজে পাও।

আমিও পাই।

তখন কি
বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা মনে পড়ে?

কে জানে।

হয়তো পড়ে।

হয়তো না।

আমি উত্তর বানাব না।

শুধু আমার নিজের
স্মৃতিটুকু লিখব।

আমার স্মৃতিতে
আমরা এখনও তরুণ।

কিন্তু এই কবিতায়
আমি আমাদের বয়স বাড়তে দিই।

কারণ বর্তমানকে অস্বীকার করে
অতীতকে ভালোবাসা যায় না।

আজকের আমরা
সেই তরুণ-তরুণীরই
দীর্ঘ পরিণতি।

তাদের ভুল।

তাদের সিদ্ধান্ত।

তাদের পাওয়া-না-পাওয়া।

সবকিছু পেরিয়ে
আমরা এখানে।

কখনো ভাবি-

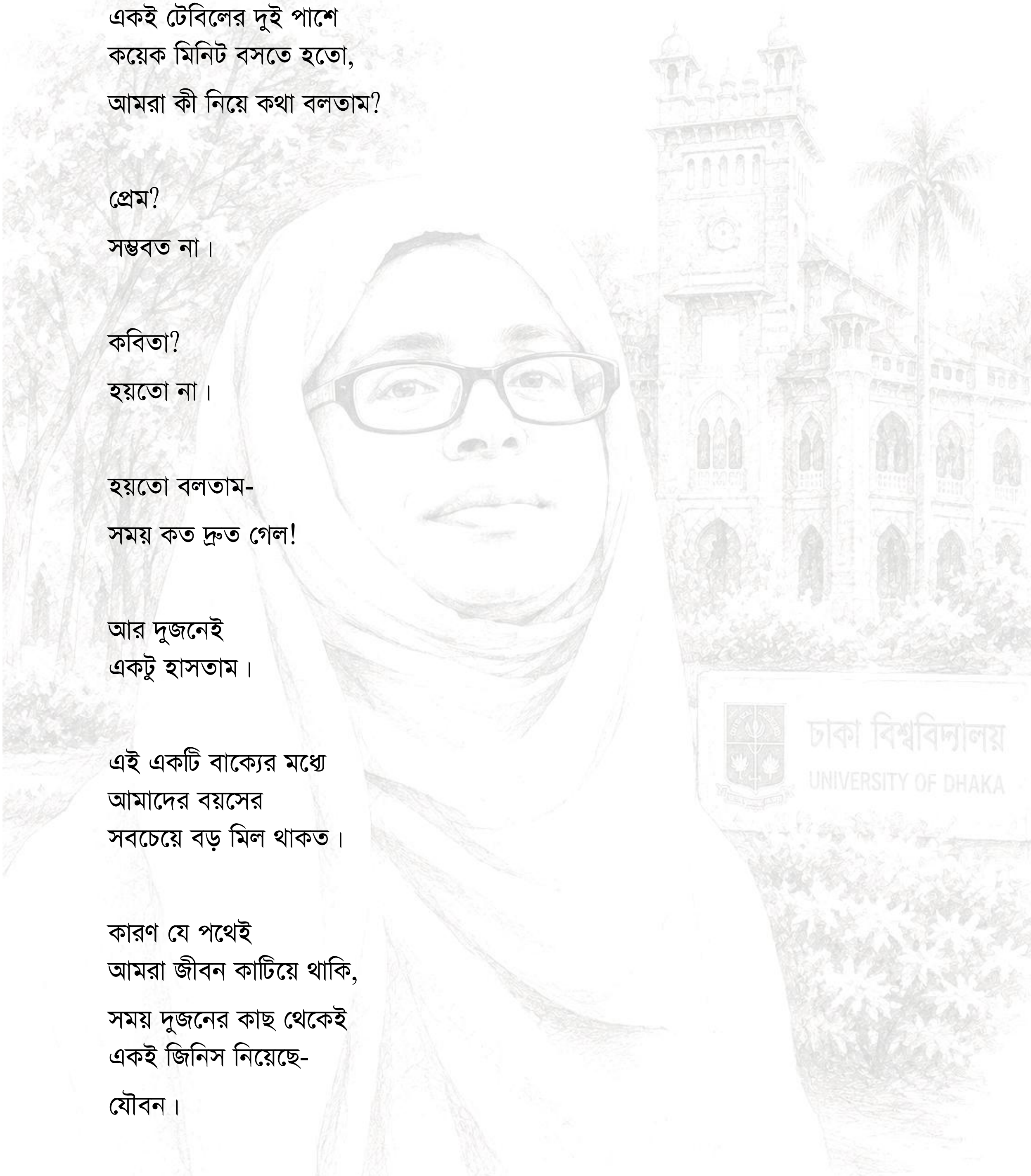

যদি আজ
একই টেবিলের দুই পাশে
কয়েক মিনিট বসতে হতো,
আমরা কী নিয়ে কথা বলতাম?

প্রেম?
সম্ভবত না।

কবিতা?
হয়তো না।

হয়তো বলতাম-
সময় কত দ্রুত গেল!

আর দুজনেই
একটু হাসতাম।

এই একটি বাক্যের মধ্যে
আমাদের বয়সের
সবচেয়ে বড় মিল থাকত।

কারণ যে পথেই
আমরা জীবন কাটিয়ে থাকি,
সময় দুজনের কাছ থেকেই
একই জিনিস নিয়েছে-
যৌবন।

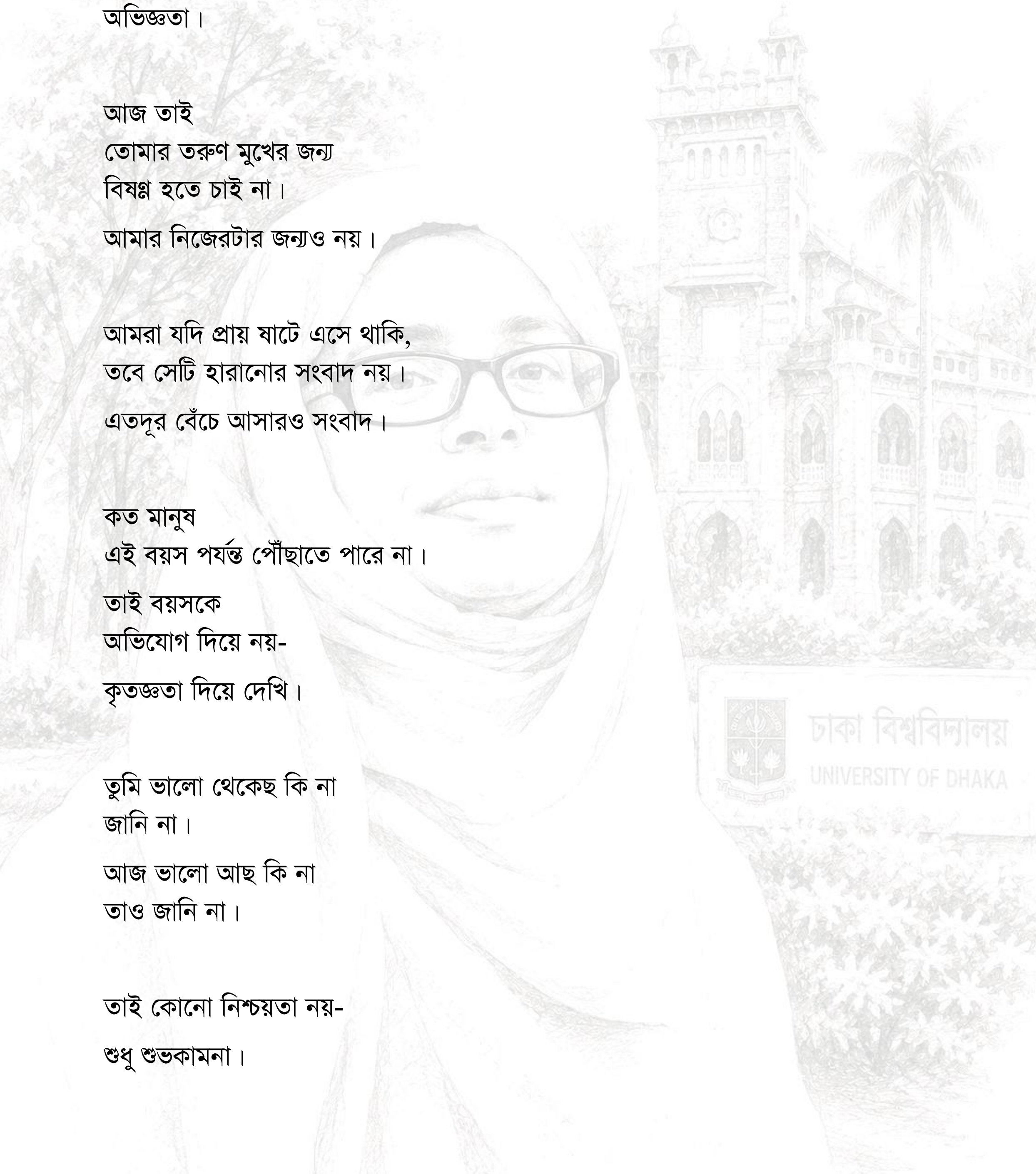

আবার দিয়েছে-

অভিজ্ঞতা।

আজ তাই
তোমার তরুণ মুখের জন্য
বিষণ্ণ হতে চাই না।

আমার নিজেরটার জন্যও নয়।

আমরা যদি প্রায় ষাটে এসে থাকি,
তবে সেটি হারানোর সংবাদ নয়।

এতদূর বেঁচে আসারও সংবাদ।

কত মানুষ
এই বয়স পর্যন্ত পৌঁছাতে পারে না।

তাই বয়সকে
অভিযোগ দিয়ে নয়-

কৃতজ্ঞতা দিয়ে দেখি।

তুমি ভালো থেকেছ কি না
জানি না।

আজ ভালো আছ কি না
তাও জানি না।

তাই কোনো নিশ্চয়তা নয়-

শুধু শুভকামনা।

আমাদের সামনে
যতটুকু পথই থাক,

তোমার পথ
শান্ত হোক।

আমারটিও।

কোনোদিন পথ না মিললেও
ক্ষতি নেই।

আমরা তো একবার
একই সময়ের মধ্যে
এসেছিলাম।

সেখান থেকেই
এই দীর্ঘ কাব্যের জন্ম।

আর আজ
প্রায় ষাটে এসে
আমি প্রথমবার যেন বুঝি-

এই কাব্যের শেষ কথা
"তোমাকে পাইনি" নয়।

শেষ কথা-

"তোমাকে একদিন দেখেছিলাম।"

সেই দেখা
আমার তরুণ বয়সকে
কবিতা দিয়েছিল।

তারপর জীবন
আমাকে সময় দিয়েছে
সেই কবিতার অর্থ বুঝতে।

আমরা দুজনেই এখন প্রায় ষাট।

তাই আজ
তোমাকে নিয়ে আমার ভাষাও
আর তরুণ নয়।

সে ধীরে কথা বলে।

কিছু জায়গায় থামে।

অনেক প্রশ্ন
উত্তরহীন রাখে।

আর শেষে শুধু বলে-

**"আমরা দুজনেই এখন প্রায় ষাট।
আমাদের যৌবন ফিরে আসবে না-
আসার প্রয়োজনও নেই।
শুধু কোনো এক দূর বিকেলে
যদি হঠাৎ ১৯৯০ মনে পড়ে,
নিজের সেই তরুণ বয়সটির দিকে
একবার মমতায় তাকিয়ো।"**

**কারণ তুমি আর আমি
একসঙ্গে জীবন কাটাইনি-
কিন্তু একই সময়ের একটি ছোট্ট জানালায়
একদিন আমরা দুজনেই তরুণ ছিলাম।**

আর আজ এত বছর পরে
আমার কাছে
সেইটুকুই এক অপূর্ব সত্য।

শেষ বয়সের প্রথম প্রেম

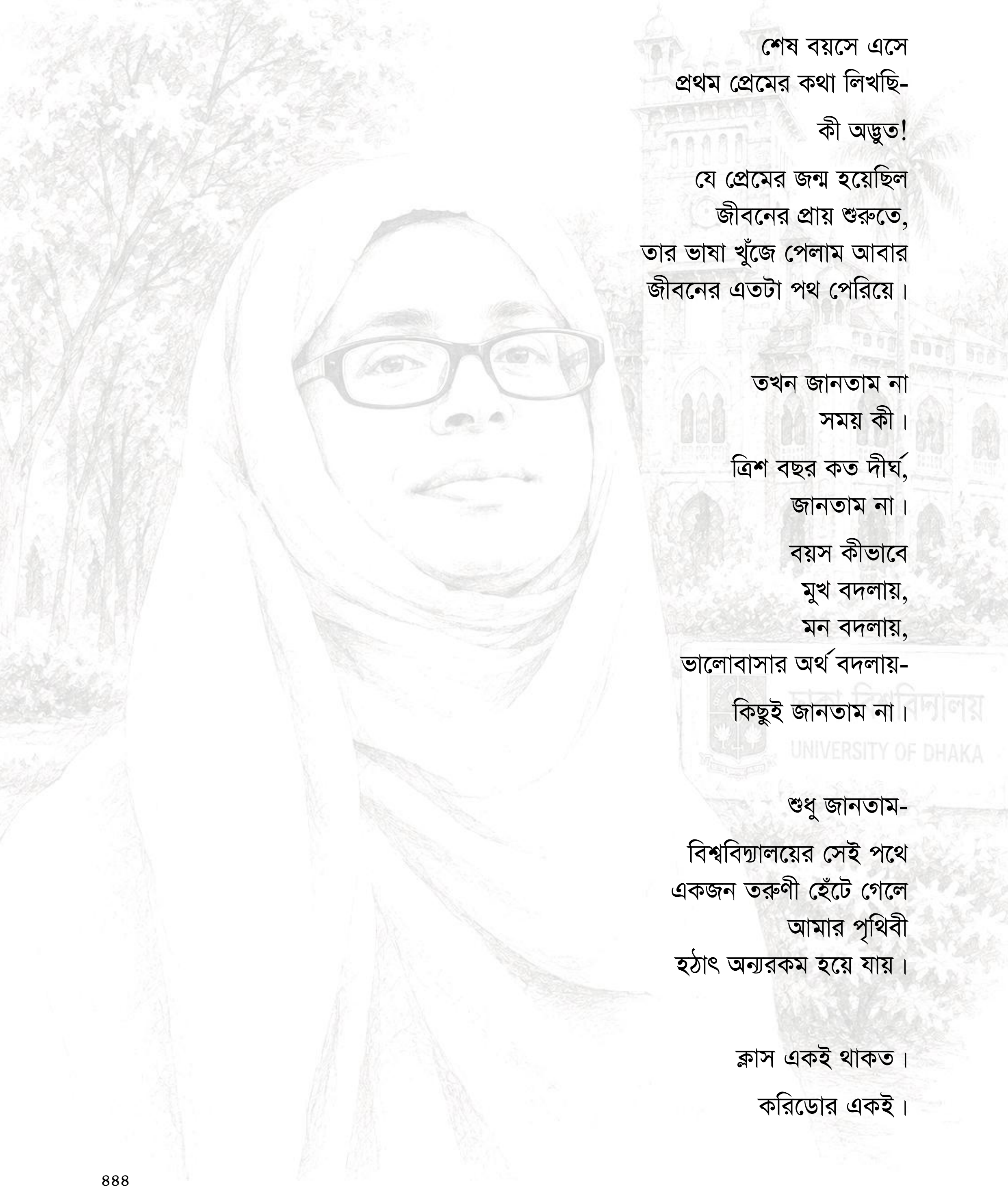

শেষ বয়সে এসে
প্রথম প্রেমের কথা লিখছি-
কী অদ্ভুত!
যে প্রেমের জন্ম হয়েছিল
জীবনের প্রায় শুরুতে,
তার ভাষা খুঁজে পেলাম আবার
জীবনের এতটা পথ পেরিয়ে।

তখন জানতাম না
সময় কী।
ত্রিশ বছর কত দীর্ঘ,
জানতাম না।
বয়স কীভাবে
মুখ বদলায়,
মন বদলায়,
ভালোবাসার অর্থ বদলায়-
কিছুই জানতাম না।

শুধু জানতাম-
বিশ্ববিদ্যালয়ের সেই পথে
একজন তরুণী হেঁটে গেলে
আমার পৃথিবী
হঠাৎ অন্যরকম হয়ে যায়।

ক্লাস একই থাকত।
করিডোর একই।

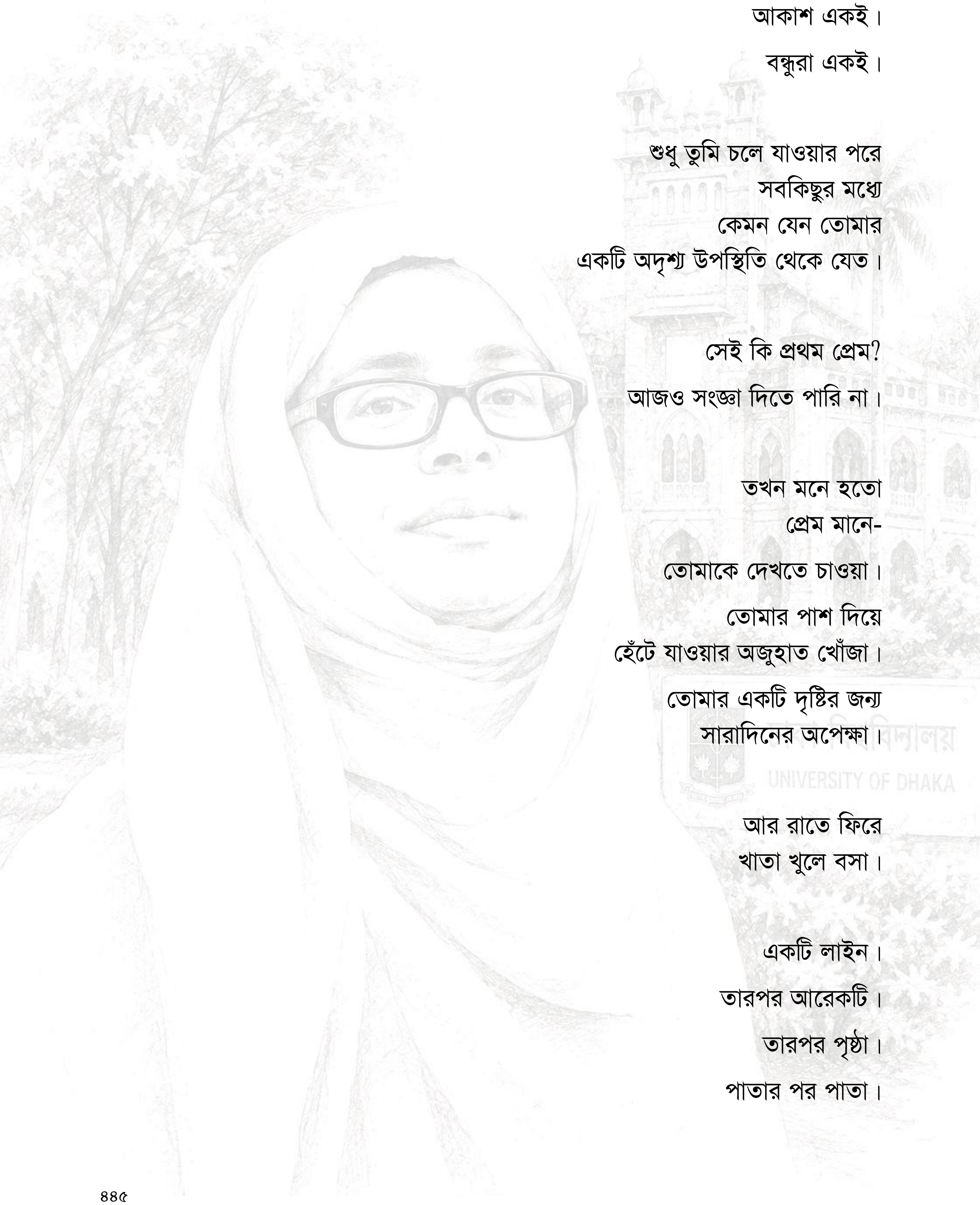

আকাশ একই।

বন্ধুরা একই।

শুধু তুমি চলে যাওয়ার পরে
সবকিছুর মধ্যে
কেমন যেন তোমার
একটি অদৃশ্য উপস্থিতি থেকে যেত।

সেই কি প্রথম প্রেম?

আজও সংজ্ঞা দিতে পারি না।

তখন মনে হতো
প্রেম মানে-

তোমাকে দেখতে চাওয়া।

তোমার পাশ দিয়ে
হেঁটে যাওয়ার অজুহাত খোঁজা।

তোমার একটি দৃষ্টির জন্য
সারাদিনের অপেক্ষা।

আর রাতে ফিরে
খাতা খুলে বসা।

একটি লাইন।

তারপর আরেকটি।

তারপর পৃষ্ঠা।

পাতার পর পাতা।

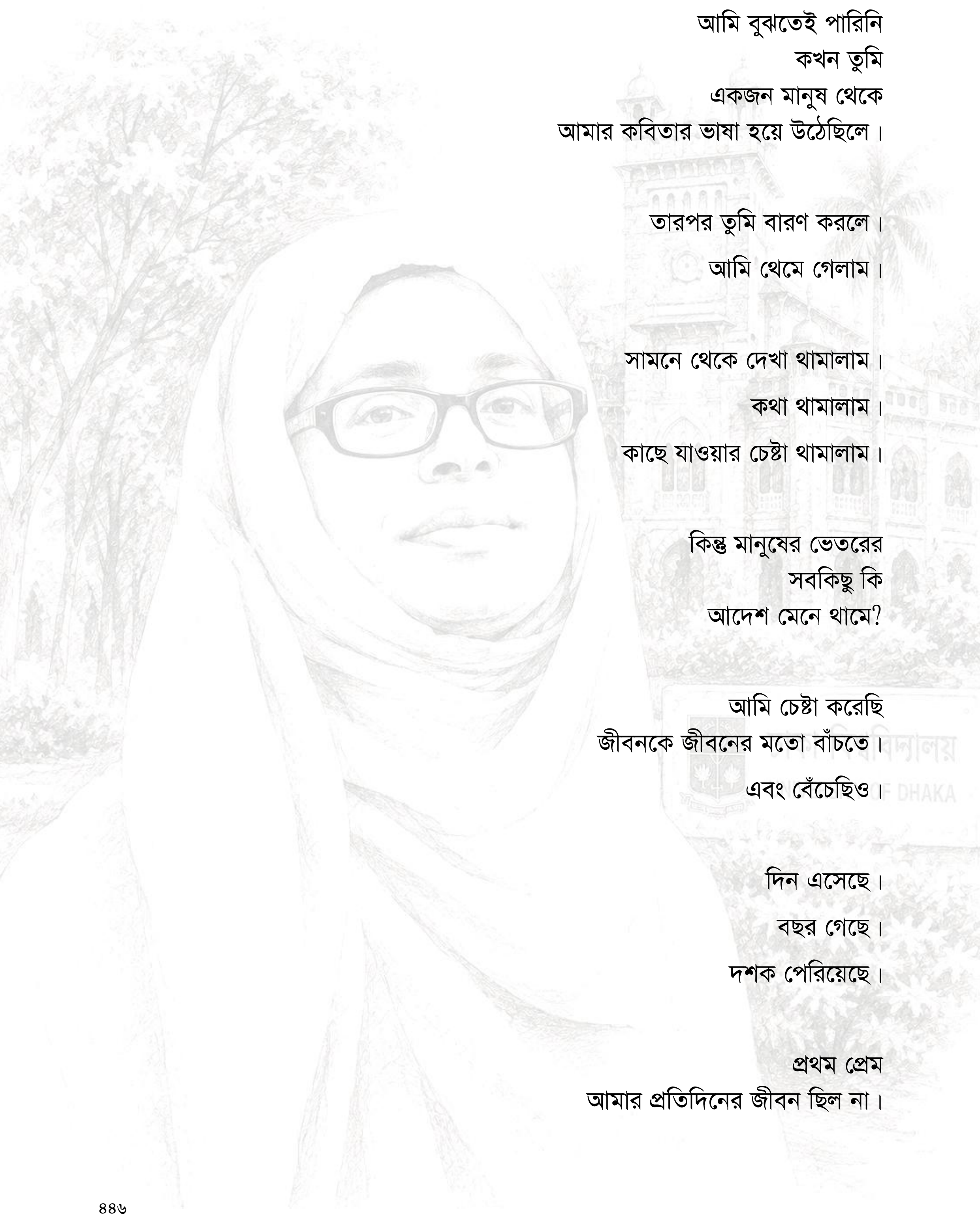

আমি বুঝতেই পারিনি
কখন তুমি
একজন মানুষ থেকে
আমার কবিতার ভাষা হয়ে উঠেছিলে।

তারপর তুমি বারণ করলে।
আমি থেমে গেলাম।

সামনে থেকে দেখা থামালাম।
কথা থামালাম।
কাছে যাওয়ার চেষ্টা থামালাম।

কিন্তু মানুষের ভেতরের
সবকিছু কি
আদেশ মেনে থামে?

আমি চেষ্টা করেছি
জীবনকে জীবনের মতো বাঁচতে।
এবং বেঁচেছিও।

দিন এসেছে।
বছর গেছে।
দশক পেরিয়েছে।

প্রথম প্রেম
আমার প্রতিদিনের জীবন ছিল না।

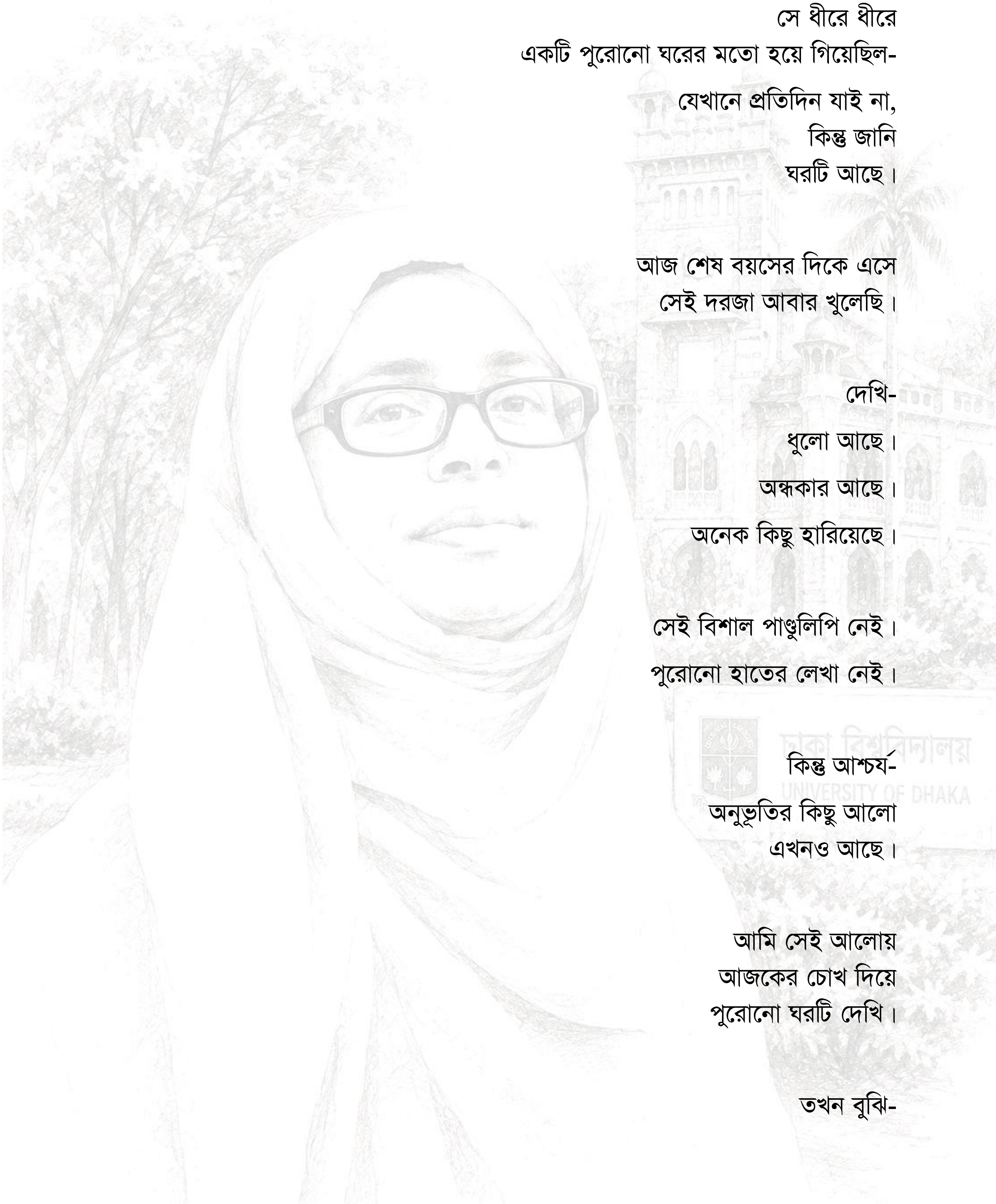

সে ধীরে ধীরে
একটি পুরোনো ঘরের মতো হয়ে গিয়েছিল-
যেখানে প্রতিদিন যাই না,
কিন্তু জানি
ঘরটি আছে।

আজ শেষ বয়সের দিকে এসে
সেই দরজা আবার খুলেছি।

দেখি-
ধুলো আছে।
অন্ধকার আছে।
অনেক কিছু হারিয়েছে।

সেই বিশাল পাণ্ডুলিপি নেই।
পুরোনো হাতের লেখা নেই।

কিন্তু আশ্চর্য-
অনুভূতির কিছু আলো
এখনও আছে।

আমি সেই আলোয়
আজকের চোখ দিয়ে
পুরোনো ঘরটি দেখি।

তখন বুঝি-

প্রথম প্রেমের সবচেয়ে বড় সৌন্দর্য
সে পূর্ণ হয়েছিল কি না
সেখানে নয়।

তার সৌন্দর্য হয়তো
এই যে-
সে প্রথমবার
একজন মানুষকে
নিজের হৃদয়ের গভীরতা দেখায়।

তোমাকে ভালোবেসে
আমি প্রথম জেনেছিলাম-
কাউকে না ছুঁয়েও
তার জন্য হৃদয় কাঁপতে পারে।

কাউকে না পেয়েও
তার কারণে কবিতা জন্মাতে পারে।

আর কাউকে ভালোবেসেও
একদিন তার কাছ থেকে
দূরে সরে যেতে হয়-
যদি সেটিই তার ইচ্ছা হয়।

শেষ শিক্ষাটি
সবচেয়ে কঠিন ছিল।

আজ এত বছর পরে
প্রথম প্রেমকে তাই
আমি আর ব্যর্থ প্রেম বলি না।

তুমি আমাকে গ্রহণ করোনি-
সত্য।

আমরা একসঙ্গে হইনি-
সত্য।

আমাদের পথ
আলাদা হয়েছে-
সত্য।

কিন্তু তাই বলে
আমার অনুভূতিটি
মিথ্যা হয়ে যায়নি।

সত্য সবসময়
সফলতার সমার্থক নয়।

কিছু সত্য
শুধু ঘটে।
তারপর মানুষকে বদলে দেয়।

তুমি আমার জীবনে
তেমনই একটি সত্য।

শেষ বয়সের প্রথম প্রেম-
শুনতে যেন
একটি অসম্ভব বাক্য।

কিন্তু আমি এখন বুঝি-
প্রেমটি প্রথম ছিল,
তার উপলব্ধি
শেষ বয়সের।

তখন অনুভব করেছিলাম।
এখন বুঝতে পারছি।

তখন তোমাকে লিখেছিলাম।
আজ লিখছি
নিজেকেও।

তখন প্রতিটি কবিতার শেষে
হয়তো একটি আশা ছিল।
আজ নেই।

আজ শুধু কৃতজ্ঞতা।

তুমি আমার জীবনে
থাকার জন্য নয়-
একদিন এসে
একটি অজানা দরজা খুলে দেওয়ার জন্য।

সেই দরজা দিয়ে
প্রথম বেরিয়েছিল কবিতা।

আজ প্রায় ষাটের কাছে এসে
আমি আবার সেখানে দাঁড়িয়ে।
আর সেই তরুণ আমাকে দেখে
হাসছে।

আমি তাকে বলি-
তোমার প্রেম
শেষ পর্যন্ত কোথায় গেল জানো?

সে জিজ্ঞেস করে-
কোথায়?

আমি বলি-
পাওয়ার ইচ্ছা থেকে
স্মরণের মমতায়।

সে হয়তো বুঝবে না।
তার বয়স হয়নি।

কিন্তু আমি বুঝি।

তাই শেষ বয়সে
প্রথম প্রেমকে নিয়ে
আমার কোনো অভিযোগ নেই।

শুধু বিস্ময় আছে-

এত মানুষের ভিড়ে
একদিন একটি মুখ
কীভাবে একটি তরুণ হৃদয়ের মধ্যে
এত শব্দ জাগিয়েছিল!

আর আরও বড় বিস্ময়-

এত বছর পরে
মুখটি সময়ের আড়ালে চলে গেলেও
শব্দগুলো আবার ফিরে এসেছে।

ভালোবাসা কি সত্যিই শেষ হয়?

ভালোবাসা কি সত্যিই শেষ হয়?

এই প্রশ্নের উত্তর
একসময় খুব সহজ মনে হতো।

হয় পাওয়া যায়-

নয় হারিয়ে যায়।

হয় থাকে-

নয় শেষ।

আজ আর
এত সহজ মনে হয় না।

কারণ এত বছর পরে
নিজের দিকে তাকিয়ে দেখি-

কিছুই আগের মতো নেই।

সেই অস্থিরতা নেই।

অপেক্ষা নেই।

তোমাকে দেখার আকাঙ্ক্ষা
আগের মতো নেই।

তোমার কাছ থেকে
কিছু পাওয়ার ইচ্ছা নেই।

তাহলে কি
ভালোবাসা শেষ?

যদি শেষ হয়ে থাকে-

এই কবিতাগুলো
কোথা থেকে আসে?

আর যদি শেষ না হয়ে থাকে-

তবে এত শান্ত কেন?

হয়তো ভালোবাসা
শেষ হয় না সবসময়।

রূপ বদলায়।

যেমন নদী
এক জায়গায় প্রবল স্রোত,

আরেক জায়গায়
শান্ত বিস্তার।

জল একই-

চেহারা আলাদা।

তরুণ বয়সে
আমার ভালোবাসা ছিল স্রোত।

তোমার দিকে যেতে চাইত।

পথ খুঁজত।

বাধায় কষ্ট পেত।

আজ সে
সমুদ্রের কাছাকাছি
একটি শান্ত নদী।

কোথাও যাওয়ার
তাড়া নেই।

তাই কি তাকে
এখনও ভালোবাসা বলব?

আমি বলি-
হ্যাঁ।
কিন্তু তার পাশে
একটি নতুন শব্দ রাখব-
মমতা।

স্মৃতির প্রতি মমতা।
তোমার প্রতি শুভকামনা।
নিজের তরুণ বয়সের প্রতি
একটি কোমল ক্ষমা।

এই তিনটি মিলে
আজকের ভালোবাসা।

ভালোবাসা কি সত্যিই শেষ হয়?

কখনো হয় নিশ্চয়ই।

মানুষ ভুলে যায়।
নতুন জীবন আসে।
অনুভূতি নিঃশেষ হয়।

সেটিও স্বাভাবিক।

সব প্রেমকে
চিরন্তন বানানোর প্রয়োজন নেই।

কিন্তু কিছু প্রেম
শেষ না হয়ে
নিজের নাম হারায়।

সে আর প্রেমিকের দাবি নয়।
সে আর অপেক্ষা নয়।

সে হয়ে যায়-
একটি গান মনে পড়া।
পুরোনো রাস্তা দেখে থেমে যাওয়া।
কোনো বয়সের নিজের দিকে
মমতায় তাকানো।

তুমি আমার কাছে
হয়তো এখন
সেই ধরনেরই এক অনুভূতি।

তোমাকে ফিরে পাওয়ার
কোনো আকাঙ্ক্ষা নেই।
কিন্তু তোমাকে ভালো না-বেসেছিলাম
এ কথাও বলতে পারি না।

তাহলে ভালোবাসা
কোথায় আছে?

হয়তো বাক্যের কালে।

"ভালোবাসতাম"-
বলেলে কিছু যেন
অসম্পূর্ণ লাগে।

"ভালোবাসি"-
বলেলে বর্তমানের ওপর
অতিরিক্ত দাবি শোনায়।

তাহলে কোন শব্দ?

হয়তো-
ভালোবাসা রয়ে গেছে।

কারও ওপর নয়।
কোনো ভবিষ্যতের দিকে নয়।

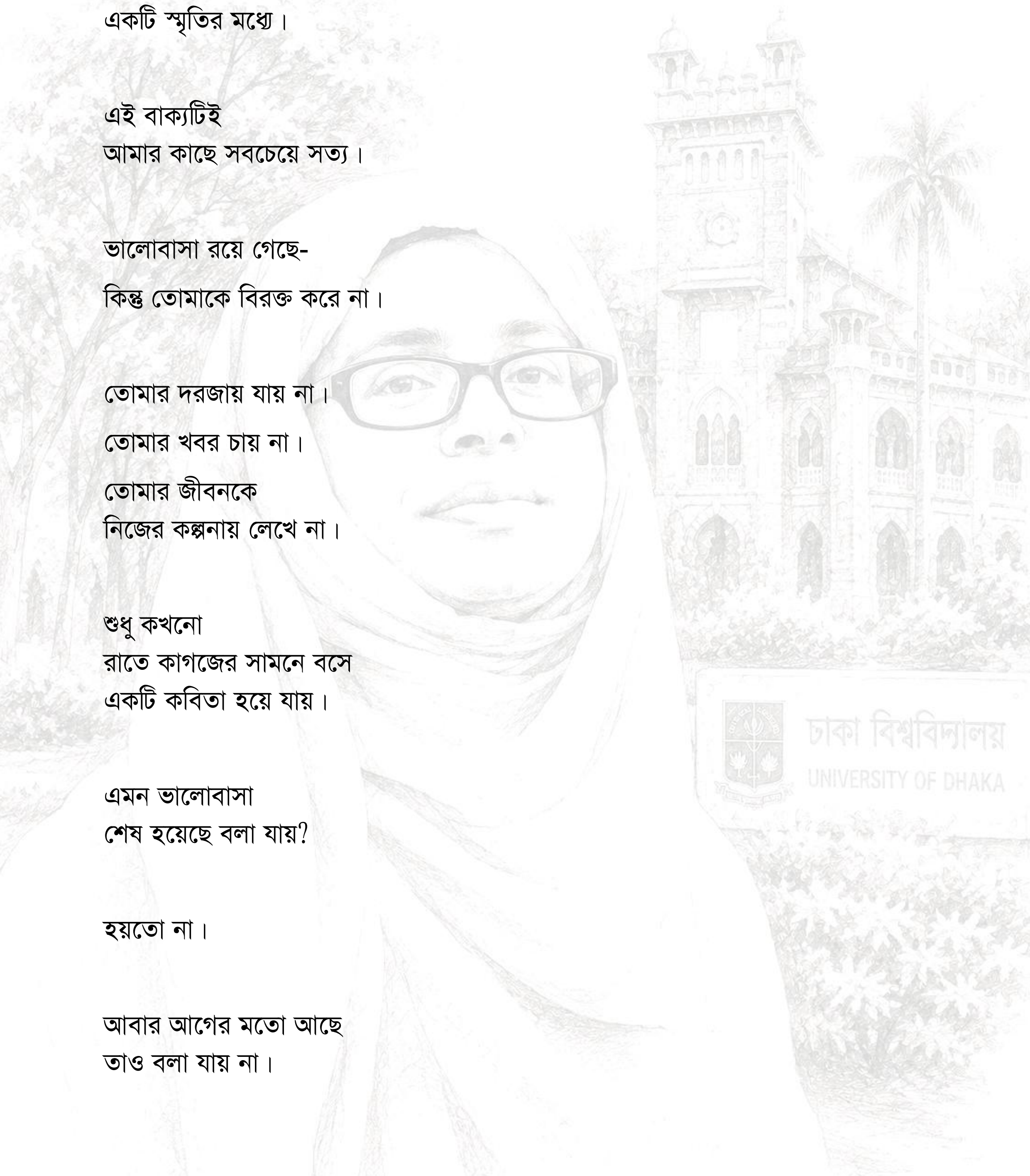

একটি স্মৃতির মধ্যে।

এই বাক্যটিই
আমার কাছে সবচেয়ে সত্য।

ভালোবাসা রয়ে গেছে-
কিন্তু তোমাকে বিরক্ত করে না।

তোমার দরজায় যায় না।
তোমার খবর চায় না।
তোমার জীবনকে
নিজের কল্পনায় লেখে না।

শুধু কখনো
রাতে কাগজের সামনে বসে
একটি কবিতা হয়ে যায়।

এমন ভালোবাসা
শেষ হয়েছে বলা যায়?

হয়তো না।

আবার আগের মতো আছে
তাও বলা যায় না।

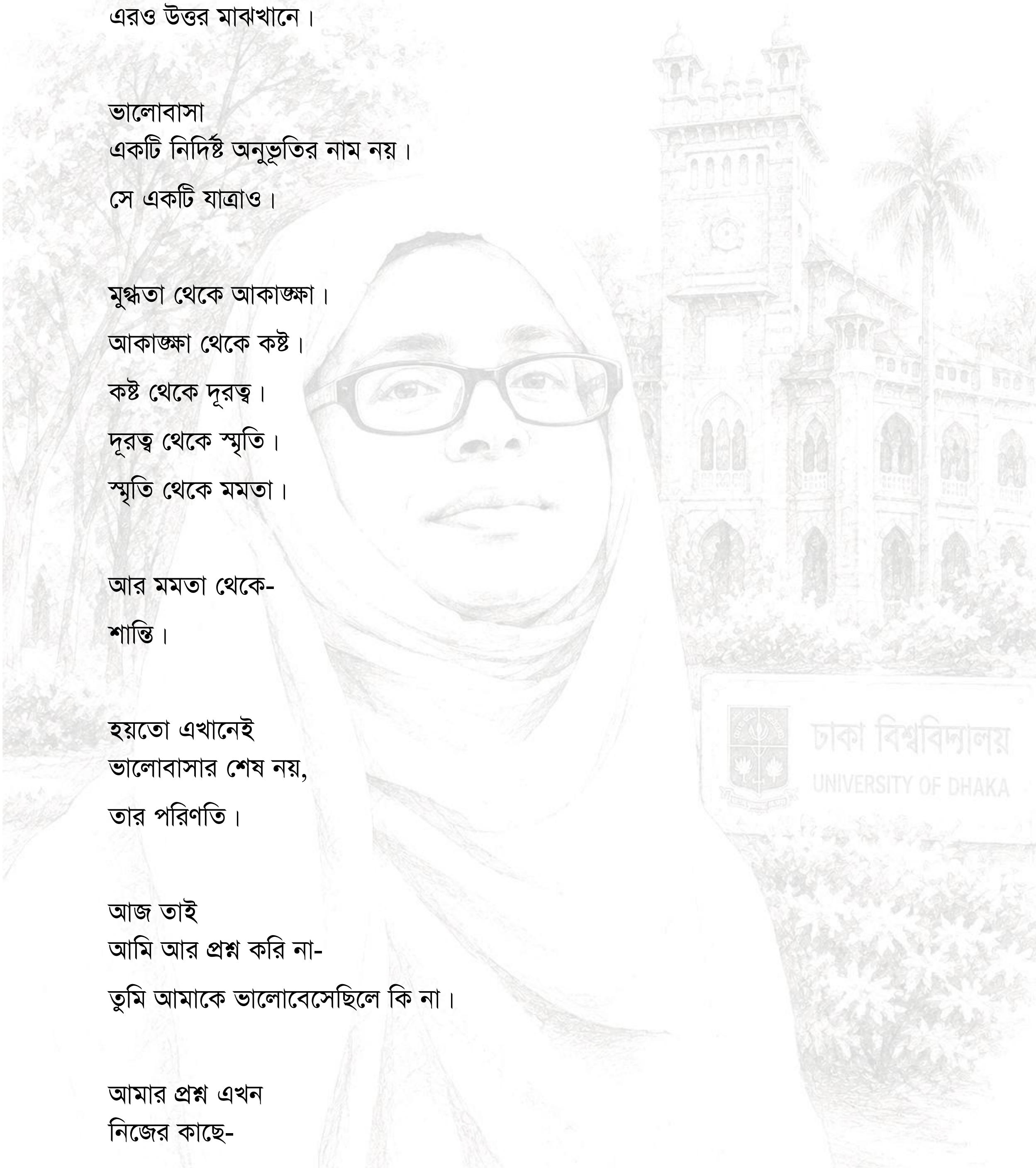

জীবনের অনেক সত্যের মতো
এরও উত্তর মাঝখানে।

ভালোবাসা
একটি নির্দিষ্ট অনুভূতির নাম নয়।
সে একটি যাত্রাও।

মুগ্ধতা থেকে আকাঙ্ক্ষা।
আকাঙ্ক্ষা থেকে কষ্ট।
কষ্ট থেকে দূরত্ব।
দূরত্ব থেকে স্মৃতি।
স্মৃতি থেকে মমতা।

আর মমতা থেকে-
শান্তি।

হয়তো এখানেই
ভালোবাসার শেষ নয়,
তার পরিণতি।

আজ তাই
আমি আর প্রশ্ন করি না-
তুমি আমাকে ভালোবেসেছিলে কি না।

আমার প্রশ্ন এখন
নিজের কাছে-

আমি কি আমার ভালোবাসাকে
এমন জায়গায় আনতে পেরেছি
যেখানে সে কারও বোঝা নয়?

যদি পেরে থাকি,

তবে এত বছরের যাত্রা
ব্যর্থ নয়।

ভালোবাসা কি সত্যিই শেষ হয়?

জানি না।

শুধু জানি-

কিছু ভালোবাসা মানুষকে পায় না,
তবু মানুষটির ভেতর
নিজের একটি শান্ত ঠিকানা পেয়ে যায়।

আর তারপর
একদিন সে আর বলে না-

"তোমাকে চাই।"

সে শুধু বলে-

"একদিন তোমাকে ভালোবেসেছিলাম।
আজও সেই সত্যটিকে ভালোবাসি।"

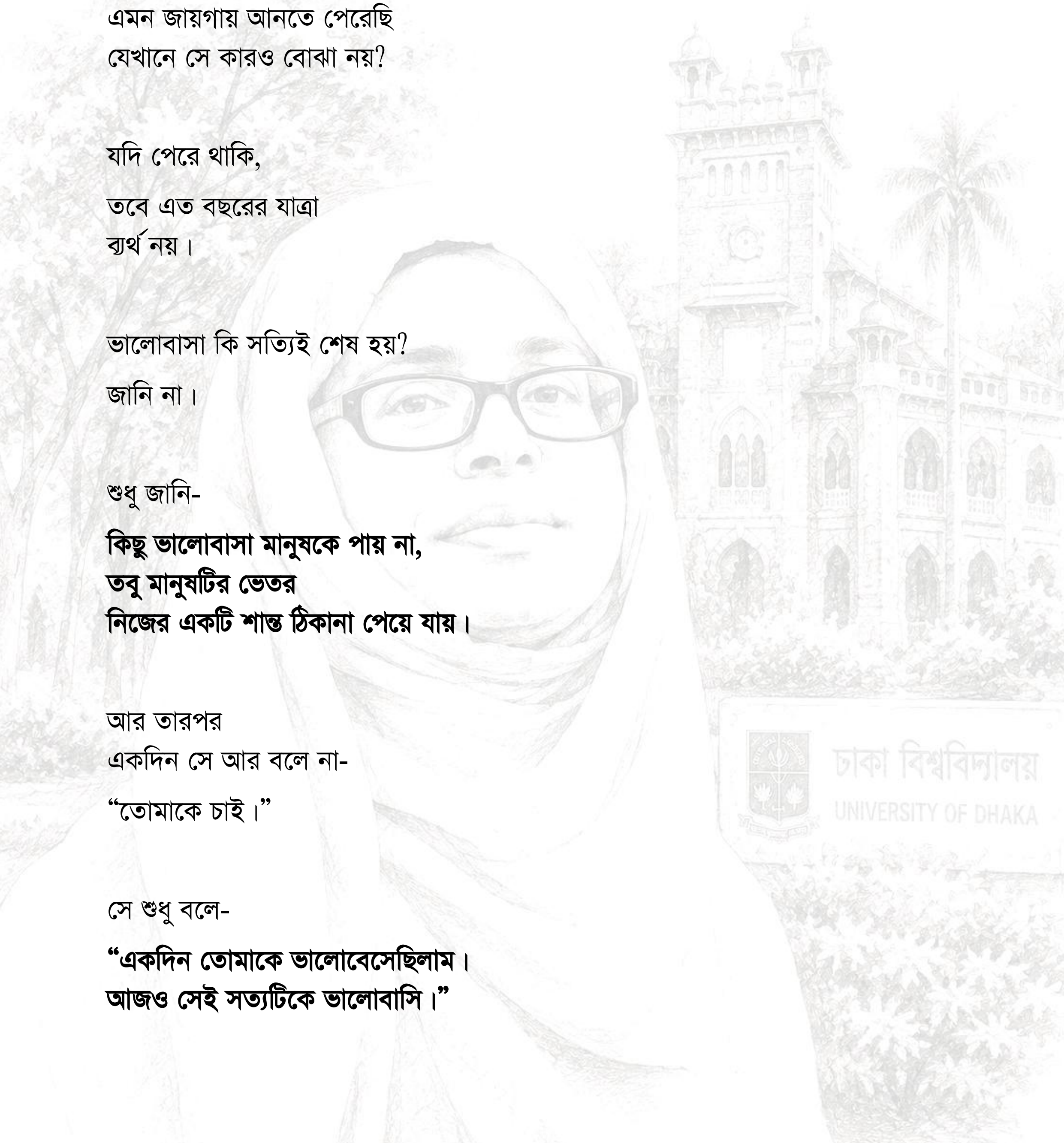

তোমার জন্য শেষ প্রার্থনা

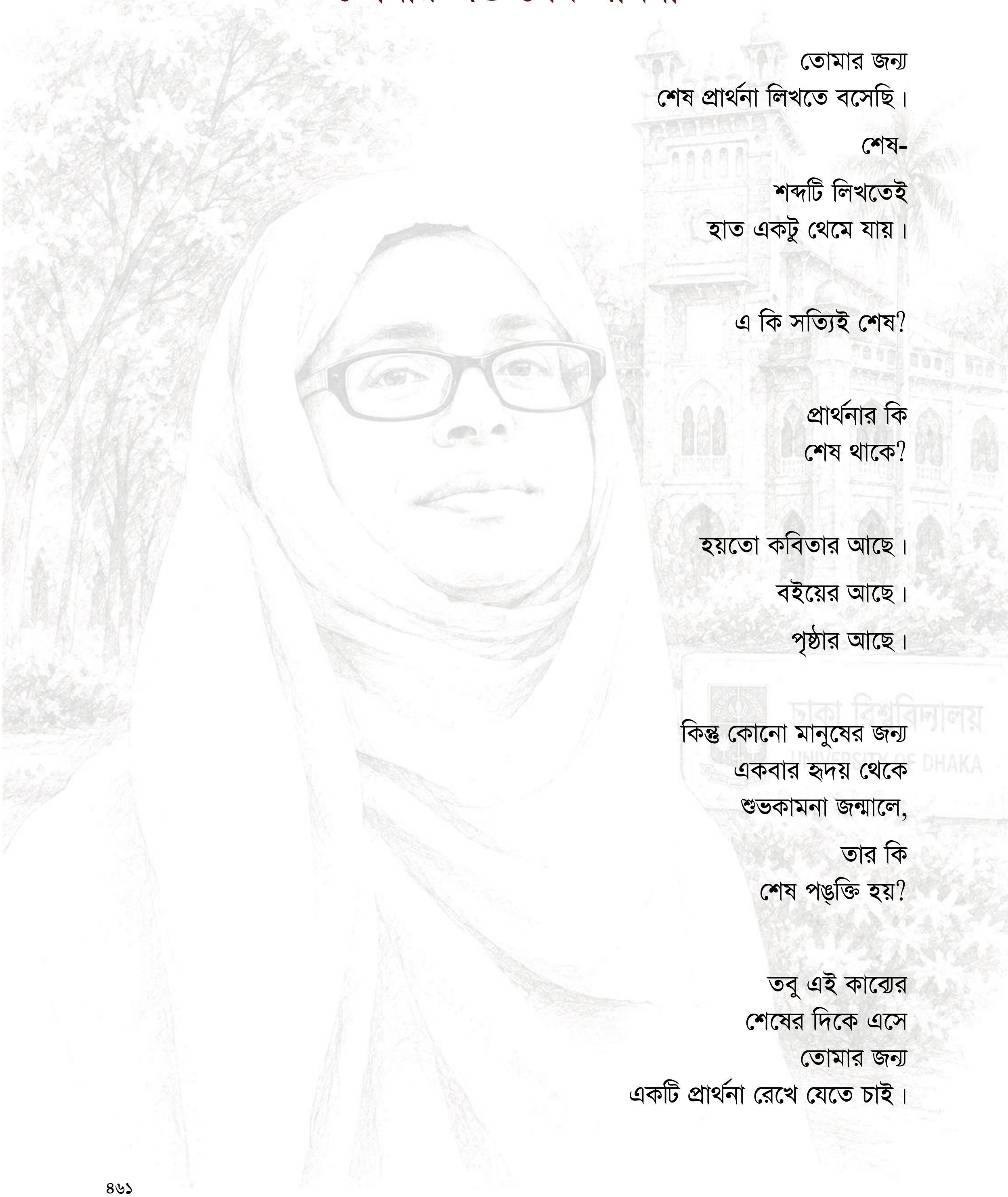

তোমার জন্য
শেষ প্রার্থনা লিখতে বসেছি।

শেষ-

শব্দটি লিখতেই
হাত একটু থেমে যায়।

এ কি সত্যিই শেষ?

প্রার্থনার কি
শেষ থাকে?

হয়তো কবিতার আছে।

বইয়ের আছে।

পৃষ্ঠার আছে।

কিন্তু কোনো মানুষের জন্য
একবার হৃদয় থেকে
শুভকামনা জন্মালে,

তার কি
শেষ পঙ্‌ক্তি হয়?

তবু এই কাব্যের
শেষের দিকে এসে
তোমার জন্য
একটি প্রার্থনা রেখে যেতে চাই।

তুমি ভালো থেকো।

এই কথাটি
আগেও বহুবার লিখেছি।
আজ একটু খুলে বলি।

তোমার শরীর
যতটা সম্ভব
সময়কে সহজে বহন করুক।

তোমার মন
অপ্রয়োজনীয় ভার থেকে
মুক্ত থাকুক।

যে দুঃখগুলো
কাউকে বলা যায় না,
সেগুলো যেন
একদিন নিজে থেকেই
হালকা হয়ে আসে।

যে আনন্দগুলো
জীবন তোমাকে দিয়েছে,
তাদের স্মৃতি
দুঃখের চেয়ে দীর্ঘ হোক।

যাদের তুমি ভালোবাসো
তারা তোমার কাছে থাকুক-

যতদিন থাকা সম্ভব।

আর যখন দূরে যেতে হয়,
বিদায় যেন
অসহনীয় না হয়।

তোমার ঘরে
শান্তি থাকুক।

সকালের আলো
তোমার কাছে
সাধারণ হয়েও সুন্দর লাগুক।

কোনো বিকেলে
এক কাপ চায়ের পাশে
হঠাৎ মনে হোক-
জীবন খুব খারাপ ছিল না।

কোনো রাতে
ঘুমের আগে
নিজের দীর্ঘ পথের দিকে তাকিয়ে
তুমি যেন বলতে পারো-
আমি আমার মতো করে বেঁচেছি।

এই বাক্যটির চেয়ে
বড় আশীর্বাদ
আর কী চাইব?

তোমার জন্য
আমার প্রার্থনায়
আমি নেই।

এই কথাটি
খুব সচেতনভাবে বলি।

আমি চাই না-
তুমি আমাকে মনে করো।

চাই না-
আমার কবিতা
তোমার কাছে পৌঁছাকই।

চাই না-
কোনো অসমাপ্ত গল্প
আবার শুরু হোক।

শুধু চাই-
তোমার জীবন
তোমার মতো করে
সম্পূর্ণ হোক।

যদি আমার স্মৃতি
সেখানে একেবারেই না থাকে-
তাতেও।

কারণ তোমার ভালো থাকা
আমাকে মনে রাখার ওপর
নির্ভর করে না।

তোমার জন্য
শেষ প্রার্থনা-
তুমি যেন
নিজের জীবনের কাছে
কোনোদিন অপরাধী না হও।

যে সিদ্ধান্তগুলো নিয়েছ,
তাদের সব নিখুঁত ছিল না হয়তো।
কারওই হয় না।

তবু নিজেকে ক্ষমা করতে শেখো।

আমি নিজের তরুণ বয়সকে
যেমন ক্ষমা করতে শিখছি।

আর যদি কোনোদিন
আমার কথা মনে পড়ে,
আমাকেও ক্ষমা কোরো-
যদি প্রয়োজন হয়।

কোনো অস্বস্তির জন্য।
কোনো অপরিণত আচরণের জন্য।
কোনো অতিরিক্ত অনুভূতির জন্য।

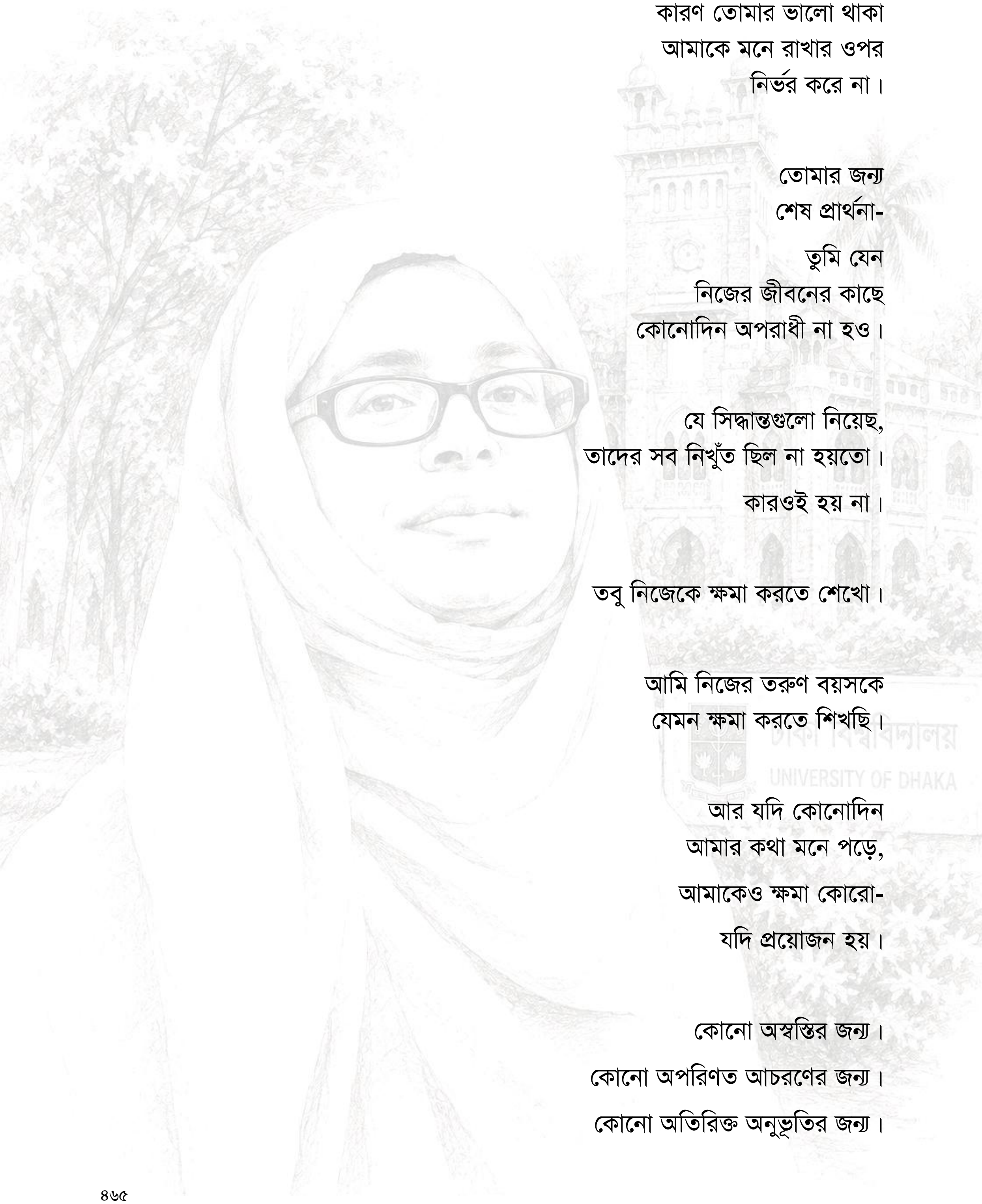

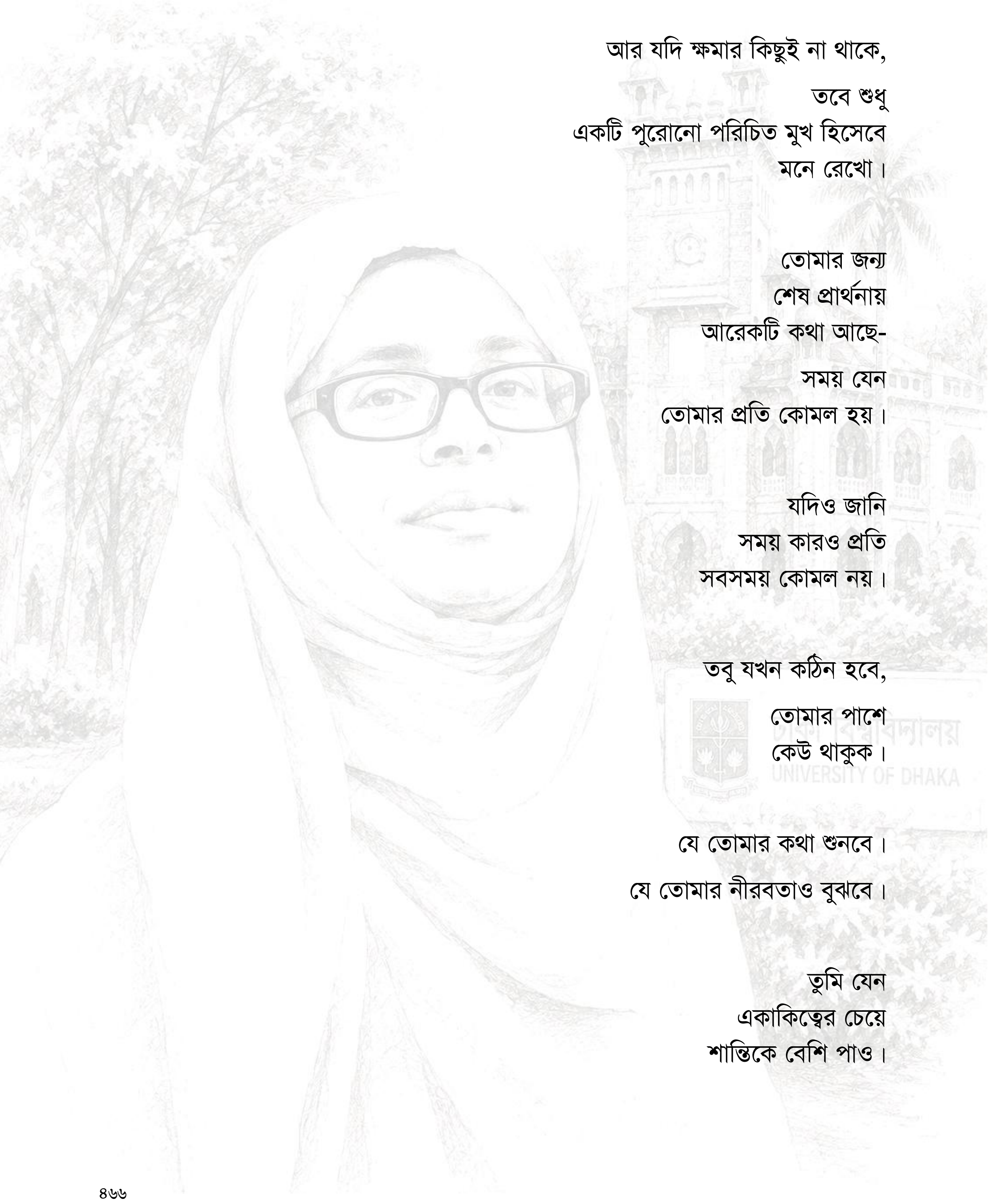

আর যদি ক্ষমার কিছুই না থাকে,

তবে শুধু
একটি পুরোনো পরিচিত মুখ হিসেবে
মনে রেখো।

তোমার জন্য
শেষ প্রার্থনায়
আরেকটি কথা আছে-

সময় যেন
তোমার প্রতি কোমল হয়।

যদিও জানি
সময় কারও প্রতি
সবসময় কোমল নয়।

তবু যখন কঠিন হবে,

তোমার পাশে
কেউ থাকুক।

যে তোমার কথা শুনবে।

যে তোমার নীরবতাও বুঝবে।

তুমি যেন
একাকিত্বের চেয়ে
শান্তিকে বেশি পাও।

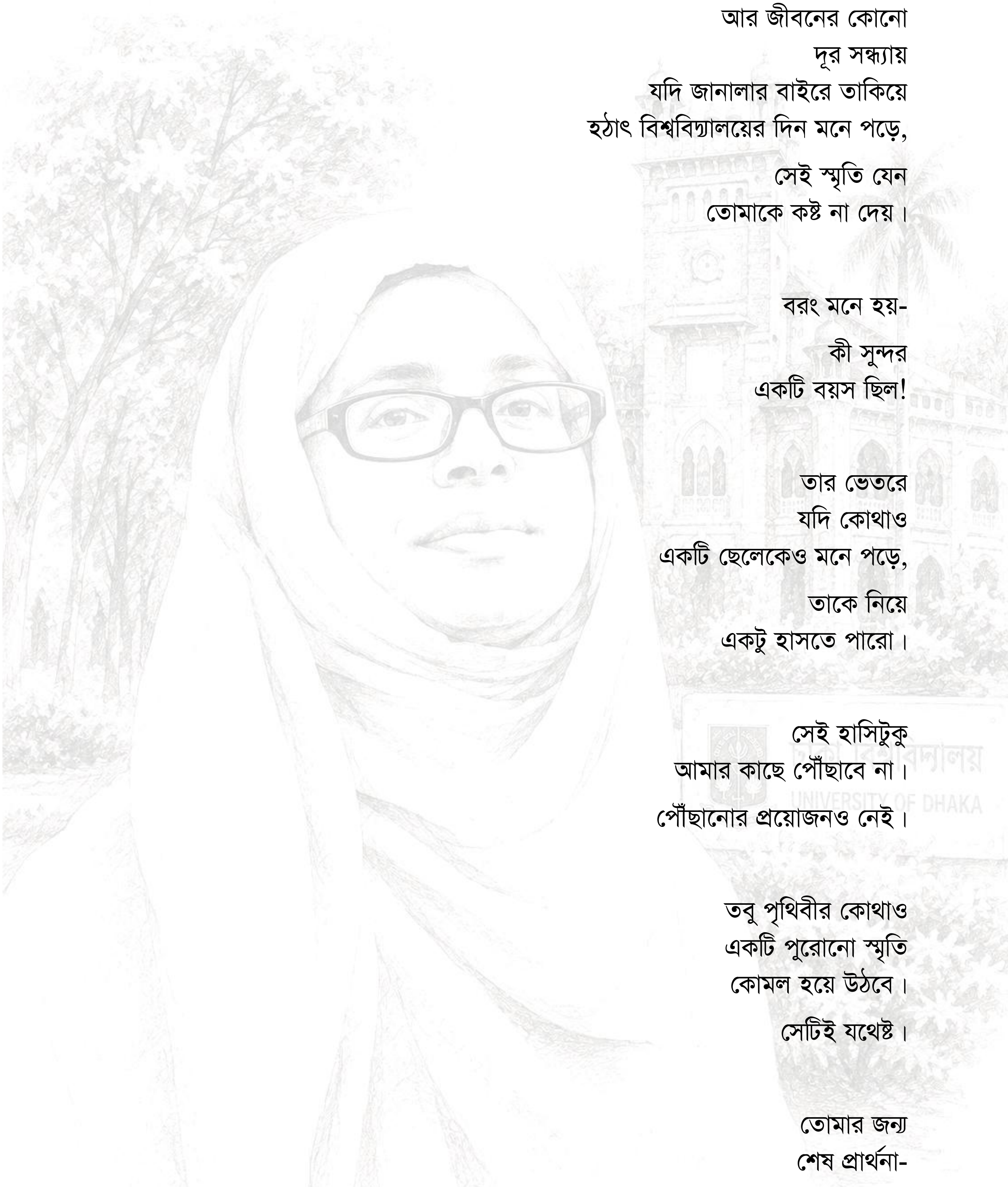

আর জীবনের কোনো
দূর সন্ধ্যায়
যদি জানালার বাইরে তাকিয়ে
হঠাৎ বিশ্ববিদ্যালয়ের দিন মনে পড়ে,

সেই স্মৃতি যেন
তোমাকে কষ্ট না দেয়।

বরং মনে হয়-

কী সুন্দর
একটি বয়স ছিল!

তার ভেতরে
যদি কোথাও
একটি ছেলেকেও মনে পড়ে,

তাকে নিয়ে
একটু হাসতে পারো।

সেই হাসিটুকু
আমার কাছে পৌঁছাবে না।
পৌঁছানোর প্রয়োজনও নেই।

তবু পৃথিবীর কোথাও
একটি পুরোনো স্মৃতি
কোমল হয়ে উঠবে।

সেটিই যথেষ্ট।

তোমার জন্য
শেষ প্রার্থনা-

তোমার বাকি পথ
আলোয় ভরা হোক-
আলো মানে দুঃখহীন জীবন নয়,
দুঃখের মধ্যেও পথ চিনতে পারার শক্তি।

তুমি ভালো থেকো।
যাদের সঙ্গে তোমার জীবন,
তাদের নিয়ে ভালো থেকো।
নিজের কাছে ভালো থেকো।

আর আমার জন্য
কিছুই করতে হবে না।

কারণ এত বছর পরে
তোমার জন্য আমার সবচেয়ে সত্য
প্রার্থনা এটুকুই-

আমি তোমার সুখের কারণ না হলেও,
কখনো যেন তোমার দুঃখের কারণ না হই।

যেদিন আর লিখব না

যেদিন আর লিখব না-

সেদিন কি
তোমার কথা মনে পড়বে না?

না।

লেখা থামা
আর স্মৃতি থামা
এক কথা নয়।

একদিন এই ধারাবাহিক কবিতার
শেষ পৃষ্ঠা আসবে।

কলম থামবে।

শিরোনাম ফুরোবে।

কিন্তু তার মানে
তুমি মুছে গেলে না।

বরং হয়তো
লেখার প্রয়োজনটাই শেষ হবে।

এত বছর ধরে
যে কথাগুলো
ভেতরে শব্দহীন ছিল,

তারা একে একে
কাগজে এসে বসবে।

তারপর একদিন
ভেতরে নীরবতা নামবে।

সেই নীরবতা
শূন্যতার নয়।
পূর্ণতার।

যেমন অনেকক্ষণ বৃষ্টি শেষে
আকাশ চুপ করে থাকে।

যেদিন আর লিখব না,
আমি হয়তো
পুরোনো কবিতাগুলো খুলে পড়ব।

দেখব-
কোথাও বিশ বছরের আমি।
কোথাও ত্রিশ বছরের দূরত্ব।
কোথাও প্রায় ষাটের
একজন মানুষ।

একই কাব্যের মধ্যে
কত বয়স!

আর তাদের মাঝখানে
তুমি।

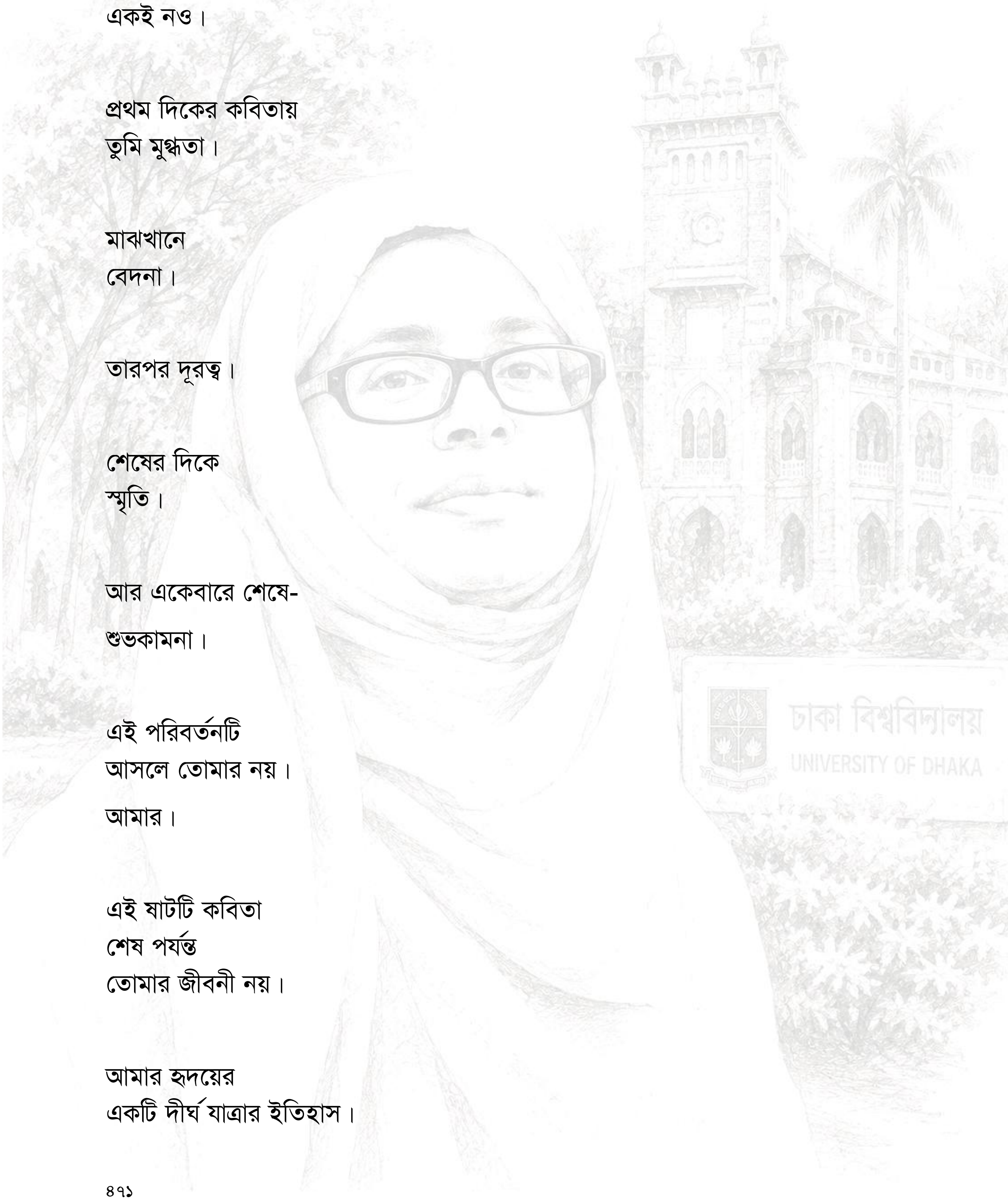

কিন্তু প্রতিটি কবিতার তুমি
একই নও।

প্রথম দিকের কবিতায়
তুমি মুগ্ধতা।

মাঝখানে
বেদনা।

তারপর দূরত্ব।

শেষের দিকে
স্মৃতি।

আর একেবারে শেষে-
শুভকামনা।

এই পরিবর্তনটি
আসলে তোমার নয়।
আমার।

এই ষাটটি কবিতা
শেষ পর্যন্ত
তোমার জীবনী নয়।

আমার হৃদয়ের
একটি দীর্ঘ যাত্রার ইতিহাস।

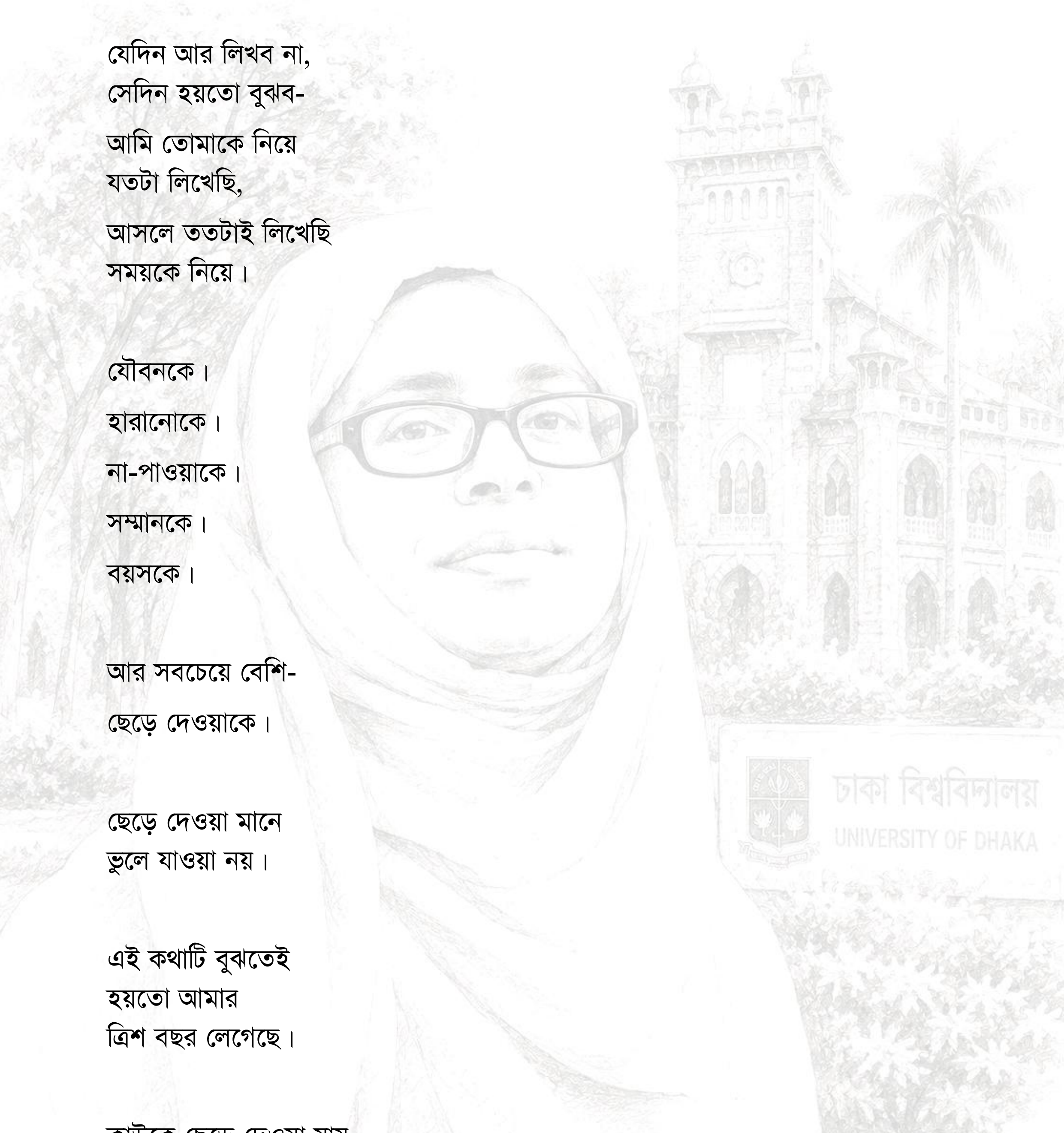

যেদিন আর লিখব না,
সেদিন হয়তো বুঝব-

আমি তোমাকে নিয়ে
যতটা লিখেছি,

আসলে ততটাই লিখেছি
সময়কে নিয়ে।

যৌবনকে।

হারানোকে।

না-পাওয়াকে।

সম্মানকে।

বয়সকে।

আর সবচেয়ে বেশি-

ছেড়ে দেওয়াকে।

ছেড়ে দেওয়া মানে
ভুলে যাওয়া নয়।

এই কথাটি বুঝতেই
হয়তো আমার
ত্রিশ বছর লেগেছে।

কাউকে ছেড়ে দেওয়া যায়
তার স্মৃতি না মুছেও।

কাউকে ভালো থাকা বলা যায়
তার জীবনে প্রবেশ না করেও।

কাউকে মনে রাখা যায়
তার ওপর কোনো দাবি না রেখেও।

যেদিন আর লিখব না,
এই শিক্ষাগুলো
আমার সঙ্গে থাকবে।

তখন তোমাকে নিয়ে
নতুন উপমা খুঁজব না।

পুরোনো ক্যাম্পাসের
নতুন দৃশ্য বানাব না।

একটি বেঞ্চকে
আর প্রশ্ন করব না-
সে এখনও আছে কি না।

করিডোরকে বলব না
আমাদের ফিরিয়ে দাও।

কারণ কিছু জায়গা
ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য নয়।

তারা শুধু
মনে থাকার জন্য।

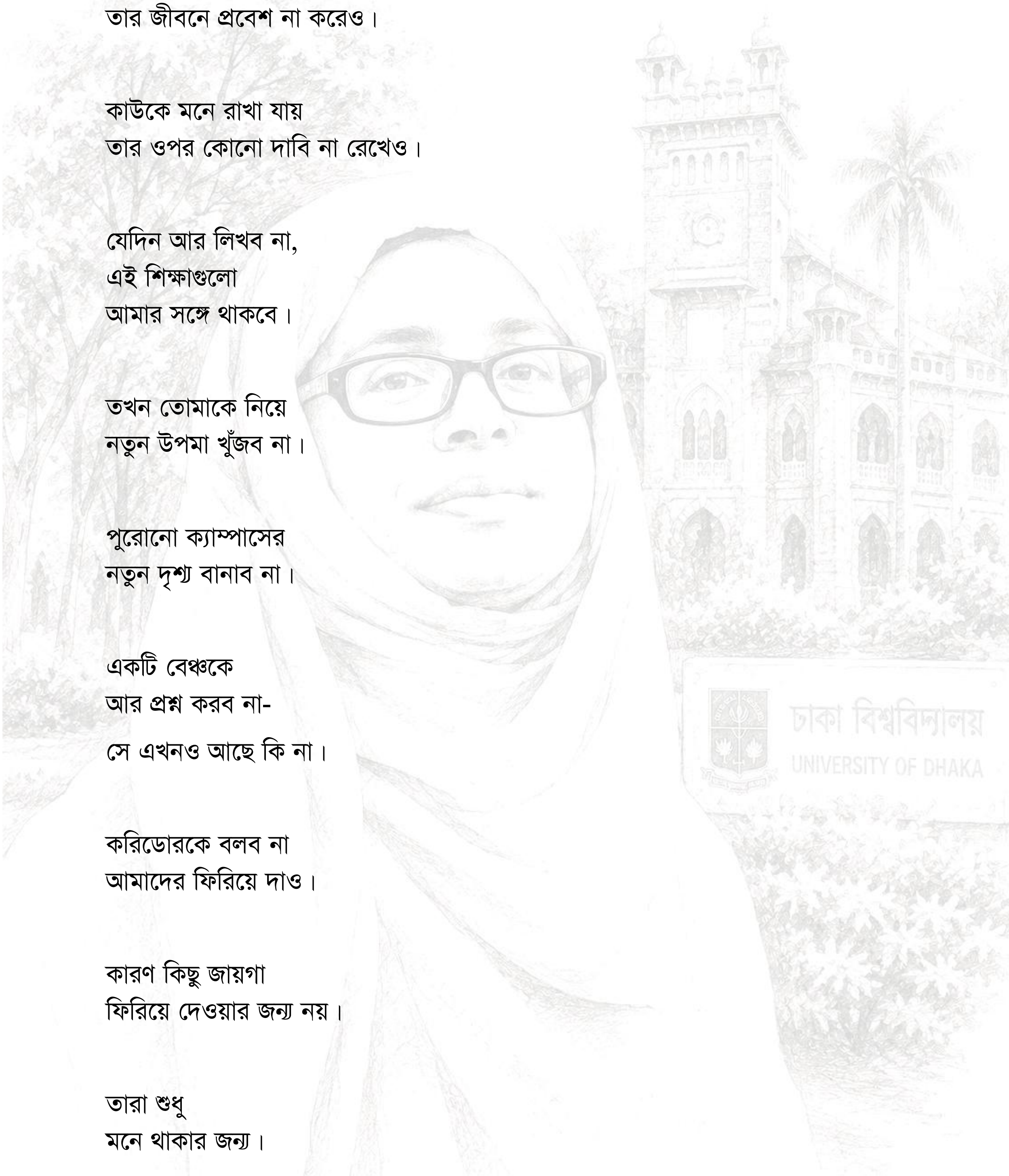

যেদিন আর লিখব না,
হারানো পাণ্ডুলিপির জন্যও
হয়তো আর কষ্ট থাকবে না।

কারণ বুঝব-
পাণ্ডুলিপিটি হারিয়ে না গেলে
এই নতুন কবিতাগুলো
হয়তো জন্মাত না।

তখনকার আমি
যা লিখেছিল,
আজকের আমি
তা হুবহু লিখতে পারতাম না।

আর আজ যা লিখছি,
তখনকার আমি
তার অর্থ বুঝত না।

দুই পাণ্ডুলিপির মাঝখানে
একটি জীবন।

এই জীবনটাই
আসল লেখা।

যেদিন আর লিখব না,
কলমটি টেবিলে রেখে
হয়তো জানালার পাশে বসব।

সন্ধ্যা নামবে।

আমি মনে মনে
১৯৯০-এ ফিরে যাব না।

বরং আজকের দিনেই থাকব।

কারণ অতীতকে সম্মান করার
সবচেয়ে সুন্দর উপায়
বর্তমানকে হারিয়ে না ফেলা।

আমি আমার বর্তমানের
মানুষদের দিকে ফিরব।
আমার কাজের দিকে।
আমার বাকি জীবনের দিকে।

তোমার স্মৃতিকে বলব-
তুমি এখানেই থাকো।

তোমাকে আর
প্রতিদিন শব্দ হতে হবে না।

তুমি অনেক কথা বলেছ।
এবার নীরব হও।

আর সেই ১৯৯০-এর ছেলেটিকে বলব-

তোমার পাণ্ডুলিপি
আমি ফিরিয়ে দিতে পারিনি।

কিন্তু তোমার গল্প
হারাতে দিইনি।

সে হয়তো জিজ্ঞেস করবে-

শেষ?

আমি বলব-

কবিতা শেষ।

ভালোবাসা?

এই প্রশ্নে
আমি একটু হাসব।

তারপর বলব-

তার উত্তর আর প্রয়োজন নেই।

কারণ সবকিছুর
শেষ সংজ্ঞা দিতে হয় না।

কিছু অনুভূতিকে
শেষ পঙ্‌ক্তির পরে
নীরবতায় রেখে দিতে হয়।

যেদিন আর লিখব না-

তোমাকে ভুলে যাওয়ার জন্য নয়।

বরং এতদিনের কথাগুলো
অবশেষে বলে ফেলার পরে
তোমাকে স্মৃতির মধ্যে
শান্তিতে থাকতে দেওয়ার জন্য।

সেদিন
আমি শেষ পাতাটি উল্টাব।

দেখব সামনে
আরেকটি সাদা পৃষ্ঠা।

কিন্তু সেখানে
তোমাকে নিয়ে লিখব না।

সাদা রেখেই
খাতা বন্ধ করব।

কারণ কিছু সাদা পৃষ্ঠা
অসম্পূর্ণতা নয়-

সমাপ্তির সবচেয়ে সুন্দর রূপ।

তারপর মনে মনে বলব-

“যা বলতে চেয়েছিলাম,
সব বলা হয়নি-
কখনো সব বলা যায়ও না।
তবু যতটুকু বলা হলো,
তার ভেতর দিয়ে
একটি তরুণ হৃদয় থেকে
একজন প্রায় ষাট বছরের মানুষের
দীর্ঘ পথটি লেখা রইল।”

আর সবশেষে-

“তুমি ভালো থেকো।
আমি এবার কলম রাখি।”

তবু তোমাকেই ভালোবেসেছিলাম

তোমায় দেবো নাকো তৃপ্তি, বিভোর সুখের মেতে,
অন্তর আমার সইবে নাকো তোমার বেদনার চিৎকারে।
তোমার সুখের মূল্য যদি আমার কাছে আসা,
দূরেই তবে থাকব আমি, দূরেই রাখব ভালোবাসা।

সেই কথাটি লিখেছিলাম যৌবনের প্রথম প্রহরে,
তোমায় প্রথম দেখার পরে বিশ্ববিদ্যালয়ের চত্বরে।
জানতাম না প্রেম কী তখন, জানতাম না তার ভাষা,
শুধু জানতাম তোমায় দেখলে বদলে যেত চারপাশটা।

ক্লাসের শেষে পথের বাঁকে হঠাৎ তোমায় যেতাম দেখে,
অকারণে মনটা আমার থমকে যেত তোমার দিকে।
কত মানুষ পাশ দিয়ে যায়-মনে থাকে কজন বলো?
তুমি গেলে মনে হতো, পথের শেষে নিভল আলো।

তোমার চোখে কী ছিল জানি আজকে আর তা বলতে নারি,
শুধু জানি সেই দৃষ্টিতে হার মেনেছিল মন-বিহারী।
চোখ নামিয়ে চলে যেতাম, কথা জমত বুকের তলে,
ফিরে এসে সেই কথারা কবিতা হতো কলম-ছলে।

একটি খাতা, দুটি চোখ আর নির্ঘুম কত রাত,
তোমায় ঘিরে জন্ম নিত শত শত না-বলা কথার পাত।
পাতার পরে পাতায় শুধু তোমার ছায়া এঁকে যেতাম,
যা মুখোমুখি বলতে নারি, নিভৃত রাতে লিখে রাখতাম।

সেই পাণ্ডুলিপি কোথায় গেল-আজকে আমি জানি না আর,
কোন ঘরের কোন অন্ধকারে হারিয়ে গেছে অক্ষর-ভার।
কাগজ গেছে, কালি গেছে, গেছে হাতের সেই লেখাটি,
তবু কেন যায়নি মুছে প্রথম প্রেমের স্মৃতিখানি?

তুমি জানোনি কত সন্ধ্যা তোমার নামে নেমেছিল,
জানোনি কত নীরব রাতে একটি কলম জেগেছিল।
জানোনি কত শব্দ এসে তোমার কাছে যেতে চেয়ে,
আমার খাতার ভেতরেই গেছে সারাজীবন থেমে রয়ে।

হয়তো তুমি বুঝেছিলে, হয়তো কিছুই বোঝোনি,
হয়তো আমার নীরব চোখের কোনো ভাষাই খোঁজোনি।
আজকে তার উত্তর খুঁজি না, চাই না কোনো ব্যাখ্যাও,
তোমার মনের অজানা কথা তোমার কাছেই থাকুক তাও।

তারপর একদিন তুমি আমায় বারণ করলে কাছে যেতে,
এক নিমেষে থেমে গেলাম তোমার দেওয়া সীমার প্রান্তে।
যে হৃদয়টি ছুটতে চাইত তোমার পথের পিছু পিছু,
তাকে বললাম-থামতে শেখো, ভালোবাসা দাবি কিছু?

আমি থামলাম।

শুধু পা নয়-
থামালাম আমার কাছে যাওয়ার সকল আয়োজন।
তোমার সামনে দাঁড়াব বলে খুঁজিনি আর কোনো কারণ,
কারণ তোমার একটি 'না'-ও তোমার পূর্ণ অধিকার,
ভালোবাসা সত্য হলেও ভাঙতে পারে না সেই দ্বার।

তবু কি মন থেমেছিল?

না।

মনকে তো আর আদেশ দিয়ে মুছে ফেলা যায় না কিছু,
কিছু মানুষ দূরে গেলেও স্মৃতি হাঁটে পিছু পিছু।
তাই তোমাকে দেখতে যাইনি-তোমার পথও আটকাইনি,
কিন্তু মনের গোপন ঘরে তোমার স্মৃতি ফেলে আসিনি।

এক বছর নয়, দুই বছর নয়-কেটে গেল তিনটি দশক,
কত বসন্ত, কত বর্ষা, কত শীতের দীর্ঘ আবর্ত।
পৃথিবী বদলেছে কত, বদলে গেছে আমার জীবন,
শুধু কোথাও নীরব হয়ে রয়ে গেল সেই প্রথম ক্ষণ।

আমি বেঁচেছি।

জীবন আমার তোমার কাছে থেমে থাকা কোনো ঘড়ি নয়,
তোমায় না-পাওয়ার বেদনায় নষ্ট করা জীবনও নয়।
কাজ করেছি, পথ চলেছি, দায়িত্বের ভার নিয়েছি,
হাসি-কান্নার হাজার দিনে নিজের জীবন আমি বেঁচেছি।

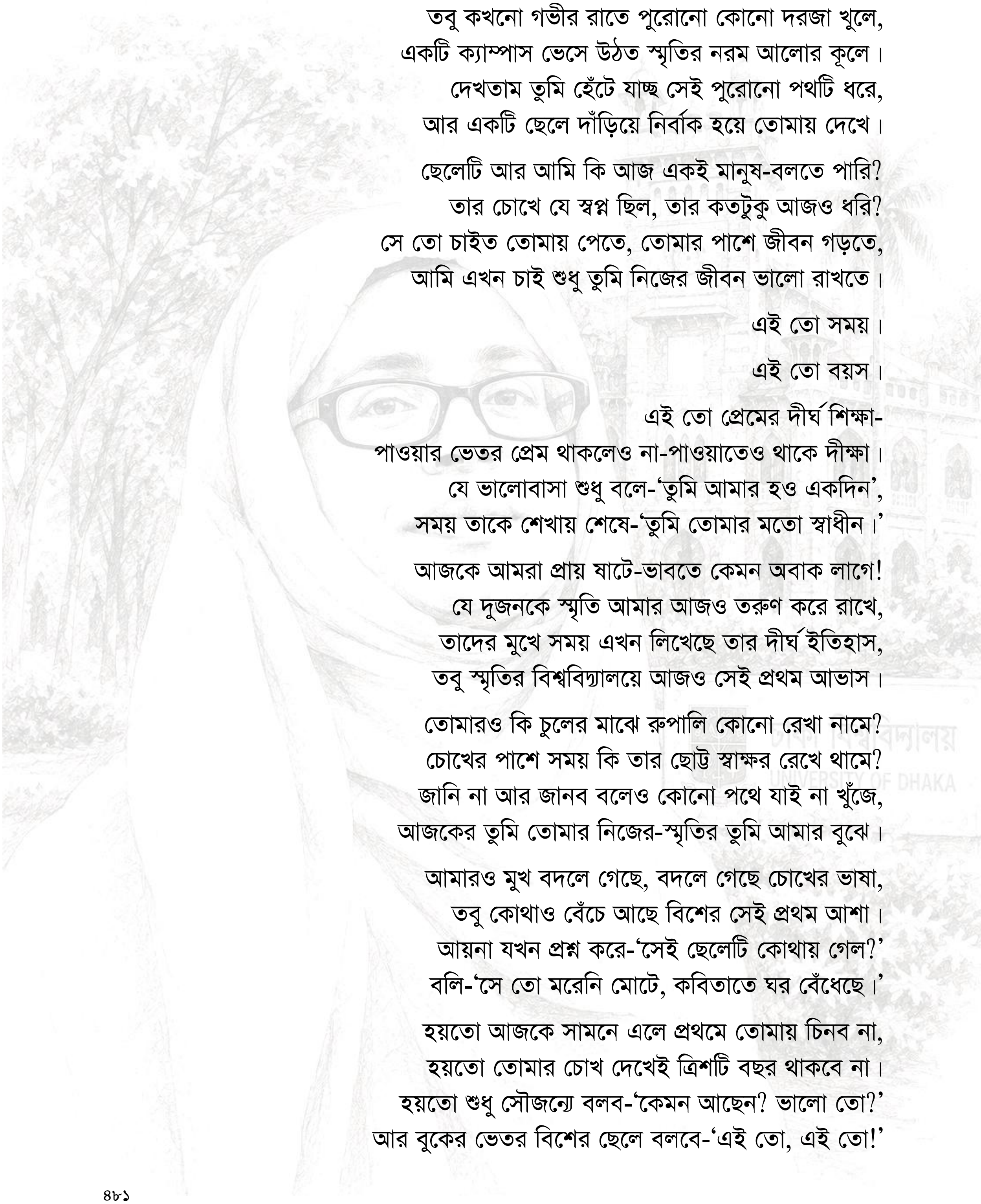

তবু কখনো গভীর রাতে পুরোনো কোনো দরজা খুলে,
একটি ক্যাম্পাস ভেসে উঠত স্মৃতির নরম আলোর কূলে।
দেখতাম তুমি হেঁটে যাচ্ছ সেই পুরোনো পথটি ধরে,
আর একটি ছেলে দাঁড়িয়ে নির্বাক হয়ে তোমায় দেখে।

ছেলেটি আর আমি কি আজ একই মানুষ-বলতে পারি?
তার চোখে যে স্বপ্ন ছিল, তার কতটুকু আজও ধরি?
সে তো চাইত তোমায় পেতে, তোমার পাশে জীবন গড়তে,
আমি এখন চাই শুধু তুমি নিজের জীবন ভালো রাখতে।

এই তো সময়।

এই তো বয়স।

এই তো প্রেমের দীর্ঘ শিক্ষা-
পাওয়ার ভেতর প্রেম থাকলেও না-পাওয়াতেও থাকে দীক্ষা।
যে ভালোবাসা শুধু বলে-'তুমি আমার হও একদিন',
সময় তাকে শেখায় শেষে-'তুমি তোমার মতো স্বাধীন।'

আজকে আমরা প্রায় ষাটে-ভাবতে কেমন অবাক লাগে!
যে দুজনকে স্মৃতি আমার আজও তরুণ করে রাখে,
তাদের মুখে সময় এখন লিখেছে তার দীর্ঘ ইতিহাস,
তবু স্মৃতির বিশ্ববিদ্যালয়ে আজও সেই প্রথম আভাস।

তোমারও কি চুলের মাঝে রুপালি কোনো রেখা নামে?
চোখের পাশে সময় কি তার ছোট্ট স্বাক্ষর রেখে থামে?
জানি না আর জানব বলেও কোনো পথে যাই না খুঁজে,
আজকের তুমি তোমার নিজের-স্মৃতির তুমি আমার বুঝে।

আমারও মুখ বদলে গেছে, বদলে গেছে চোখের ভাষা,
তবু কোথাও বেঁচে আছে বিশের সেই প্রথম আশা।
আয়না যখন প্রশ্ন করে-'সেই ছেলেটি কোথায় গেল?'
বলি-'সে তো মরেনি মোটে, কবিতাতে ঘর বেঁধেছে।'

হয়তো আজকে সামনে এলে প্রথমে তোমায় চিনব না,
হয়তো তোমার চোখ দেখেই ত্রিশটি বছর থাকবে না।
হয়তো শুধু সৌজন্যে বলব-'কেমন আছেন? ভালো তো?'
আর বুকের ভেতর বিশের ছেলে বলবে-'এই তো, এই তো!'

তবু তাকে থামিয়ে দেব-'শান্ত হও, এ সেই দিন নয়,
এই নারী তাঁর নিজের জীবন, তোমার কোনো স্মৃতিও নয়।
তুমি যাকে ভালোবেসেছিলে সে ছিল অন্য সময়ের আলো,
আজকে যিনি সামনে আছেন, তাঁকে তাঁর বর্তমানেই ভালো।'

হয়তো তুমি চিনবে আমায়, হয়তো চিনবে না কোনোদিন,
হয়তো আমার নামটি তোমার স্মৃতি থেকে হয়েছে বিলীন।
তার জন্যও দুঃখ নেই আর, অভিযোগও রাখব না,
আমার মনে আছ বলে তোমার মনেও থাকতে হবে না।

তোমার জীবনে আমার কোনো দাবি ছিল না-আজও নেই,
আমার জন্য তোমার মনে একটি জায়গা চাইও না সেই।
তোমার সুখের কোনো ছবিতে আমার মুখটি না-ই বা থাক,
তোমার ঘরের আলো জ্বলুক-আমার জন্য সেটিই থাক।

দূর থেকেই ভালো থেকো-এইটুকুই আজকের চাওয়া,
তোমার আকাশ তোমার থাকুক, তোমার হোক নিজের হাওয়া।
যারা তোমার আপন মানুষ, তাদের নিয়ে সুখে থেকো,
ক্লান্ত হলে আপন ঘরে শান্ত কোনো সন্ধ্যা রেখো।

কোনো সকালে জানলা খুলে আলো যদি ভালো লাগে,
কোনো বিকেল চায়ের কাপে পুরোনো দিন ফিরে জাগে,
কোনো রাতে হঠাৎ যদি বিশ্ববিদ্যালয় মনে পড়ে,
একটি ছেলেও যদি আসে অস্পষ্ট সেই স্মৃতির ঘরে-

তাকে নিয়ে দুঃখ কোরো না।

একটু শুধু হেসে নিয়ো।

ভাবতে পারো-
'একটি ছেলে ছিল বটে, কেমন করে তাকিয়ে থাকত!'
হয়তো তুমি জানোনি সে ফিরে গিয়ে কতটা লিখত।
সেটুকু যদি মনে পড়ে, আর কিছুই চাই না আমি,
স্মৃতি যেন বোঝা না হয়-এই প্রার্থনাই রেখে যাই।

ক্ষমা কোরো সেই ছেলেটি যদি কখনো ভুল করে থাকে,
নিজের প্রেমের তীব্রতাকে তোমার সত্য ভেবে থাকে।

ক্ষমা কোরো কবিতারা যদি তোমার হয়ে কথা বলে,
যে কথা তুমি বলোনি কোনোদিন-কল্পনারই ছদ্মছলে।

আজকে আমি তাদের বলি-
তার নীরবতায় শব্দ দিও না,
তার 'না'-এর মধ্যে লুকিয়ে কোনো গোপন 'হ্যাঁ' খুঁজো না।
তোমার প্রেমের সত্য তোমার-তার সত্যটিও তারই থাক,
দুটি সত্য পাশাপাশি থেকেও দূরের দুটি নদী হোক।

কারণ আজকে বুঝতে শিখি-প্রেম মানেই অধিকার নয়,
কাউকে গভীর ভালোবাসা তাকে পাওয়ার অঙ্গীকার নয়।
আমার চোখের জল দিয়ে তোমার পথের ঋণ হবে না,
আমার লেখা হাজার হলেও তোমায় পড়তে হবে না।

তুমি আমার কাছে কোনো অসমাপ্ত পাওনার নাম নও,
তুমি আমার ব্যর্থতারও কোনো পুরোনো অভিযোগ নও।
তুমি শুধু সেই মানুষটি, যাকে দেখে প্রথমবার
আমার ভেতর খুলে গিয়েছিল কবিতাদের গোপন দ্বার।

তাই তো বলি-

তোমায় আর চাই না আমি, তবু ভালোবাসা আছে,
চাওয়ার সকল আগুন নিভে শান্ত প্রদীপ জ্বলে কাছে।
এই ভালোবাসা তোমার পথে কোনো ছায়া ফেলবে না,
তোমার বন্ধ দরজাটিতে কোনোদিনও ঠেলবে না।

সে থাকবে আমারই ভেতর, একটি সময় হয়ে শুধু,
হারানো এক পাণ্ডুলিপির কালি-লাগা স্মৃতির মতো মধু।
সে বলবে না-'ফিরে এসো', বলবে না-'আমাকে চাও',
শুধু দূর থেকে বলবে-'তুমি তোমার মতো ভালো থাকাও।'

কী আশ্চর্য-

একদিন তোমায় পেতে চাওয়া ছিল প্রেমের সবচেয়ে বড় ভাষা,
আজকে তোমায় মুক্ত রাখাই হয়ে গেছে সেই ভালোবাসা।
একদিন তোমার কাছাকাছি যাওয়ার পথই খুঁজত মন,
আজকে তোমার দূরত্বটুকু রক্ষা করাই তার আপন।

এত বছরে এই কি তবে আমার সবচেয়ে বড় পাওয়া?
প্রেমকে তার দাবি থেকে মুক্ত করে ভালোবাসা?
যে অনুভূতি বলত আগে-'তোমায় ছাড়া পারব না',
সে-ই আজকে শান্ত স্বরে বলে-'তোমায় বাঁধব না।'

তোমার বেদনার বিনিময়ে তৃপ্তি আমি চাইনি সেদিন,
আজও চাই না-এই একটি সত্য রয়েছে অমলিন।
তখন শুধু অনুভবে তার গভীর অর্থ বুঝিনি,
আজকে প্রায় ষাটে এসে সেই কথাটাই নতুন চিনি।

তোমায় দেবো নাকো তৃপ্তি, বিভোর সুখের মেতে,
অন্তর আমার সইবে নাকো তোমার বেদনার চিৎকারে।

দেখো-

এতগুলো বছর ঘুরে
আবার এলাম সেই দুই পঙ্‌ক্তির কাছে।

যেখান থেকে শুরু হয়েছিল।

তখন লিখেছিল একটি ছেলে-
যে ভালোবাসত,
কিন্তু ভালোবাসার পূর্ণ অর্থ জানত না।

আজ সেই একই কথা লিখছে
প্রায় ষাটের একজন মানুষ-

যে জেনেছে,

প্রেমের সবচেয়ে কঠিন পাঠ
কাছে পাওয়া নয়,

কখনো কখনো
দূরে থাকার মধ্যেও
ভালোবাসাকে সত্য রাখা।

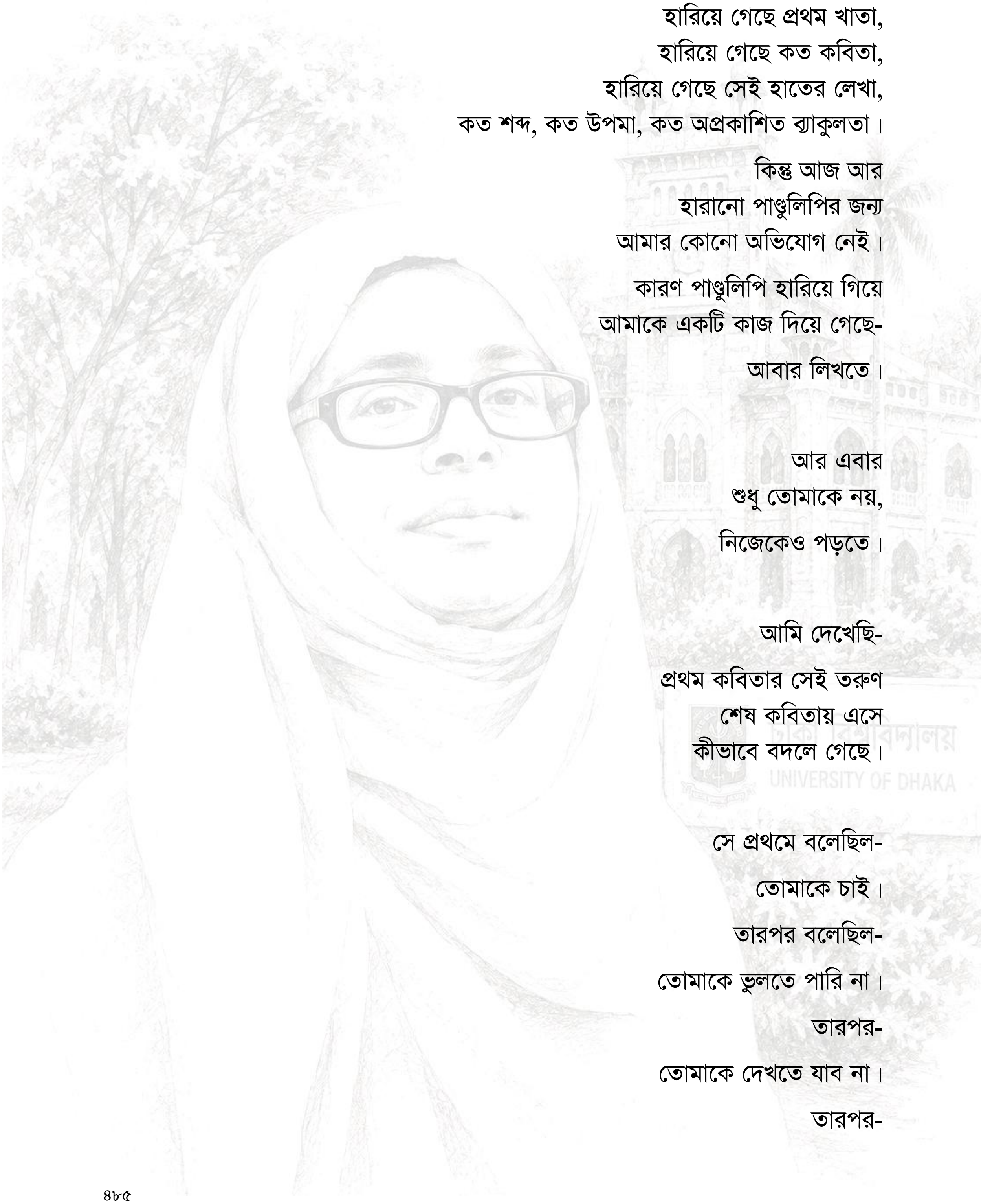

হারিয়ে গেছে প্রথম খাতা,
হারিয়ে গেছে কত কবিতা,
হারিয়ে গেছে সেই হাতের লেখা,
কত শব্দ, কত উপমা, কত অপ্রকাশিত ব্যাকুলতা।

কিন্তু আজ আর
হারানো পাণ্ডুলিপির জন্য
আমার কোনো অভিযোগ নেই।

কারণ পাণ্ডুলিপি হারিয়ে গিয়ে
আমাকে একটি কাজ দিয়ে গেছে-
আবার লিখতে।

আর এবার
শুধু তোমাকে নয়,
নিজেকেও পড়তে।

আমি দেখেছি-
প্রথম কবিতার সেই তরুণ
শেষ কবিতায় এসে
কীভাবে বদলে গেছে।

সে প্রথমে বলেছিল-
তোমাকে চাই।
তারপর বলেছিল-
তোমাকে ভুলতে পারি না।
তারপর-
তোমাকে দেখতে যাব না।
তারপর-

তুমি ভালো থেকো।

আর আজ-

তুমি স্বাধীন থেকো।

এই চারটি বাক্যের মাঝখানে
একটি জীবন কেটে গেল।

যদি কোনোদিন
এই ষাটটি কবিতা
তোমার হাতে এসে পড়ে,
প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত
পড়তেই হবে না।

হয়তো শুধু
প্রথম কবিতার প্রথম দুটি পঙ্‌ক্তি
আর শেষ কবিতার শেষ কয়েকটি পঙ্‌ক্তি পড়ো।

দেখবে-

মাঝখানে ত্রিশ বছরেরও বেশি সময়।

একদিকে একটি তরুণ হৃদয়।

অন্যদিকে
একজন প্রায় ষাট বছরের মানুষ।

কিন্তু তাদের মধ্যে
একটি সূক্ষ্ম সুতো একই-
তোমার অস্বস্তির বিনিময়ে
নিজের সুখ না-চাওয়া।

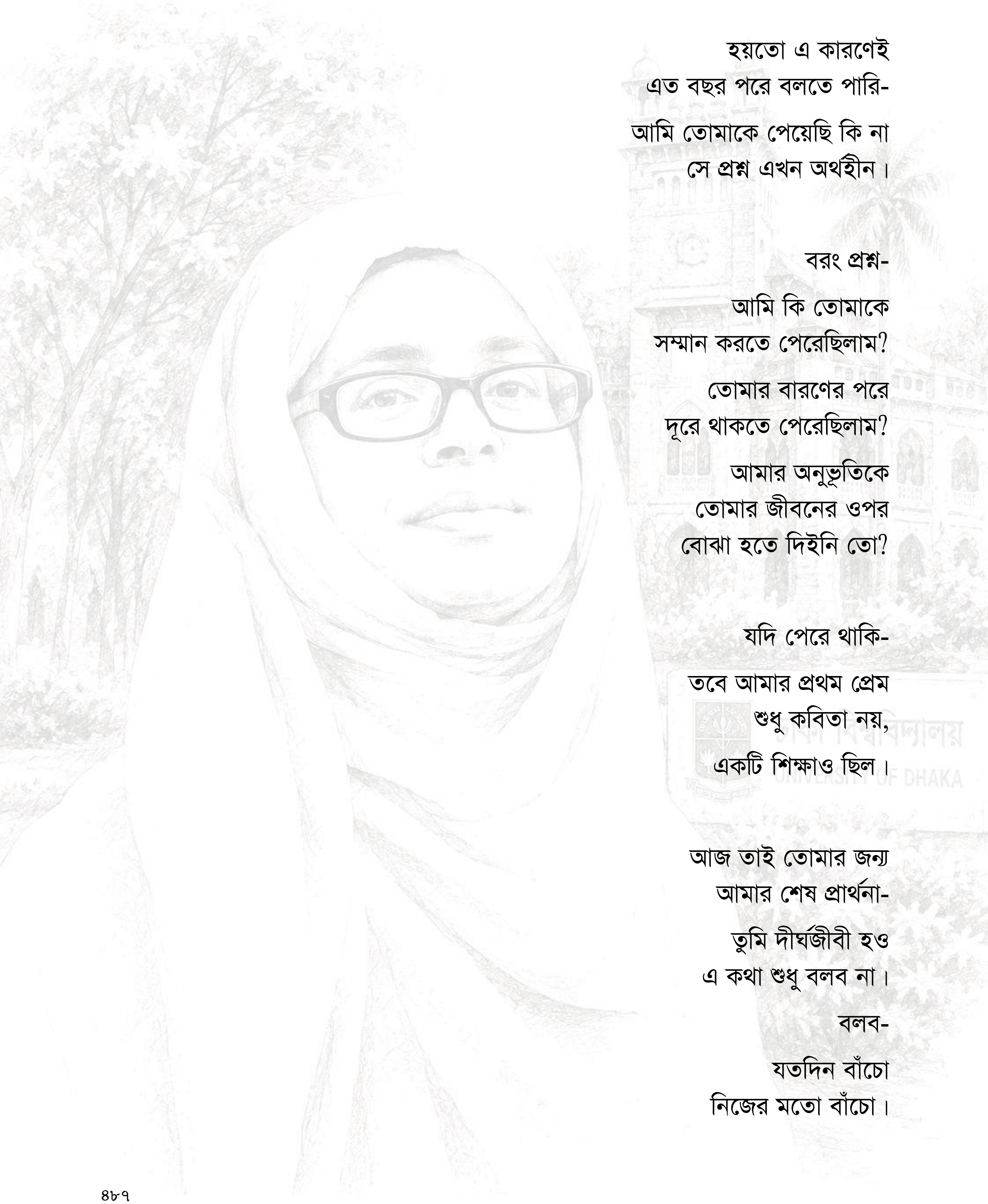

হয়তো এ কারণেই
এত বছর পরে বলতে পারি-
আমি তোমাকে পেয়েছি কি না
সে প্রশ্ন এখন অর্থহীন।

বরং প্রশ্ন-
আমি কি তোমাকে
সম্মান করতে পেরেছিলাম?
তোমার বারণের পরে
দূরে থাকতে পেরেছিলাম?
আমার অনুভূতিকে
তোমার জীবনের ওপর
বোঝা হতে দিইনি তো?

যদি পেরে থাকি-
তবে আমার প্রথম প্রেম
শুধু কবিতা নয়,
একটি শিক্ষাও ছিল।

আজ তাই তোমার জন্য
আমার শেষ প্রার্থনা-
তুমি দীর্ঘজীবী হও
এ কথা শুধু বলব না।
বলব-
যতদিন বাঁচো
নিজের মতো বাঁচো।

তোমার চারপাশে
যারা তোমাকে ভালোবাসে,
তাদের উষ্ণতা থাকুক।

যে মানুষগুলোর জন্য
তোমার সকাল শুরু হয়,
তারা ভালো থাকুক।

তোমার জীবনে
যদি কোনো দুঃখ থেকে থাকে,
সময় তাকে কোমল করুক।

আর যদি সুখে থাকো-
সে সুখ দীর্ঘ হোক।

আমার কোনো স্থান
সেখানে প্রয়োজন নেই।

কী অদ্ভুত!
যে ছেলে একদিন
তোমার জীবনে জায়গা চেয়েছিল,
আজ সেই মানুষই
নিজেকে সম্পূর্ণ সরিয়ে
তোমার জন্য সুখ চাইতে পারে।

এই পরিবর্তনকে
আমি পরাজয় বলি না।

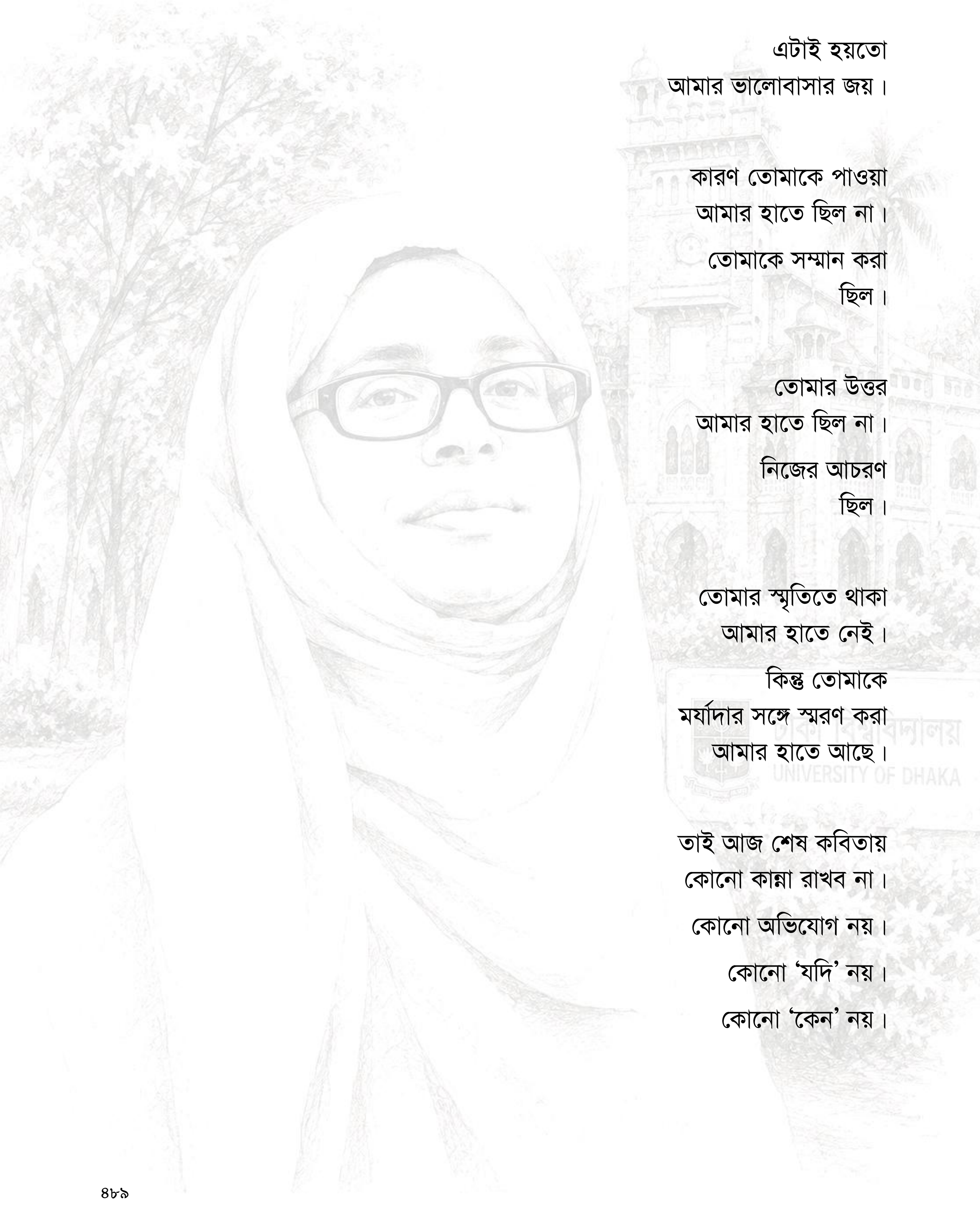

এটাই হয়তো
আমার ভালোবাসার জয়।

কারণ তোমাকে পাওয়া
আমার হাতে ছিল না।
তোমাকে সম্মান করা
ছিল।

তোমার উত্তর
আমার হাতে ছিল না।
নিজের আচরণ
ছিল।

তোমার স্মৃতিতে থাকা
আমার হাতে নেই।
কিন্তু তোমাকে
মর্যাদার সঙ্গে স্মরণ করা
আমার হাতে আছে।

তাই আজ শেষ কবিতায়
কোনো কান্না রাখব না।
কোনো অভিযোগ নয়।
কোনো 'যদি' নয়।
কোনো 'কেন' নয়।

শুধু একটি দীর্ঘ
কৃতজ্ঞতা।

ধন্যবাদ সেই প্রথম দেখাকে।
ধন্যবাদ সেই ক্যাম্পাসকে।
সেই করিডোর।
সেই বেঞ্চ।
সেই পথ।
সেই না-বলা কথাগুলো।

এমনকি-
ধন্যবাদ সেই বারণকেও।

কারণ সে আমাকে শিখিয়েছে
ভালোবাসারও সীমারেখা আছে।

আর ধন্যবাদ
এই দীর্ঘ দূরত্বকে-
যে আমাকে বুঝিয়েছে,
কাউকে ভুলে না গিয়েও
তার কাছ থেকে দূরে থাকা যায়।

তোমাকে ভালোবেসে
আমি তোমাকে পাইনি-
কিন্তু নিজের একটি গভীর অংশকে
প্রথম পেয়েছিলাম।

সেই অংশটির নাম ছিল-
কবিতা।

তুমি জানোনি।
আজও হয়তো জানো না।
জানার প্রয়োজনও নেই।

তবু সত্যটি রয়ে গেল-
একদিন একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের
সাধারণ দিনের মধ্যে
তুমি হেঁটে গিয়েছিলে।

তোমার কাছে
হয়তো সেটি ছিল
আর দশটি দিনের মতোই একটি দিন।

কিন্তু একটি ছেলের কাছে
সেদিন পৃথিবীর ভাষা বদলে গিয়েছিল।

সে ফিরে গিয়ে
কলম ধরেছিল।

তারপর একদিন
কলম থেমে গিয়েছিল।

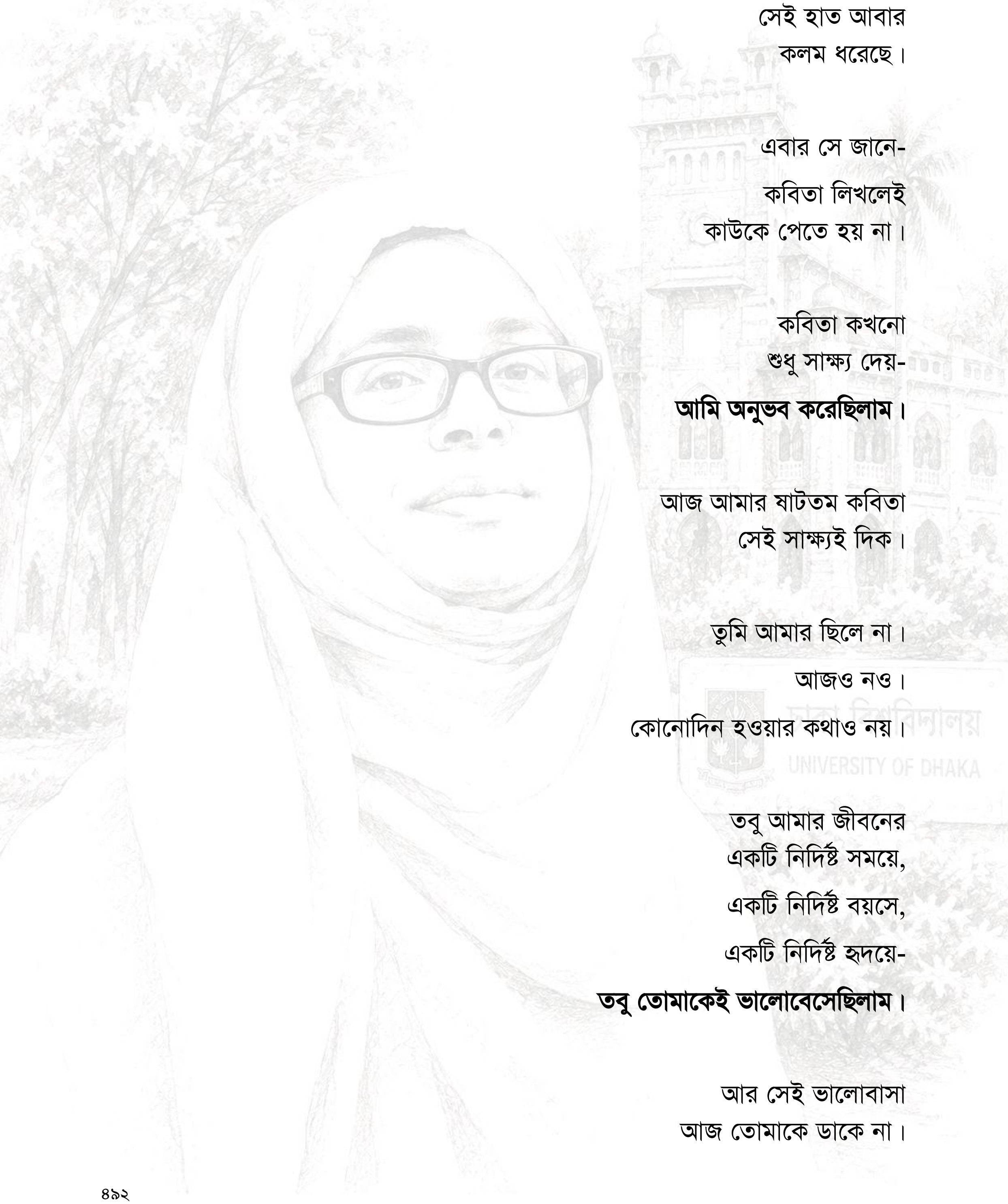

ত্রিশ বছরেরও বেশি পরে
সেই হাত আবার
কলম ধরেছে।

এবার সে জানে-
কবিতা লিখলেই
কাউকে পেতে হয় না।

কবিতা কখনো
শুধু সাক্ষ্য দেয়-
আমি অনুভব করেছিলাম।

আজ আমার ষাটতম কবিতা
সেই সাক্ষ্যই দিক।

তুমি আমার ছিলে না।
আজও নও।
কোনোদিন হওয়ার কথাও নয়।

তবু আমার জীবনের
একটি নির্দিষ্ট সময়ে,
একটি নির্দিষ্ট বয়সে,
একটি নির্দিষ্ট হৃদয়ে-
তবু তোমাকেই ভালোবেসেছিলাম।

আর সেই ভালোবাসা
আজ তোমাকে ডাকে না।

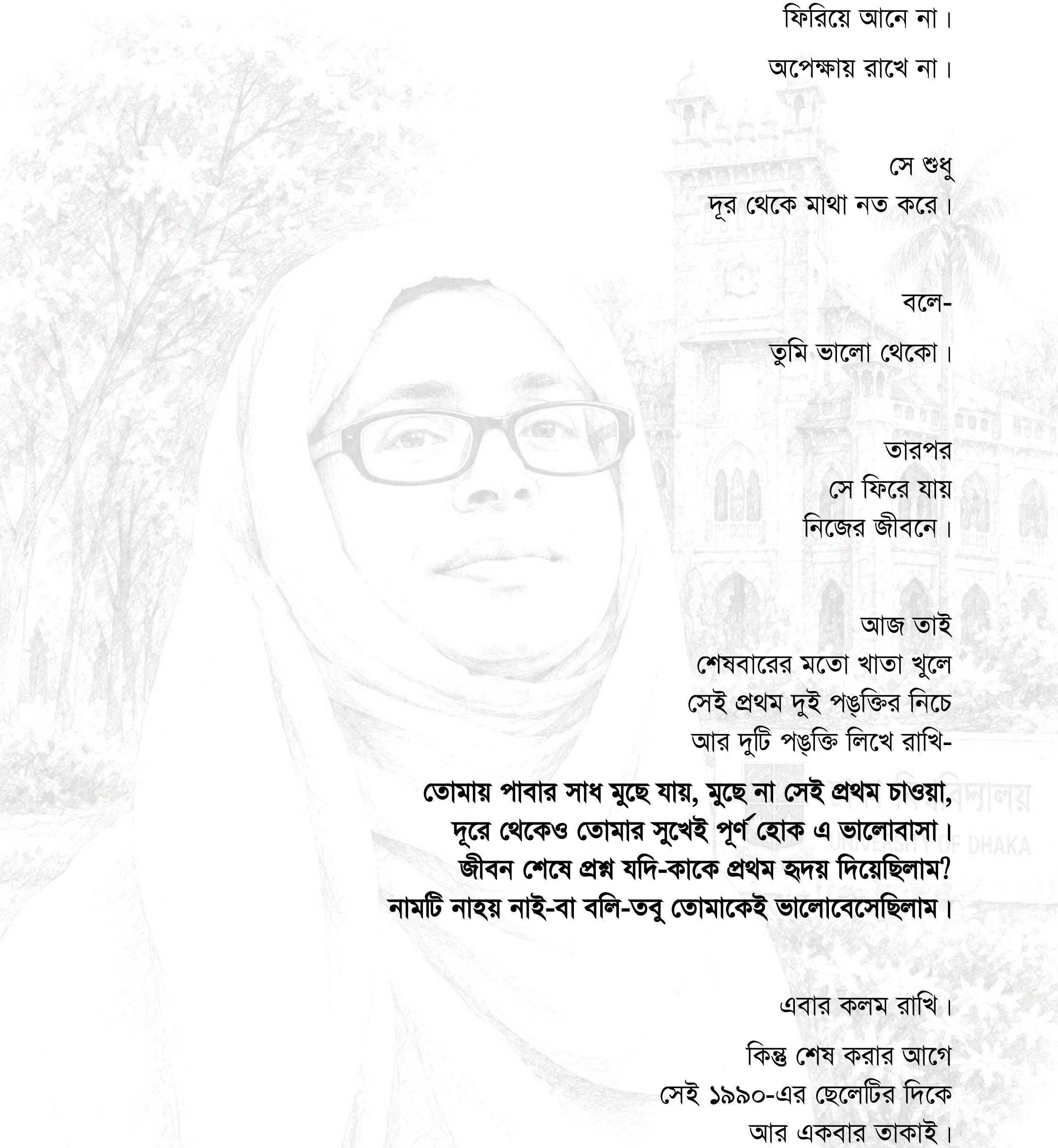

ফিরিয়ে আনে না।

অপেক্ষায় রাখে না।

সে শুধু
দূর থেকে মাথা নত করে।

বলে-

তুমি ভালো থেকো।

তারপর
সে ফিরে যায়
নিজের জীবনে।

আজ তাই
শেষবারের মতো খাতা খুলে
সেই প্রথম দুই পঙ্‌ক্তির নিচে
আর দুটি পঙ্‌ক্তি লিখে রাখি-

তোমায় পাবার সাধ মুছে যায়, মুছে না সেই প্রথম চাওয়া,
দূরে থেকেও তোমার সুখেই পূর্ণ হোক এ ভালোবাসা।
জীবন শেষে প্রশ্ন যদি-কাকে প্রথম হৃদয় দিয়েছিলাম?
নামটি নাহয় নাই-বা বলি-তবু তোমাকেই ভালোবেসেছিলাম।

এবার কলম রাখি।

কিন্তু শেষ করার আগে
সেই ১৯৯০-এর ছেলেটির দিকে
আর একবার তাকাই।

সে এখনও দাঁড়িয়ে আছে
বিশ্ববিদ্যালয়ের সেই পথে।

তুমি হেঁটে যাচ্ছ।

সে তাকিয়ে আছে।

আমি প্রায় ষাটের মানুষটি
তার পাশে গিয়ে দাঁড়াই।

বললাম-

চলো।

সে জিজ্ঞেস করে-

কোথায়?

আমি বলি-

সামনে।

সে একবার
তোমার চলে যাওয়া পথের দিকে তাকায়।

তারপর আমার সঙ্গে হাঁটে।

আমরা দুজন-

একই মানুষের
দুটি বয়স-

ধীরে ধীরে
ক্যাম্পাসের বাইরে চলে আসি।

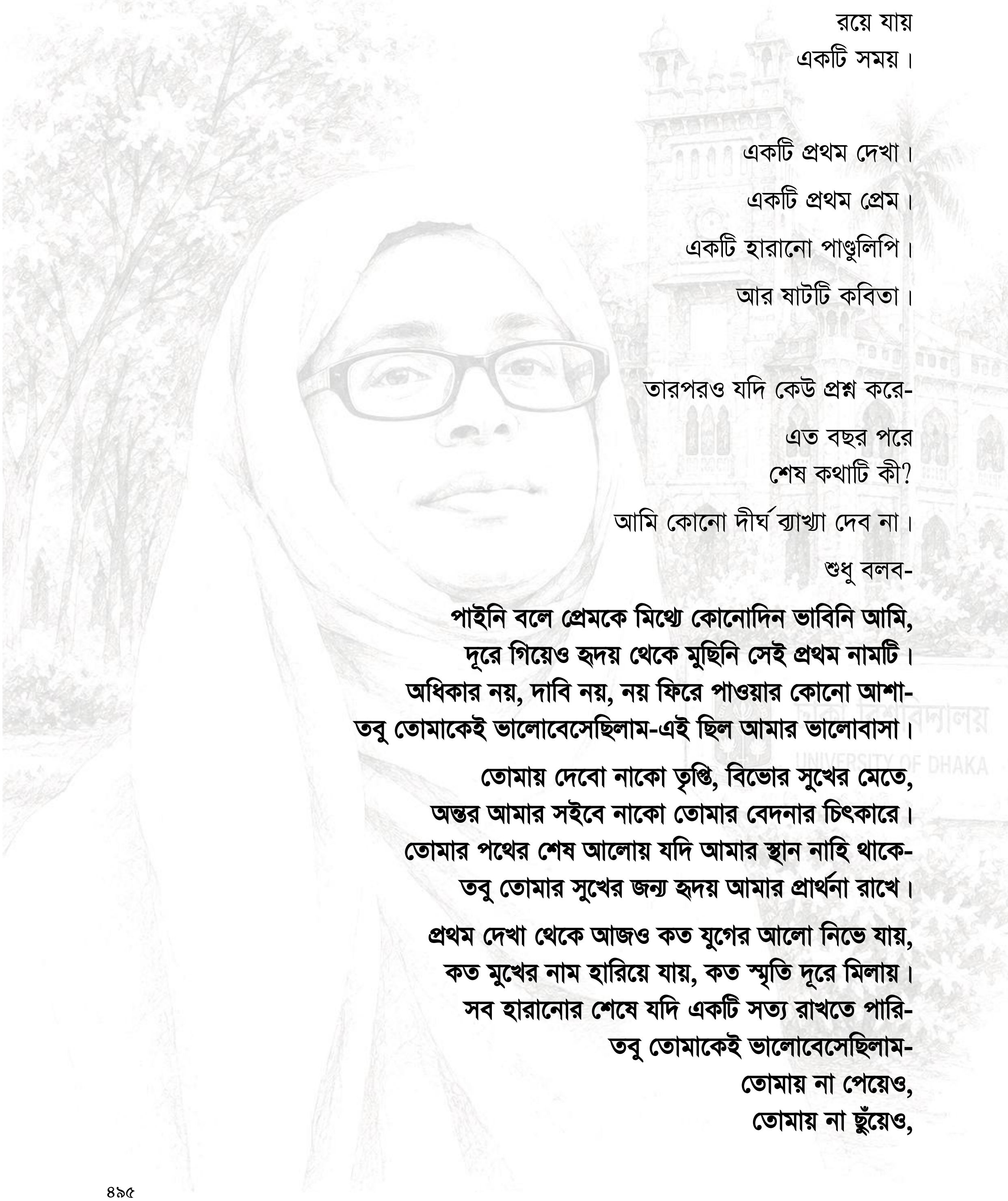

পেছনে তুমি রয়ে যাও না।

রয়ে যায়
একটি সময়।

একটি প্রথম দেখা।

একটি প্রথম প্রেম।

একটি হারানো পাণ্ডুলিপি।

আর ষাটটি কবিতা।

তারপরও যদি কেউ প্রশ্ন করে-

এত বছর পরে
শেষ কথাটি কী?

আমি কোনো দীর্ঘ ব্যাখ্যা দেব না।

শুধু বলব-

পাইনি বলে প্রেমকে মিথ্যে কোনোদিন ভাবিনি আমি,
দূরে গিয়েও হৃদয় থেকে মুছিনি সেই প্রথম নামটি।
অধিকার নয়, দাবি নয়, নয় ফিরে পাওয়ার কোনো আশা-
তবু তোমাকেই ভালোবেসেছিলাম-এই ছিল আমার ভালোবাসা।

তোমায় দেবো নাকো তৃপ্তি, বিভোর সুখের মেতে,
অন্তর আমার সইবে নাকো তোমার বেদনার চিৎকারে।
তোমার পথের শেষ আলোয় যদি আমার স্থান নাহি থাকে-
তবু তোমার সুখের জন্য হৃদয় আমার প্রার্থনা রাখে।

প্রথম দেখা থেকে আজও কত যুগের আলো নিভে যায়,
কত মুখের নাম হারিয়ে যায়, কত স্মৃতি দূরে মিলায়।
সব হারানোর শেষে যদি একটি সত্য রাখতে পারি-
তবু তোমাকেই ভালোবেসেছিলাম-
তোমায় না পেয়েও,
তোমায় না ছুঁয়েও,

তোমার স্বাধীনতাকে অক্ষুণ্ন রেখেই-
তবু তোমাকেই ভালোবেসেছিলাম।

- সমাপ্ত -

লেখকের কথা

কিছু কথা সময়মতো বলা হয় না। কিছু অনুভূতি প্রকাশের আলোই স্মৃতি হয়ে যায়। আর কিছু মানুষ জীবন থেকে দূরে চলে গেলেও মনের কোনো এক নির্জন জায়গায় থেকে যায়।

‘তুমি জানোকি’ তেমনই কিছু না-বলা কথার ফিরে আসা। যে অনুভূতির জন্ম বিশ্ববিদ্যালয় জীবনে, তাকে আমি কোনো প্রাপ্তি বা অধিকারের গল্প হিসেবে নির্মিনি। সময় ও দূরত্ব পেরিয়ে স্মৃতিতে যা রয়ে গেছে, কবিতার শুধু সেইটুকুই ধরতে চেয়েছি।

এ বইয়ের কবিতাগুলো তাই কাউকে ফিরে পাওয়ার আহ্বান নয়; বরং একসময় নীরবে ভালোবেসেছিলাম—সেই অনুভূতির প্রতি আমার স্বীকারোক্তি।

সব কথা যাকে নিয়ে লেখা, তাকে সব কথা জানতেই হবে—এমন নয়। কিছু কথা কবিতা হয়ে থাকাই হয়তো সুন্দর।

— ফারিস হাকিম

প্রকাশকের কথা

‘তুমি জানোকি’ কেবল একটি প্রেমের কবিতার বই নয়; এটি সময়, স্মৃতি এবং না-বলা অনুভূতির এক দীর্ঘ কাব্যিক যাত্রা। প্রথম দেখা থেকে জন্ম নেওয়া অনুভব সময়ের সঙ্গে দূরত্ব, স্মৃতি ও মনভায় রূপ নিয়েছে। এখানে প্রেমের দাবি নেই, অধিকার নেই—আছে দূর থেকে ভালো থাকার কবিতা।

পাঠক এই কবিতাগুলো পড়তে হয়তো নিজের জীবনের কোনো হারিয়ে যাওয়া সময়, মুখ কিংবা না-বলা কথাকেও খুঁজে পাবেন।

— প্রকাশক

ISBN: 978-984-35-9742-7

9 789843 597427

QR Code (DOI)

DOI Link (Digital Object Identifier)

https://doi.org/10.64907/xkmf.book.b2.15.08.26

ISBN DOI BARCODE

KMF PUBLISHERS